

রবীন্দ্র রচনাবলী
দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্র



Dr. J. K. Singh

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৯
মে ১৯৮২

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	শ্রীপদ্বিনবিহারী সেন
শ্রীক্ষুদিরাম দাশ	শ্রীভূদেব চৌধুরী
শ্রীভবতোষ দত্ত	শ্রীনেপাল মজুমদার
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীজগদীন্দ্র ভৌমিক

শ্রীশুভেন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
সচিব

প্রকাশক

লিঙ্কাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ। কলিকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রাকর

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড .
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন)

৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০ ০০১

সূচীপত্র

নিবেদন	[৭]
শিশু	১
উৎসর্গ	৫৫
খেয়া	১২১
গীতাঞ্জলি	১৯১
গীতিমালা	২৯৩
গীতালি	৩৬১
বলাকা	৪৩৩
পলাতকা	৪৯৩
শিশু ভোলানাথ	৫৩৯
পূরবী	৫৮৩
লেখন	৭১৯
মহুয়া	৭৬৭
বনবাণী	৮৪৭
পরিশেষ	৮৮৩
শিরোনাম-সূচী	৯৯৭
প্রথম ছত্রের সূচী	১০০৩

চিহ্নসূচী

সম্মুখীন পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ ১৯২০। আলবার্ট কাহ্ন ন গৃহীত রচিত আত্মোক্তিচিহ্ন	মুদ্রাপত্র
কন্যা বেলা সহ রবীন্দ্রনাথ। উইলিয়াম আর্চার-অঙ্কিত	২৫
রবীন্দ্রনাথ ১৯১২। উইলিয়াম রোটেমন্টাইন-কৃত পোর্ট্রসেল স্কেচ	১৯১
রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত	৪৩৩
রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯। বোরিস জর্জিয়েভ-অঙ্কিত	৭৬৯
বৃক্ষরোপণ উৎসব। নন্দলাল বসু-কৃত	৪৭৫

পান্ডুলিপিচিহ্ন

'একটি নমস্কারে, প্রভু'। গীতাজলি ১৭৮	২৮২
'তোমার সাথে নিত্য বিরোধ'। গীতাজলি ১৫০	২৮৩
'হে বিরাট নদী'। চণ্ডলা। বলাকা ৮	৪৫১
'আমার মন যে বলে'। পূর্ববী 'শীত'	৬৫৯
লেখন গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা	৭২২
লেখন গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	৭২৩

নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যার রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দলুপ্ত হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই বিবেচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ্য ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী দ্রুত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বহুতর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আয়োজন।

এখন দিকে বিপুল আয়তন রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যারা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং সুসম্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অবাবহিত পরবর্তীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত। যতই নালক্লেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ ভাঙল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংবলিত বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদেব নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যেক তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ষোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনাকর্মে যে-যত্ন প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সৌষ্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কাগজ মূল্য ইত্যাদির দ্রুতমূল্যে সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ ‘মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে’ না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সম্বয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
রবীন্দ্রভবন শান্তিনিকেতন
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন
শ্রীবিশ্বরূপ বসু
শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনকাৰ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের
নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
ও মদ্রঙ্গকাৰ্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্মীগণ সহযোগিতা ও
বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মদ্রঙ্গ সৌষ্ঠব, বিশেষত চিত্র
নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বাদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া
গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শিশু

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল-পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায়-গাথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

জানে না তারা সাতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা।
ডুবির ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে,
ছেলেরা নর্দী কুড়িয়ে পেয়ে
সাজায় বসি ভেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা।

ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রাঁচিছে গাথা তরল তানে,
দোলনা ধরি যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা।

জগৎ-পারাবারের তীরে
 ছেলেরা করে মেলা ।
 ঝঞ্জা ফিরে গগনতলে,
 তরণী ভুবে স্দদর জলে,
 মরণ-দত উড়িয়া চলে,
 ছেলেরা করে খেলা ।
 জগৎ-পারাবারের তীরে
 শিশুর মহামেলা ।

জন্মকথা

থোকা মাকে শূন্য ডেকে—
‘এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।’
মা শূনে কয় হেসে কেঁদে
থোকারে তার বদকে বেঁধে—
‘ইচ্ছা হয়ে ছিল মনের মাঝারে।’

ছিল আমার পুতুল-খেলায়,
প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিল পূজার সিংহাসনে,
তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে—
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের ‘পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিল কে জানে।

যৌবনেতে যখন হিরা
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিল সৌরভের মতো মিলিয়ে,
আমার তরুণ অঙ্গো অঙ্গো
ভুড়িয়ে ছিল সঙ্গো সঙ্গো
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমকয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ-স্রোতে
নতন হয়ে আমার বদকে বিলসি।

নির্নিমেবে তোমায় ছেলে
তোর রহস্য বদকি নে রে,
সময় ছিল আমার হালি কেমনে।

ওই দেহে এই দেহ চুমি
 মায়ের খোকা হয়ে তুমি
 মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
 বুকে চেপে রাখতে যে চাই.
 কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
 জানি নে কোন্‌ মায়ায় ফেঁদে
 বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
 আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে।

খেলা

তোমার কটি-তটের ধটি
 কে দিল রাঙিয়া।
 কোমল গায়ে দিল পরায়ে
 রাঙন আঙিয়া।
 বিহানবেলা আঙিনাতলে
 এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
 চরণ দুটি চলিতে ছুটি
 পড়িছে ভাঙিয়া।
 তোমার কটি-তটের ধটি
 কে দিল রাঙিয়া।

কিসের স্নেহে সহাস মৃৎ
 নাচিছ বাছনি,
 দুয়ার-পালে জননীর হাসে
 হেরিয়া নাচনি।
 তাথেই থেই তালির সাথে
 কাকন বাজে মায়ের হাতে,
 রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে
 বেগুর পাঁচনি।
 কিসের স্নেহে সহাস মৃৎ
 নাচিছ বাছনি।

ভিখারী ওরে, অমন করে
 শরম ভুলিয়া
 মাগিস কী বা মায়ের গ্রীবা
 আঁকড়ি কঁদলিয়া।

ওরে রে লোভী, ভুবনখানি
গগন হতে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দর্দী ললিত মৃঠি
দিব কি তুলিয়া ।
কী চাস ওরে অমন ক'রে
শরম তুলিয়া ।

নিখিল শোনে আকুল মনে
নন্দুর-বাজনা ।
তপন শশী হেরিছে বাস
তোমার সাজনা ।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মৃখে,
ভাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা ।
নিখিল শোনে আকুল মনে
নন্দুর-বাজনা ।

ঘুমের বর্ডি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী ।
গায়ের 'পরে কোমল করে
পরশ-বুলানী ।
মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি
ভগৎ-মাতা রয়েছে ভাগি,
ভুবন-মাঝে নিম্নত রাজে
ভুবন-ভুলানী ।
ঘুমের বর্ডি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী ।

খোকা

খোকায় চোখে যে ঘুম আসে
সকল তাপ-নাশা--
জান কি কেউ কোথা হতে যে
করে সে যাওয়া-আসা ।
শুনোছি রূপকথার গায়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দর্দীছে দর্দী পারুল-কুণ্ডি,
তাহারি মাঝে বাসা—

সেখান হতে খোকার চোখে
করে সে বাওয়া-আসা।

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে—
কোন দেশে যে জনম তার
কে কবে তাহা মোরে।
জুনেছি কোন শরৎ-মেঘে
শিশু-শশীর কিরণ লেগে
সে হাসিরূচি জনমি ছিল
শিশিররূচি ভোরে—
খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে।

খোকার গারে মিলিয়ে আছে
যে কঁচি কোমলতা—
জান কি সে যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা।
মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরান ছেয়ে
মাধুরীরূপে মূরছি ছিল
কহে নি কোনো কথা—
খোকার গারে মিলিয়ে আছে
যে কঁচি কোমলতা।

আশিস আশি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জান কি কেহ কোথা হতে সে
বরষে তার শিরে।
কাগুনে নব মলয়বাসে,
প্রাণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদণ্ডে,
আষাড়ে নব নীরে—
আশিস আশি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে।

এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে অঁধি—
ইহার ভর কে লবে আজি
ভোমরা জান তা কি।
হিরণ্যর কিরণ-কোলা
ধীরে এই দুখন-দোলা

তপন-শশী-তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি—
এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি।

ঘুমচোরা

কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া।
মা তখন জল নিতে ও পাড়ার দিঘিটিতে
গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া।—
তখন রোদের বেলা সবাই ছেড়েছে খেলা,
ও পারে নীরব চখা-চখীরা:
শালিখ থেমেছে খোপে, শূন্য পায়রার খোপে
বকাবাক করে সখা-সখীরা।
তখন রাখাল ছেলে পাঁচনি ধুলায় ফেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে বটতলাতে:
বাঁশ-বাগানের ছায়ে এক মনে এক পায়ে
খাড়া হয়ে আছে বক জলাতে।
সেই ফাঁকে ঘুমচোর ঘরেতে পশিয়া মোর
ঘুম নিয়ে উড়ে গেল গগনে,
মা এসে অবাক রয়, দেখে খোকা ঘরময়
হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সমনে।

আমার খোকার ঘুম নিল কে।
যেথা পাই সেই চোরে বাঁধিয়া আনিব ধরে
সে লোক লুকাবে কোথা হিলোকে।
যাব সে গৃহার ছায়ে কালো পাথরের গায়ে
কুল, কুল, বহে যেথা করনা।
যাব সে বকুলবনে নিরিবিলি যে বিজনে
ঘুমুয়া করিছে ঘর-করনা।
যেখানে সে বুড়া বট নামায়ে দিয়েছে ভট,
ঝিলি ডাকিছে দিনে নুপুদরে,
যেখানে বনের কাছে বনদেবতার নাচ
চাঁদিনিতে রুন্দরুন্দ নুপুদরে,
যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বৈদ্যন-মাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি
শূন্য মিনতি করে, ‘আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের আছে জানাশোনা কি।’

কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে।
কোনোমতে দেখা তার পাই যদি একবার

লই তবে সাধ মোর পদ্যারে ।
 দেখি তার বাসা খুঁজি কোথা ঘুম করে পুঁজি,
 চোরা ধন রাখে কোন্ আড়ালে ।
 সব লুটি লব তার, ভাবিতে হবে না আর
 খোকার চোখের ঘুম হারালে ।
 ডানা দুটি বেঁধে তারে নিয়ে যাব নদীপারে,
 সেখানে সে বসে এক কোণেতে
 ডলে শরকাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে
 দিন কাটাইবে কাশবনেতে ।
 যখন সাঁঝের বেলা ভাঙবে হাটের মেলা
 ছেলেরা মায়ের কোল ভরিবে,
 সারা রাত টিটি-পাখি টিটকারি দিবে ডাকি—
 'ঘুমচোরা কার ঘুম হরিবে ।'

অপযাশ

বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল ।
 কে তোরে যে কী বলেছে
 আমায় খুলে বল ।
 লিখতে গিয়ে হাতে মুখে
 মোখেছ সব কালি,
 নোংরা বলে তাই দিলেছে গালি :
 ছি ছি, উচিত এ কি ।
 পূর্ণশশী মাখে মসী
 নোংরা বলুক দেখি ।

বাছা রে, তোর সবাই ধরে দোষ ।
 আমি দেখি সকল-ভাতে
 এদের অসন্তোষ ।
 খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
 ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে
 তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে ।
 ছি ছি, কেমন ধারা ।
 ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে,
 সে কি লক্ষ্মীছাড়া ।

কান দিলো না তোমায় কে কী বলে ।
 তোমার নামে অপবাদ যে
 ক্রমেই বেড়ে চলে ।
 মিণ্টি ভূমি ভালোবাস
 তাই কি ঘরে পরে

লোভী বলে তোমার নিষ্পে করে।
ছি ছি, হবে কী।
তোমার যারা ভালোবাসে
তারা তবে কী।

বিচার

আমার খোকার কত যে দোষ
সে-সব আমি জানি,
লোকের কাছে মানি বা নাই মানি।
দৃষ্টিয় তার পারি কিংবা
নারি থামাতে,
ভালোমন্দ বোঝাপড়া
তাতে আমাতে।
বাহির হতে তুমি তারে
ষেমন কর দুষী
যত তোমার খুশি,
সে বিচারে আমার কী বা হয়।
খোকা বলেই ভালোবাসি,
ভালো বলেই নয়।

খোকা আমার কতখানি
সে কি তোমরা বোঝ।
তোমরা শুধু দোষ গুণ তার খোঁজ।
আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তারে কাদাই যে গো
আপনি কেন্দ্রে।
বিচার করি, শাসন করি,
করি তারে দুষী
আমার যাহা খুশি।
তোমার শাসন আমরা মানি নে গো।
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।

চাতুরী

আমার খোকা করে গো যদি মনে
এখনি উড়ে পারে সে যেতে
পারিজাতের বনে।
যায় না সে কি সাথে।

মায়ের বদকে মাথাটি ধুয়ে
সে ভালোবাসে থাকিতে শুয়ে,
মায়ের মদ্য না দেখে যদি
পরান তার কাঁদে।

আমার খোকা সকল কথা জানে।
কিন্তু তার এমন ভাষা,
কে বোঝে তার মানে।
মৌন থাকে সাথে?
মায়ের মদ্যে মায়ের কথা
শিখিতে তার কী আকুলতা,
তাকায় তাই বোবার মতো
মায়ের মদ্যচাঁদে।

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের পরে
ভিখারীটির মতো।
এমন দণ্ডা সাথে?
দীনের মতো করিয়া ডান
কাঁড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ,
তাই সে এল বসনহীন
সম্মতসীর ছাঁদে।

খোকা যে ছিল বাধন-বাধা-হারা—
সেখানে জাগে নতুন চাঁদ
ঘুমায় শূন্যতারা।
ধরা সে দিল সাথে?
অমিয়মাথা কোমল বদকে
হারাতে চাহে অসীম মদ্যে,
মদ্যকাত চেয়ে বাধন মিঠা
মায়ের মায়-ফাঁদে।

আমার খোকা কাঁদিতে জানিত না,
হাসির দেশে করিত শূন্য
মদ্যের আলোচনা।
কাঁদিতে চাহে সাথে?
মদ্যমদ্যের হাসিটি দিয়া
টানে সে বটে মায়ের হিরা,
কান্না দিলে বাধার ফাঁসে
মিথগল বলে বাঁধে।

নির্মলিন্দ

বাছা রে মোর বাছা,
 ধূলির পরে হরষভরে
 লইয়া তুণগাছা
 আপন মনে খেলিছ কোণে,
 কাটিছে সারা বেলা।
 হাসি গো দেখে এ ধূলি মেখে
 এ তুণ লয়ে খেলা।

আমি যে কাজে রত,
 লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
 হিসাব করি কত,
 আঁকের সারি হতেছে ভারী
 কাটিয়া যায় বেলা—
 ভাবিছ দেখি মিথ্যা একি
 সময় নিয়ে খেলা।

বাছা রে মোর বাছা,
 খেলিতে ধূলি গিরেছি ভূলি
 লইয়ে তুণগাছা।
 কোথায় গেলে খেলেনা মেলে
 ভাবিয়া কাটে বেলা,
 বেড়াই খুঁজি করিতে পুঁজি
 সোনারপার জেলা।

যা পাও চারি দিকে
 তাহাই ধরি ভুলিছ গড়ি
 মনের স্খলটিকে।
 না পাই যারে চাহিয়া তারে
 আমার কাটে বেলা,
 আশাতীতেরই আশায় ফিরি
 ভাসাই মোর ভেলা।

কেন মধুর

রাঙন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
 তখন বদ্বি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
 এত রঙ খেলে মেখে, জলে রঙ ওঠে জেগে,
 কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
 রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
 আপন হৃদয়-মাঝে বৃষ্টি রে তবে,
 পাতায় পাতায় বনে ধরনি এত কী কারণে,
 ঢেউ বহে নিজ মনে তরল যবে,
 বৃষ্টি তা তোমারে গান শুনাই যবে।

যখন নবনী দিই লোলমুগ করে
 হাতে মৃদে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
 তখন বৃষ্টিতে পারি স্বাদ কেন নদীবারি,
 ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে,
 যখন নবনী দিই লোলমুগ করে।

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
 হাসিটি ফুটায় তুলি তখন জানি
 আকাশ কিসের স্নেহে আলো দেয় মোর মৃদে,
 বায়ু দিয়ে যায় বৃকে অমৃত আনি—
 বৃষ্টি তা চুমিলে তোর বদনখানি।

খোকার রাজ্য

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
 আমি যদি পারি বাসা নিতে—
 তবে আমি একবার
 ভগ্নাতের পানে তার
 চেয়ে দেখি বসি সে নিভতে।
 তার রবি লগ্নী তারা
 জানি নে কেমনধারা
 সভা করে আকাশের তলে,
 আমার খোকার সাথে
 গোপনে দিবসে রাতে
 শুনছি তাদের কথা চলে।
 শুনছি আকাশ তারে
 নামিয়া মাঠের পারে
 লোভায় রঙিন ধন হাতে,
 আসি শালবন-পরে
 মেঘেরা মন্ত্রণা করে
 খেলা করিবারে তার সাথে।
 যারা আমাদের কাছে
 নীরব গম্ভীর আছে,
 আশায় অতীত যারা সবে,

খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে।

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁষে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে
সকল উদ্দেশ-হারা
সকল ভূগোল-ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে -
যেথা আসে রাতিদিন
সর্ব ইতিহাস-হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া,
তারি যদি এক ধারে
পাই আমি বসিবারে
দেখি কারা করে আসা-যাওয়া।
তাহারা অদ্ভুত লোক,
নাই কারো দুঃখ শোক,
নেই তারা কোনো কর্মে কাজে,
চিন্তাহীন মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্পলোক-মাঝে।
সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ রাক্ষস পশু পাখি,
যাহা খুশি তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ভরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।

ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎ-মাঝের
অন্তঃপুরে—
তাই সে শোনে কত যে গান
কতই সুরে।
নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আকাশ পাতাল
মা রচেন খোকার খেলা-
ঘরের চাতাল।
ভিনি হাসেন, যখন শব্দ-
লতার দলে

খোকার কাছে পাতা নেড়ে
 প্রলাপ বলে।
 সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
 সূর্য শশী
 খোকার সাথে হাসে, যেন
 এক-কয়সী।
 সত্য বড়ো নানা রঙের
 মন্থোশ পরে
 শিশুর সনে শিশুর মতো
 গল্প করে।
 চরাচরের সকল কর্ম
 করে হেলা
 মা যে আসেন খোকার সঙ্গে
 করতে খেলা।
 খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি
 যা ইচ্ছে তাই—
 কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
 বিপর্যাস নাই।
 বোবাদেরও কথা কলান
 খোকার কানে,
 অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন
 চেতন প্রাণে।
 খোকার তরে গল্প রচে
 বর্ষা শরৎ,
 খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
 বিশ্বজগৎ।
 খোকা তারি মাঝখানেতে
 বেড়ায় ঘুরে,
 খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
 অন্তঃপুরে।

আমরা থাকি জগৎ-পিতার
 বিদ্যালয়ে—
 উঠেছে ঘর পাথর-গাথা
 দেয়াল লয়ে।
 জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে
 সূর্য শশী,
 নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে
 রণারণি।
 এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
 বৃক্ষ লতা,

যেন তারা বোঝেই নাকো
কোনোই কথা।
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এমনি জানে
যেন তারা সাত ভাগ্নেয়ে
কেউ না জানে।
মেঘেরা চায় এমনিরো
অবোধ ভাবে,
যেন তারা জানেই নাকো
কোথায় যাবে।
ভাঙা পদতুল গড়ায় ভূঁয়ে
সকল বেলা,
যেন তারা কেবল শব্দ
মাটির ঢেলা।
দীর্ঘ থাকে নীরব হয়ে
দিবারাশ্র,
নাগকনোর কথা যেন
গল্পমাত্র।
সুখদুঃখ এমনি বৃকে
চেপে রাখে,
যেন তারা কিছুমাত্র
গল্প নহে।
যেমন আছে তেমনি থাকে
যে যাহা তাই—
আর যে কিছু হবে এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরুদ্বন্দ্বায় থাকেন
কঠিন হয়ে,
আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন

মা গো, আমার ছুটি দিতে বল,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শব্দ পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বলছ শব্দর এখন সব,
না-হয় যেন সত্যি হল তাই,

একদিনও কি দূরবেলা হলে
 বিকেল হল মনে করতে নাই?
 আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে
 সন্ধ্যা ডুবে গেছে মাঠের শেষে.
 বাগ্দি-বুড়ি চুড়ি ভরে নিয়ে
 শাক তুলেছে পুকুর-ধারে এসে।
 আঁধার হল মাদার-গাছের তলা,
 কালি হয়ে এল দিঘির জল.
 হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
 মাঠের থেকে এল চাষীর দল।
 মনে কর্-না উঠল সাঁঝের তারা,
 মনে কর্-না সন্ধ্যা হল যেন!
 রাতের বেলা দূর যদি হয়
 দূরবেলা রাত হবে না কেন।

সমবায়ী

যদি খোকা না হয়ে
 আমি হতেম কুকুর-ছানা—
 তবে পাছে তোমার পাতে
 আমি মধু দিতে যাই ভাতে
 তুমি করতে আমার মানা?
 সত্যি করে বল্
 আমার করিস নে মা, ছল--
 বলতে আমার 'দূর দূর দূর।
 কোথা থেকে এল এই কুকুর'?
 যা মা, তবে যা মা.
 আমার কোলের থেকে নামা।
 আমি খাব না তোমার হাতে.
 আমি খাব না তোমার পাতে।

যদি খোকা না হয়ে
 আমি হতেম তোমার টিমে,
 তবে পাছে যাই মা, উড়ে
 আমার রাখতে শিকল দিয়ে?
 সত্যি করে বল্
 আমার করিস নে মা, ছল—
 বলতে আমার 'হতভাগা পাখি
 শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি'?

তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই বাব চলে।

বিচিত্র সাধ

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওলা বাজে ফেরি নিয়ে।
'চুড়ি চা—ই, চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চীনের পদতুল ঝড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুঁশি,
যখন খুঁশি যায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অম্নি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।

আমি যখন হাতে মেখে কালি
ঘরে ফিরি, সাড়ে চারটে বাজে,
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালী
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মাঝে।
কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পারের পরে।
গারে মাথায় লাগছে কত ধুলো,
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা,
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি।
ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মালী।

একটু বেশি রাত না হতে হতে
মা আমারে ঘুম পাড়াতে চায়।
জানলা দিয়ে দেখি চেরে পথে
পাগড়ি পরে পাহারওলা যায়।
অধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লন্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায়।

রাত হয়ে যায় দশটা-এগারোটা
 কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি।
 ইচ্ছে করে পাহারওলা হয়ে
 গলির ধারে আপন মনে জাগি।

মাস্টারবাবু

আমি আজ কানাই মাস্টার,
 পোড়ো মোর বেড়ালছানাটি।
 আমি ওকে মারি নে মা বেত,
 মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।
 রোজ রোজ দেরি করে আসে,
 পড়াতে দেয় না ও তো মন,
 ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
 যত আমি বলি 'শোন্ শোন্'।
 দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
 লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
 আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
 ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'।

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
 আমি ওরে বোঝাই মা কত—
 চুরি করে খাস নে কখনো,
 ভালো হোস গোপালের মতো।
 যত বলি সব হয় মিছে,
 কথা যদি একটিও শোনে—
 মাছ যদি দেখেছে কোথাও
 কিছুই থাকে না আর মনে।
 চড়াই পাখির দেখা পেলে
 ছুটে যায় সব পড়া ফেলে।
 যত বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
 দৃষ্টিমি করে বলে 'মিয়োঁ'।

আমি ওরে বলি বার বার,
 'পড়ার সময় তুমি পোড়ো—
 তার পরে ছুটি হয়ে গেলে
 খেলার সময় খেলা কোরো।'
 ভালোমানুষের মতো থাকে,
 আড়ে আড়ে চায় মৃদুপানে,
 এমনি সে ভান করে যেন
 যা বলি বুকেছে তার মানে।

একটু সদ্ব্যোগ বোঝে যেই
কোথা যায় আর দেখা নেই।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
ও কেবল বলে 'মিন্নো মিন্নো'।

বিস্ত্র

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুকি
আমরা যখন উড়িয়েছিলাম ফানুস।

আমি যখন খাওয়া-খাওয়া খেলি
খেলার খালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো করে মুখে দেয় মা পুরি।

সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি 'খুকি, পড়া করো'
দু হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে—
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো।

আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আন্তে আন্তে আসি গুড়িগুড়ি
তোমার খুকি অমনি কেন্দে ওঠে,
ও ভাবে বা এল জুজুবুড়ি।

আমি যদি রাগ করে কখনো
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি—
তোমার খুকি খিলখিলিয়ে হাসে।
খেলা করছি মনে করে ও কি।

সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি 'আসছে বাবা'
তাড়াতাড়ি চার দিকেতে চায়—
তোমার খুকি এমনি বোকা হাবা।

খোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাজা গাথা,
আমি বলি 'আমি গুরুদ্বন্দ্বাই',
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে 'দাদা'।

তোমার খুঁকি চাঁদ ধরতে চায়,
 গণেশকে ও বলে যে মা গান্ধুশ।
 তোমার খুঁকি কিচ্ছু বোঝে না মা,
 তোমার খুঁকি ভারি ছেলেমানুষ।

ব্যাকুল

অমন করে আঁছিস কেন মা গো,
 খোকারে তোর কোলে নিবি না গো?
 পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে
 কী যে ভাবিস আপন মনে,
 এখনো তোর হয় নি তো চুল বাঁধা।
 বৃষ্টিতে যায় মাথা ভিজ্ঞে,
 জানলা খুলে দেখিস কী যে—
 কাপড়ে যে লাগবে ধূলোকাঁদা।
 ওই তো গেল চারটে বেজে,
 ছুটি হল ইস্কুলে যে—
 দাদা আসবে মনে নেইকো সিঁটি।
 বেলা অম্নি গেল যায়,
 কেন আঁছিস অমন হয়ে—
 আঁজকে বুঝি পাস নি বাবার চিঠি।
 পেয়াদাটা কুঁলির থেকে
 সবার চিঠি গেল রেখে—
 বাবার চিঠি রোজ কেন সে দেয় না।
 পড়বে বলে আপনি রাখি,
 যায় সে চলে কুঁলি-কাঁধে,
 পেয়াদাটা ভারি দৃষ্টে সায়না।

মা গো মা, তুই আমার কথা শোন,
 ভাবিস নে মা, অমন সারা ক্ষণ।
 কালকে যখন হাটের বারে
 বাজার করতে যাবে পারে
 কাগজ কলম আনতে বলিস ঝিকে।
 দেখো ভুল করব না কোনো—
 ক খ থেকে মর্দন্য গ
 বাবার চিঠি আঁমিই দেব লিখে।
 কেন মা, তুই হাসিস কেন।
 বাবার মতো আঁমি যেন
 অমন ভালো লিখতে পারি নেকো,

লাইন কেটে মোটা মোটা
 বড়ো বড়ো গোটা গোটা
 লিখব যখন তখন তুমি দেখো।
 চিঠি লেখা হলে পরে
 বাবার মতো বুদ্ধি করে
 ভাবছ দেব ঝুলির মধ্যে ফেলে?
 কখনো না, আপনি নিজে
 বাব ভোমার পড়িয়ে দিয়ে,
 ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে।

ছোটোবড়ো

এখনো তো বড়ো হই নি আমি,
 ছোটো আছি ছেলেমানুষ বলে।
 দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
 বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।
 দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
 পাখির ছানা পোষে কেবল খাচার,
 তখন তারে এমনি বকে দেব!
 বলব, 'তুমি চুপটি করে পড়ো।'
 বলব, 'তুমি ডারি দৃষ্টে ছেলে—
 যখন হব বাবার মতো বড়ো।
 তখন নিজে দাদার খাচাখানা
 ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা।

সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
 নাবার জন্যে করব না তো তাড়া।
 ছাতা একটা ছাড়ে করে নিজে
 চটি পারে বেড়িয়ে আসব পাড়া।
 গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
 চৌকি এনে দিতে বলব ঘরে,
 তিনি যদি বলেন 'সেলোট কোথা?
 দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো'
 আমি বলব, 'খোকা তো আর নেই,
 হরেছি যে বাবার মতো বড়ো।'
 গুরুমশায় শুনে তখন কবে,
 'বাবুদশায়, আসি এখন তবে।'

খেলা করতে নিজে যেতে যাঠে
 ছুলা যখন আসবে বিকেল বেলা,

আমি তাকে ধমক দিয়ে কব,
 'কাজ করছি, গোল কোরো না মেলা।'
 রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়
 একলা যাব, করব না তো ভয়—
 মামা যদি বলেন ছুটে এসে
 'হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ে'
 বলব আমি, 'দেখছ না কি মামা,
 হয়েছে যে বাবার মতো বড়ো।'
 দেখে দেখে মামা বলবে, 'তাই তো,
 থোকা আমার সে থোকা আর নাই তো।'

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হব
 মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে
 আসবে যখন খিড়কি-দুরোর দিগে
 ভাববে 'কেন গোল শূনি নে ঘরে'।
 তখন আমি চাবি খুলতে শিখে
 যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি কিকে,
 মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি,
 'থোকা, তোমার খেলা কেমনতরো।'
 আমি বলব, 'মাইনে দিচ্ছি আমি,
 হয়েছে যে বাবার মতো বড়ো।'
 ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
 যত চাই মা, এনে দেব আবার।'

আশ্বিনেতে পূজোর ছুটি হবে,
 মেলা বসবে গাজনতলার হাটে,
 বাবার নৌকো কত দূরের থেকে
 লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।
 বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি,
 থোকা তেমনি থোকাই আছে বৃষ্টি,
 ছোটো ছোটো রঙিন জামা জুতো
 কিনে এনে বলবে আমার 'পরো'।
 আমি বলব, 'দাদা পরুক এসে,
 আমি এখন তোমার মতো বড়ো।'
 দেখছ না কি যে ছোটো মাপ জামার—
 পরতে গেলে অঁট হবে যে আমার।'

সমালোচক

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে।
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে।
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলাম?—বল্ মা সত্যি করে।

এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কী হবে।

তোর মূখে মা, যেমন কথা শুনি,
তেমন কেন লেখেন নাকো উনি।
ঠাকুরমা কি বাবাকে ককখনো।
রাজার কথা শোনায় নিকো কোনো।
সে-সব কথাগুণি
গেছেন বুঝি ভুলি?

স্নান করতে বেলা হল দেখে
তুমি কেবল যাও মা, ডেকে ডেকে—
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাক,
সে কথা তার মনেই থাকে নাকো।

করেন সারা বেলা
লেখা-লেখা খেলা।

বাবার ঘরে আমি খেলতে গেলে
তুমি আমায় বল, 'দুশ্টে ছেলে!'
বক আমায় গোল করলে পরে—
'দেখাছিস নে লিখছে বাবা ঘরে!'
বল্ তো, সত্যি বল্,
লিখে কী হয় ফল।

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে—
ক খ গ ঘ ঙ হ য ব র,
আমার বেলা কেন মা, রাগ কর।

বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে।

বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ।
আমি যদি নোটকা করতে চাই
অম্নি বল 'নষ্ট করতে নাই'।

সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?

বীরপুরুষ

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধ্য হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধুধু করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ— ভাবছ, 'এলেম কোথা!'
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধ্য হতেই গেছে গায়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো!'

এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে',
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা কর।'

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া, খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর—

এই চেনে দেখ্ আমার তলোয়ার,
 টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
 শূনে তারা লক্ষ দিয়ে উঠে
 চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁরে রে রে রে রে।'

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে,'
 আমি বলি, 'দেখো-না চুপ করে।'
 ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেন তাদের মাঝে,
 ঢাল তলোয়ার ঝন্ঝনিয়ে বাজে,
 কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
 শূনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
 কত লোক যে পাণিয়ে গেল ভরে,
 কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
 ভাবছ খোকা গেলই বৃদ্ধি মরে।
 আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
 বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে,'
 তুমি শূনে পার্লিক থেকে নেমে
 চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমার কোলে—
 বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
 কী দুর্দশাই হত তা না হলে।'

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
 এমন কেন সঁতা হয় না, আহা।
 ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
 শূনত যারা অবাক হত সবে,
 দাদা বলত, 'কেমন করে হবে,
 খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।'
 পাড়ার লোকে সবাই বলত শূনে,
 'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো;
 সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।
 রূপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
 থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।
 সাত-মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সন্মোরানী,
 সাত রাজার ধন মানিক-গাঁথা গলার মালাখানি।

আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে,
আমি ছাড়া আর কেহ তো পার না খুঁজে তারে।
দু হাতে তার কাকন দুটি, দুই কানে দুই দুলা,
খাটের থেকে মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তার মানিকগুঁলি পড়বে ঝরে ভূয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোন মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হলে
আমি তখন চুপি চুপি যাই সে ছাদে চলে।
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা, যেই কোণে
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন মনে।
সঙ্গে শব্দ নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সেও জানে নাপিত ভায়া কোন্‌খানেতে থাকে।
জানিস নাপিতপাড়া কোথায়? শোন মা, কানে কানে
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে;
জাল টেনে নেয় জেলে,
গোরু মহিষ সাতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধ্য হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে:
শব্দ রাতদুপুরে
শেয়ালাগলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙার 'পরে।
মা, যদি হও রাজি,

বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

দুর্দেহি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেখান
চখাচখী বত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর:
মানিক-জোড়ের ঘর,
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের পর।
সন্ধ্যা হলে কত দিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখোঁছি একমনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

এ-পার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলেমেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমার
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হলে—
আসব তখন চলে
'বড়ো খিদে পেয়েছে গো—
খেতে দাও মা' বলে।
আবার আমি আসব ফিরে
অধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

নৌকাযাত্রা

মধু মাঝির ওই যে নৌকোখানা
 বাধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
 কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
 বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
 আমার যদি দেয় তারা নৌকাটি
 আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
 পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা--
 মিথ্যে ঘরে বেড়াই নাকো হাটে।
 আমি কেবল যাই একটিবার
 সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন
 বসে বসে একলা ঘরের কোণে—
 আমি তো মা, যাচ্ছি নেকো চলে
 রামের মতো চোন্দ বছর বনে।
 আমি যাব রাজপুত্র হয়ে
 নৌকো-ভরা সোনামানিক বয়ে,
 আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
 আমরা শূদ্ধ যাব মা তিন জনে।
 আমি কেবল যাব একটিবার
 সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ভোরের বেলা দেব নৌকো ছেড়ে,
 দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে।
 দুপুরবেলা তুমি পুকুরঘাটে,
 আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
 পেরিয়ে যাব তিরুপুর্নির ঘাট,
 পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
 ফিরে আসতে সম্ভব হয়ে যাবে,
 গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
 আমি কেবল যাব একটিবার
 সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ছুটির দিনে

ওই দেখো মা, আকাশ ছেয়ে
 মিলিয়ে এল আলো,
 আজকে আমার ছুটোছুটি
 লাগল না আর ভালো।

ঘণ্টা বেজে গেল কখন,
 অনেক হল বেলা।
 তোমায় মনে পড়ে গেল,
 ফেলে এলেম খেলা।
 আজকে আমার ছুটি, আমার
 শনিবারের ছুটি।
 কাজ যা আছে সব রেখে আয়
 মা তোর পারে লুটি।
 শ্বাবারের কাছে এইখানে বোস,
 এই হেথা চৌকাঠ—
 বল্ আমারে কোথায় আছে
 তেপান্তরের মাঠ।

ওই দেখো মা, বর্ষা এল
 ঘনঘটায় ঘিরে,
 বিজুলি ধায় একেবেঁকে
 আকাশ চিরে চিরে।
 দেবতা যখন ডেকে ওঠে
 থরথরিয়ে কেঁপে
 ভয় করতেই ভালোবাসি
 তোমায় বৃকে চেপে।
 ঝড়ঝড়পিয়ে বৃষ্টি যখন
 বাঁশের বনে পড়ে
 কথা শুনতে ভালোবাসি
 বসে কোণের ঘরে।
 ওই দেখো মা, জানলা দিয়ে
 আসে জলের ছাউ—
 বল্ গো আমার কোথায় আছে
 তেপান্তরের মাঠ।

কোন্ সাগরের তীরে মা গো,
 কোন্ পাহাড়ের পারে,
 কোন্ রাজাদের দেশে মা গো,
 কোন্ নদীটির ধারে।
 কোনোখানে আল বাঁধা তার
 নাই ডাইনে বাঁয়ে?
 পথ দিয়ে তার সম্মুখেলায়
 পেঁপে না কেউ গাঁয়ে?
 সারা দিন কি ধু ধু করে
 শুকনো ঘাসের জমি?

একটি গাছে থাকে শূন্য
 ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গামি ?
 সেখান দিয়ে কাঠকুড়নি
 যায় না নিয়ে কাঠ ?
 বল্ গো আমার কোথায় আছে
 তেপান্তরের মাঠ।

এমনিভাবে মেঘ করেছে
 সারা আকাশ বোপে,
 রাজপুস্তুর যাচ্ছে মাঠে
 একলা ঘোড়ায় চেপে।
 গজমোতির মালাটি তার
 বৃকের পরে নাচে—
 রাজকন্যা কোথায় আছে
 খোঁজ পেলে কার কাছে।
 মেঘে যখন ঝিলিক মারে
 আকাশের এক কোণে
 দুয়োরানী-মায়ের কথা
 পড়ে না তার মনে ?
 দুখিনী মা গোয়ালঘরে
 দিচ্ছে এখন ঝাটি,
 রাজপুস্তুর চলে যে কোন
 তেপান্তরের মাঠ।

ওই দেখো মা, গাঁয়ের পথে
 লোক নেইকো মোটে,
 রাখাল-ছেলে সকাল করে
 ফিরেছে আঙ গোঠে।
 আজকে দেখো রাত হয়েছে
 দিন না যেতে যেতে,
 কৃষাণেরা বসে আছে
 দাওয়ায় মাদুর পেতে।
 আজকে আমি নৃকিয়েছি মা,
 পৃথিবীর যত—
 পড়ার কথা আঙ বোলো না।
 যখন বাবার মতো
 বড়ো হব তখন আমি
 পড়ব প্রথম পাঠ—
 আজ বোলো মা, কোথায় আছে
 তেপান্তরের মাঠ।

বনবাস

বাবা যদি রাগের মতো
 পাঠায় আমার বনে
 যেতে আমি পারি নে কি
 তুমি ভাবছ মনে?
 চোন্দ বছর ক' দিনে হয়
 জানি নে মা ঠিক,
 দণ্ডকবন আছে কোথায়
 ওই মাঠে কোন দিক।
 কিন্তু আমি পারি যেতে,
 ভয় করি নে তাতে—
 লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
 থাকত সাথে সাথে।

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
 বেঁধে নিতেম ঘর—
 সামনে দিলে বহিত নদী,
 পড়ত বালির চর।
 ছোটো একটি থাকত ডিঙি
 পারে যেতেম বেয়ে—
 হরিণ চরে বেড়ায় সেথা,
 কাছে আসত ধৈয়ে।
 গাছের পাতা খাইয়ে দিতেম
 আমি নিজের হাতে—
 লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
 থাকত সাথে সাথে।

কত যে গাছ ছেয়ে থাকত
 কত রকম ফুলে,
 মালা গেঁথে পরে নিতেম
 জড়িয়ে মাথার চুলে।
 নানা রঙের ফলগুঁড়ি সব
 ভুঁয়ে পড়ত পেকে,
 ঝড়ি ভরে ভরে এনে
 ঘরে দিতেম রেখে;
 খিদে পেলে দুই ভাগ্নেতে
 খেতেম পদ্মপাতে—
 লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
 থাকত সাথে সাথে।

রোদের বেলায় অশথ-তলায়
 ঘাসের 'পরে আসি
 রাখাল-ছেলের মতো কেবল
 বাজাই বসে বাঁশি।
 ডালের 'পরে ময়ূর থাকে,
 পেখম পড়ে ঝুলে—
 কাঠবিড়ালি ছুটে বেড়ায়
 ন্যাজিটি পিঠে তুলে।
 কখন আমি ঘুমিয়ে যেতেম
 দূরবেলায় তাতে—
 লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
 থাকত সাথে সাথে।

সন্ধ্যাবেলায় কুড়িয়ে আনি
 শুকোনো ডালপালা,
 বনের ধারে বসে থাকি
 আগুন হলে জ্বালা।
 পাখিরা সব বাসায় ফেরে,
 দূরে শেয়াল ডাকে,
 সন্ধ্যতারা দেখা যে যায়
 ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
 মায়ের কথা মনে করি
 বসে আঁধার রাতে
 লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
 থাকত সাথে সাথে।

ঠাকুরদাদার মতো বনে
 আছেন ঋষি মূর্খনি,
 তাঁদের পায়ে প্রণাম করে
 গল্প অনেক শুনিনি।
 ব্রাহ্মসেবে ভয় করি নে,
 আছে গৃহক মিত্র
 রাখণ আমার কী করবে না,
 নেই তো আমার সীতা
 হনুমানকে যত্ন করে
 খাওয়াই দাখে-ভাতে—
 লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
 থাকত সাথে সাথে।

মা গো, আমায় দে-না কেন
 একটি ছোটো ভাই—
 দুইজনেতে মিলে আমরা
 বনে চলে যাই।
 আমাকে মা, শিখিয়ে দিবি
 রাম-যাত্রার গান,
 মাথায় বেঁধে দিবি চুড়ো,
 হাতে ধনুক-বাণ।
 চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
 এমনি বরষাতে—
 লক্ষ্যুণ ভাই যদি আমার
 থাকত সাথে সাথে।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র

আমি শুধু বলছিলাম—
 'কদম গাছের ডালে
 পূর্ণিমা-চাঁদ আটকা পড়ে
 যখন সন্ধ্যাকালে
 তখন কি কেউ তারে
 ধরে আনতে পারে।'
 'দাদা' নাদা হেসে কেন
 বললে আমায়, 'খোকা,
 তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা।
 চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে
 কেমন করে ছুঁই।'
 আমি বলি, 'দাদা, তুমি
 জান না কিচ্ছুই।
 মা আমাদের হাসে যখন
 ওই জানলার ফাঁকে
 তখন তুমি বলবে কি, মা
 অনেক দূরে থাকে।'
 তবু দাদা বলে আমায়, 'খোকা,
 তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'
 দাদা বলে, 'পারি কোথায়
 অত বড়ো ফাঁদ।'
 আমি বলি, 'কেন দাদা,
 ওই তো ছোটো চাঁদ,
 দুটি মন্থায় ওরে
 আনতে পারি ধরে।'
 শুনেন দাদা হেসে কেন

বললে আমার, 'খোকা,
 তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
 চাঁদ যদি এই কাছে আসত
 দেখতে কত বড়ো।'
 আমি বলি, 'কী তুমি ছাই
 ইস্কুলে যে পড়।
 মা আমাদের চুমো খেতে
 মাথা করে নিচু,
 তখন কি মার মূখটি দেখায়
 মস্ত বড়ো কিছু।'
 তবু দাদা বলে আমার, 'খোকা,
 তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'

বেঙ্গোানক

যেম্‌নি মা গো গরু গরু
 মেঘের পৈলে সাড়া
 যেম্‌নি এল আষাঢ় মাসে
 বৃষ্টিজলের ধারা,
 পূবে হাওয়া মাঠ পৌরিয়ে
 যেম্‌নি পড়ল আসি
 বাঁশ-বাগানে সৌ সৌ করে
 বাঁজিয়ে দিয়ে বাঁশ--
 অম্‌নি দেখ্‌ মা, চেয়ে--
 সকল মাটি ছেয়ে
 কোথা থেকে উঠল যে ফুল
 এত রাশি রাশি।

তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
 অম্‌নি যেন ফুল,
 আমার মনে হয় মা, তাদের
 সেটা ভারি ভুল।
 ওরা সব ইস্কুলের ছেলে,
 পুঁথি-পত্র কাঁখে
 মাটির নীচে ওরা ওদের
 পাঠশালাতে থাকে।
 ওরা পড়া করে
 দুরোর-বন্ধ ঘরে,
 খেলতে চাইলে গুরুমশায়
 দাঁড় করিয়ে রাখে।

বোশেখ-জন্টি মাসকে ওরা
 দুপুর বেলা কর,
 আষাঢ় হলে অধার করে
 বিকেল ওদের হয়।
 ডালপালারা লব্দ করে
 ঘন বনের মাঝে,
 মেঘের ডাকে তখন ওদের
 সাড়ে চারটে বাজে।
 অম্নি ছুটি পেয়ে
 আসে সবাই ধোয়ে,
 হলদে রাঙা সবুজ সাদা
 কত রকম সাজে।

জার্নিস মা গো, ওদের ঘেন
 আকাশেতেই বাড়ি,
 রাত্রে যেথায় তারাগুলি
 দাঁড়ায় সারি সারি।
 দেখিস নে মা, বাগান ছেয়ে
 বাস্তু ওরা কত!
 বৃষ্টিতে পারিস কেন ওদের
 তাড়াতাড়ি অতঃ
 জার্নিস কি কার কাছে
 হাত বাড়িয়ে আছে।
 মা কি ওদের নেইকো ভাবিস
 আমার মায়ের মতো?

মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে
 তারা আমায় ডাকে, আমার ডাকে।
 বলে, 'আমরা কেবল করি খেলা,
 সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যাবেলা।
 সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
 রূপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে।'
 আমি বলি, 'যাব কেমন করে।'
 তারা বলে, 'এসো মাঠের শেষে।
 সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে,
 আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।'
 আমি বলি, 'মা যে আমার ঘরে
 বসে আছে চেয়ে আমার তরে,

তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে।'

শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ—
দু হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।

চেউয়ের মধ্যে মা গো যারা থাকে,
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
বলে, 'আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান।'

তারা বলে, 'কোন দেশে যে ভাই,
আমরা চলি ঠিকানা তার নাই।'
আমি বলি, 'কেমন করে যাই।'

তারা বলে, 'এসো ঘাটের ধরে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোখ বুজে,
আমরা তোমায় নেন চেউয়ের দেশ'
আমি বলি, 'মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধে হলে নাম ধরে ঘোর ডাকে,
কেমন করে ছেড়ে থাকব তাকে।'

শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।

তুমি হবে অনেক দূরের দেশ।
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ

লুকোচুরি

আমি যদি লুকোচুরি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মা গো, ডালের পরে
কিচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হার,
তখন কি মা চিনতে আমায় পার।
তুমি ডাক, 'খোকা কোথায় ওরে।'
আমি শুধু হাসি চুপটি করে।

যখন তুমি থাকবে যে-কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখব নয়ন মেলে।
স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে
আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে:

এখান দিয়ে পূজোর ঘরে যাবে,
 দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে—
 তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
 তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে।

দুপুরবেলা মহাভারত-হাতে
 বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
 গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
 পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে,
 আমি আমার ছোট ছায়াখানি
 দোলাব তোর বইয়ের 'পরে' আনি—
 তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
 তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে।

সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপখানি জেদলে
 যখন তুমি যাবে গোয়ালঘরে
 তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
 টুপ করে মা, পড়ব ভূঁয়ে করে।
 আবার আমি তোমার খোকা হব,
 'গল্প বলো' তোমায় গিয়ে কব।
 তুমি বলবে, 'দুষ্টু, ছিঁলি কোথা।'
 আমি বলব, 'বলব না সে কথা।'

দুঃখহারী

মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে,
 আমি যেন যাব দেশান্তরে।
 ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরী,
 জিনিসপত্র নিয়েছি সব ভরি—
 ভালো করে দেখ্ তো মনে করি
 কী এনে মা, দেব তোমার তরে।

চাস কি মা, তুই এত এত সোনা—
 সোনার দেশে করব আনাগোনা।
 সোনামতী নদীতীরের কাছে
 সোনার ফসল মাঠে ফলে আছে,
 সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে—
 না কুঁড়িয়ে আমি তো ফিরব না।

পরতে কি চাস মৃদু গোঁথে হারে—
জাহাজ বেয়ে বাব সাগর-পারে।
সেখানে মা, সকালবেলা হলে
ফুলের 'পরে মৃদুগন্ধি দোলে,
টুপ্‌টুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে—
যত পারি আনব ভারে ভারে।

দাদার জন্যে আনব মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া।
বাবার জন্যে আনব আমি তুলি
কনক-লতার চারা অনেকগুলি—
তোমর তরে মা, দেব কোটা খুলি
সাত-রাজার-ধন মানিক একটি জোড়া।

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে,
বলব আমি, 'নাই সে খোকা নাই।'
মা গো, যাই।

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
বাব মা, তোমর বৃকে বয়ে,
ধরতে আমার পারবি নে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ডেউ
জানতে আমার পারবে না কেউ—
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।

বাদলা যখন পড়বে ঝরে
রাতে শূন্যে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গাব ওই বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে বাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোমর মনে।

খোকার লাগি তুমি মা গো,
অনেক রাতে যদি জাগ
ভাৱা হয়ে বলব তোমায়, 'মৃদু!'

তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।

স্বপন হয়ে আঁধার ফাঁকে
দেখতে আমি আসব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যখানে।
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে—
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে।

পূজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে 'খোকা নেই রে ঘরের মাঝে'।
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে।

পূজোর কাপড় হাতে করে
মাসি যদি শূন্যে তোরে,
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।'
বলিস, 'খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।'

নবীন অতিথি

গান

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নতুন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সংগোপন।
যতনে কত কী আনি বেঁধেছিলাম গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ।
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিলাম বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে!
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারানী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ।

অন্তঃসখী

রজনী একাদশী
 পোহায় ধীরে ধীরে,
 রঙিন মেঘমালা
 উষারে বাঁধে ঘিরে।
 আকাশে ক্ষীণ শশী
 আড়ালে যেতে চায়,
 দাঁড়িয়ে মাঝখানে
 কিনারা নাহি পায়।

এ-হেন কালে যেন
 মায়ের পানে মেয়ে
 রয়েছে শূন্যতারা
 চাঁদের মূখে চেয়ে।
 কে তুমি মরি মরি
 একটুখানি প্রাণ।
 এনেছ কী না জানি
 করিতে ওরে দান।

মহিমা যত ছিল
 উদয়-বেলাকার
 যতেক সূর্যসাপী
 এখনি যাবে যার,
 পুরানো সব গেল—
 নতুন তুমি একা
 বিদায়-কালে তারে
 হাসিয়া দিলে দেখা।

ও চাঁদ যামিনীর
 হাসির অবশেষ,
 ও শূন্য অতীতের
 সূর্যের স্মৃতিলেশ।
 তারারা দ্রুতপদে
 কোথায় গেছে সরে—
 পারে নি সাথে যেতে,
 পিছিয়ে আছে পড়ে।

তাদেরই পানে ও যে
 নয়ন ছিল মেলি,
 তাদেরই পথে ও যে
 চরণ ছিল ফেলি,

এমন সময়ে কে
ডাকিলে পিছদ-পানে
একটি আলোকেরই
একটু মৃদু গানে।

গভীর রজনীর
রিত্ত ভিখারীকে
ভোরের বেলাকার
কী লিপি দিলে লিখে।
সোনার-আঙা-মাথা
কী নব আশাখানি
শিশির-জলে ধুয়ে
তাহারে দিলে আনি।

অস্ত-উদয়ের
মাঝেতে তুমি এসে
প্রাচীন নবীনেরে
টানিছ ভালোবেসে—
বধু ও বর-রূপে
করিলে এক হিরা
করুণ কিরণের
গ্রন্থি বান্ধি দিয়া।

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি,
পল্লীটি তার দখলে,
সবাই তারি পূজো জোগায়
লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমার
কথায় যদি মন দেহ—
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে
আছে আমার সন্দেহ।
ভোরের বেলা অধার থাকে,
ঘুম যে কোথা ছোটে ওর—
বিছানাতে হৃদয়স্থল
কলরবের চোটে ওর।
খিল্খিলিয়ে হাসে শব্দ
পাড়াসদ্বন্দ্ব জাগিয়ে,
আড়ি করে পালাতে যার
ঘরের কোলে না গিয়ে।

হাত বাড়িয়ে মূখে সে চায়,
 আমি তখন নাচারই,
 কাঁধের 'পরে তুলে ভারে
 করে বেড়াই পাচারি।
 মনের মতো বাহন পেয়ে
 জরি মনের খুঁশিতে
 মারে আমার মোটা মোটা
 নরম নরম খুঁশিতে।
 আমি ব্যস্ত হয়ে বলি—
 'একটু রোসো রোসো মা।
 মঠো করে ধরতে আসে
 আমার চোখের চশমা।
 আমার সঙ্গে কলভাষায়
 করে কতই কলহ।
 তুমুল কাণ্ড! তোমরা ভারে
 শিল্পে আচার কলহ?

তবু তো তার সঙ্গে আমার
 বিবাদ করা সাজে না।
 সে নইলে যে তেমন করে
 ঘরের বাঁশি বাজে না।
 সে না হলে সকালবেলায়
 এত কুসুম ফুটেবে কি।
 সে না হলে সন্ধ্যাবেলায়
 সন্ধ্যাতারা উঠবে কি।
 একটি দণ্ড ঘরে আমার
 না যদি হয় দ্রুত
 কোনোমতে হয় না তবে
 বৃকের খুঁশ পূরণ তো।
 দৃষ্টমি তার দখিন-হাওয়া
 সূর্যের ডুফান-জাগানে
 দোলা দিয়ে যার গো আমার
 হৃদয়ের ফুল-বাগানে।

নাম যদি তার জিগেস কর
 সেই আছে এক ভাবনা,
 কোন্ নামে যে দিই পরিচয়
 সে তো জেবেই পাব না।
 নামের খবর কে রাখে ওর,
 জিকি ওরে বা-খুঁশি—
 দৃষ্ট কল, দসি কল,
 গোড়ারমুখী, রাকদসি।

বাপ-মাত্রে যে নাম দিয়েছে
 বাপ-মাত্রেই থাক্ সে নয়।
 ছিটি খুঁজে মিটি নামটি
 তুলে রাখুন বাত্রে নয়।

একজনেতে নাম রাখবে
 কখন অসম্প্রাপ্তে,
 বিশ্বসমুদ্রে সে নাম নেবে—
 ভারি বিষম আসন এ।
 নিজের মনের মতো সবাই
 করুন কেন নামকরণ—
 বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার,
 খুঁড়ো ডাকুন রামচরণ।
 ঘরের ঘেরে তার কি সাজে
 সঙ্কট নামটা ওই।
 এতে কারো দাম বাড়ে না
 অভিধানের দামটা বই।
 আমি বাপ, ডেকেই বসি
 যেটাই মখে আসুক-না—
 যারে ডাকি সেই তা বোঝে,
 আর সকলে হাসুক-না—
 একটি ছোটো মানুস তাহার
 একশো রকম রঙ্গ তো।
 এমন লোককে একটি নামেই
 ডাকা কি হয় সংগত।

বিচ্ছেদ

বাগানে ওই দূটো গাছে
 ফুল ফুটেছে কত যে,
 ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
 ছিল ফুলের মতো যে।
 ফুল যে দিত ফুলের সঙ্গে
 আপন সুখা মাথারে,
 সকাল হত সকাল বেলায়
 বাহার পানে তাকারে,
 সেই আমাদের ঘরের ঘেরে,
 সে গেছে আজ প্রবাসে,
 নিরে গেছে এখান থেকে
 সকাল বেলায় শোভা সে।

একটুখানি মেয়ে আমার
কত স্বপ্নের পুণ্য যে,
একটুখানি সরে গেছে
কতখানিই শূন্য যে।

বিশিষ্ট পড়ে টুপদর টুপদর,
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মৃদুখানি আজ
কেমন যেন ফ্যাকাশে।
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই,
দরজারগুলো ভেজানো,
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন।
ময়নাটি ওই চুপটি করে
কিমোচ্ছে সেই খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য পড়ে বিছানা,
কার তরে সে কৈদে মরে—
সে কল্পনা মিছা না।
বইগুলো সব ছড়িয়ে আছে,
নাম লেখা তার কার গো।
এমনি তারা হবে কি হার,
খুলবে না কেউ আর গো।
এটা আছে সেটা আছে,
অভাব কিছ, নেই তো—
স্মরণ করে দেয় রে যারে
থাকে নাকো সেই তো।

উপহার

স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই,
কী যে দেব তাই ভাবনা—
যত দিতে সাধ করি মনে মনে
খুঁজে-পেতে সে তো পাব না।
আমার যা ছিল ফাঁকি দিয়ে নিতে
সবাই করেছে একতা,
বাকি যে এখন আছে কত ধন
না তোলাই ভালো সে কথা।

সোনা রূপো আর হীরে জহরত
 পোতা ছিল সব মাটিতে,
 জহরি যে যত সম্ভান পেয়ে
 নে গেছে যে যার বাটীতে।
 টাকাকড়ি-মেলা আছে টাকশালে,
 নিতে গেলে পড়ি বিপদে।
 বসনভূষণ আছে সিন্দুরকে,
 পাহারাও আছে ফি পদে।

এ যে সংসারে আছি মোরা সবে
 এ বড়ো বিষম দেশ রে।
 ফাঁকিফঁকি দিবে দূরে চলে গিয়ে
 ভুলে গিয়ে সব শেষ রে।
 ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণচিহ্ন
 যে যাহারে পারে দেয় যে।
 তাও কত থাকে, কত ভেঙে যায়,
 কত মিছে হয় ব্যয় যে।
 স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত,
 চোখে যদি দেখা যেত রে,
 কতগুলো তবে জিনিসপত্র
 বল্ দেখি দিত কে তোরে।
 তাই ভাবি মনে কী ধন আমার
 দিয়ে যাব তোরে নরকিয়ে,
 খুশি হবি তুই, খুশি হব আমি,
 বাস্, সব যাবে চুকিয়ে।

কিছু দিবে-থুয়ে চিরদিন-তরে
 কিনে রেখে দেব মন তোর—
 এমন আমার মন্ত্রণা নেই,
 জানি নেও হেন মন্তর।
 নবীন জীবন, বহুদূর পথ
 পড়ে আছে তোর সমুখে:
 স্নেহরস মোরা যেটুকু যা দিই
 পিয়ে নিস এক চুমুকে।
 সাথীদলে জুটে চলে যাস ছুটে
 নব আশে নব পিয়াসে,
 যদি ভুলে যাস, সময় না পাস,
 কী যার তাহাতে কী আসে।
 মনে রাখিবার চির-অবকাশ
 থাকে আমাদেরই বয়সে,
 বাহিরেতে যার না পাই নাগাল
 অন্তরে জেগে রয় সে।

পাষাণের বাধা ঠেলেঠেলে নদী
 আপনার মনে সিঁথে সে
 কলগান গেয়ে দূই তীর বেয়ে
 যার চলে দেশ-বিদেশে—
 যার কোল হতে ঝরনার স্রোতে
 এসেছে আদরে গলিয়া
 তারে ছেড়ে দূরে যার দিনে দিনে
 অজানা সাগরে চলিয়া।
 অচল শিখর ছোটো নদীটরে
 চিরদিন রাখে স্মরণে—
 যত দূরে যার স্নেহধারা তার
 সাথে যার দ্রুতচরণে।
 তেমনি তুমিও থাক নাই থাক,
 মনে কর মনে কর না,
 পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
 আমার আশিস-ঝরনা।

পূজার সাজ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল ঝড়না বাজি,
 পূজার সময় এল কাছে।
 মধু বিধু দূই ভাই ছুটোছুটি করে তাই,
 আনন্দে দূ হাত তুলি নাচে।

পিতা বসি ছিল স্নারে, দূরনে শূধাল তারে,
 'কী পোশাক আনিয়াছ কিনে।'
 পিতা কহে, 'আছে আছে তোদের মায়ের কাছে,
 দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।'

সবুদ্র সহে না আর— জননীয়ে বার বার
 কহে, 'মা গো, ধরি তোর পায়ে,
 বাবা আমাদের তরে কী কিনে এনেছে ঘরে
 একবার দে-না মা, দেখায়ে।'

ব্যস্ত দেখি হাসিয়া মা দূখানি ছিটের জামা
 দেখাইল করিয়া আদর।
 মধু কহে, 'আর নেই?' মা কহিল, 'আছে এই
 একজোড়া ধতি ও চাদর।'

রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় খুলায় ফেলে
 কাদিয়া কহিল, 'চাহি না মা,

রায়বাবুদের গুঁপি পেয়েছে জরিপ টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা।'

মা কহিল, 'মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি,
গরিব যে তোমাদের বাপ।
এবার হয় নি ধান, কত গেছে লোকসান,
পেয়েছেন কত দুঃখতাপ।

তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে
সাধ্যমতো এনেছেন কিনে।
সে জিনিস অনাদরে ফেলিল ধুলির 'পরে—
এই শিক্ষা হল এতদিনে!'

বিধু বলে, 'এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর,
এই জামা পরাস আমারে।'
মধু শূনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুতবেগে
গেল রায়বাবুদের 'বারে।

সেখা মেলা লোক জড়ো, রায়বাবু ব্যস্ত বড়ো;
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল স্নান মনে
চোখে তার পড়িল হঠাৎ।

কাছে ডাকি স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া,
'কী রে মধু, হয়েছে কী, তোরে যে শূকনো দেখি।'
শূনি মধু উঠিল কাঁদিয়া।

কহিল, 'আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।'
শূনি রায়মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
'সেজন্য ভাবনা কিবা তোর।'

ছেলেবেলা ডাকিয়া চুপি কহিলেন, 'ওরে গুঁপি,
তোর জামা দে তুই মধুকে।'
গুঁপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় খেয়ে,
হাসি আর নাহি ধরে মদখে।

বুক ফুলাইয়া চলে— সবাক্সে ডাকিয়া বলে,
'দেখো কাকা! দেখো চেয়ে জামা!
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।'

মা শূন্য কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
 কপালে করিয়া করাঘাত,
 'হই দঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ,
 কারো কাছে পাতি নাই হাত।

ভূমি আমাদেরই ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
 অহংকার কর ধেরে ধেরে!
 ছেঁড়া ধর্তি আপনার ঢের বেশি দাম তার
 ভিক্ষা-করা মাটিনের চেয়ে।

আর বিধু, আর বৃকে, চুমো খাই চাঁদমুখে।
 তোর সাজ সব চেয়ে ভালো।
 দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
 ছিটের জামাটি করে আলো।'

কাগজের নৌকা

ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
 কাগজ-নৌকাখানি।
 লিখে রাখি তাতে আপনার নাম
 লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম
 বড়ো বড়ো করে মোটা অঙ্করে,
 যতনে লাইন টানি।
 যদি সে নৌকা আর-কোনো দেশে
 আর-কারো হাতে পড়ে গিরে শেষে
 আমার লিখন পড়িয়া তখন
 বৃকিবে সে অনুমানি
 কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
 কাগজ-নৌকাখানি।

আমার নৌকা সাজাই যতনে
 শিউলি বকুলে ভরি।
 বাড়ির বাগানে গাছের তলায়
 ছেয়ে থাকে ফুল সকালবেলায়,
 শিশিরের জল করে কলমল
 প্রভাতের আলো পড়ি।
 সেই কুসুমের অতি ছোটো বোকা
 কোন্ দিক-পানে চলে যার সোজা,
 কোণেবে যদি পার হয়ে নদী
 ঠেকে কোনোখানে ঘেয়ে—

প্রভাতের ফুল সঁখে পাবে কুল
কাগজের তরী বেয়ে।

আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি তীরে।
ছোটো ছোটো ঢেউ উঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি চলে যায় ডাকি,
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোটো নৌকার মতো—
কে ভাসালে তার, কোথা ভেসে যায়,
কোন দেশে গিয়ে লাগে।
ওই মেঘ আর তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে।

বেলা হলে শেষে বাড়ি থেকে এসে
নিরে যায় মোরে টানি;
আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিলি,
ষেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি—
কোথা কোন গরি ভেসে চলে যায়
আমার নৌকাখানি।
কোন পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তারে কছু নাহি করে মানা,
ধরে নাহি রাখে, ফিরে নাহি ডাকে—
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী, তারি 'পরে চড়ি
মন যায় ভেসে ভেসে।

রাত হলে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দই হাতে—
চোখ বন্ধে ভাবি—এমন আধার,
কালি দিয়ে ঢালা নদীর দূ ধার
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে।
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বদিক ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে আসি।
হুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
হুমপাড়ানিয়া মাসি।

শীতের বিদায়

বসন্ত বালক মৃদু-ভরা হাসিটি,
 বাতাস ধরে ওড়ে চুল—
 শীত চলে যায়, মাঝে তার গায়
 মোটা মোটা গোটা ফুল।
 আঁচল ভরে গেছে শত ফুলের মেলা,
 গোলাপ ছুঁড়ে মাঝে টগর চাঁপা বেলা—
 শীত বলে, 'ভাই, এ কেমন খেলা,
 বাবার বেলা হল, আসি।'
 বসন্ত হাসিরে বসন ধরে টানে,
 পাগল করে দেয় কুহু কুহু গানে,
 ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের 'পরে হানে—
 হাসির 'পরে হানে হাসি।
 ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
 ফুলের পাপড়ি উড়ে করে যে বিকল—
 কুসুমিত শাখা, বনপথ ঢাকা,
 ফুলের 'পরে পড়ে ফুল।
 দক্ষিণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
 উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শত্রু কেশ;
 কোন্ পথে যাবে না পার উদ্দেশ,
 হরে যায় দিক ভুল।

বসন্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
 টলমল করে রাঙা চরণ দুটি,
 গান গোয়ে পিছে যায় ছুঁটি ছুঁটি—
 বনে লুটোপুটি যায়।
 নদী তালি দেয় শত হাত তুলি,
 কলাবলি করে ডালপালাগুঁলি,
 লতার লতায় হেসে কোলাকুলি—
 অঙ্গুলি তুলি চায়।
 রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
 আশেপাশে হাসে কতই জাতী বৃধী,
 মৃদু বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী—
 বনফুল-বনগুঁলি।
 কত পাখি ডাকে কত পাখি গায়,
 কিচিঝিচিঝিচি কত উড়ে যায়,
 এ পাশে ও পাশে মাথাটি হেলায়—
 নাচে পদ্মখানি তুলি।
 শীত চলে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
 মনে মনে জবে 'এ কেমন বিদায়'—

হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুল-ঘাস হার মানে।
শুকনো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্তরে বাতাস করে হায় হায়—
আপাদমস্তক ঢেকে কুয়াশায়
শীত গেল কোন্‌খানে।

ফুলের ইতিহাস

বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
প্রথম হেরিল চারি ধার।

মধুকর গান গেয়ে বলে,
‘মধু কই, মধু দাও দাও।’
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে, ‘এই লও লও।’
বায়ু আসি কহে কানে কানে,
‘ফুলবালা, পরিমল দাও।’
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল,
‘যাহা আছে সব লয়ে যাও।’

তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।

মধুকর কাছে এসে বলে,
‘মধু কই, মধু চাই চাই।’
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে, ‘কিছু নাই নাই।’
‘ফুলবালা, পরিমল দাও।’
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে, ‘আর কী বা আছে।’

আকুল আহ্বান

সন্ধ্যে হল, গৃহ অন্ধকার,
মা গো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে মা, ‘মা’ কেউ বলে না।

সময় হল, বেঁধে দেব চুল,
 পরিয়ে দেব রান্ধা কাপড়খানি।
 সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে—
 কোথায় গেল রানী আমার রানী।

রাতি হল, আঁধার করে আসে,
 ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
 আমার ঘরে ঘুম নেইকো শূন্য—
 শূন্য শেজ শূন্য-পানে চায়।
 কোথায় দাঁটি নয়ন ঘুমে-ভরা,
 নৈতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।
 শ্রান্ত দেহ ঢুলে পড়ে, তবু
 মায়ের তরে আছে বঁকি চেয়ে।

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
 আঁধার রাতে চুপি চুপি আর।
 কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,
 তারা শূন্য তারার পানে চায়।
 এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
 কঠিন, শূন্য মায়ের প্রাণ ছাড়া,
 সেইখানে তুই আর মা, ফিরে আর—
 এত ডাকি, দিবি নে কি সাড়া।

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
 ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
 ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
 একটি সে তো পরতে পেল না।
 ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে যায়—
 ফুল নিয়ে যে আর-সকলে পরে,
 ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
 একটিও যে ঝইবে না তার তরে।

খেলত তারা তারা খেলতে গেছে,
 হাসত তারা তারা আজও হাসে,
 তার ভরে তো কেহই বসে নেই,
 মা যে কেবল রয়েছে তার আশে।
 হার রে বিধি, সব কি ব্যর্থ হবে—
 ব্যর্থ হবে মায়ের ভালোবাসা।
 কত জনের কত আশা পূরে,
 ব্যর্থ হবে মার প্রাণেরই আশা।

উৎসর্গ

রোভারেন্ড সি. এফ. এন্ড্রুজ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

গার্গিহীনিকেন
১লা বৈশাখ ১৩২১

ভোরের পাখি ডাকে কোথায়
 ভোরের পাখি ডাকে।
 ভোর না হতে ভোরের খবর
 কেমন করে রাখে।
 এখনো যে অধার নিশি
 জড়িয়ে আছে সকল দিশি
 কালি-বরন পুচ্ছ-ভোরের
 হাজার লক্ষ পাকে।
 ঘুমিয়ে-পড়া বনের কোণে
 পাখি কোথায় ডাকে।

ওগো ভূমি ভোরের পাখি,
 ভোরের ছোটো পাখি,
 কোন্ অরণ্যের আভাস পেয়ে
 মেল' তোমার অঁখি।
 কোমল তোমার পাখার 'পরে
 সোনার রেখা স্তরে স্তরে,
 বাঁধা আছে ডানায় তোমার
 উষার রাঙা রাখী।
 ওগো ভূমি ভোরের পাখি,
 ভোরের ছোটো পাখি।

রয়েছে বট, শতেক জটা
 ঝুলছে মাটি ব্যোপে,
 পাতার উপর পাতার ঘটা
 উঠছে ফুলে ফেঁপে।
 তাহারি কোন্ কোণের শাখে
 নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
 বাকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
 পাখাতে মৃদু ঝেঁপে,
 যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা
 জটায় মাটি ব্যোপে।

ওগো ভোরের সরল পাখি,
 কহো আমার কহো—
 ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
 ঘুমিয়ে যখন রহ,
 হঠাৎ তোমার কুলায়-পরে

কেমন ক'রে প্রবেশ করে
আকাশ হতে অধার-পথে
আলোর বার্তাবহ?
ওগো ভোরের সরল পাখি,
কহো আমার কহো।

কোমল তোমার বৃকের তলে
রক্ত নেচে উঠে,
উড়বে বলৈ পদক জাগে
তোমার পক্ষপটে।
চক্ষু মেলি পদবের পানে
নিদ্রা-ভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
উৎস-সমান ছুটে।
কোমল তোমার বৃকের তলে
রক্ত নেচে উঠে।

এত অধার-মাঝে তোমার
এতই অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাক, 'দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।'
এত অধার-মাঝে তোমার
এতই অসংশয়!

আনন্দেতে জাগো আজি
আনন্দেতে জাগো।
ভোরের পাখি ডাকে যে ওই,
তন্দ্রা এখন না গো।
প্রথম আলো পড়ুক মাথায়,
নিদ্রা-ভাঙা অধির পাতায়,
জ্যোতির্ময়ী উদয়-দেবীর
আশীর্বচন মাগো।
ভোরের পাখি গাহিছে ওই,
আনন্দেতে জাগো।

২

কেবল তব মৃৎখের পানে
 চাহিয়া
 ঝাহির হনু তিমির রাতে
 তরঙ্গীথানি বাহিয়া।
 অরুণ আজি উঠেছে,
 অশোক আজি ফুটেছে,
 না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
 তবুও আমি চলিব ছুটে,
 তোমার মৃৎখে চাহিয়া।

নয়নপাতে ডেকেছ মোরে
 নীরবে।
 হৃদয় মোর নিমেষ-মাঝে
 উঠেছে ভরি গরবে।
 শঙ্খ তব বাজিল,
 সোনার তরী সাজিল,
 না যদি বাজে, না যদি সাজে,
 গরব যদি টুটে গো লাজে,
 চলিব তব নীরবে।

কথাটি আমি শূন্য নাকো
 তোমারে।
 দাঁড়াব নাকো কণেকতরে
 শ্বিখার ভরে দুরারে।
 বাতাসে পাল ফুলিছে,
 পতাকা আজি দুলিছে,
 না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
 তরঙ্গী যদি না লাগে কুলে,
 শূন্য নাকো তোমারে।

৩

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
 বাকি সব ধন স্বপনে
 নিভৃত স্বপনে।
 ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
 ওগো কোথা তুমি পরল-চকিত,
 কোথা গো স্বপনবিহারী।

ভূমি এসো এসো গভীর গোপনে,
 এসো গো নিবিড় নীরব চরণে,
 বসনে প্রদীপ নিবারণ,
 এসো গো গোপনে।
 মোর কিছু ধন আছে সংসারে
 যাকি সব আছে স্বপনে
 নিভৃত স্বপনে।

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না ভূমি
 পথ ভরিয়াছে আলোকে
 প্রখর আলোকে।
 সবার অজানা হে মোর বিদেশী,
 তোমাতে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
 হে মোর স্বপনবিহারী।
 তোমাতে চিনিব প্রাণের পদকে,
 চিনিব সজল অধির পদকে,
 চিনিব বিরলে নেহারি
 পরম পদকে।
 এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
 এসো না পথের আলোকে
 প্রখর আলোকে।

৪

তোমাতে পাছে সহজে বৃষ্টি
 তাই কি এত লীলার ছল,
 বাহিরে যবে হাসির ছটা
 ভিতরে থাকে অধির জল।
 বৃষ্টি গো আমি, বৃষ্টি গো তব
 ছলনা,
 যে কথা ভূমি বলিতে চাও
 সে কথা ভূমি বল না।

তোমাতে পাছে সহজে ধরি
 কিছুরই তব কিনারা নাই,
 দলের দলে টানি গো পাছে
 বিরূপ ভূমি, বিরুদ্ধ তাই।
 বৃষ্টি গো আমি, বৃষ্টি গো তব
 ছলনা,
 যে পথে ভূমি চলিতে চাও
 সে পথে ভূমি চল না।

সবার চেয়ে অধিক চাহ
 তাই কি ভূমি ফিরিয়া যাও।
 হেলার ভরে খেলার মতো
 ডিক্কাবুলি ভাসিয়ে দাও?
 বদ্বোধি আমি বদ্বোধি তব
 ছলনা,
 সবার যাহে ভূমি হল
 তোমার তাহে হল না।

৫

আপনারে ভূমি করিবে গোপন
 কী করি।
 হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
 থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।
 আজ আসিয়াছ কৌতুকবেশে,
 মানিকের হার পরি এলোকেশে,
 নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে
 এসেছ হৃদয়-পদলিনে।
 ভুলি নে তোমার বঁকা কটাক্ষে,
 ভুলি নে চতুর নিষ্ঠুর বাক্যে
 ভুলি নে।
 করপল্লবে দিলে যে আঘাত
 করিব কি তাহে আঁখিজলপাত
 এমন অবোধ নহি গো।
 হাস ভূমি, আমি হাসিমুখে সব
 সহি গো।

আজ এই বেশে এসেছ আমার
 ভূলাতে।
 কড়ু কি আস নি দীপ্ত ললাটে
 স্নিগ্ধ পরশ বদ্বোধে।
 দেখেছি তোমার মৃদু কথাহারা,
 জলে ছলছল স্নান আঁখিতারা,
 দেখেছি তোমার ভয়-ভয়ে সারা
 করুণ পেলব মূর্ততি।
 দেখেছি তোমার বেদনাবিধুর
 পলকবিহীন নয়নে মধুর
 মিনতি।

আজি হাসিমাখা নিপুণ হাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো।
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।

৬

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়,
'কে গো সে'— শূন্য তব পরিচয়,
'কে গো সে।'
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শূন্য বলি, 'কী জানি কী জানি!'
তুমি শূন্যে হাস, তারা দূরে মোরে
কী দোষে।

তোমায় অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন ব্যস্ততা লুকায়ে রাখিতে
পারি নি আপন প্রাণে।
কত জন মোরে ডাকিয়া করেছে,
'যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি।'
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শূন্য বলি, 'অর্থ কী জানি!'
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে
মুচুকি।

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বলো তো
কেমনে বলি।
খনে খনে তুমি উঁকি দারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি।
জ্যেষ্ঠমানিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেরেছি তোমার
লখিতে।

বন্ধ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে।

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে।

চিরকালতরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে।

সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁধিতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে— ধরা তুমি
দিলে কি!

কাজ নাই, তুমি যা খুশি তা করো—
ধরা না-ই দাও মোর মন হরো,
চিনি যা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি।

৭

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।

ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ু
কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

বন্ধ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বন্ধে লইতে
বন্ধে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁধি মম,
উত্তলা পাগলসম।

যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর
 রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
 বাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
 বাহা পাই তাহা চাই না।

৮

আমি চঞ্চল হে,
 আমি সদৃশের পিয়াসী।

দিন চলে যায়, আমি আনমনে
 তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
 ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
 পরশ পাবার প্রয়াসী।

আমি সদৃশের পিয়াসী।

ওগো সদৃশ, বিপুল সদৃশ! তুমি যে
 বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
 মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাই.
 সে কথা যে যাই পারি।

আমি উৎসুক হে,
 হে সদৃশ, আমি প্রয়াসী।

তুমি দল্লভ দুরাশার মতো
 কী কথা আমায় শুনোও সত্যত,
 তব ভাষা শ্রুনে তোমারে হৃদয়
 জেনেছে তাহার স্বভাষী।
 হে সদৃশ, আমি প্রয়াসী।

ওগো সদৃশ, বিপুল সদৃশ! তুমি যে
 বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
 নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
 সে কথা যে যাই পারি।

আমি উদ্মনা হে,
 হে সদৃশ, আমি উদাসী।

রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
 তরুশ্রমরে, ছায়ার খেলায়
 কী মদ্রতি তব নীলাকাশশায়ী
 নয়নে উঠে গো আভাসি।
 হে সদৃশ, আমি উদাসী।

ওগো

সদদর, বিপদল সদদর! তুমি যে
 বাজাও ব্যাকুল বাণীরি।
 কক্ষে আমার রুদ্ধ দয়ার
 সে কথা যে যাই পাসরি।

৯

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
 কাঁদছে আপন মনে,
 কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
 করুণ কাতর স্বনে।
 কহিছে সে, 'হায় হায়,
 বেলা যায় বেলা যায় গো
 ফাগুনের বেলা যায়।'
 ভয় নাই তোরা, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
 কিছু নাই তোরা ভাবনা।
 কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
 পরিবে সকল কামনা।
 নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
 ফাগুন তখনো যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে—
 ফিরিছে আপনমাঝে,
 বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
 কী জানি কিসের কাজে।
 কহিছে সে, 'হায় হায়,
 কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
 না জানিয়া দিন যায়।'
 ভয় নাই তোরা, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
 কিছু নাই তোরা ভাবনা।
 দখিনপবন শ্বারে দিয়া কান
 জেনেছে যে তোরা কামনা।
 আপনারে তোরা না করিয়া ভোর
 দিন তোরা চলে যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে—
 ভাবিছে উদাসপারা,
 জীবন আমার কাহার দোষে
 এমন অর্থহারা।

কহিছে সে, 'হায় হায়,
 কেন আমি বাঁচি, কেন আছি গো
 অর্থ না বুঝা যায়।'
 ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
 কিছু নাই তোর ভাবনা।
 যে শূভ প্রভাতে সকলের সাথে
 মিলিবি, পূরাবি কামনা,
 আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি—
 জনম ব্যর্থ যাবে না।

১০

আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে,
 কোন্ বিরহিণী নারী।
 আপন করিতে চাহিন্দু তাহারে,
 কিছুতেই নাহি পারি।
 রমণীরে কে বা জানে—
 মন তার কোন্‌খানে।
 সেবা করিলাম দিবানিশি তার,
 গাণ্ধি দিন গলে কত ফুলহার,
 মনে হল, সুখে প্রসন্ন মুখে
 চাহিল সে মোর পানে।
 কিছু দিন যায়, একদিন হায়
 ফেলিল নয়নবারি—
 'তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই'
 কহে বিরহিণী নারী।

রতনে জড়িত নুপুর তাহারে
 পরায়ে দিলাম পায়ের,
 রজনী জাগিয়া বাজন করিন্দু
 চন্দন-ভিজা বায়ে।
 রমণীরে কে বা জানে—
 মন তার কোন্‌খানে।
 কনকখচিত পাশঙ্ক-পরে
 বসান্দু তাহারে বহু সমাদরে,
 মনে হল হেন, হাসিমুখে যেন
 চাহিল সে মোর পানে।
 কিছু দিন যায়, লুটায় ধূলার
 ফেলিল নয়নবারি—
 'এ-সবে আমার কোনো সুখ নাই'
 কহে বিরহিণী নারী।

বাহিরে আনিব, তাহারে, করিতে
 হৃদয়দিশিষজয়।
 সারথি হইয়া রথখানি তার
 চালান, ধরণীময়।
 রমণীরে কে বা জানে—
 মন তার কোন্‌খানে।
 দিকে দিকে লোক সর্পি দিল প্রাণ,
 দিকে দিকে তার উঠে চাটু গান,
 মনে হল তবে, দীপ্ত গরবে
 চাহিল সে মোর পানে।
 কিছু দিন যায়, মৃখ সে ফিরায়,
 ফেলে সে নয়নবারি।
 'হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সূখ নাই'
 কহে বিরহিণী নারী।

আমি কহিলাম, 'কারে তুমি চাও
 ওগো বিরহিণী নারী।'
 সে কহিল, 'আমি যারে চাই, তার
 নাম না কহিতে পারি।'
 রমণীরে কে বা জানে—
 মন তার কোন্‌খানে।
 সে কহিল, 'আমি যারে চাই তারে
 পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,
 পলকে তখনি লব তারে চিনি,
 চাহি তার মৃখপানে।'
 দিন চলে যায়, সে কেবল হায়
 ফেলে নয়নের বারি।
 'অজানারে কবে আপন করিব'
 কহে বিরহিণী নারী।

না জানি কারে দেখিয়াছি,
 দেখেছি কার মৃখ।
 প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
 পেয়েছি তাই সূখে আছি,
 পেয়েছি এই সূখ—
 কারেও আমি দেখাব নাকো সেটি।

লিখন আমি নাহিকো জানি,
 বদ্বি না কী যে রয়েছে বাণী,
 যা আছে থাক্ আমার থাক্ তাহা।
 পেয়েছি এই সন্ধে আজি
 পবনে উঠে বাণির বাজি,
 পেয়েছি সন্ধে পরান গাহে 'আহা'।

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
 শুনোঁছি নাকি তিনি
 পড়িয়া দেন লিখন নানামতো।
 যাব না আমি তাঁর কাছে,
 তাহারে নাহি চিনি,
 থাকুন লয়ে পুরানো পুঁথি যত।
 শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
 বদ্বেন কি না বদ্বিব কিসে,
 ধন্দ লয়ে পড়িব মহা গোলে।
 তাহার চেয়ে এ লিপিকথানি
 মাথায় কভু রাখিব আনি,
 যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে।

রজনী যবে আধারিয়া
 আসিবে চারি ধারে,
 গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা;
 ধরিব লিপি প্রসারিয়া
 বসিয়া গহম্বারে
 পদলকে রব হয়ে পলকহারা।
 তখন নদী চলিবে বাহি
 যা আছে লেখা তাহাই গাহি;
 লিপির গান গাবে বনের পাতা;
 আকাশ হতে সপ্তর্ষি
 গাহিবে ভেদি গহন নিশি
 গভীর তানে গোপন এই গাথা।

বদ্বি না-বদ্বি ক্ষতি কিবা,
 রব অবোধসম।
 পেয়েছি বাহা কে লবে তাহা কাড়ি।
 রয়েছে বাহা নিশিদিবা
 রহিবে তাহা মম,
 বদ্বের ধন যাবে না বদ্ব ছাড়ি।

খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,
 বৃষ্টিতে গিয়া ভুল যে বৃষ্টি,
 ঘুরিতে গিয়া কাছেই করি দূর।
 না-বোঝা মোর লিখনখানি
 প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি,
 সকল গানে লাগানে দিল সুর।

হাজারিবাগ
 ১১ চৈত্র ১৩০৯

১২

‘হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিতে কে বা।
 ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা।’
 শিশির কহিল কাদিয়া,
 ‘তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
 হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
 তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।’

‘আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
 তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
 বাসিতে পারি যে ভালো।’
 শিশিরের বৃকে আসিয়া
 কহিল তপন হাসিয়া,
 ‘ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
 তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
 হাসির মতন করি।’

১৩

আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে
 তোমারেই ভালো বেসেছি।
 জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
 শব্দে তুমি আমি এসেছি।
 দেখি চারি দিক-পানে
 কী যে জেগে ওঠে প্রাণে।
 তোমার আমার অসীম মিলন
 যেন গো সকল খানে।

কত যুগ এই আকাশে যাপিন্দু
সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপছে
সে আলোকে দৌঁছে দুলেছি।

ভূগরোমাণ্ড ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
ক্ষেত্রে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পদক্ষেপে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মৃদু মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত ভূগে দৌঁছে কেঁপেছি।

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী:
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন ভাঙারে সঞ্চার তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মৃদুয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাধ নি কি মোর জীবনে।
সে প্রভাতে কোনখানে
জাগেছিল কে বা জানে।
কী মূর্তি-মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে!
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নতুন করিয়া;
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি
 সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
 দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
 সেই দেশ লব বুকিয়া।
 পরবাসী আমি যে দুরারে চাই—
 তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাই,
 কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
 সম্মান লব বুকিয়া।
 ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
 তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
 ফুল-সুগন্ধ গগনে
 কেঁদে ফেরে হিয়া মিলনবিহীন
 মিলনের শূভ লগনে।
 আপনার যারা আছে চারি ভিতে
 পারি নি তাদের আপন করিতে,
 তারা নির্দিষ্ট জাগাইছে চিতে
 বিরহবেদনা সঘনে।
 পাশে আছে যারা তাদেরই হারারে
 ফিরে প্রাণ সারা গগনে।

ভূগে পুঙ্খকিত যে মাটির ধরা
 লুটায় আমার সামনে—
 সে আমার ডাকে এমন করিয়া
 কেন যে, কব তা কেমনে।
 মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
 যুগে যুগে আমি ছিন্দু ভূগে জলে,
 সে দুরার খুলি কবে কোন্ ছলে
 বাহির হইয়াছে ভ্রমণে।
 সেই মৃক মাটি মোর মৃখ চেয়ে
 লুটায় আমার সামনে।

নিজার আকাশ কেমন করিয়া
 তাকায় আমার পানে সে।
 লক্ষ যোজন দূরের তারকা
 মোর নাম যেন জানে সে।
 যে জাহাজ তারা করে কানাকানি
 সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি;

চিরদিবসের ভুলে-মাওয়া বাণী
কোন কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হয় ভুলে যাই বারে বারে,
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে।
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চিরজনমের ভিটাতে।

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা;
ছোটো বড়ো হীন সবার মাঝারে
করি চিন্তের স্থাপনা।
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তুল, হই ফুল ফল,
জীব-সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা;
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

বিশাল বিশ্ব চারি দিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুরারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস?
মোর তরে জল দূ হাত বাড়াস?
নিশ্বাসে বৃকে পশিয়া বাতাস
চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাষি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে।

আছে আছে প্রেম ধূলার ধূলার,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যার ঘেরে ছোটো কণাটির
ভুচ্ছ করিয়া দেখিলে।

জগতের যত অশুদ্র রোগে সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চিরগোরব—
এ কথা না যদি লিখিলে,
জীবনে মরণে ভরে ভরে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

ধূলা-সাথে আমি ধূলা হয়ে রব
সে গোরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তার পূজারতি-বরণে।
বেথা যাই আর বেথার চাহি রে
তিল ঠাই নাই তাহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে।
বাহা হই আমি তাই হয়ে রব
সে গোরবের চরণে।

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরনী।
বেথা আছি আমি আছি তারি দ্বারে,
নাহি জানি গাণ কেন বল কারে।
আছে তারি পারে তারি পারাবারে
বিপুল ভুবনতরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি,
ধন্য এ মোর ধরণী।

৩ ফাল্গুন ১৩০৭

১৫

আকাশ-সিন্ধু-মাঝে এক ঠাই
কিসের বাতাস লেগেছে,
জগৎ-ঘূর্ণি জেগেছে।
ঝলকি উঠেছে রবি-শশাঙ্ক,
ঝলকি ছুটেছে তারা,
অমৃত চক্ৰ ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা।
স্থির আছে শূন্য একটি বিশ্ব
ঘূর্ণির মাঝখানে—

সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে।
সুন্দরী, ওগো সুন্দরী,
শতদল-দলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়িয়ে রয়েছে মরি মরি।
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
অচল তোমার রূপরাশি।
নানা দিক হতে নানা দিন দেখি—
পাই দেখিবারে ওই হাসি।

জনমে মরণে আলোকে আধারে
চলিছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলিছি ঘুরনে।
কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
চলে যায় সেই দূরে,
হাতে পাই যারে, পলক ফেলিতে
তারে ছুয়ে যাই ঘুরে।
কোথাও থাকিতে না পারি কণেক,
রাখিতে পারি নে কিছু,
মস্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধুবসুন্দর,
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর।
স্বীপগর্ভে তব গীতমধুরিত,
ঝরে নিঝর কলভাষে,
অসীমের চির-চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।

১৬

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভভল
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীলব আশিস-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,

সাগর তোমার পরাশি চরণ
 পদধূলি সদা করিছে হরণ;
 জাহ্নবী তব হার-আভরণ
 দুলিছে বক্ষ-পর।
 হৃদয় খুলিয়া চাহিন্দ বাহিরে,
 হেরিন্দ আজিকে নিমেষে—
 মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা,
 মোর সনাতন স্বদেশে।

শুনিন্দ তোমার স্তবের মন্ত্র
 অতীতের তপোবনেতে—
 অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
 ধনিতেকে দ্বিভুবনেতে।
 প্রভাতে হে দেব, তরুণ তপনে
 দেখা দাও যবে উদয়গগনে
 মৃখ আপনার ঢাকি আবরণে
 হিরণ-কিরণে গাঁথা—
 তখন ভারতে শূনি চারি ভিতে
 মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,
 প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
 উঠে গায়ত্রীগাথা।
 হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ান্দ বাহিরে
 শুনিন্দ আজিকে নিমেষে,
 অতীত হইতে উঠিছে হে দেব,
 তব গান মোর স্বদেশে।

নয়ন মৃদিয়া শুনিন্দ, জানি না
 কোন্ অনাগত বরষে
 তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
 বাজায় ভারত হরষে।
 ডুবারে ধরার রণহংকার
 ভেদি বণিকের ধনঝংকার
 মহাকাশতলে উঠে ওঙ্কার
 কোনো বাধা নাহি মানি।
 ভারতের ধ্বংস হৃদিশতদলে,
 দাঁড়ায় ভারতী তব পদতলে,
 সংগীততানে শুন্যে উথলে
 অপূর্ব মহাবাণী।
 নয়ন মৃদিয়া ভাবীকালপানে
 চাহিন্দ, শুনিন্দ নিমেষে
 তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ
 বাজিছে আমার স্বদেশে।

১৭

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
 গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
 সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
 ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
 ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
 রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
 অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
 সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
 প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার মর্ন্তি,
 ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
 বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মর্ন্তি,
 মর্ন্তি মাগিছে বঁধনের মাঝে বাসা।

১৮

তোমার বীণায় কত তার আছে
 কত-না সুরে,
 আমি তার সাথে আমার তারটি
 দিব গো জুড়ে।
 তার পর হতে প্রভাতে সাঝে
 তব বিচিত্র রাগিণীমাঝে
 আমারো হৃদয় রনিয়া রনিয়া
 বাজিবে ভবে:
 তোমার সুরেতে আমার পরান
 জড়াবে রবে।

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
 রাখিব জ্বালি।
 তোমার কুসুমে আমার বাসনা
 দিব গো ঢালি।
 তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
 তব বিচিত্র শোভার সাথে
 আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে,
 মর্ন্তিবে সুরে—
 মোর পরানের ছায়াটি পড়িবে
 তোমার মূখে।

১৯

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিলেছ যে অর
তোমার সিংহদরবারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে ভব্, ভুলে যাই,
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়
কোথা হতে যায় কোথা রে।

কেহ নাহি চায় থাকিতে।
শিরে লগ্নে বোঝা চলে যায় সোজা
না চাহে দখিনে বামেতে।
বকুলের পাখে পাখি গায়,
ফুল ফটে তব আঙিনায়,
না দেখিতে পায়, না খুঁজিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে।

বাঁশি লই আমি ভুলিয়া।
তারি ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া।
আছে যাহা চিরপদ্রাতন
তারে পায় যেন হারাযন,
বলে, 'ফুল এ কী ফুটিয়াছে দেখি।
পাখি গায় প্রাণ খুলিয়া।'

হে রাজন্, তুমি আমারে
য়েথো চিরদিন বিষামবিহীন
তোমার সিংহদরবারে।
যারা কিছু নাহি কহে যায়,
সুখদুঃখভার বহে যায়,
তারি ক্ষণতরে বিস্ময়ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহদরবারে।

২০

দরবারে তোমার ভিড় ক'রে যারা আছে,
জিকা তাদের চুকাইয়া দাও আগে।
যোর নিবেদন নিজ্জে তোমার কাছে,
সেখক তোমার অধিক কিছু না মাগে।

ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র,
 শূন্য বীণাখানি রেখেছি মাত্র,
 বসি এক ধারে পথের কিনারে
 বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র।

দেখো কতজন মাগিছে রতনধূলি,
 কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,
 ভরি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝূলি,
 কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা।
 আমি আনিয়াছি এ বীণায়ন্ত,
 তব কাছে লব গানের মন্ত,
 তুমি নিজ হাতে বাঁধো এ বীণায়
 তোমার একটি স্বর্ণতন্ত।

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
 লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে,
 পাব না কিছুই রাখিব না কারো দেনা,
 অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।
 তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
 ঝংকার দিব কত কী ছন্দ,
 যত গান গাব, তব বাঁধা তারে
 বাজিবে তোমার উদার মন্দ।

২১

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
 আমার দেখো না বাহিরে।
 আমার পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
 আমার বেদনা খুজো না আমার বদকে,
 আমার দেখিতে পাবে না আমার মদখে,
 কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
 মেঘগর্জনে ছুটে ঝঞ্জার মাঝে,
 নীরব মন্ডে নিশীথ-আকাশে রাজে
 অধার হইতে অধারে আসন পাতিয়া--
 আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
 বাজিয়া উঠিছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
 গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
 বিপুল ছন্দে উদার মন্ডে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বৃকের কাছে,
 ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
 শারদ ধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
 কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,
 সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
 সে গান আমাতে রচিছে নতুন মায়া,
 সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া—
 আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে।

নর-অরণ্যে মর্মরতান তুলি,
 যৌবনবনে উড়াই কুমুমধূলি,
 চিত্তগুহার সন্ত রাগিণীগূলি
 শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।
 নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি
 গগনের কোণে মেলি পুঙ্কিত অঁখি,
 নীরব প্রদোষে করুণ কিরণে ঢাকি
 থাকি মানবের হৃদয়চুড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে অঁখিজল ঝরে যবে
 আমি তাহাদের গোধে দিই গীতরবে,
 লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
 সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।
 নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
 খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
 কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
 সম্মান তার বলিতে পারি না কাহারে।

যে আমি স্বপন-ম্রতি গোপনচারী,
 যে আমি আমারে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে নারি,
 আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
 সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।
 মানুষ-আকারে বন্ধ যে জন ঘরে,
 ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
 বাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
 কবিরে পাষে না তাহার জীবনচরিতে।

আছি আমি বিস্ময়রূপে হে অন্তরঙ্গামী,
 আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। 'আছি আমি'
 এ কথা স্মরিলে মনে মহান বিশ্বয়
 আবুল করিয়া দেয়, স্তম্ভ এ হৃদয়

প্রকাণ্ড রহস্যভারে। 'আছি আর আছে'
 অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
 শূন্যইব অর্থ এর। তত্ত্ববিদ তাই
 কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,
 শূন্য এক আছে।' করে তারা একাকার
 অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।
 একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
 যে আদি গোপন তত্ত্ব, আমি কবি তারে
 চিরকাল সর্বিনয়ে স্বীকার করিয়া
 অপার বিস্ময়ে চিস্ত রাখিব ভরিয়া।

২৩

শূন্য ছিল মন,
 নানা কোলাহলে ঢাকা
 নানা আনাগোনা-আঁকা
 দিনের মতন।
 নানা জনতায় ফাকা
 কর্মে অচেতন
 শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন এল নৃপদ্রবিহীন
 নিঃশব্দ গোখলি।
 দেখি নাই স্বর্ণরেখা,
 কী লিখিল শেষ লেখা
 দিনান্তের তুলি।
 আমি যে ছিলাম একা
 তাও ছিন্দ তুলি।
 আইল গোখলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো
 কোন স্বর্গ হতে
 চাঁদখানি লয়ে হেসে
 শূক্ৰসন্ধ্যা এল ভেসে
 অধারের স্রোতে।
 যদি সে আপনি মেখে
 আপন আলোতে।
 এল কোথা হতে।

অকস্মাৎ বিকশিত পদ্যের পদ্যকে
 তুলিলাম আঁখি।
 আর কেহ কোথা নাই,
 সে শব্দ আমারি ঠাই
 এসেছে একাকী।
 সম্মুখে দাঁড়াল ভাই
 মোর মূখে রাখি
 অনিমেষ আঁখি।

রাজহংস এসেছিল কোন্ মৃগান্তরে
 শূন্যে পুরাণে।
 দময়ন্তী আলবালে
 স্বর্ণঘটে জল ঢালে
 নিকুঞ্জবিতানে,
 কার কথা হেনকালে
 কহি গেল কানে—
 শূন্যে পুরাণে।

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মতো আকাশ বাহিয়া
 এল মোর বদকে।
 কোন্ দূর প্রবাসের
 লিপিবানি আছে এর
 ভাষাহীন মূখে।
 সে যে কোন্ উৎসবের
 মিলনকৌতুকে
 এল মোর বদকে।

দুইখানি শব্দ ডানা ঘেরিল আমারে
 সর্বাপেক্ষা হৃদয়ে।
 স্ফুটিল মোর রাখি গির
 নিঃসঙ্গ রহিল স্থির,
 কথাটি না করে।
 কোন্ পদ্ম-বনানীর
 কোমলতা লয়ে
 পশিল হৃদয়ে!

আর কিছু বাক্য নাই, শব্দ বাক্যিলাম
 আঁখি আমি একা।
 এই শব্দ জানিলাম
 জানি নাই তার নাম

লিপি যার লেখা।
এই শব্দ বদ্বিলায়
না পাইলে দেখা
রব আমি একা।

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিনরজনী,
এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভূবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দত্ত দূরবাসী, ওগো বাকাহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর,
চাহি তব মৃগপানে
ভাবিতোছি মৃগপ্রাণে
কী দিব উত্তর।
অশ্রু আসে দূর নয়ানে,
নির্বাক অন্তর,
হে সৌম্য-সুন্দর।

২৪

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অপ্রভেদী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের স্ফার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়-পানে
দুর্গম দূরত্ব পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে!
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মূহুর্তে যেন হারিয়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর--সামগীত শব্দহারা
নিরত চাহিয়া শুনো বরষিছে নিকরিরগীধারা।

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারিয়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষণ।
পেরেছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সর্পিয়া।

২৫

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি
তোমার সর্বঙ্গ ঘেরি পদ্যকিছে শ্যাম শম্পরাজি
প্রস্ফুটিত পদ্পঞ্জালে; বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপদ্যে তার
বক্ষলে শৈবালে জটে; সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোপ্লাসে করিছে মৃদুধর।
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটিরগুণি বর্ধিয়াছে নির্ঝরিতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য করিবারে গ্রাস—
সেদিন হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয়;
যখনি ধেমোছ তুমি, বলিয়াছ 'আর নয় নয়',
চারি দিক হতে এল তোমা-পরে আনন্দনিবাস,
তোমার সমাপ্ত ঘেরি বিস্তারিত বিশ্বের বিশ্বাস।

জোড়াসাঁকো

৯ আশ্বিন ১৩১০

২৬

আজি হেরিতেছি আমি হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জনে
পাঠকের মতো তুমি বসে আছ অচল আসনে,
সনাতন পুণ্ড্রিখানি তুলিয়া লয়েছ অক্ষ-পরে।
পাষাণের পত্রগুণি খুলিয়া গিয়াছে ধরে ধরে,
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ।
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ডব-ভবানীর প্রেমগাথা—
নিরাসক্ত নিরাকাম্পক ধ্যানাতীত মহাবোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে? কিছু নাহি চাহি যার,
তিনি কেন চাহিলেন—ভালোবাসিলেন নির্বিকার—
পারিলেন পরিণয়পাশ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারই কাহিনী বহে হে শৈল, তোমার যত শিলা।

আলমোড়া

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসংগত
 তপস্যার মতো। স্তম্ভ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
 নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নিজনে,
 নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।
 তোমার সহস্রশৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
 ঋষির আশ্বাসবাণী—‘শূন শূন বিশ্বজন সবে
 জেনেছি, জেনেছি আমি।’ যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
 উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে
 আদিঅন্তবিহীনৈর অখণ্ড অমৃতলোক-পানে,
 সে আজ উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাশাগে।
 একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমোয়্যিন-আহুতি
 ভাষাহারা মহাবর্তী প্রকাশিতে করেছে আকৃতি,
 সেই বহিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
 শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ড উজ্জ্বলিছে মেঘধ্বস্তত্বে।

জোড়াসাঁকো
 ৮ আষাঢ়

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
 অভেদাঙ্গ হরগোরী আপনারে যেন বারংবার
 শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূর্তি।
 ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তম্ভ পশুপতি,
 দূর্গম দূর্গেই মৌন, জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
 নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
 পূজাম্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
 মহান-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর,
 হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কী লীলা করেছে বেটন—
 মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তম্ভেরে করেছে আলিঙ্গন
 সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
 কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
 ছারারৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশেরে রয়েছেন ঈশ্বর
 পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

শান্তিনিকেতন
 ৬ আষাঢ় ১০১০

ভারতসমুদ্র তার বাম্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে
 আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ সমীরণে,
 অনির্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ।
 উর্ধ্ববাহু হিমাচল, তুমি সেই উর্ধ্বাহিত মেঘ
 শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
 রাখিছ নিরুদ্ধ করি—পুনর্বীর উন্মত্ত ধারায়
 নতন আনন্দস্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
 অসীম জিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে।
 সেইমতো ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
 করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল,
 অনন্তের জ্যোতিঃস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
 রেখেছ সঞ্চার করি হে হিমাঙ্গি, তুমি স্তম্ভশিখরে।
 তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
 ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অশ্বিনের সনে।

জোড়াসাঁকো

৯ আষাঢ় ১৩১০

ভারতের কোন্ বৃক্ষ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
 হে আৰ্য আচার্য জগদীশ! কী অদৃশ্য তপোভূমি
 বিরচিলে এ পাষাণনগরীর শৃঙ্খল ধূলিতলে।
 কোথা পেলো সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
 যার তলে মগ্ন হয়ে মূহূর্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
 দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
 সূর্যচন্দ্র-পদ্পপট-পশুপক্ষী-ধূলার প্রস্তুত—
 এক তন্ত্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক-পরে
 দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সংগীতে। মোরা যবে
 মস্ত ছিন্দু অতীতের অতি দূর নিষ্ফল গৌরবে,
 পরবশ্বে, পরবাক্যে, পরভাষ্যমার ব্যঙ্গরূপে
 কল্লোল করিতেছিন্দু স্ফীত কণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
 তুমি ছিলে কোন্ দূরে। আপনার স্তম্ভ ধ্যানাসন
 কোথায় পাতিয়াছিলে। সংযত গম্ভীর করি মন
 ছিলে রত তপস্যায় অরুপরশ্মির অন্বেষণে
 লোক-লোকান্তের অন্তরালে—যেথা পূর্ব ঋষিগণে
 বহুদেব সিংহম্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
 দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে।
 হে তপস্বী, ডাকো তুমি সাময়ন্ত্রে জলদগ্ধর্জনে,
 'উত্তীর্ণত নিবোধত!' ডাকো শাস্ত-অভিমানী জনে

পান্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবহুং বিশ্বতলে
ডাকো মৃদু দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে,
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোমহুতান্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন শ্বশ্বহীন শূন্য শান্ত গুরুদর বেদীতে।

৩১

আজকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে ওগো,
দির্ঘদিগন্ত ঢাকি।
আজকে আমরা কাঁদিয়া শূন্যে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি—
হৃদয়বন্ধ, শূন্য গো বন্ধ মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়রাশি ঘোর।
চিরদিবসের আলোক গেল কি মূচ্ছিয়া।
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছুর নাহি বাকি?
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শূন্যে
আমরা খাঁচার পাখি।

ফল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হতে
মাঝে মাঝে রহি রহি
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হতে
অপূর্ব আশা বহি।
হৃদয়বন্ধ, শূন্য গো বন্ধ মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসী-আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি।
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখি।

আজ দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুর না যায় দেখা—
আজ কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়ে নি সোনার রেখা।

হৃদয়বন্ধু, শূন্য গো বন্ধু মোর,
 আজি শৃংখল বাজে অতি সুকঠোর।
 আজি পিঞ্জর ভূলাবারে কিছু নাহি রে,
 কার সম্ভান করি অন্তরে বাহিরে।
 মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
 আপনারে দিব ফাঁকি
 সে আলোটুকুও হারায়োছি আজি
 আমরা খাঁচার পাখি।

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
 তোমারে না দেয় ব্যথা।
 পিঞ্জরম্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
 লয়ে বৃথা আকুলতা।
 হৃদয়বন্ধু, শূন্য গো বন্ধু মোর,
 তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
 সকল মেঘের উষ্মে যাও গো উড়িয়া,
 সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া—
 'নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি'
 কহো আমাদের ডাকি,
 মৃদিয়া নয়ান শূনি সেই গান
 আমরা খাঁচার পাখি।

৩২

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী,
 কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি
 আপন চরণপ্রান্তে: তুমি মৃদু চিতে
 মগ্ন আছ আপনার গৃহের সংগীতে।
 স্তবে তব নাহি কান, তাই স্তব করি,
 তাই আমি ভক্ত তব অনিন্দ্যসুন্দরী।
 ভুবন তোমারে পূজে, জেনেও জান না:
 ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
 খ্যাতিহীন প্রিয়জনে। রাজমহিমারে
 যে করপরণে তব পার করিবারে
 শ্বিগুণ মহিমাম্বিত, সে সুন্দর করে
 ধূলি ঝাট দাও তুমি আপনার ঘরে।
 সেই তো মহিমা তব, সেই তো পরিমা,
 সকল মাধুর্য চেরে তারি মধুরিমা।

৩৩

কত কী যে আসে কত কী যে যায়
 বাহিয়া চেতনা-বাহিনী।
 আধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
 হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত—
 ছিন্নসূত্র বাছি শত শত
 তুমি গাঁথ বসে কাহিনী।
 ওগো একমনা, ওগো অগোচরা,
 ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

তব ঘরে কিছ্ ফেলা নাহি যায়
 ওগো হৃদয়ের গেহিনী।
 কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,
 কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ—
 তুমি তাই লয়ে বিরামবিহীন
 রচিছ জীবনকাহিনী।
 আধারে বসিয়া কী যে কর কাজ
 ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

কত যুগ ধরে এমনি গাঁথিছ
 হৃদি-শতদলশায়িনী।
 গভীর নিভূতে মোর মাঝখানে
 কী যে আছে কী যে নাই কে বা জানে,
 কী জানি রচিলে আমার পরানে
 কত-না যুগের কাহিনী--
 কত জনমের কত বিস্মৃতি
 ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

৩৪

কথা কও, কথা কও।
 অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
 কেন বসে চেয়ে রও।
 কথা কও, কথা কও।
 যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
 তোমার সাগরতলে,
 কত জীবনের কত ধারা এসে
 মিলায় তোমার জলে।
 সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
 কলকল ভাষ নীরব তাহার--

ভরসাহীন ভীষণ মৌন,
তুমি তারে কোথা লও।
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
স্তম্ভ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও।
তব সঙ্গার শূন্যেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সপ্ন
রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে,
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও,
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মঞ্জার মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত ষত নীরব কাহিনী
স্মৃতিভিত্ত হয়ে বও—
ভাষা দাও তারে, হে মূর্খ অতীত,
কথা কও, কথা কও।

৩৫

দেখো চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর কোরো না দেরি।
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরন,

দাঁড়াও, তোমায় হেরি।
 দাঁড়াও গো ওই আকাশ-কোলে,
 দাঁড়াও আমার হৃদয়-দোলে,
 দাঁড়াও গো ওই শ্যামল তৃণ-পরে,
 আকুল চোখের বারি বেয়ে
 দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
 জন্মে জন্মে যুগে যুগান্তরে।
 অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এসো,
 অমনি করে তড়িৎ-হাসি হেসো,
 অমনি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ।
 অমনি করে নিবিড় ধারাজলে
 অমনি করে ঘন তিমিরতলে
 আমায় তুমি করো নিরুদ্দেশ।

ওগো তোমার দরশ লাগি,
 ওগো তোমার পরশ মাগি,
 গুমরে মোর হিয়া।
 রহি রহি পরান ব্যোপে
 আগুনরেখা কেঁপে কেঁপে
 যায় যে ঝলকিয়া।
 আমার চিস্ত-আকাশ জুড়ে
 বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে
 জানি নে কোন্ দূর সমুদ্রপারে।
 সজল বায়ু উদাস ছুটে,
 কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
 পৃথিবীহীন গহন অন্ধকারে।
 ওগো তোমার আনো খেয়ার তরী,
 তোমার সাথে যাব অকূল-পরি,
 যাব সকল বাধন-বাধা-খোলা।
 ঝড়ের বেলা তোমার স্মিতহাসি
 লাগবে আমার সর্বদেহে আসি,
 তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা।

ওই যেখানে ঈশান কোণে
 তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে
 বিজ্ঞান উপকূলে,
 তটের পারে মাথা কুটে
 তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
 গিরির পদমূলে:
 ওই যেখানে মেঘের বেণী
 জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
 ঘর্ম্মরিছে নারিকেলের লাখা,

গরুড়সম ওই যেখানে
 উধর্বাশিরে গগনপানে
 শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা,
 কেন আজি আনে আমার মনে
 ওইখানেতে মিলে তোমার সনে
 বেধেছিলেম বহুকালের ঘর,
 হোথায় ঝড়ের নৃত্যমাঝে
 ঢেউয়ের সুরে আজো বাজে
 যুগান্তরের মিলনগীতিস্বর।

কে গো চিরজনম ভ'রে
 নিয়েছে মোর হৃদয় হ'রে
 উঠছে মনে জেগে।
 নিত্যকালের চেনাশোনা
 করছে আজি আনাগোনা
 নবীন ঘন মেঘে।
 কত প্রিয়মুখের ছায়া
 কোন্ দেহে আজ নিল কায়া।
 ছড়িয়ে দিল সুখদুখের রাশি,
 আজকে যেন দিশে দিশে
 ঝড়ের সাথে যাচ্ছে মিশে
 কত জন্মের ভালোবাসাবাসি।
 তোমায় আমার যত দিনের মেলা,
 লোক-লোকান্তে যত কালের খেলা
 এক মুহূর্তে আজ করো সার্থক।
 এই নিমেষে কেবল তুমি একা,
 জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা,
 জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক।

পাগল হয়ে বাতাস এল,
 ছিন্ন মেঘে এলোমেলো
 হচ্ছে বরষন,
 জানি না দিগ্দিগন্তরে
 আকাশ ছেয়ে কিসের তরে
 চলেছে আয়োজন।
 পথিক গেছে ঘরে ফিরে,
 পাখিরা সব গেছে নীড়ে,
 তরঙ্গী সব বাঁধা ঘাটের কোলে,
 আজি পথের দুই কিনারে
 জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ স্ফারে
 দ্বিধা আজি নয়ন নাহি খোলে।

শান্ত হ রে, শান্ত হ রে প্রাণ—
 ক্রান্ত করিস প্রগল্ভ এই গান,
 ক্রান্ত করিস বৃকের দোলাদুলি।
 হঠাৎ যদি দুরার খুলে যায়,
 হঠাৎ যদি হরষ লাগে গায়,
 তখন চেয়ে দেখিস আঁখি তুলি।

আলমোড়া
 ৩০ বৈশাখ ১৩১০

৩৬

আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে,
 বাঁকা পথের ডাহিন পাশে, ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
 কে জানে এই গ্রাম,
 কে জানে এর নাম,
 খেতের ধারে মাঠের পারে বনের ঘন ছায়ে।
 শূন্য আমার হৃদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে।

বেগুশাখার আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
 কত সাক্ষর চাঁদ-ওঠা সে দেখেছে এইখানে।
 কত আষাঢ় মাসে
 ভিজে মাটির বাসে
 বাদলা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে।
 সে-সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

এই দিঘি, ওই আমের বাগান, ওই যে শিবালয়,
 এই আঁঙনা ডাক-নামে তার জানে পরিচয়।
 এই পুকুরে তারি
 সাতার-কাটা বারি,
 ঘাটের পথরেখা তারি চরণ-লেখাময়।
 এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয়।

এই বাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি
 এরা সবাই দেখেছিল তারি মৃথের হাসি।
 কুশল পদাঙ্ক তারে
 দাঁড়াত তার স্মারে
 লাঙল কাঁধে চলছে মাঠে ওই যে প্রাচীন চাষী।
 সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালোবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি দখিন বাল্লি,
 দূর প্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে,

পারের বাতীদলে
 খেলার ঘাটে চলে,
 কেউ গো চেয়ে দেখে না ওই ভাঙা ঘাটের বঁয়ে।
 আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে।

আলমোড়া
 ২৯ বৈশাখ ১৩১০

০৭

ওরে আমার কর্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া
 ওরে আমার মন রে আমার মন।
 জানি নে তুই কিসের লাগি কোন্ জগতে আছিস জাগি,
 কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন।
 কোন্ পুরানো যুগের বাণী অর্থ যাহার নাহি জানি,
 তোমার মূখে উঠছে আজি ফুটে।
 অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্ ভাষাতে গাঁথছে গীতি
 শব্দে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে।
 আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্ছে তোমার পাখা উড়ে
 তোমার সাথে চলতে আমি নারি।
 তুমি যাদের চিনি ব'লে টানছ বৃকে নিছ কোলে
 আমি তাদের চিনতে নাহি পারি।

আজকে নবীন চৈত্র মাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
 খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
 মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা
 এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।
 গভীর চিন্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
 জানি নে সে কোন্ জনমের পাওয়া।
 দেখে নিলেম কণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
 যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।
 ফুলের গন্ধ চূপে চূপে আজি সোনার কাঠিরূপে
 ভাঙালো তার চিরযুগের ঘুম।
 দেখছে লয়ে মকুর করে আঁকা তাহার ললিট-পরে
 কোন্ জনমের চন্দনকুঙ্কুম।

আজকে হৃদয় যাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে
 কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।
 খুলে গেছে কেমন করে আজি অসম্ভবের ঘরে
 মর্চে-পড়া পুরানো কুলাপ।
 সেথায় মায়াম্বীপের মাঝে নিরন্তরের বীণা বাজে,
 ফেরিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,

মর্মরিত-তমাল-ছায়ে ভিজ়ে চিকুর শব্দকার বায়ে
তাদের চেনে, চেনে না বা কেউ।
শৈলতলে চরায় খেন্দু রাখালশিশু বাজায় বেগু
চুড়ায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়া লিখা চৈত মাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্বধন-তরে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন বায়ে মধুর তাপে,
তেমনি মম কাঁপছে সারা প্রাণ।
কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্মরিয়া উঠছে কলতান।
কোন্ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনি নে গো,
মোর স্বারে কে করছে আনাগোনা।
ছায়ায় আঁজি তরুর মূলে ঘাসের 'পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মন-হারানি
জুই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান।

শুনাস নে গো ক্লান্ত বৃকের বেদনা যত সুখের দুখের
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার।
শুনাও শুধু মৃদুমন্দ অর্থবিহীন কথার ছন্দ
শুধু সুরের আকুল ঝংকার।
ধারাবন্ত সিনান করি যত্নে তুমি এসো পরি
চাঁপাবরন লঘু বসনখানি।
ভালে আঁকো ফুলের রেখা চন্দনেরই পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহো টানি।
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীল ছায়া গাছের সারে
নয়ন-দুটি মগন করি চাও।
ভিন্নদেশী কবির গাথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও।

হাজিরাবাগ

১২ চৈত্র ১৩০৯

৩৮

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
কে এলে গো, কে গো তুমি এলে।
একলা আমি বসে আছি
অন্তলোকের কাছাকাছি
পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে।

অতি সুদূর দীর্ঘ পথে
 আকুল তব আঁচল হতে
 অধারতলে গন্ধরেখা রাখি
 জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
 কখন এলে দুরারদেলে
 শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি।

তোমার সাথে আমার পাশে
 কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
 পান্থবিহীন পথের বিজনতা,
 ধূসর আলো কত ঘাটের,
 বহুশূন্য কত ঘাটের
 অধার কোণে জলের কলকথা।
 শৈলতটের পারের 'পরে
 তরঙ্গদল ঘূর্মিয়ে পড়ে
 স্বপ্ন তারি আনলে বহন করি,
 কত বনের পাথে পাথে
 পাখির যে গান সুপ্ত থাকে
 এনেছ তাই মৌন নৃপদর ভরি।

মোর ভালে ওই কোমল হস্ত
 এনে দেয় গো সুখ-অস্ত,
 এনে দেয় গো কাজের অবসান,
 সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ
 সকল সমাপনের ছন্দ,
 সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।
 আঁচল তব উড়ে এসে
 লাগে আমার বক্ষে কেশে,
 দেহ যেন মিলায় শূন্য-পরি,
 চক্ৰ তব মৃত্যুসম
 স্তম্ভ আছে মৃধে ময়
 কালো আলোর সর্বহদর ভরি।

যেহানি তব দক্ষিণপাণি
 তুলে নিল প্রদীপখানি
 রেখে দিল আমার গৃহকোণে
 গৃহ আমার এক নিমেষে
 ব্যাপ্ত হল ভারার দেশে
 ভিমিরতটে আলোর উপবনে।
 আজি আমার ঘরের পাশে
 গগনপারের কারা আসে
 অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি।

আজি আমার স্বামীর কাছে
অনাদি রাত স্তম্ভ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।

এই মৃদুহৃদে আধেক ধরা
লগ্নে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি
আমার বাতায়নে এসে
দাঁড়াল আজ দিনের শেষে,
শোনার তোমায় গুঞ্জরিত গীতি।
চক্ষে তব পলক নাই,
ধুবতারার দিকে চাই
তাকিয়ে আছি নিরুদ্দেশের পানে।
নীরব দুটি চরণ ফেলে
আঁধার হতে কে গো এলে
আমার ঘরে আমার গীতে গানে।

কত মাঠের শূন্যপথে,
কত পুরীর প্রান্ত হতে
কত সিদ্ধবালুর তীরে তীরে,
কত শান্ত নদীর পারে,
কত স্তম্ভ গ্রামের ধারে,
কত সুস্ত গৃহদুয়ার ফিরে
কত বনের বায়ুর 'পরে
এলোচুলের আঘাত ক'রে
আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে।
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সূরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে।

হাজারিবাগ
১৬ মে ১৩০১

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
জাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাই রে।
কেন আসি, কেন হাসি,
কেন আঁখিজলে ভাসি,

কার কথা বলে যাই,
কার গান গাহি রে।
অর্থ কিছুই তার নাহি রে।

ওরে মন, আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কী করিস নাট-বেদীতে?
বদ্বিজে চাহিস যদি বাহিরেতে আয়,
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।
ওই দেখ্ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই
চাস যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস নাট-বেদীতে।

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বদ্বিবি।
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে,
বদ্বি নিবি, বিধাতার
সাথে নাহি বদ্বিবি—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

৪০

চিরকাল এ কী লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অশ্রুত এই দোল।
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি
তখন পলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভরে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল।

চিরকাল একই লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কে বা জানে।
কোথা বসে আছ একেলা।
সব রবিংশণী কুড়িয়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা।
ঝুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেন্দ্রে ভাবি, আমারি কী ধন
কে লইল বদ্বি হ'রে।
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান
সে কথাটি কে বা জানে।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।

এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু বাওয়া, শুধু আসা।
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে তো যেমন যা ছিল—
হারায় নি কিছ, ফুরায় নি কিছ,
যে মরিল যে বা বাঁচিল।
বহি সব সুখদুখ
এ ভুবন হাসিমুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বদক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু বাওয়া, শুধু আসা।

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি, মোর সভাতে।
হাতে ছিল তব বাঁজি,
অধরে অবাক হাসি,

সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
 মদবিহীন গোড়াতে।
 সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
 সেদিন নবীন প্রভাতে—
 নব-বৌবন-সভাতে।

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
 সব কাজ তুমি ভুলালে।
 খেলিলে সে কোন্ খেলা,
 কোথা কেটে গেল বেলা।
 ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার
 রক্তকমল দুলালে।
 পদলিকিত মোর পরানে তোমার
 বিলোল নয়ন দুলালে,
 সব কাজ মোর ভুলালে।

তার পরে হায় জানি নে কখন
 ঘুম এল মোর নয়নে।
 উঠিন্, যখন জেগে
 ঢেকেছে গগন মেঘে,
 তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া
 দলিত পত্ন-শয়নে।
 তোমাতে আমাতে রত ছিন্, যবে
 কাননে কুসুমচরনে
 ঘুম এল মোর নয়নে।

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
 আজি ঝরঝর বাদরে।
 পথে লোক নাই আর,
 রুদ্ধ করেছি দ্বার,
 একা আছে প্রাণ ভূতল-শয়ান
 আজিকার ভরা ভাদরে।
 তুমি কি দূরারে আঘাত করিলে,
 তোমারে লব কি আদরে
 আজি ঝরঝর বাদরে।

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
 তাপস-মুদ্রিতি ধরিয়া।
 স্তিমিত নয়নতারা
 ঝলিছে অনলপারা,
 সিক্ত তোমার জটাজুট হতে
 সজিল পড়িছে ঝরিয়া।

বাহির হইতে ঝড়ের আধার
আনিয়াছে সাথে করিয়া
তাপস-মুরতি ধরিয়া।

নামি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,
এসো মোর ভাঙা আলয়ে।
ললাটে তিলকরেখা
যেন সে বহিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেরো না অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এসো এসো ভাঙা আলয়ে।

৪২

মন্ত্রে সে যে পুত
রাখীর রাঙা সূতো
বাধন দিয়েছিল হাতে:
আজ কি আছে সেটি সাথে।
বিদায়বেলা এল মেঘের মতো ব্যোমে,
গ্রন্থি বোধে দিতে দৃ হাত গেল কে'পে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষু-দৃষ্টি ছোপে
ভরে যে এল জলধারা।
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা—
সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাখী -
আধেক রাঙা, সোনা আধা,
আজো কি আছে সেটি বাধা।

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে
চৈত্র-ফসলের দেশে।
যখন গেলে চলে তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেশী তব এলিয়ে ছিল খুলে,
মালাখানি গাথা সাজের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পারে।

একটুখানি ভূমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে।
 নতুন ফুলে দেখো কানন ওঠে যেতে,
 দিতেম ফরা করে নবীন মালা গেঁথে
 কনকচাঁপা-বনছায়ে।
 মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
 পল কি বেণী হতে খসে,
 আজকে ভাবি তাই বসে।

নুপূর ছিল ঘরে
 গিয়েছ পারে পরে,
 নিয়েছ হেথা হতে তাই,
 অঙ্গে আর কিছু নাই।
 আকুল কলতানে শতেক রসনার
 চরণ ঘেরি তব কাঁদিয়ে করুণায়,
 তাহারা হেথাকার বিরহবেদনায়
 মূখর করে তব পথ।
 জানি না কী এত যে তোমার ছিল দুরা,
 কিছতে হল না যে মাথার ভূষা পরা,
 দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা -
 রহিল মনে মনোরথ।
 হেলায় বাধা সেই নুপূর-দুটি পায়ে
 আছে কি পথে গেছে খুলে,
 সে কথা ভাবি তরুন্মূলে।

অনেক গীতগান
 করেছি অবসান
 অনেক সকালে ও সাজে,
 অনেক অবসরে কাজে।
 তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
 দীর্ঘ পথ দিয়ে গেছ সুদূর-পানে,
 আধেক-জানা সুরে আধেক-ভোলা তানে
 গেয়েছ গদগদ স্বরে।
 কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
 সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
 তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
 ফুটল তব প্রজাতরে।
 মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর
 যে গান নিয়ে গেলে শেষে,
 ভাবি যে তাই অনিমেষে।

পথের পথিক করেছ আমার
 সেই ভালো ওগো সেই ভালো ।
 আলোয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে
 সেই আলো মোর সেই আলো ।
 ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়াতরী,
 তাও কি ডুবালে ছল করি ।
 সঁতারিয়া পার হব বহি ডার
 সেই ভালো মোর সেই ভালো ।

ঝড়ের মূখে যে ফেলেছ আমার
 সেই ভালো ওগো সেই ভালো ।
 সব স্নেহজ্বালে বহু জ্বালালে
 সেই আলো মোর সেই আলো ।
 সাথী যে আছিল নিলে কাড়ি,
 কী ভয় লাগালে গেল ছাড়ি ।
 একাকীর পথে চলিব জগতে
 সেই ভালো মোর সেই ভালো ।

কোনো মান তুমি রাখ নি আমার
 সেই ভালো ওগো, সেই ভালো ।
 হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
 সেই আলো মোর সেই আলো ।
 পাথের যে-ক'টি ছিল কড়ি
 পথে খসি কবে গেছে পড়ি,
 শব্দ নিঃস্বল আছে সম্বল
 সেই ভালো মোর সেই ভালো ।

আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে
 পান্থ, বিদেশী পান্থ ।
 স্বপ্নটা বাজিল দূরে,
 ও-পারের রাজপদুরে,
 এখনো যে পথে চলিছিস তুই
 হার রে পথপ্রান্ত
 পান্থ, বিদেশী পান্থ । *

দেখ, সবে ঘরে ফিরে এস, ওরে
 পান্থ, বিদেশী পান্থ ।

পূজা সারি দেবালয়ে
প্রসাদী কুসুম লয়ে,
এখন ঘুমের কর্ আয়োজন
হার রে পথপ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

রজনী আঁধার হয়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ওই যে গ্রামের পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কী করিবি একা
হার রে পথপ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
নাথ্যবি এমন ঠাই
পাড়ায় কোথা কি নাই।
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি
হার রে পথপ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

পথের চিহ্ন দেখা নাই যার
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
কোন প্রান্তরশেষে
কোন বহুদূর-দেশে,
কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
হার রে পথপ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

৪৫

সাপা হলেছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
ভূমি এসো, এসো নারী,
আনো তব হেমকারি।
ধরে-মুছে দাও যুগির চিহ্ন,
জোড়া দিবে দাও ভস্ম-ছিন্ন,
সুন্দর করো, সার্থক করো
পূজিত আয়োজন।

এসো সুন্দরী নারী,
শিরে লরে হেমঝারি।

হাটে আর নাহি কেহ।
শেষ করে খেলা ছেড়ে এন্দ্র মেলা,
গ্রামে গড়িয়া গেল।
তুমি এসো, এসো নারী,
আনো গো তীর্থবারি।
স্নিগ্ধহাসিত বদন-ইন্দ্র,
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু,
মঙ্গল করো, সার্থক করো
শূন্য এ মোর গেল।
এসো কল্যাণী নারী,
বহিরা তীর্থবারি।

বেলা কত যায় বেড়ে।
কেহ নাহি চাহে খর-বিদাহে
পরবাসী পথিকেরে।
তুমি এসো, এসো নারী,
আনো তব সুধাবারি।
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া পোভন লব্ধ,
বরণ করিয়া সার্থক করো
পরবাসী পথিকেরে।
আনন্দময়ী নারী,
আনো তব সুধাবারি।

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মতো দিন হল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এসো, এসো নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে করে দিক করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হোক বিদায়ের বেলা।
অগ্নি বিদ্যাদিনী নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।

অধির নিশীথরাতি।
গৃহ নির্জন শূন্য শয়ন
অদলিছে পূজার ষাতি।

ভূমি এসো, এসো নারী,
 আনো তর্পণবারি।
 অব্যাহত করি ব্যাখিত বন্ধ
 খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
 এলোকেশপাশে শূন্যবসনে
 জ্বালাও পূজার বাতি।
 এসো তাপসিনী নারী,
 আনো তর্পণবারি।

৪৬

আমাদের এই পল্লীখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
 দেবদারুর কুঞ্জে খেন্দু চরায় রাখালেরা।
 কোথা হতে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে,
 অঘ্রানেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা
 আমরা কিছুই জানি নেকো সেই সুন্দরের কথা।
 আমরা জানি গ্রাম ক'খানি চিনি দশটি গিরি,
 মা ধরণী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি।

সে ছিল ওই বনের ধারে ভূটোখেতের পাশে
 যেখানে ওই ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে।
 কণা হতে আনতে বারি জুটত হোথা অনেক নারী,
 উঠত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে,
 সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে।
 মিশত কুলকুলধ্বনি তারি দিনের কাজে,
 ওই রাগিণী পথ হারাত তারি ধূমের মাঝে।

সন্ধ্যাবেলায় সম্যাসী এক বিপুল জটা শিরে
 মেঘে-ঢাকা শিখর হতে নেমে এলেন ধীরে।
 বিস্ময়েতে আমরা সব শূন্যাই, 'ভূমি কে গো হবে।'
 বসল ষোগী নিরন্তরে নিষ্করীণীর কূলে
 নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে।
 অজানা কোন্ অমঙ্গলে বন্ধ কাঁপে ডরে,
 রাতি হল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে।

পরদিনে প্রভাত হল দেবদারুর বনে,
 কণাতলার আনতে বারি জুটল নারীগণে।
 দয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে ধূশি, নাই সে হাসি,
 জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
 নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জ্বলে।
 কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোছাতেই
 শূন্য ঘরের দ্বারের কাছে সম্যাসীও নেই।

চৈতন্যমাসে রৌদ্র বাড়ে, বরফ গলে পড়ে—
 ঝর্নাভাঙ্গায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে।
 আজিকে এই তুষার দিনে কোথায় ফেরে নিঝর বিনে,
 শূন্য কলস ভরে নিতে কোথায় পাবে ধারা।
 কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হল হারা।
 কোথাও কিছ্ আছে কি গো, শূন্যই যারে ভারে,
 আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশ পাহাড়ের পারে।

গ্রীষ্মরাতে বাতায়নে বাতাস হু হু করে,
 বসে আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শূন্য ঘরে।
 শূন্য বসে শ্বাসের কাছে ঝর্না যেন তারেই যাচে
 বলে, 'ওগো আজকে তোমার নাই কি কোনো তুষা,
 জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন গ্রীষ্মানিশা :'
 আমিও কৈঁদে কৈঁদে বলি, 'হে অজ্ঞাতচারী,
 তুষা যদি হারাও তবু ছুঁলো না এই বারি।'

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগল চোখে ধাঁধা,
 চারি দিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।
 ওই যে আসে, করে দেখি আমাদের যে ছিল সে কি?
 ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সন্ধে?
 খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মন্ডে?
 নাইকো পাহাড়, কোনোখানে ঝর্না নাই করে,
 তুষা গেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে?

সে কহিল, 'যে-ঝর্না সেথা মোদের শ্বাসে,
 নদী হয়ে সে-ই চলছে হেথা উদার ধারে।
 সে আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে অসীম-পানে গেছে বেড়ে
 সেই ধরায়েই নাইকো হেথা পাষণ-বাঁধা বেঁধে।'
 'সবই আছে, আমরা তো নেই', কইনু তারে কৈঁদে।
 সে কহিল করুণ হেসে, 'আছ হৃদয়মূলে।'
 স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝর্নাকূলে।

জোড়াসাঁকো

১০ মার্চ ১৯০৯

৪৭

অন্ত চূপি চূপি কেন কথা কও
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
 অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
 ওগো একি প্রণয়েরই ধরন।
 যবে সম্মুখবেলায় ফুলদল
 পড়ে ক্রান্ত বৃন্তে নখিরা,

যবে ফিরে আসে গোঠে গাড়ীদল
সারা দিনমান ঘাটে প্রমিলা,
ভূমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

হার এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ।
ভূমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অরণ বক্ষণোন্নিতে?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিংকণী-রণরণিতে?
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কহো মিলনের এ কি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছ্র নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চড়া করি বাধা হবে না।
তব বিজয়োন্মত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ হবে না।
তব মঙ্গল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাগাবরন?
চাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তার কতমতো ছিল আরোজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তার লটপট করে বাঘছাল,
তার বৃষ রহি রহি গরজে,
তার বেণ্টন করি জটাজাল
যত ভূজঙ্গদল ভরজে।

তাঁর ববম্-ববম্ বাজে গাল,
 দোলে গলায় কপালাভরণ,
 তাঁর বিষাগে ফুকারি উঠে তান
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

শূনি শ্মশানবাসীর কলকল
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
 সূখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
 তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
 তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর,
 তাঁর হিম্মা দরদরদর দুলিছে,
 তাঁর পলকিত তনু জরজর,
 তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
 তাঁর মাতা কাদে শিরে হানি কর
 খেপা বরেবরে করিতে বরণ,
 তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

তুমি চুরি করি কেন এস চোর
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
 শূধু নীরবে কখন নিশি-জের,
 শূধু অশ্রু-নিঝর-ঝরন।
 তুমি উৎসব করো সারারাত
 তব বিজয়শঙ্খ বাজারে।
 মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
 নব রক্তবসনে সাজারে।
 তুমি কারে করিযো না দৃক্-পাত,
 আমি নিজের লব তব শরণ
 যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
 তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
 কোরো সব লাজ অপহরণ।
 যদি স্বপনে মিটারে সব সাধ
 আমি শূরে থাকি সূখশরনে,
 যদি হৃদয়ে জড়াবে অবসাদ
 থাকি আশ্রয়গরুক নয়নে,
 তবে শব্দে তোমার তুলো নাদ
 করি প্রলয়শ্বাস ভরন,

আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আমি বাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
যেথা অকল হইতে যায় বয়
করি আধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

৪৮

সে তো সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে
এসেছিল প্রবাসীর মতো এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে।
আজ সেথা কী করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হতে টানি লয় যত মোর গীতি।
এ ভুবনে মোর চিন্তে অতি অল্প স্থান
নিরেছ ভুবননাথ। সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ। পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজাশেষে
লবে সবে তোমা সাথে মোরে ভালোবেসে
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে।
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখো বেঁধে।

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পদ্পদলে; প্রেম-আকর্ষণে
যত গঢ় যত মোর অন্তরে বিলাসে
উঠবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি—অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহবানে

নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
 নব নব বিকাশের বর্ণ যাব একে।
 কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা-রূপে
 এক ধরাভ্রম্মাঝে শূন্য একরূপে
 বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুপথে
 তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

.

সংযোজন

.

কবী কথা বলিব বলে
 বাহিরে এলেন চলে,
 দাঁড়ালেম দুয়ারে তোমার—
 উর্ধ্বমুখে উচ্চরবে
 বলিতে গেলেম যবে
 কথা নাহি আর।
 যে কথা বলিতে চাহে প্রাণ
 সে শব্দ হইয়া উঠে গান।
 নিজের না বদ্বিজে পারি,
 তোমারে বদ্বিজে নারি,
 চেয়ে থাকি উৎসুক-নয়ান।

তবে কিছ্ শব্দধারো না—
 শব্দে যাও আনমনা,
 যাহা বোঝ, যাহা নাই বোঝ।
 সম্ভার অধার-পরে
 মূখে আর কণ্ঠস্বরে
 বাকিটুকু খোঁজো।
 কথায় কিছ্ না যায় বলা,
 গান সেও উন্মত্ত উতলা।
 তুমি যদি মোর সুরে
 নিজ কথা দাও পুরে
 গীতি মোর হবে না বিফলা।

কত দিবা কত বিভাবরী
 কত নদী নদে লক্ষ স্রোতের
 মাঝখানে এক পথ ধরি,
 কত ঘাটে ঘাটে লাগিয়ে,
 কত সারিগান জাগিয়ে,
 কত অগ্নানে নব নব ধানে
 কতবার কত বোঝা ভারি
 কর্ণধার হে কর্ণধার,
 বেচে কিনে কত স্বর্ণভার
 কোন্ গ্রামে আজ সাধিতে কী কাজ
 বাঁধিয়া ধরিলে তব উরী।

হেথা বিকিকিনি কার হাটে।
 কেন এত ত্বরা লইয়া পসরা
 ছুটে চলে এরা কোন্ বাটে।
 শুন গো থাকিয়া থাকিয়া
 বোঝা লয়ে যায় হাঁকিয়া,
 সে করুণ স্বরে মন কী যে করে
 কী ভেবে আমার দিন কাটে।
 কর্ণধার হে কর্ণধার,
 বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
 হেথা কারা রয় লহো পরিচয়,
 কারা আসে যায় এই ঘাটে।

যেথা হতে যাই, যাই কোন্।
 এমনটি আর পাব কি আবার
 সরে না যে মন সেই বেদে।
 সে-সব কাদন ভুলালে,
 কী দোলায় প্রাণ দুলালে।
 হোথা যারা তাঁরে আনমনে ফিরে
 আমি তাহাদের মরি সেধে।
 কর্ণধার হে কর্ণধার,
 বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
 এই হাটে নামি দেখে সব আমি--
 এক বেলা তরী রাখো বেধে।

গান ধর ভূমি কোন্ সুরে।
 মনে পড়ে যায় দূর হতে এন্দু,
 যেতে হবে পুন কোন্ দূরে।
 শূনে মনে পড়ে, দূজনে
 খেলোছি সজনে বিজনে,
 সে যে কত দেশ নাই তার শেষ--
 সে যে কত কাল এন্দু ঘুরে।
 কর্ণধার হে কর্ণধার,
 বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
 বাঁজিয়াছে শাখ, পড়িয়াছে ডাক
 সে কোন্ অচেনা রাজপুরে।

৩

রোগীর শিয়রে রাখে একা ছিন্দু জাগ,
 বাহিরে দাঁড়ান এসে ক্ষণেকের লাগি।
 শান্ত মৌন নগরীর স্তম্ভ হর্ম্যশিরে
 হেরিন্দু জড়লিছে তারা নিস্তব্ধ তিমিরে।

ভূত ভাবী বর্তমান একটি পলকে
 মিলিল বিষাদশ্লিষ্ট আনন্দপলকে
 আমার অন্তরতলে; অনির্বচনীয়
 সে মূহুর্তে জীবনের যত-কিছু প্রিয়,
 দর্শিত বেদন্য যত, যত গত সুখ,
 অনঙ্গত অশ্রুবাম্প, গীত মৌনমুক
 আমার হৃদয়পাশে হয়ে রাশি রাশি
 কী অনলে উজ্জ্বলিল। সৌরভে নিশ্বাসি
 অপরূপ ধূপধূম উঠিল সুধীরে
 তোমার নক্ষত্রদীপ্ত নিঃশব্দ মন্দিরে।

৪

কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে
 গাহিতে তোমার গান কহিল সকলে,
 সহসা রুদ্ধিয়া গেল হৃদয়ের দ্বার—
 যেথায় আসন তব, গোপন আগার।
 স্থানভেদে তব গান মূর্তি নব নব—
 সখাসনে হাস্যোচ্ছ্বাস সেও গান তব,
 প্রিয়াসনে প্রিয়ালোপ, শিশুসনে খেলা—
 জগতে যেথায় যত আনন্দের মেলা
 সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
 আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।
 আকাশে তারকা ফুটে, ফুলবনে ফুল,
 ধ্বনিতে মানিক থাকে, হয় নাকো ভুল।
 তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
 রেখেছ, কবিও যেন রাখে ভাব মান।

৫

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়;
 হেরি সে মস্ততা মোর বন্ধু আসি কর,
 'তরি ভূতা হয়ে ভোর এ কী চপলতা।
 কেন হাস্য-পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
 কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
 ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে।'
 দিগ্বেষি উত্তর তারে, 'ওগো পুরুষেশ,
 আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
 যে জানিলে যে অনন্ত চিস্তাবেদনার
 ধ্বনিত মানবপ্রাণ, আমার বীণায়

দিয়েছেন তারি সুর—সে তাহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।
তব আশ্রয় রক্ষা করি নাই সে ক্রমতা,
সাধ্য নাই তার আশ্রয় করিতে অন্যথা।’

৬

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শরতি,
এনেছি মোদের মনের ভরতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমাতে করিতে দান।

কাঞ্চনখালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিকো জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজিয়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা জুটে।
সুরদল্লভ তোমার প্রসাদ
জীব পর্ণপুটে।

রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।
দৈনের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত অগ্নিবচন—
তাই আমাদের দিও।
পরের সম্ভ্রা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
 অশোকমন্ত্র তব।
 দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
 দাও গো জীবন নব।
 যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
 যে জীবন ছিল তব রাজ্যসনে,
 মৃত্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
 চিস্ত ভরিয়া লব।
 মৃত্যুতরণ লঙ্কাহরণ
 দাও সে মন্ত্র তব।

৭

নব বৎসরে করিলাম পণ,
 লব স্বদেশের দীক্ষা,
 তব আশ্রমে তোমার চরণে
 হে ভারত, লব শিক্ষা।
 পরের ভূষণ পরের বসন
 তেয়াগিব আজ পরের অশন;
 যদি হই দীন, না হইব হীন,
 ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
 নব বৎসরে করিলাম পণ,
 লব স্বদেশের দীক্ষা।

না থাকে প্রাসাদ, আছে তো কুটির
 কল্যাণে সুপবিত্র।
 না থাকে নগর, আছে তব বন
 ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
 তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে
 তোমারে দেখেছি তত ছোটো করে;
 কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ,
 তুমি পুরাতন মিত্র।
 হে তাপস, তব পর্ণকুটির
 কল্যাণে সুপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
 দিয়েছি পেরেছি লজ্জা।
 তোমারে ভুলিতে ফিরিয়েছি মদ্য,
 পেরেছি পরের সজ্জা।
 কিছ্ নাহি গণি কিছ্ নাহি কহি
 জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি—

তব সনাতন ধ্যানের আসন
 মোদের অস্থিরজ্ঞা।
 পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
 দিয়েছি পেরেছি লজ্জা।

সে-সকল লাজ তেয়াগিব আজ,
 লইব তোমার দীক্ষা।
 তব পদতলে বসিয়া বিরলে
 শিখিব তোমার শিক্ষা।
 তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
 তব মন্দের গভীর মর্ম
 লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
 ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
 তব গৌরবে গরব মানিব,
 লইব তোমার দীক্ষা।

খেয়া

উৎসর্গ

বিজ্ঞানাচার্য-শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
করকমলোষু

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কী পেয়েছে আকাশ হতে,
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুকে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুম্বে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুম্বে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন ধ্যানে রতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ-পরশ,
হরষ দিয়ে দাও,
করণ চক্ৰ মেলে ইহার
মর্মপানে ঢাও।
সারা দিনের গন্ধগীতি
সারা দিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এ যে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা—
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

এই-যে মৃদে আছে লাজে
 পড়বে তুমি এরই মাঝে—
 জীবনমৃত্যু রৌদ্রছায়া
 ঝটিকার বারতা।
 আমার লজ্জাবতী লতা।

কলিকাতা
 ২৮ আষাঢ় ১৩১৩

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।
ও পারেতে সোনার কদলে অধারমূলে কোন্‌ মায়ী
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামায়ে মদ্য চুকায়ে সুখ যাবার মদ্যে যার যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘরছাড়া—
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।

ওরে আর
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও পার হতে একটানা
একটি-দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌ স্থানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে
ছায়ায় বেন ছায়ার মতো যায়,
ডাকলে আমি কণেক থামি হেথায় পাড়ি ধরবে সে
এমন নেরে আছে রে কোন্‌ নার।

ওরে আর
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বাহার নাইকো যাহার, ফসল বাহার ফলল না—
অগ্র বাহার ফেলতে হারি পার—
দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁজের আলো জ্বলল না—
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

ওরে আর
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।

ঘাটের পথ

ওরা চলেছে দিঘির ধারে।
 ওই শোনা যায় বেণুবনছায়
 কঙ্কণ ঝংকারে।
 আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
 শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ,
 দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বারে।
 ওরা চলেছে দিঘির ধারে।

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
 শাখা-থরথর পাতা-মরমর
 ছায়া সুশীতল বাটে
 বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ,
 ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ,
 এ বেলা কেমনে কাটে।
 আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে।

ওগো কী আমি কহিব আর।
 ভাবিস নে কেহ ভয় করি আমি
 ভরা-কলসের ভার।
 যা হোক তা হোক এই ভালোবাসি,
 বাহে নিয়ে যাই, ভরে নিয়ে আসি,
 কতদিন কতবার।
 ওগো আমি কী কহিব আর।

এ কি শূন্য জল নিয়ে আসা।
 এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
 কী কব, কী আছে ভাষা!
 কত-না দিনের অধারে আলোতে
 বহিয়া এনেছি এই বঁকা পথে
 কত কাদা কত হাসা।

এ কি শূন্য জল নিয়ে আসা।

আমি ডরি নাই ঝড়জল,
 উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে
 উদ্দাম অশ্রুজল।
 বেণুশাখা-পরে বারি করবারে,
 এ কূলে ও কূলে কালো ছায়া পড়ে,
 পঞ্চাট পিচ্ছল।

আমি ডরি নাই ঝড়জল।

আমি গিয়াছি আঁধার সাজে।
 শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
 নিজের বনমাঝে।
 বাতাস ধমকে, জোনাকি চমকে,
 ঝিল্লির সাথে কমকে কমকে
 চরণে ভূষণ বাজে।
 আমি গিয়াছি আঁধার সাজে।

যবে বৃকে ভরি উঠে ব্যথা,
 ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
 অকারণ আকুলতা।
 আপনার মনে একা পথে চলি,
 কাঁথের কলসী বলে ছলছলি
 জলভরা কলকথা—
 যবে বৃকে ভরি উঠে ব্যথা।

ওগো দিনে কতবার করে
 ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
 ওই পথ ডাকে মোরে।
 কুসুমের বাস ঘেরে ঘেরে আসে,
 কপোত-কজ্জল-করুণ আকাশে
 উদাসীন মেঘ ঘোরে—
 ওগো দিনে কতবার করে।

আমি বাহির হইব বলে
 যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
 নীল আকাশের কোলে!
 তাই কানাকানি পাতার পাতার,
 কালো লহরীর মাথার মাথার
 চঞ্চল আলো দোলে—
 আমি বাহির হইব বলে।

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।
 আঙিনার দ্বারে চাহি পঞ্চপানে
 ঘর ছেড়ে যেতে নারি।
 দিনের আলোক স্নান হয়ে আসে,
 বধুগণ ঘাটে যার কলহাসে
 ককে লইয়া বারি।
 মোর ভরা হয়ে গেছে বারি।

ঘাটে

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া।
 যে হাওয়াতে চলত তরী
 অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।
 নেই যদি বা জমল পাড়ি
 ঘাট আছে তো বসতে পারি,
 আমার আশার তরী ডুবল যদি
 দেখব তোদের তরী বাওয়া।
 হাতের কাছে কোলের কাছে
 যা আছে সেই অনেক আছে,
 আমার সারা দিনের এই কি রে কাজ
 ও পার পানে কেঁদে চাওয়া।
 কম কিছ্ মোর থাকে হেথা
 পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা,
 আমার সেইখানেতেই কম্পলতা
 যেখানে মোর দাবি-দাওয়া।

গিরিডি
 ২৭ ভাদ্র ১৩১২

শুভক্ষণ

১

ওগো মা,

রাজার দলাল যাবে আজি মোর
 ঘরের সমুখপথে,
 আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
 রহিব বলো কী মতে।
 বলে দে আমার কী করিব সাজ,
 কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আশ্র,
 পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
 কোন্ বরনের বাস।

মা গো,

কী হল তোমার, অবাক নয়নে
 মৃদুপানে কেন চাস।

আমি

দাঁড়াব যেখানে বাতায়নকোণে
 সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে—
 ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
 যাবে সে সদরে পুরে,
 শুধু সঙ্গের বালি কোন্ মাঠ হতে
 বাজবে ব্যাকুল সুরে।

তব্দ রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
 রহিব বলো কী মতে।

ত্যাগ

২

ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায় বাতাসনে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে।

মা গো,

কী হল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে!

মোর

হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়িয়ে,
রথের চাকার গেছে সে গুঁড়িয়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু অঁকা।

আমি

কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধুলায় রহিল ঢাকা।

তব্দ

রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে—

মোর

বন্ধের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে।

বোলপুর

১৩ শ্রাবণ ১৩১২

আগমন

তখন রাত্রি অধার হল,

সাঙ্গ হল কাজ—

আমরা মনে ভেবেছিলাম

আসবে না কেউ আজ।

মোদের গ্রামে দুয়ার ষত
 রুদ্ধ হল রাতের মতো,
 দু-এক জনে বলোছিল,
 'আসবে মহারাজ।'
 আমরা হেসে বলোছিলাম,
 'আসবে না কেউ আজ।'

দ্বারে যেন আঘাত হল
 শুনোছিলাম সবে,
 আমরা তখন বলোছিলাম,
 'বাতাস বৃষ্টি হবে।'
 নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
 শূন্যেছিলাম আলসভরে,
 দু-এক জনে বলোছিল,
 'দুত এল বা তবে।'
 আমরা হেসে বলোছিলাম,
 'বাতাস বৃষ্টি হবে।'

নিশীথরাতে শোনা গেল
 কিসের যেন ধ্বনি।
 ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলাম
 মেঘের গরজনি।
 ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি
 কাঁপল ধরা থরহরি,
 দু-এক জনে বলোছিল,
 'চাকার ঝনঝনি।'
 ঘুমের ঘোরে কহি মোরা,
 'মেঘের গরজনি।'

তখনো রাত অধার আছে,
 বেজে উঠল ভেরী,
 কে ফুকারে, 'জাগো সবাই,
 আর কোরো না দেরি।'
 বন্ধ-পরে দু হাত চেপে
 আমরা ভরে উঠি কে'পে,
 দু-এক জনে কহে কানে,
 'রাজার ধ্বজা হেরি।'
 আমরা জেগে উঠে বলি,
 'আর তবে নয় দেরি।'

কোথায় আলো, কোথায় মালা,
কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল—
কোথায় সিংহাসন।
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সম্ভা।
দু-এক জনে কহে কানে,
'বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্য ঘরে
করো অভ্যর্থন।'

ওরে, দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা, শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
অধির ঘরের রাজা।
বন্ধু ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঁঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

কলিকাতা
২৮ শ্রাবণ ১৩১০

দুঃখমূর্তি

দুঃখের বেশ এসেছ বলে
তোমাতে নাই ডরিব হে।
যেখানে বাথা তোমাতে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।
আঁধারে মূখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমাতে তবু চিনিব আমি:
মরণরূপে আসিলে প্রভু,
চরণ ধরি মরিব হে—
যেমন করে দাও-না দেখা
তোমাতে নাই ডরিব হে।

নয়নে আঁজ ঝরিছে জল
ঝরুক জল নয়নে হে।
বাজিছে বৃকে বাজুক, তব
কঠিন বাহু-বাঁধনে হে।

তুমি যে আছ বন্ধে ধরে
বেদনা তাহা জানাক মোরে,
চাব না কিছ্, কব না কথা,
চাহিয়া রব বদনে হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক জল নয়নে হে।

মুক্তিপাশ

ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে।
আমি চরণশব্দ পাই নি শূন্যে
ছিলেম কিসের ধ্যানে
তাহা কে জানে।
বন্ধ আছিল আমার এ গেহ,
কতকাল আসে-যায় নাই কেহ,
তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম
এখনো রয়েছে যামিনী—
যেমন বন্ধ আছিল সকল
বন্ধি বা রয়েছে তেমনি।
হে মোর গোপনবিহারী,
ঘুমিয়ে ছিলেম যখন, তুমি কি
গিয়েছিলে মোরে নেহারি।

আজ নয়ন মেলিয়া এ কী হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি বাধা নাই।
ওগো যে অধার ছিল শয়ন ঘোরিয়া
আধা নাই তার আধা নাই—
আমি বাধা নাই।
তখন উঠিয়া গেলেম ছুটিয়া,
দেখিন্, কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দ্বার-জানালা
সকল দিয়েছে খুলিয়া—
আকাশ-বাতাস ঘরে আসে মোর
বিজয়পতাকা তুলিয়া।
হে বিজয়ী বীর অজানা,
কখন যে তুমি জয় করে যাও
কে পায় তাহার ঠিকানা!

আমি ঘরে বাঁধা ছিন্দু, এবার আমারে
আকাশে রাখিলে ধরিয়া
দূঢ় করিয়া।
সব বাঁধা খুলে দিয়ে মৃদ্ধি-বাঁধনে
বাঁধিলে আমারে হরিয়া
দূঢ় করিয়া।

রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
দুর্জেক্ষিল মন পথ পালাবার,
এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে—
তোমারে ঐরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরানবন্ধু হে,
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরানে পরশমধু হে।

প্রভাতে

এক রজনীর বরষনে শুধু
কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজ
উঠেছে ভরে।
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থইথই,
কূল কোথা এর, তল মেলে কই,
কহো গো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখো
উঠেছে ভরে।

কাল রজনীতে কে জানিত মনে
এমন হবে
ঝরঝর ঝরি তিমির নিশীথে
ঝরিল যবে—
ভরা প্রাণের নিশি দূ-পহরে
শুনোছিন্দু শূন্যে দীপহীন ঘরে
কেঁদে যায় বারু পথে প্রান্তরে
কাতর হবে—
তখন সে রাতে কে জানিত মনে
এমন হবে।

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু-
 সলিলমাঝে
 আজি এ অমল কমলকান্ত
 কেমনে রাজে।
 একটিমাত্র শ্বেত শতদল
 আলোক-পদকে করে ঢলঢল,
 কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
 এমন সাজে
 আমার অতল অশ্রুসাগর-
 সলিলমাঝে!

আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে
 ইহারে দেখি,
 দুখ-খামিনীর বুক-চেরা ধন
 হেরিন্দু এ কী।
 ইহারি লাগিয়া হৃদবিদারণ,
 এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
 ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
 বক্ষে লেখি।
 দুখ-খামিনীর বুক-চেরা ধন
 হেরিন্দু এ কী।

১৪ শ্রবণ ১৩১২

দান

ভেবেছিলাম চেরে নেব,
 চাই নি সাহস করে
 সন্ধ্যাবেলায় যে মালাটি
 গলায় ছিলে পরে
 আঁমি চাই নি সাহস করে।
 ভেবেছিলাম সকাল হলে
 যখন পারে যাবে চলে
 ছিন্ন মালা শয্যাভূলে
 রইবে বৃষ্টি পড়ে।
 তাই আঁমি কাঙালের মতো
 এসেছিলাম ভেরে—
 তবু চাই নি সাহস করে।

এ তো মালা নয় গো, এ যে
 তোমার তরবারি।
 জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
 বহু-হেন ভারী—

এ যে তোমার তরবারি।
 তরুণ আলো জানলা বেয়ে
 পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
 ভোরের পাখি শূন্যে গিয়ে
 'কী পেলি তুই নারী'।
 নয় এ মালা, নয় এ থালা,
 গন্ধজলের ঝারি,
 এ যে ভীষণ তরবারি।

তাই তো আমি ভাবি বসে
 এ কী তোমার দান।
 কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
 নাই যে হেন স্থান।

ওগো এ কী তোমার দান।
 শক্তিহীনা মরি লাজে,
 এ ভূষণ কি আমায় সাজে।
 রাখতে গেলে বৃকের মাঝে
 বাথা যে পায় প্রাণ।

তবু আমি বইব বৃকে
 এই বেদনার মান—
 নিয়ে তোমারি এই দান।

আজকে হতে জগৎমাঝে
 ছাড়ব আমি ভয়,
 আজ হতে মোর সকল কাজে
 তোমার হবে জয়—

আমি ছাড়ব সকল ভয়।
 মরণকে মোর দোসর করে
 রেখে গেছ আমার ঘরে,
 আমি তারে বরণ করে
 রাখব পরানময়।

তোমার তরবারি আমার
 করবে বাধন ক্ষয়।
 আমি ছাড়ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি
 করব না আর সাজ।
 নাই বা তুমি ফিরে এলে
 ওগো হৃদয়রাজ।

আমি করব না আর সাজ।
 ধূলায় বসে তোমার ভরে
 কাদিব না আর একলা ঘরে,

তোমার লাগি ঘরে-পরে
মানব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমার
সাজিয়ে দিল আজ,
আমি করব না আর সাজ।

গিরিডি
২৬ ভাদ্র ১৩১২

বালিকা বধু

ওগো বর, ওগো ব'ধু,
এই যে নবীনা বৃন্দবিহীনী
এ তব বালিকা বধু।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার
খেলিবার ধন শূন্য,
ওগো বর, ওগো ব'ধু।

জানে না করিতে সাজ।
কেশ বেশ তার হলে একাকার
মনে নাই মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া
ধূলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
ঘরকরণের কাজ--
জানে না করিতে সাজ।

কহে এরে গুরুজনে,
'ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা'--
ভীত হয়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি কত মনে পড়ে তার
'পালিব পরানপণে
যাহা কহে গুরুজনে'।

বাসকশয়ন-'পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও
অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাই দেয় তোমার কথায়,

কত শূন্যখন বৃথা চলি যায়,
যে হার তাহারে পরালে সে হার
কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশরন-পরে।

শূন্য দৃষ্টিতে ঝড়ে—
দশ দিক ঘাসে অধারিয়া আসে
ধরাতে অশ্বরে—
তখন নরনে ঘুম নাই আর,
খেলাধুলা কোথা পড়ে থাকে তার,
তোমারে সবলে রহে অকিড়িয়া—
হিয়া কাঁপে ধরতরে
দৃষ্টিদিনের ঝড়ে।

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস,
এই দেখিতেই বৃষ্টি জলোবাস,
খেলাঘর-স্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কী যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয়।

তুমি বৃষ্টিয়াছ মনে,
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতষট্টি করি মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বৃষ্টিয়াছ মনে।

ওগো বর, ওগো বৃষ্টি,
জান জান তুমি—ধূলার বসিলা
এ বালা তোমারি বধু।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজারে নির্জন ঘরে,
সোনার পায়ে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বৃষ্টি।

অনাহত

দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা
 বাতায়নের ধারে
 নতুন বধু বদ্বি?
 আসবে কখন চুড়িওলা
 তোমার গৃহস্থারে
 লয়ে তাহার পুঞ্জি।
 দেখছ চেয়ে গোরুর গাড়ি
 উড়িয়ে চলে ধূলি
 ধর রোদের কালে;
 দূর নদীতে দিচ্ছে পাড়ি
 বোঝাই নৌকাগুলি—
 বাতাস লাগে পালে।

আধেক-খোলা বিজন ঘরে
 ঘোমটা-ছায়ায় ঢাকা
 একলা বাতায়নে,
 বিশ্ব তোমার আঁখির 'পরে
 কেমন পড়ে আঁকা,
 তাই ভাবি যে মনে।
 ছায়াময় সে ভুবনখানি
 স্বপন দিয়ে গড়া
 রূপকথাটি ছাঁদা,
 কোন সে পিতামহীর ষাণী—
 নাইকো আগাগোড়া,
 দীর্ঘ ছড়া ষাধা।

আমি ভাবি হঠাৎ যদি
 বৈশাখের এক দিন
 বাতাস বহে বেগে—
 লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
 শূন্যে বাধনহীন,
 পাগল উঠে জেগে—
 যদি তোমার ঢাকা ঘরে
 বত আগল আছে
 সকলি যায় দূরে—
 ওই যে বসন নেমে পড়ে
 তোমার আঁখির কাছে
 ও যদি যায় উড়ে—

তীর তড়িৎহাসি হেসে
 বজ্রভেরীর স্বরে
 তোমার ঘরে ঢুকি
 জগৎ যদি এক নিমেষে
 শঙ্খমূর্তি ধরে
 দাঁড়ায় মন্থোমূখি—
 কোথায় থাকে আধেক-ঢাকা
 অলস দিনের ছায়া,
 বাতায়নের ছবি,
 কোথায় থাকে স্বপনমাখা
 আপনগড়া মায়া—
 উড়িয়া যায় সবই।

তখন তোমার ঘোমটা-খোলা
 কালো চোখের কোণে
 কাঁপে কিসের আলো,
 ডুবে তোমার আপন-ভোলা
 প্রাণের আন্দোলনে
 সকল মন্দ ভালো।
 বন্ধে তোমার আঘাত করে
 উত্তাল নর্তনে
 রক্ততরঙ্গিনী।
 অঙ্গে তোমার কী সুর তুলে
 চঞ্চল কম্পনে
 কঙ্কণকিঙ্কণী।

আজকে তুমি আপনাকে
 আধেক আড়াল করে
 দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে
 দেখতেছ এই জগৎটাকে
 কী যে মায়ায় ভরে,
 তাহাই ভাবি মনে।
 অধীবিহীন খেলার মতো
 তোমার পথের মাঝে
 চলেছে যাওয়া-আসা,
 উঠে ফুটে মিলায় কত
 ক্ষুদ্র দিনের কাজে
 ক্ষুদ্র কাদা-হাসা।

বাঁশি

ওই তোমার ওই বাঁশিখানি
 শব্দে কণেক-তরে
 দাও গো আমার করে।
 শরৎ-প্রভাত গেল বয়ে,
 দিন যে এল ক্রান্ত হয়ে,
 বাঁশি-রাজা সাঙ্গ যদি
 কর আলস-ভরে
 তবে তোমার বাঁশিখানি
 শব্দে কণেক-তরে
 দাও গো আমার করে।

আর কিছু নয়, আমি কেবল
 করব নিরে খেলা
 শব্দে একটি বেলা।
 ভুলে নেব কোলের 'পরে,
 অধরেতে রাখব ধরে,
 তারে নিরে যেমন খুঁশি
 যেথা-সেথায় ফেলা—
 এমনি করে আপন মনে
 করব আমি খেলা
 শব্দে একটি বেলা।

তার পরে যেই সম্মে হবে
 এনে ফুলের ডালা
 গেঁথে তুলব মালা।
 সাজাব তার স্বর্ধীর হারে,
 গন্ধে ভরে দেব তারে,
 করব আমি আরতি তার
 নিরে দীপের থালা।
 সম্মে হলে সাজাব তার
 ভরে ফুলের ডালা
 গেঁথে স্বর্ধীর মালা।

রাতে উঠবে আধেক শশী
 তারার মধ্যখানে,
 চাষে তোমার পানে।
 তখন আমি কাছে আসি
 ফিরিয়ে দেব তোমার বাঁশি,

তুমি তখন বাজাবে সুর
গভীর রাতের তানে—
রাতে যখন আশেক শশী
ভারার মধ্যখানে
চাবে তোমার পানে।

কলিকাতা
২৯ শ্রাবণ ১৩১২

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে,
'একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
অঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'
গোধূলিতে দৃষ্টি নয়ন কালো
ক্ষণেক-তরে আমার মূখে তুলে
সে কহিল, 'ভাসিয়ে দেব আলো,
দিনের শেষে তাই এসেছি ক্লে।'
চেরে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে,
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ভরা সাঁঝে আধার হলে এলে
আমি ডেকে জিজ্ঞাসিলাম তারে,
'তোমার ঘরে সকল আলো জ্বলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও করে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'
আমার মূখে দৃষ্টি নয়ন কালো
ক্ষণেক-তরে রইল চেরে ভুলে।
সে কহিল, 'আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব ভুলে।'
চেরে দেখি শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।

অমাবস্যা আধার দুই পহরে
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে,
'ওগো, তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বৃকের কাছে নিয়ে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'

অন্ধকারে দৃষ্টি নয়ন কালো
 ক্ষণেক ঘোরে দেখলে চেয়ে তবে,
 সে কহিল, 'এনেছি এই আলো,
 দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।'
 চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
 দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।

বোলপুর
 ২৫ শ্রাবণ ১০১২

অবারিত

এরে ওগো তোরা বল্ তো, এরে
 ঘর বলি কোন্ মতে।
 কে বেঁধেছে হাটের মাঝে
 আনাগোনার পথে।
 আসতে যেতে বাঁধে তরী
 আমারি এই ঘাটে,
 যে খুঁশি সেই আসে—আমার
 এই ভাবে দিন কাটে।
 ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
 হার রে—
 কী কাজ নিরে আছি, আমার
 বেলা বহে যায় যে, আমার
 বেলা বহে যায় রে।

ওগো পারের শব্দ বাজে তাদের,
 রজনীদিন বাজে।
 মিথ্যে তাদের ডেকে বলি,
 'তোদের চিনি না যে!'
 কাউকে চেনে পরল আমার,
 কাউকে চেনে জ্ঞান,
 কাউকে চেনে বৃকের রক্ত,
 কাউকে চেনে প্রাণ।
 ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
 হার রে—
 ডেকে বলি, 'আমার ঘরে
 যায় খুঁশি সেই আর রে, তোরা
 যায় খুঁশি সেই আর রে।'

সকালবেলায় শব্দ বাজে
 পূর্বের দেবালয়ে—

ওগো স্নানের পরে আসে তারা
ফুলের সাজি লয়ে।
মুখে তাদের আলো পড়ে
তরুণ আলোখানি।
অরুণ পারের ধুলোটুকু
বাতাস লহে টানি।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, 'আমার বনে
তুলিবি ফুল আর রে তোরা,
তুলিবি ফুল আর রে।'

ওগো দূপুরবেলা ঘণ্টা বাজে
রাজার সিংহাসনে।
কী কাজ ফেলে আসে তারা
এই বেড়াটির ধারে।
মলিনবরন মালাখানি
শিথিল কেশে সাজে,
ক্লিষ্টকরুণ রাগে তাদের
ক্লান্ত বাঁশি বাজে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, 'এই ছায়াতে
কাটাবি দিন আর রে তোরা,
কাটাবি দিন আর রে।'

ওগো রাতের বেলা ঝিল্লি ডাকে
গহন বনমাঝে।
ধীরে ধীরে দূরারে মোর
কার সে আঘাত বাজে।
যায় না চেনা মৃৎখানি তার,
কর না কোনো কথা,
ঢাকে তারে আকাশডরা
উদাস নীরবতা।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
চরে থাকি সে মৃৎপানে—
রাশি বহে যায়, নীরবে
রাশি বহে যায় রে।

গোধূলিলগন

আমার গোধূলিলগন এল বৃষ্টি কাছে—
 গোধূলিলগন রে।
 বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
 সোনার গগন রে।
 শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়া,
 নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া,
 ও পারের তীর ভাঙা মন্দির
 আধারে মগন রে।
 আসিছে মধুর ঝিল্লিন্দপূরে
 গোধূলিলগন রে।

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়,
 কখনো কত কী কাজে।
 এখন কি শূন্য পূর্বীর সুরে
 কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।
 বৃষ্টি দেরি নাই, আসে বৃষ্টি আসে,
 আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
 কেলোশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
 নবমিলনের সাজে।
 সারা হল কাজ, মিছে কেন আজ
 ডাক মোরে আর কাজে।

এখন নিরিবিলি ঘরে সাজাতে হবে রে
 বাসকশয়ন যে।
 ফুলশেজ লাগি রজনীগন্ধা
 হয় নি চয়ন যে।
 সারা যামিনীর দীপ সমতনে
 জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে,
 বৃষ্টিদল আনি গুণ্ঠনখানি
 করিব বয়ন যে।
 সাজাতে হবে রে নিবিড় রাতের
 বাসকশয়ন যে।

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
 চলে গেছে তারা সব।
 রাখালের গান হল অবসান,
 না শূন্য খেন্দুর রব।
 এই পথ দিয়ে প্রভাতে দূপদূরে
 যারা এল আর যারা গেল দূরে

কে তারা জানিত আমার নিভৃত
সন্ধ্যার উৎসব।
কেনাবেচা যারা করে গেল সারা
চলে গেল তারা সব।

আমি জানি যে আমার হলে গেছে গণা
গোধূলিলগন রে।
ধূসর আলোকে মৃদিবে নল্লন
অন্তগগন রে—
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমার কে জানে কী মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে—
সব গান সেরে আসিবে যখন
গোধূলিলগন রে।

শান্তিনিকেতন
২৯ পৌষ ১৩১২

লীলা

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
তোমার গগনকোণে
সদাই ফিরি অকারণে।
তুমি আমার চিরদিনের
দিনমণি গো—
আজ্ঞো তোমার কিরণপাতে
মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে
দেয় নি মোরে বাষ্প করে
তোমার পরশনি।
তোমা হতে পৃথক হয়ে
বৎসর মাস গণি।

ওগো এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,
এমনি খেলা তব
তবে খেলাও নব নব।
লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক
কণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে,
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে,
বারদ্বার স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও স্বধা-তথা—

শূন্য আমার নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।

ওগো আবার যবে ইচ্ছা হবে
 সাঙ্গ কোরো খেলা
ঘোর নিশীথরাতিবেলা।
 অগ্রদ্বারে ঝরে যাব
 অন্ধকারে গো—
 প্রভাতকালে রবে কেবল
 নির্মলতা শূভ্রশীতল,
 রেখাবিহীন মৃদু আকাশ
 হাসবে চারি ধারে।
 মেঘের খেলা মিথিয়ে যাবে
 জ্যোতিঃসাগরপারে।

শান্তিনিকেতন। বোলপুর
২০ পৌষ ১৩১২

মেঘ

আদি অস্ত হারিয়ে ফেলে
সাদা কালো আসন মেলে
 পড়ে আছে আকাশটা খোশ-খেয়ালি,
আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পূজা ভেসে আসি,
 আমরা তারি খেয়াল, তারি হেয়ালি।
মোদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই,
আমরা আসি, আমরা চলে যাই।

ওই যে সকল জ্যোতির মালা
গ্রহতারা রবির ডালা
 জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা,
ওদের হিসেব পাকা খাতায়
আলোর লেখা কালো পাতায়,
 মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া।
রঙ-বেরঙের কলম দিয়ে একে
যেমন খুশি মোছে আবার লেখে।

আমরা কিছু বিনা কাজে
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে,
 অকারণে মদ্যকে হাসি হাসে।

ভাই বলে সব মিথ্যে নাকি।
 বৃষ্টি সে তো নরকো ফাঁকি,
 বজ্রটা তো নিভান্ত নর তামাশা।
 শূন্য আমরা থাকি নে কেউ ভাই,
 হাওয়ার আসি, হাওয়ার ভেসে বাই।

নিরুদ্যম

তখন আকাশভলে ঢেউ ভুলেছে
 পাখিরা গান গেয়ে।
 তখন পথের দূর্টি ধারে
 ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
 মেঘের কোণে রঙ ধরেছে
 দেখি নি কেউ চেরে।
 মোরা আপন মনে ব্যস্ত হয়ে
 চলেছিলাম ধেরে।

মোরা সূর্যের বলে গাই নি তো গান,
 করি নি কেউ খেলা।
 চাই নি ভুলে ডাহিন-বাঁয়ে,
 হাটের লাগি বাই নি গায়ে,
 হাসি নি কেউ, কই নি কথা,
 করি নি কেউ হেলা।

মোরা ততই বেগে চলেছিলাম
 যতই বাড়ে বেলা।

শেষে সূর্য যখন মাঝ-আকাশে,
 কপোত ডাকে বনে,
 তপ্ত হাওয়ার ঘরে ঘরে
 শূন্যকনো পাতা বেড়ায় উড়ে,
 বটের তলে রাখালশিশু,
 ঘুমার অচেতনে,

আমি জলের ধারে শূন্যে এসে
 ল্যামল ভাসানে।

আমার দলের সবাই আমার পানে
 চেরে গেল হেসে।
 গেল গেল উচ্চাশিরে,
 চাইল না কেউ পিছদ ফিরে,

- মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ার
পথতরুর শেষে।
তারা পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ,
কত দূরের দেশে।
- ওগো ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে।
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,
মগ্ন হলেম আনন্দমগ্ন
অগাধ অগোরবে,
পাখির গানে, বাঁশির তানে,
কম্পিত পল্লবে।
- আমি মদুন্দিতনু দিলাম মেলে
বসুন্ধরার কোলে।
বাঁশের ছায়া কী কৌতুকে
নাচে আমার চক্ষে মদুখে,
আমের মদুকুল গন্ধে আমার
বিধুর করে তোলে,
নয়ন মদুদে আসে মৌমাছিদের
গুঞ্জনকল্লোলে।
- সেই রৌদ্রে-ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে।
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের পরে,
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ার গন্ধে গানে,
ধীরে ঘুমিয়ে পলেম অবশ দেহে
কখন কে তা জানে।
- শেষে গভীর ঘূমের মধ্য হতে
ফুটল যখন আঁখি,
চক্রে দেখি, কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচেতন্য ঢাকি,
ওগো ভেবেছিলাম আছে আমার
কত-না পথ বাকি।

মোরা ভেবেছিলাম পরানপদে
 সজাগ রব সবে—
 সন্ধ্যা হবার আগে যদি
 পার হতে না পারি নদী,
 ভেবেছিলাম তাহা হলেই
 সকল ব্যর্থ হবে।
 যখন আমি ধেম্বে গেলাম, তুমি
 আপনি এলে কবে।

কলিকাতা
 ৬ মে ১৩১২

কৃপণ

আমি ভিন্কা করে ফিরতেছিলাম
 গ্রামের পথে পথে,
 তুমি তখন চলোছিলে
 তোমার স্বর্ণরথে।
 অপূর্ব এক স্বপ্নসম
 লাগতেছিল চক্রে মম—
 কী বিচিত্র শোভা তোমার,
 কী বিচিত্র সাজ।
 আমি মনে ভাবতেছিলাম,
 এ কোন্ মহারাজ।

আজি শূভক্ষণে রাত পোহাল
 ভেবেছিলাম তবে,
 আজ আমারে স্মারে স্মারে
 ফিরতে নাহি হবে।
 বাহির হতে নাহি হতে
 কাহার দেখা পেলেম পথে,
 চলিতে রথ ধন ধান
 ছড়াবে দুই ধারে—
 মূঠা মূঠা কুড়িয়ে নেব,
 নেব ভারে ভারে।

দেখি সহসা রথ ধেম্বে গেল
 আমার কাছে এসে,
 আমার মৃৎপানে চেরে
 নামলে তুমি হেসে।
 দেখে মৃৎখের প্রসন্নতা
 জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,

হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
'আমায় কিছ্ দাও গো' বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত।

মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ—
‘আমায় দাও গো কিছ্’!
শূনে ক্ষণকালের তরে
রইনু মাথা-নিচু।
তোমার কী বা অভাব আছে
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে।
এ কেবল কৌতূকের বশে
আমায় প্রবণনা।
ঝুঁলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি--এ কী!
ভিক্ষামাখে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কার্দি চোখের ভলে
দাঁটি নমন ভরে--
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল ধন্য করে।

কলিকাতা
৪ চৈত্র [১৩১২]

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাই নি কিছ্,
জানাই নি মোর নাম—
তুমি যখন বিদায় নিলে
নীরব রহিলাম।
একলা ছিলাম কুয়ার ধারে
নিম্নের ছায়াতলে,
কঙ্গ নিরে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে।

আমায় তারা ডেকে গেল,
‘আয় গো, বেলা যার।’
কোন আলসে রইন বসে
কিসের ভাবনায়।

পদধ্বনি শব্দে নাইকো
কখন তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্তকণ্ঠে
করুণ চক্ষু মেলে—
‘তুমিকাতর পান্থ আমি—
শব্দে চমকে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপদে।
মর্মরিয়া কাঁপে পাতা,
কোকিল কোথা ডাকে,
বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে
পল্লীপথের বাকি।

কখন তুমি শব্দে নাম
পেলেম বড়ো লাজ,
তোমার মনে থাকার মতো
করেছি কোন কাজ।
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তুমার জল,
এই কথাটি আমার মনে
রহিল সর্বদা।
কুমার ধারে দূরবর্তী
তেমনি ডাকে পাখি,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা—
আমি বসেই থাকি।

২ মে ১০১২

জাগরণ

পথ চেয়ে ভো কাটল নিশি,
লাগছে মনে ভয়—
সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়ি
যদি এমন হয়!
যদি তখন হঠাৎ এসে
দাঁড়ায় আমার দূরার-দেশে!

বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর
 আছে তো তার জানা—
 ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস,
 করিস নে কেউ মানা।

যদি বা তার পায়ের শব্দে
 ঘুম না ভাঙে মোর,
 শপথ আমার, তোরা কেহ
 ভাঙাস নে সে ঘোর।
 চাই নে জাগতে পাখির রবে
 নতুন আলোর মহোৎসবে,
 চাই নে জাগতে হাওয়ায় আকুল
 বকুল ফুলের বাসে—
 তোরা আমার ঘুমোতে দিস
 যদিই বা সে আসে।

ওগো, আমার ঘুম যে ভালো
 গভীর অচেতনে—
 যদি আমার জাগায় তারি
 আপন পরশনে।
 ঘুমের আবেশ ঘেঁষনি টুটি
 দেখব তারি নয়ন দুটি
 মুখে আমার তারি হাসি
 পড়বে সকৌতুকে—
 সে যেন মোর সুখের স্বপন
 দাঁড়াবে সম্মুখে।

সে আসবে মোর চোখের 'পরে
 সকল আলোর আগে,
 তাহারি রূপ মোর প্রভাতের
 প্রথম হয়ে জাগে।
 প্রথম চমক লাগবে সুখে
 চেয়ে তারি করুণ মুখে,
 চিন্তা আমার উঠবে কে'পে
 তার চেতনায় ড'রে—
 তোরা আমার জাগাস নে কেউ,
 জাগাবে সেই মোরে।

ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পারবি নে গো,
 পারবি নে ফুল ফোটাতে।
 যতই বলিস,. যতই করিস,
 যতই তারে তুলে ধরিস,
 বাগ্ন হয়ে রজনীদিন
 আঘাত করিস বোঁটাতে—
 তোরা কেউ পারবি নে গো,
 পারবি নে ফুল ফোটাতে।

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
 স্পান করতে পারিস তারে,
 ছিঁড়তে পারিস দলগদলি তার,
 ধুলায় পারিস লোটাতে -
 তোদের বিষম গন্ডগোলে
 যদিই বা সে মূর্খটি খোলে,
 ধরবে না রঙ, পারবে না তার
 গন্ধটুকু ছোটাতে।
 তোরা কেউ পারবি নে গো,
 পারবি নে ফুল ফোটাতে।

যে পারে সে আপনি পারে,
 পারে সে ফুল ফোটাতে।
 সে শুধু চায় নয়ন মেলে
 দৃষ্টি চোখের কিরণ ফেলে,
 অর্মানি যেন পূর্ণপ্রাণের
 মন্ত লাগে বোঁটাতে।
 যে পারে সে আপনি পারে,
 পারে সে ফুল ফোটাতে।

নিশ্বাসে তার নিমেষেতে
 ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
 পাতার পাখা মেলে দিয়ে
 হাওয়ার থাকে লোটাতে।
 রঙ যে ফুটে ওঠে কত
 প্রাণের ব্যাকুলতার মতো,
 যেন ফায়ে আনতে ডেকে
 গন্ধ থাকে ছোটাতে।

যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

বোলপুর
১১ চৈত্র [১৩১২]

হার

মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে,
জানি আমরা পারব না।
হারাও যদি হারব খেলায়,
তোমার খেলা ছাড়ব না।
কেউ বা ওঠে, কেউ বা পড়ে,
কেউ বা বাঁচে, কেউ বা মরে,
আমরা না-হয় মরার পথে
করব প্রয়াণ রসাতলে,
হারের খেলাই খেলব মোরা
বসিও যদি হারের দলে।

আমরা বিনা পণে খেলব না গো,
খেলব রাজার ছেলের মতো।
ফেলব খেলায় ধনরতন
যেথায় মোদের আছে যত।
সর্বনাশা তোমার যে ডাক,
যায় যদি থাক সকলি থাক,
শেষ কর্ণিটি চুকিয়ে দিয়ে
খেলা মোদের করব সারা।
তার পরে কোন্ বনের কোণে
হারের দলটি হব হারা।

তবু এই হারা তো শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুদ্রে কাটব বাধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।
তার পরে কী করবে তুমি
সে কথা কেউ ভাবতে পারে!

বোলপুর
১২ চৈত্র [১৩১২]

বন্দী

বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
এত কঠিন করে।

প্রভু আমার বেঁধেছে যে
বজ্রকঠিন ডোরে।
মনে ছিল সবার চেয়ে
আমিই হব বড়ো,
রাজার কড়ি করেছিলাম
নিজের ঘরে জড়ো।
ঘুম লাগিতে শয়েছিলাম
প্রভুর শয্যা পেতে,
ভোগে দেখি বাঁধা আছি
আপন ভাঙারেতে।

বন্দী ওগো, কে গড়েছে
বজ্রবাধনখানি।

আপনি আমি গড়েছিলাম
বহু যতন মানি।
ভেবেছিলাম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন,
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমার বন্দী করে
আমারি এই ডোর।

বোলপুর
৯ বৈশাখ ১৩১৩

পাথক

পাথক ওগো পাথক, যাবে ভূমি,
এখন এ যে গভীর ঘোর নিশা।
নদীর পারে তমালবনভূমি
গহন ঘন অন্ধকারে মিলা।

মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জ্বালা,
 বাঁশির ধ্বনি হৃদয়ে এসে লাগে,
 নবীন আছে এখনো ফুলমালা,
 তরুণ আঁখি এখনো দেখো জাগে।
 বিদায়বেলা এখনি কি গো হবে,
 পথিক ওগো পথিক, যাবে তবে?

তোমারে মোরা বাঁধি নি কোনো ডোরে,
 রুধিয়া মোরা রাখি নি তব পথ।
 তোমার ঘোড়া রয়েছে সাজ প'রে,
 বাহিরে দেখো দাঁড়িয়ে তব রথ।
 বিদায়-পথে দিয়েছি বটে বাধা
 কেবল শূন্য করুণ কলগীতে।
 চেয়েছি বটে রাখিতে হেথা বাধা
 কেবল শূন্য চোখের চাহনিতে।
 পথিক ওগো, মোদের নাহি বল,
 রয়েছে শূন্য আকুল আঁখিজল।

নয়নে তব কিসের এই গ্লানি,
 রক্তে তব কিসের তরলতা।
 আঁধার হতে এসেছে নাহি জানি
 তোমার প্রাণে কাহার কী ব্যর্থতা।
 সন্তর্কষ গগনসীমা হতে
 কখন কী যে মল্ল দিল পড়ি -
 ত্রিমির-রাতি শব্দহীন স্রোতে
 হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।
 বচনহারা অচেনা অদ্ভুত
 তোমার কাছে পাঠাল কোন্ দ্রুত।

এ মেলা যদি না লাগে তব ভালো,
 শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
 সভার তবে নিবাসে দিব আলো,
 বাঁশির তবে থামিয়ে দিব তান।
 স্তম্ভ মোরা আঁধারে রব বসি,
 ঝিল্লিরব উঠবে জেগে বনে,
 কুঙ্করাতে প্রাচীন ক্ষীণ ললা
 চক্রে তব চাহিবে বাতায়নে।
 পথ-পাগল পথিক, রাখো কথা,
 নিশীথে তব কেন এ অধীরতা।

মিলন

- আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
 জুড়াল হৃদয় জুড়াল— আমার
 . জুড়াল হৃদয় প্রভাতে।
- আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
 পরান কী নিধি কুড়াল— ডুবিয়া
 নিবিড় নীরব শোভাতে।
- আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
 দেখেছি একেলা আলোকে—দেখেছি
 আমার হৃদয়-রাজারে।
- আমি দূ-একটি কথা করেছি তা-সনে
 সে নীরব সভা-মাঝারে—দেখেছি
 চিরজনমের রাজারে।
- ওগো সে কি মোরে শূন্য দেখেছিল চেয়ে
 অথবা জুড়াল পরশে— তাহার
 কমলকরের পরশে—
- আমি সে কথা সকলি গিয়েছি যে ভুলে
 ভুলেছি পরম হরষে।
- আমি জানি না কী হল, শূন্য এই জানি
 চোখে মোর শূন্য মাথালো— কে যেন
 শূন্য-অঙ্গন মাথালো—
- কার আঁখিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
 যে দিকেই আঁখি তাকাল।
- আজ মনে হল কারে পেয়েছি— কারে যে
 পেয়েছি সে কথা জানি না।
- আজ কী লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
 সারা আকাশের আঁগুনা— কিসে যে
 পূরেছে শূন্য জানি না।
- এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে,
 আলোক আমার তনুতে— কেমনে
 মিলে গেছে মোর তনুতে।
- তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল
 আমার অণুতে অণুতে।
- আজ চিড়বন-জোড়া কাহার বন্ধে
 দেহ ঘন মোর ফুড়াল— যেন রে
 নিঃশেষে আজি ফুড়াল।

আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়াল জীবন জুড়াল—আমার
আদি ও অন্ত জুড়াল।

শিলাইদহ। 'পদ্মা'
২৩ মাঘ সোমবার, ১৩১২

বিচ্ছেদ

তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে সুর কোথায় পাব।

যেমন সহজ ভোরের জাগা,
স্রোতের আনাগোনা,
যেমন সহজ পাতায় শিশির,
মেঘের মুখে সোনা,
যেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি
নদীর বালু-পাড়ে,
গভীর রাতে বৃষ্টিধারা
আষাঢ়-অন্ধকারে,
খুঁজে মরি তেমনি সহজ,
তেমনি ভরপুর,
তম্নিতরো অর্থ-ছোটা
আপনি-ফোটা সুর-
তেম্নিতরো নিত্য নবীন,
অফুরন্ত প্রাণ,
বহুকালের পুরানো সেই
সবার জানা গান।

আমার যে এই নতুন-গড়া
নতুন-বাঁধা তার
নতুন সুরে করতে সে যায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশে না তাই চারি দিকের
সহজ সমীরণে,
মেশে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তম্ভ আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দন্ডে পলে পলে,
মত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।

ঘটিয়ে তুলি কত কী যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

শিলাইদহ। 'পদ্মা'
২৪ মার্চ ১৩১২

বিকাশ

আজ বৃকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছাড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
কুঁড়ির মতো ফেটে গিয়ে
ফুলের মতো উঠল কেঁদে,
সুধাকোষের সুগন্ধ তার
পারলে না আর রাখতে বেঁধে।
ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে—
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক-পানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ রে ফুটে,
চোখের 'পরে আলসভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।
আজ বৃকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।

শিলাইদহ। 'পদ্মা'
২৫ মার্চ ১৩১২

সীমা

সেটুকু তোর অনেক আছে
যেটুকু তোর আছে খাঁটি।
তার চেয়ে লোভ করিস যদি
সকলি তোর হবে মাটি।
একমনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটে রাজা,
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর জালি সাজা।

যেখানে তোর বেড়া সেধায়
 আনন্দে তুই থামিস এসে,
 যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
 সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
 লোকের কথা নিস নে কানে,
 ফিরিস নে আর হাজার টানে,
 যেন রে তোর হৃদয় জানে
 হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
 একতারাতে একটি যে তার
 আপন মনে সেইটি বাজা।

শিলাইদহ। 'পদ্মা'
 ২৫ মাঘ ১৩১২

ভার

তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার
 করিয়া দিয়েছ সোজা,
 আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
 সকলি হয়েছে বোঝা।
 এ বোঝা আমার নামাও বন্ধ,
 নামাও—
 ভারের বেগেতে চলেছি, আমার
 এ যাত্রা তুমি থামাও।

যে তোমার ভার বহে কভু তার
 সে ভারে ঢাকে না অঁখি,
 পথে বাহিরিলে জগৎ তারে তো
 দেয় না কিছ্‌ই ফাঁকি।
 অব্যাহত আলো ধরে আসি তার
 হাতে—
 বনে পাখি গায়, নদীধারা ধায়,
 চলে সে সবার সাথে।

তুমি কাজ দিলে কাজেরই সঙ্গ
 দাও যে অসীম ছুটি,
 তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
 আকাশ লয় না লুটি।
 বাসনায় মোরা বিশ্বজগৎ
 ঢাকি—
 তোমা-পানে চেয়ে যত করি ভোগ
 তত আরো থাকে বাকি।

আপনি যে দূখ ডেকে আনি সে যে
জ্বালায় বজ্জানলে—
অপায় করে রেখে যায়, সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে।
তুমি বাহা দাও সে যে দঃখের
দান,
প্রাণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ।

যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলি
সকলি করেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা।
এ বোকা আমার নামাও বন্ধ,
নামাও।
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে,
এ যাত্রা মোর থামাও।

‘পদ্মা’
২৫ মার্চ [১৩১২]

টিকা

আজ পূরবে প্রথম নয়ন মেলিতে
হেরিন্দু অরুণশিখা—হেরিন্দু
কমলবরন শিখা,
তখন হাসিয়া প্রভাততপন
দিলেন আমারে টিকা—আমার
হৃদয়ে জ্যোতির টিকা।
কে যেন আমার নয়ন-নিমেষে
রাখিল পরশমণি,
যে দিকে তাকাই সোনা করে দেয়
দৃষ্টির পরশনি।
অন্তর হতে বাহিরে সকলি
আলোক হইল মিশ্রা,
নয়ন আমার হৃদয় আমার
কোথাও না পায় দিশা

আজ যেমনি নয়ন তুলিয়া চাহিন্দু
কমলবরন শিখা—আমার
অন্তরে দিল টিকা।

ভাবিয়াছি মনে দিব না মর্দাছিতে
এ পরশ-রেখা দিব না মর্দাছিতে,
সন্ধ্যার পানে নিয়ে যাব বহি
নবপ্রভাতের লিখা—
উদয়রবির টিকা।

‘পদ্মা’

২৩ বাষ [১০১২]

বৈশাখে

তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
আমলাগাছের কচি পাতায়,
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।
কেউ কোথা নেই মাঠের 'পরে,
কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে,
আজ দূপদূরে আকাশতলে
রিমিঝিমি নূপদূর বাজে।
বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছিদের গুঞ্জসূরে
কার চরণের নৃত্য ঘেন
ফিরে আমার বৃকের মাঝে।
রক্তে আমার তালে তালে
রিমিঝিমি নূপদূর বাজে।

ঘন মহল-শাখার মতো
নিশ্বাসিয়া উঠিছে প্রাণ,
গায়ে আমার লেগেছে কার
এলোচুলের সুন্দর ঘ্রাণ।
আজি রোদের প্রথম তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
বাতাস বাজে মর্মরিয়া
সারি-বাঁধা তালের বনে।
আমার মনের মরীচিকা
আকাশপারে পড়ল লিখা,
লক্ষ্যবিহীন ধূরের 'পরে
চেয়ে আছি আপন মনে।
অলস খেন্দু চরে বেড়ায়
সারি-বাঁধা তালের বনে।

আজিকার এই তপ্ত দিনে
কাটল বেলা এমনি করে,

গ্রামের ধারে ঘাটের পথে
 এল গভীর ছায়া পড়ে।
 সন্ধ্যা এখন পড়ছে হেলে
 শালবনেতে অঁচল মেলে,
 অঁধার-ঢালা দিঘির ঘাটে
 হয়েছে শেষ-কলস ভরা।
 মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
 ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে—
 সারা দিনের অকাজে আজ
 কেউ কি মোরে দেয় নি ধরা।
 আমার কি মন শুনো, যখন
 হল বধুর কলস ভরা।

৭ বৈশাখ ১৩১৫

বিদায়

বিদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই।
 কাজের পথে আমি তো আর নাই।
 এগিয়ে সব ষাও-না দলে দলে,
 জয়মালা লও-না তুলি গলে,
 আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
 অলঙ্কিতে পিছিয়ে যেতে চাই।
 তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।

অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,
 চলছিলাম সবাই হাতে হাতে।
 এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
 হিরা আমার উঠল কেমন করে
 জানি নে কোন্ ফুলের গন্ধ-ঘোরে
 সন্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
 আর তো চলা হয় না সাথে সাথে।

তোমরা আজ ছুটেছ যার পাছে
 সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে—
 রক্ত খোঁজা, রাজ্য ডাঙা-গড়া,
 মতের লাপি দেশ-বিদেশে লড়া,
 আলবালে জলসেচন করা
 উচ্চাখা স্বর্গচাঁপার পাছে।
 পারি নে আর চলতে সবার পাছে।

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজালো আজ বাঁশি।
লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,
একটি কথা পরান জুড়ে বাজে
'ভালোবাসি, হায় রে ভালোবাসি'—
সবার বড়ো হৃদয়-হরা হাসি।

তোমরা তবে বিদায় দেহো মোরে,
অকাজ আমি নিরৈছি সাধ করে।
মেঘের পথের পথিক আমি আজ
হাওয়ার মধ্যে চলে যেতেই রাজি,
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহো মোরে।

বোলপুর
১৪ চৈত্র ১৩১২

পথের শেষ

পথের নেশা আমার লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
সূর্য তখন পূর্বগগনমূলে,
নৌকা তখন বাধা নদীর কূলে,
শিশির তখন শূন্য নিকো ফূলে,
শিবালয়ে উঠল বেজে শাখ।
পথের নেশা তখন লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির লেখা
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ—
প্রভাত-কালে অপার-পানে চেয়ে
কী মোহগান উঠতেছিল গেয়ে,
উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে
বহুদূরের অরণ্য পর্বত,
নানা দিনের নানা-পথিক-চল
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ।

ভাবি নাইকো কেন কিসের লাগি
ছুটে চলে এলেম পথের 'পরে'।
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সূখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,

প্রতি পদেই অন্তর উৎসর্গ
অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে।
ভোরের বেলা দূয়ার খুলে দিয়ে
বাহির হয়ে এলেম পথের 'পরে।

বেলা এখন অনেক হয়ে গেছে,
পেরিয়ে চলে এলেম বহু দূর।
ভেবেছিলাম পথের বাঁকে বাঁকে
নব নব ভাগ্য আমার ডাকে,
হঠাৎ যেন দেখতে পাব কাকে,
শুনতে যেন পাব নতুন সুর।
তার পরে তো অনেক বেলা হল,
পেরিয়ে চলে এলেম বহু দূর।

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শব্দ আকুল মনে বাঁচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

বোলপুর
১৪ মে [১৯১২]

নীড় ও আকাশ

নীড়ে বসে গেরেছিলাম
আলোছারার বিচিত্র গান।
সেই গানেতে মিশেছিল
বনভূমির চঞ্চল প্রাণ।
দুপুরবেলার গভীর ক্লান্তি,
রাতিবেলার নিবিড় শান্তি,
প্রভাত-কালের বিজয়-যাত্রা,
মলিন মৌন সম্মুখবেলার,
পাতার কাঁপা, ফুলের ফোটা,
প্রাণ-রাতে জলের ফোটা,
উসুধুসু শব্দটুকু
কোটর-ঘাষে কীটের খেলার,
কত আভাস আসা-যাওয়ার,
করুণানি হঠাৎ-হাওয়ার,

বেগুনের ব্যাকুল যাত্রা
 নিষ্প্রসিত জ্যোৎস্নারাতে,
 ঘাসের পাতার মাটির গন্ধ,
 কত ঋতুর কত ছন্দ—
 সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল
 নীড়ে-গাওয়া গানের সাথে।

আজ কি আমায় গাইতে হবে
 নীল আকাশের নিজস্ব গান।
 নীড়ের বাধন ভুলে গিয়ে
 ছড়িয়ে দেব মৃদু পরান :
 গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে
 শব্দবিহীন শূন্য-পরে
 ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে
 সঙ্গীবিহীন নির্মমতায়
 মিশে যাব অবাধ সুরে,
 উড়ে যাব উষ্ম-মুখে,
 গেয়ে যাব পূর্ণসুরে
 অর্থবিহীন কলকথায় ?
 আপন মনের পাই নে দিশা,
 ভুলি শব্দকা, হারাই তুষা,
 যখন করি বাধন-হারা
 এই আনন্দ-অমৃত পান।
 তবু নীড়েই ফিরে আসি,
 এমনি কাঁদি এমনি হাসি,
 তবুও এই ভালোবাসি
 আলোছায়ার বিচিত্র গান।

বোলপুর
 ১২ জুলাই [১৩১২]

সমুদ্রে

সকালবেলায় ঘাটে বোধিন
 ভাসিয়ে দিলেম নৌকাখানি
 কোথায় আমার যেতে হবে
 সে কথা কি কিছুই জানি।
 শব্দ শিকল দিলেম খুলে,
 শব্দ নিশান দিলেম ভুলে,
 টানি নি দাঁড়, ধরি নি হাল,
 ভেসে গেলেম স্রোতের মূখে।

তীরে তরুর ডালে ডালে
ডাকল পাখি প্রভাত-কালে,
তীরে তরুর ছায়ায় রাখাল
বাজায় বাঁশি মনের সূখে।

তখন আমি ভাবি নাইকো
সূর্য বাবে অস্তাচলে,
নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে
পড়ব এসে সাগর-জলে—
ঘাটে ঘাটে তীরে তীরে
যে তরী ধায় ধীরে ধীরে
বাইতে হবে নিরে ভারে
নীল পাথারে একলা প্রাণে।
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
গুঞ্জে আমার রইল চেয়ে,
সিন্ধু-লকুন উড়ে গেল
কূলে আপন কুলায়-পানে।

দুলাক তরী ঢেউয়ের পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাও রে আজি নিশীথ-রাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দগান।
দিক-না গুঞ্জে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক-না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে
লও রে বৃকে দৃ হাত মেলি
অন্তর্বিহীন অজানাকে।

১. বৈশাখ ১৩১৩

দিনশেষ

ভাঙা অতিথিশালা।
ফাটা ডিতে অশথ-কটে
মেলেছে ডালপালা।
প্রখর স্রোদে তপ্ত পথে
কেটেছে দিন কোনোমতে,
মনে ছিল সন্ধ্যাবেলায়
মিলবে ছেঁচা ঠাই—

মাঠের 'পরে' আঁধার নামে,
হাটের লোকে ফিরল গ্রামে,
হেথায় এসে চেয়ে দেখি
নাই যে কেহ নাই।

কত কালে কত লোকে
কত দিনের শেষে
ধুয়েছিল পথের ধূলা
এইখানেতে এসে।
বসেছিল জ্যোৎস্নারাতে
স্নিগ্ধ শীতল আঁতুনাতে,
করেছিল সবাই মিলে
নানা দেশের কথা।
প্রভাত হলে পাখির গানে
জেগেছিল নূতন প্রাণে,
দুলেছিল ফুলের ভারে
পথের তরঙ্গতা।

আমি যেদিন এলুম, সেদিন
দীপ জ্বলে না ঘরে।
বহু দিনের শিখার কালি
আঁকা ভিতের 'পরে।
শুদ্ধজলা দিঘির পাড়ে
জোনাক ফিরে কোপে কাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা
ফেলে ভয়ের ছায়া।
আমার দিনের যাত্রাশেষে
কার অতিথি হলুম এসে!
হায় রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি,
হায় রে ক্লান্ত কারা!

৮ বৈশাখ ১৩১০

সমাপ্ত

বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা,
শৈবালেতে আটক পল তরী।
নৌকা-বাওয়া এবার করো সারা,
নাই রে হাওয়া, পাল নিয়ে কী করি।
এখন তবে চলো নদীর তটে,
গোধূলিতে আকাশ হল রাঙা,
পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে
বাবুলাবনে ওই দেখা যায় ডাঙা।

ভেসো না আর, খেকো না আর ভেসে,
চলো এখন, যাবে যে দূর দেশে।

এখন তোমায় তারার ক্ষীণালোকে
চলতে হবে. মাঠের পথে একা,
গিরি কানন পড়বে কি আর চোখে,
কুটিরগুটি যাবে কি আর দেখা।
পিছন হতে দখিন-সমীরণে
ফুলের গন্ধ আসবে অধির বেয়ে,
অসময়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে
আবেশেতে দিবে হৃদয় ছেয়ে।
চলো এবার, কোরো না আর দেরি—
মেঘের আভাস আকাশ-কোণে ছেঁরি।

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজ
ব্যাবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।
এখন ঘরে আর রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেলো।
ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা,
জ্বালতে হবে সারা রাতের আলো।
শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,
গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দ ভালো।
ফিরিয়ে আনো ছড়িয়ে-পড়া মন,
সফল হোক সকল সমাপন।

কোলপুর
১০ বৈশাখ ১৩১০

কৌকিল

আজ বিকালে কৌকিল ডাকে,
শূনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলেম যেন
তিনশো বছর আগে।
সে দিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অপ্রজন্মের ছায়া।

পল্লীখানি প্রাণে ভরা,
গোলায় ভরা ধান,
ঘাটে শূনি নারীর কণ্ঠে
হাসির কলতান।

সন্ধ্যাবেলায় ছাদের 'পরে
দখিন-হাওয়া বহে,
তারায় আলোর কারা বসে
পুরাণ-কথা কহে।

ফুলবাগানের বেড়া হতে
হেনার গন্ধ ভাসে,
কদমশাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে।
বধু তখন বিনিরে খোঁপা
চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুলবনে
কোকিল কোথা ডাকে।

তিনশো বছর কোথায় গেল,
তবু বৃষ্টি নাকো।
আজো কেন ওরে কোকিল,
তেমনি সুরেই ডাক'।
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
ফেটেছে সেই ছাদ,
রূপকথা আজ কাহার মূখে
শুনবে সাক্ষের চাঁদ।

শহর থেকে ঘন্টা বাজে,
সময় নাই রে হার—
ঘর্ঘরিয়া চলোঁছ আজ
কিসের ব্যর্থতার।
আর কি বধু, গাঁথ' মালা,
চোখে কাজল আঁক' ?
পুরানো সেই দিনের সুরে
কোকিল কেন ডাক'।

বোলপুর
২৯ বৈশাখ [১৩১০]

দিঘি

জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ,
কাটল সারা দিন।
সামনে আসে বাকহারা স্বপ্নভরা রাত
সকল কর্মহীন।

তারি মাঝে দিখির জলে বাবার বেলাটুকু
একটুকু সময়
সেই গোখলি এল এখন, সূর্য ছুঁছুঁছুঁ,
ঘরে কি মন রয়।

কলে কলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তার তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধু যেমন নমন রাঙা করে
বাপের ঘরে চায়।

শেওলা-পিছল পৈঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,
ডুবে বাবার সূখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলেম আপন মনে, ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে।

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তম্ভ সঙ্গমভীর
গভীর ভয়ংকর,
ভূমি নিবিড় নিশীথ-রাতি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধুলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রানের নিকেতন,
হঠাৎ খেমে তোমার 'পরে নত হয়ে পড়ে
দেখিছে দর্পণ।

তীরের কর্ম সেরে আমি গায়ের ধুলো নিয়ে
নামি তোমার মাঝে—
এ কোন্ অপ্রভা গীতি হুলস্থলিতে উঠে
কানের কাছে বাজে।
ছায়া-নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণ-ভরা ভব
বৃক্ষের আলিঙ্গন
আমার নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হতে,
কাড়িল যোর মন।

শিউলি-শাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলিতে
 ক্রান্ত আশার ডাক।
 স্তান ধসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
 উড়ে গেল কাক।
 মর্মরিয়া মর্মরিয়া বাতাস গেল মরে
 বেগুনের তলে,
 আকাশ যেন ঘনিষে এল ঘুমঘোরের মতো
 দিঘির কালো জলে।

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে.
 বাজল দূরে শাখ।
 রম্ববিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
 গেল বকের ঝাঁক।
 পথে কেবল জোনাক জ্বলে, নাইকো কোনো আলো
 এলেন যবে ফিরে।
 দিন ফুরাল, রাতি এল, কাটল মাঝের বেলা
 দিঘির কালো নীরে।

দার্বিনিকেন
 ২৭ বৈশাখ ১৩১৩

ঝড়

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে
 ঝড় এল রে আজ,
 মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে
 বাজ্ রে মদঙ বাজ্।
 আজকে তোরা কী গাণি গান,
 কোন্ রাগিণীর সুরে।
 কালো আকাশ নীল ছায়াতে
 দিল যে বৃক পুরে।

বৃষ্টিধারার আপসা মাঠে
 ডাকছে খেন্দল,
 তালের তলে শিউরে ওঠে
 বাঁধের কালো জল।
 পোড়ো বাড়ির ভাঙা ছিতে
 ওঠে হাওয়ার হাঁক,
 শূন্য খেতের ও পার যেন
 এ পারকে দেয় ডাক।

আমাকে আজ কে খুঁজছে
 পথের থেকে চেরে।
 জলের বিন্দু পড়ছে রে তার
 অলক বেয়ে বেয়ে।
 মল্লারেতে মীড় মিলায়ে
 বাজে আমার প্রাণ,
 দূরার হতে কে ফিরেছে
 না গেয়ে তার গান।

আর গো তোরা ঘরেতে আর,
 বোস্ গো তোরা কাছে।
 আজ যে আমার সমস্ত মন
 আসন মেলে আছে।
 জলে স্থলে শুনো হাওয়ার
 ছুটেছে আজ কী ও।
 ঝড়ের পরে পল্লান আমার
 উড়ার উত্তরীয়।

আসবি তোরা কারা কারা
 বৃষ্টিধারার স্রোতে
 কোন্ সে পাগল পারাবারের
 কোন্ পরপার হতে।
 আসবি তোরা ভিজে বনের
 কান্না নিয়ে সাথে,
 আসবি তোরা গন্ধরাজের
 গাঁথন নিয়ে হাতে।

ওরে, আজি বহু দূরের
 বহু দিনের পানে
 পাঁজর টুটে বেদনা মোর
 ছুটেছে কোন্‌খানে—
 ফুরিয়ে-যাওয়ার ছায়াবনে,
 ভুলে-যাওয়ার দেশে,
 সকল-গড়া সকল-ভাঙা
 সকল গানের শেষে।

কাজল ঘেঁষে ঘনিরে ওঠে
 সজল ব্যাকুলতা,
 এলোমেলো হাওয়ার ওড়ে
 এলোমেলো কথা।

দুলছে দূরে বনের শাখা,
বৃষ্টি পড়ে বেগে,
মেঘের ডাকে কোন্ অশান্ত
উঠিস জেগে জেগে।

কলিকাতা
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

প্রতীক্ষা

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে।
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে।
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা,
কেনাবেচা নানান হাটে হাটে।

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি,
ভরেছি জুই পদ্মপাতার পুটে
তোমার করপদ্মদলের লাগি।
রেখেছি আজ শান্ত শীতল করে
অঙ্গন মোর চন্দনসৌরভে।
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে
তোমার এবার সময় কখন হবে।

আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া-সনে।
দখিন-হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে,
আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে—
বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের পরে যাবে মাথা কুটে।

জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে,
ধুম্‌ধামিয়ে আসবে যখন জল,
বাতাস যখন পড়বে ঢুলে ঢুলে,
চন্দ্র যখন নামবে অন্তাচল,

শিখিল ভন্দ তোমার ছোঁয়া শুনে
চরণতলে পড়বে লুপ্তে তবে।
বসে আছি শরন পাতি ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে।

কলিকাতা
১৭ বৈশাখ [১৩১০]

গান শোনা

আমার এ গান শুনবে তুমি যদি
শোনাই কখন বলো।
ভরা চোখের মতো যখন নদী
করবে ছলছল,
ঘনিয়ে যখন আসবে মেঘের ভার
বহু কালের পরে,
না যেতে দিন সজল অন্ধকার
নামবে তোমার ঘরে,
যখন তোমার কাজ কিছ্র নেই হাতে,
তবুও বেলা আছে,
সাথী তোমার আসত যারা রাতে
আসে নি কেউ কাছে,
তখন আমায় মনে পড়ে যদি
গাইতে যদি বল—
নবমেঘের ছায়ায় যখন নদী
করবে ছলছল।

জ্ঞান আলোর দখিন-বাতায়নে
বসবে তুমি একা—
আমি গাব বসে ঘরের কোণে,
যাবে না মদ্য দেখা।
ফরায়ে দিন, অধার ঘন হবে,
বৃষ্টি হবে শব্দ—
উঠবে বেজে মদ্যভীর রবে
মেঘের গদগদ।
ভিজে পাতার গন্ধ আসবে ঘরে,
ভিজে মাটির বাস,
মিলিয়ে যাবে বৃষ্টির ঝর্ঝরে
ঘনের নিশ্বাস।
বাদল-সাঁঝে অধার বাতায়নে
বসবে তুমি একা,
আমি গেয়ে যাব আপন মনে,
যাবে না মদ্য দেখা।

জলের ধারা ঝরবে দ্বিগুণ বেগে,
 বাড়বে অন্ধকার,
 নদীর ধারে বনের সঙ্গে ঘেঁষে
 ভেদ হবে না আর।
 কাসির ঘণ্টা দূরে দেউল হতে
 জলের শব্দে মিশে
 অধার পথে বোড়ো হাওয়ার স্রোতে
 ফিরবে দিশে দিশে।
 শিরীষফুলের গন্ধ থেকে থেকে
 আসবে জলের ছাঁটে,
 উচ্চরবে পাইক যাবে হেঁকে
 গ্রামের শূন্য বাটে।
 জলের ধারা ঝরবে বাঁশের বনে,
 বাড়বে অন্ধকার,
 গানের সাথে বাদলা রাতের সনে
 ভেদ হবে না আর।

ও ঘর হতে যবে প্রদীপ জ্বলে
 আনবে আচম্বিত
 সেতারখানি মাটির 'পরে ফেলে
 থামাব মোর গীত।
 হঠাৎ যদি মৃৎ ফিরিয়ে তবে
 চাহ আমার পানে
 এক নিমিষে হয়তো বৃক্ষে লবে
 কী আছে মোর গানে।
 নামায়ে মৃৎ নয়ন করে নিচু
 বাহির হয়ে যাব,
 একলা ঘরে যদি কোনো-কিছু
 আপন মনে ভাব।
 থামায়ে গান আমি চলে গেলে
 যদি আচম্বিত
 বাদল-রাতে অধারে চোখ মেলে
 শোন আমার গীত।

বোলপুর
 ১২ জুলাই ১০১০

জাগরণ

কৃষ্ণকে আধখানা চাঁদ
 উঠল অনেক রাতে,
 খানিক কালো খানিক আলো
 পড়ল আঙিনাতে।

ওরে আমার নরন, আমার
নরন নিদ্রাহারা,
আকাশ-পানে চেয়ে চেয়ে
কত গুনবি তারা।

মাড়া কারো নাই রে, সবাই
ঘুমায় অকাতরে।
প্রদীপগদলি নিবে গেল
দুয়ার-দেওয়া ঘরে।
তুই কেন আজ বেড়াস কিরি
আলোর অন্ধকারে।
তুই কেন আজ দেখিস চেয়ে
বনপথের পারে।

শব্দ কোথাও শুনতে কি পাস
মাঠে তেপান্তরে।
মাটি কোথাও উঠছে কেঁপে
ঘোড়ার পদভরে?
কোথাও ধুলো উড়ছে কি রে
কোনো আকাশ-কোণে।
আগুনলিখা যায় কি দেখা
দূরের আশ্রবনে।

সন্ধ্যাবেলা তুই কি কারো
লিখন পেয়েছিলি।
বৃকের কাছে লুকিয়ে রেখে
শান্তি হারাইলি?
নাচে রে তাই রক্ত নাচে
সকল দেহমাকে,
বাজে রে তাই কী কথা তোর
পাঁজর জুড়ে বাজে।

আজিকে এই খন্ড চাঁদের
কীণ আলোকের পরে
ব্যাকুল হয়ে অশান্ত প্রাণ
আঘাত করে মরে।
কী লুকিয়ে আছে ওরে,
কী রেখেছে ঢেকে,
কিসের কপিন কিসের আভাস
পাই যে থেকে থেকে।
ওরে, কোথাও নাই রে ছাওয়া,
স্তম্ভ বাঁধের পাখা—

ঝালদুটের পাশে নদী
 কালির বর্ণে অঁকা।
 বনের 'পরে চেপে আছে
 কাহার অভিশাপ—
 ধরণীতল মূর্ছা গেছে
 জন্মে আপন তাপ।

ওরে, হেথায় আনন্দ নেই,
 পুরানো তোর বাড়ি,
 ভাঙা দয়ার বাদুড়কে ওই
 দিয়েছে পথ ছাড়ি।
 সম্মুখ হতে ঘুমিয়ে পড়ে
 যে যেথা পায় স্থান।
 জাগে না কেউ বীণা হাতে,
 গাহে না কেউ গান।

হেথা কি তোর দয়ারে কেউ
 পেঁছাবে আজ রাতে—
 এক হাতে তার ধনুজা তুলে,
 আলো আরেক হাতে?
 হঠাৎ কিসের চঞ্চলতা
 ছুটে আসবে বেগে,
 গ্রামের পথে পাখিরা সব
 গেয়ে উঠবে জেগে।

উঠবে মৃদু বেজে বেজে
 গর্জি গরুগরু.
 অঙ্গে হঠাৎ দেবে কাঁটা.
 বন্ধ দরদরু.
 ওরে নিদ্রাবিহীন অঁখি,
 ওরে শান্তিহারা,
 অঁখার পথে চেয়ে চেয়ে
 কার পেয়েছিস সাড়া।

বোলপুর
 ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১০১০

হারাধন

বিধি বৈদ্যন কান্ত দিলেন
 সন্নিহিত করার কাজে
 সকল তারা উঠল ফুটে
 নীল আকাশের মাঝে।

নবীন সৃষ্টি সামনে রেখে
সদরসভার ভলে
ছায়াপথে দেবতা সবাই
বসেন দলে দলে।
গাহেন ভাৱা, 'কী আনন্দ!
এ কী পূর্ণ ছবি!
এ কী মন্দ, এ কী হৃদয়,
গ্রহ চন্দ্র রবি!'

হেনকালে সভার কে গো
হঠাৎ বলি উঠে,
'জ্যোতির মালায় একটি তারা
কোথায় গেছে টুটে!
ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
থেকে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল
পড়িল সম্মান।
সবাই বলে, 'সেই তারাতেই
স্বর্গ হত আলো—
সেই তারাটাই সবার বড়ো,
সবার চেয়ে ভালো।'

সেদিন হতে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোঁজে,
ভ্রমিত নাই দিনে, রাতে
চন্দ্র নাই বোঝে।
সবাই বলে, 'সকল চেয়ে
তারেই পাওয়া চাই।'
সবাই বলে, 'সে গিয়েছে
ভুবন কানা তাই।
জ্বলন্ত গভীর রাতিবেলায়
স্তম্ভ তারার দলে—
'মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে'
নীরব হেসে বলে।

কোলপুর
১০ আষাঢ় ১৩১৩

চাণ্ডাল্য

নিবাস রুদ্ধে দূর চন্দ্র মৃদে
ভাপসের মতো যেন
স্তম্ভ ছিলি যে ওরে বনভূমি,
চন্দ্র ছিলি কেন।

হঠাৎ কেন রে দূলে ওঠে পাখা,
 যাবে না ধরার আর ধরে রাখা,
 ঝট্‌পট্‌ করে হানে ঘেন পাখা
 খাঁচার বনের পাখি।
 ওরে আমলকী, ওরে কদম্ব,
 কে তোদের গেল ডাকি।

‘ওই যে ঈশানে উড়েছে নিশান,
 বেজেছে বিবাণ বেগে—
 আমার বরষা কালো বরষা যে
 ছুটে আসে কালো মেঘে।’

ওরে নীলজল, অতল অটল
 ভরা ছিলি কূলে কূলে,
 হঠাৎ এমন শিহরি শিহরি
 উঠিলি কেন রে দূলে।
 তালতরুছায়া করে টলমল—
 কেন কলকল, কেন ছলছল—
 কী কথা বলিতে হলি চঞ্চল,
 ফুটিতে চাহে না বাক্—
 কাঁদিয়া হাসিয়া সাড়া দিতে চাস,
 কার শূনেছিস ডাক।

‘ওই যে আকাশে পূবের বাতাসে
 উতলা উঠেছে জেগে—
 আজি মোর বর মোর কালো বড়
 ছুটে আসে কালো মেঘে।’

পরান আমার, রুখিয়া দুরার
 আপনার গৃহমাঝে
 ছিলি এতদিন বিশ্রামহীন
 কী জানি কত কী কাজে।
 আজিকে হঠাৎ কী হল রে তোর,
 ভেঙে যেতে চায় বৃকের পাজির,
 অকারণে বহে নরনের লোর,
 কোথা যেতে চাস ছুটে।
 কে রে সে পাগল ভাঙিল আগল,
 কে দিল দুরার টুটে।

‘জানি না তো আমি কোথা হতে নামি
 কী ঝড়ে আঘাত লেগে

জীবন ভরিয়া মরণ হকিমা
কে আনিছে কালো মেঘে।'

বোলপুর
১০ আষাঢ় [১৩১০]

প্রচ্ছদ

- কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে।
- যারা ধূলাপায়ে ধায় গো পথে তোমায় ঠেলে যায়
তারা তোমায় ভাবে মিছে।
- আমি তোমার লাগি কুসুম ভুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাখি জালি—
- ওগো যে আসে সেই একটি-দুটি নিয়ে যে যায় তুলে
আমার সাজি হয় যে খালি।
- ওগো সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসে,
চোখে লাগছে ঘুমঘোর।
- সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমার দেখে হাসে
মনে লজ্জা লাগে মোর।
- আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মূখের 'পরে
যেন ভিখারিনীর মতো
- কেহ শূন্য যদি 'কী চাও তুমি' থাকি নিরুত্তরে
করি দৃষ্টি নয়ন নত।
- আজি কোন লাঞ্জে বা বলব আমি তোমার শূন্য চাহি,
আমি বলব কেমন করে—
- শূন্য তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনী দিন বাহি,
তুমি আসবে আমার তরে?
- আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজেশ্বরের তব
ভারে দিব বিসর্জন,
- ওগো অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,
তাহা মইল সংগোপন।
- আমি সুন্দর-পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন-মনে
হেথা তুণে আসন মেলে—
- তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল আরোহনে
তোমার সকল আলো জেদলে।
- তোমার মূখের 'পরে সোনার ধন্য বলবে কলমল
সাথে বাজবে বাঁশির তান—
- তোমার প্রতাপ-জয়ে বসুন্ধরা করবে টলমল
আমার উঠবে মেচে প্রাণ।

তখন পথের লোকে অধাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে,
তুমি নেমে আসবে পথে।
হেসে দূর হাত ধরে ধূলা হতে আমার তুলে লবে—
তুমি লবে তোমার রথে।
আমার ভূষণবিহীন মলিন বেশে ভিখারিনীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বাম পাশে,
তখন লতার মতো কাঁপবে আমি গর্বে সূখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে।

গুগো সময় বয়ে যাচ্ছে চলে রয়েছে কান পেতে
কোথা কই গো চাকার ধ্বনি।
তোমার এ পথ দিয়ে কত-না লোক গর্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কি গো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে
তুমি রবে সবার শেষে—
হেথায় ভিখারিনীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে
তারে রাখবে মলিন বেশে?

শান্তিনিকেতন
২ আষাঢ় ১৩১০

অনুমান

পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই
আধেক আঁখি মৃদিয়ে চাই,
ভয়ে চাই নে ফিরে।
আমি দেখি যেন আপন-মনে
পথের শেষে দূরের বনে
আসছ তুমি ধীরে।
যেন চিনতে পারি সেই অশান্ত
তোমার উত্তরীর প্রান্ত
ওড়ে হাওয়ার 'পরে।
আমি একলা বসে মনে গণি
শুনছি তোমার পদধ্বনি
মর্ম্মরে মর্ম্মরে।

ভোরে নরন মেলে অরুণরাগে
যখন আমার প্রাণে জাগে
অকারণের হাসি,
যখন নবীন তুলে লতার গাছে
কোন্‌ জোয়ারের স্রোতে নাচে
সবুজ সুধারসি—

যখন নব মেঘের সজল ছায়া
 বেন রে কার মিলন-মাসা
 ঘনায় বিশ্ব জুড়ে,
 যখন পদকে নীল শৈল ঘেরি
 বেজে ওঠে কাহার ভেরী,
 ধ্বজা কাহার উড়ে—

তখন মিথ্যা সত্য কেই বা জানে,
 সন্দেহ আর কেই বা মানে,
 ভুল যদি হয় হোক!
 ওগো জানি না কি আমার হিয়া
 কে ভুলালো পরশ দিয়া,
 কে জুড়ালো চোখ।
 সে কি তখন আমি ছিলাম একা,
 কেউ কি মোরে দেয় নি দেখা।
 কেউ আসে নাই পিছে?
 তখন আড়াল হতে সহাস আঁখি
 আমার মূখে চায় নি নাকি।
 এ কি এমন মিছে।

বোলপুর
 ৪ আষাঢ় ১৩১৩

বর্ষাপ্রভাত

ওগো এমন সোনার মাসাখানি
 কে যে গড়েছে!
 ঘেঁষ টুটে আজ প্রভাত-আলো
 ফুটে পড়েছে।
 বাতাস কাহার সোহাগ মাগে,
 গাছে-পালার চমক লাগে,
 হৃদয় আমার বিভাস রাগে
 কী গান ধরেছে!

আজ বিশ্বদেবীর দ্বারের কাছে
 কোন্ সে ভিখারী
 ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল
 দৃ হাত বিছারি—
 আজিল ভরে সোনা দিতে
 ছাপিয়ে পড়ে চারি ভিত্তে,

জন্মটিয়ে গেল পৃথিবীতে,
এ কী নেহারি!

ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে
স্বর্গপদরীতে
মোঁমাঁছির লেগেছিল
মধু চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙেছে চাক সন্ধান ভারে,
সোনার মধু লক্ষ ধারে
লাগে ঝড়িতে।

আজ সকাল হতেই খবর এল,
লক্ষ্মী একেলা
অরুণরাগে পাতবে আসন
প্রভাতবেলা।
শূনে দিগ্বিদিকে টুটে
আলোর পশ্ম উঠল ফুটে,
বিশ্বহৃদয়মধুপ জুটে
করেছে মেলা।

ও কি সুরপদরীর পদাধিনি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে?
কে জানে গো কী উল্লাসে
হেরেন ধরা মধুর হাসে,
আঁচলখানি নীলাকাশে
পড়েছে দূলে।

ওগো কাহারে আজ জানাই আমি,
কী আছে ভাষা—
আকাশপানে চেয়ে আমার
মিটেছে আশা।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাই-নে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

বর্ষাসন্ধ্যা

- আমায় অমনি খুশি করে রাখো
কিছুই না দিয়ে—
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।
এমনি ধূসর মাঠের পারে,
এমনি সাঁঝের অন্ধকারে,
বাজাও আমার প্রাণের তারে
গভীর স্বা দিয়ে।
- আমায় অমনি রাখো বন্দী করে
কিছুই না দিয়ে।
- আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব
কিছুই না করি,
দু হাত মেলে দিয়ে, তোমার
চরণ পাকড়ি।
আষাঢ়-রাতের সভায় তব
কোনো কথাই নাহি কব,
বুক দিয়ে সব চেপে লব
নিখিল অকিড়ি।
- আমি রাতের সাথে মিশিয়ে রব
কিছুই না করি।
- আজ বাদল-হাওয়ার কোথা যে জুই
গন্ধে মেতেছে।
লুপ্ত তারার মালা কে আজ
লুকিয়ে গেঁথেছে।
আজ নীরব অভিসারে
কে চলেছে আকাশপারে,
কে আজ এই অন্ধকারে
শয়ন পেতেছে।
- আজ বাদল-হাওয়ার জুই আপনার
গন্ধে মেতেছে।
- ওগো আজকে আমি সূখে রব
কিছুই না নিয়ে,
আপন হতে আপন-মনে
সুখা ছানিয়ে।
বনে হতে বনান্তরে
অনধারায় বৃষ্টি করে,

নিদ্রাবিহীন নয়ন-পরে
 স্বপন বানিয়ে।
 ওগো আজকে পরান ভরে লব
 কিছুই না নিয়ে।

রাতি
 ৯ আষাঢ় [১৩১৩]

সব-পেয়েছি'র দেশ

সব-পেয়েছি'র দেশে কারো
 নাই রে কোঠাবাড়ি,
 দুয়ার খোলা পড়ে আছে,
 কোথায় গেল স্বারী।
 অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়,
 হস্তীশালায় হাতি,
 স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে
 জ্বালায় না কেউ বাতি।
 রমণীরা মোতির সিন্ধ
 পরে না কেউ কোশে,
 দেউলে নেই সোনার চুড়া
 সব-পেয়েছি'র দেশে।

পথের ধারে ঘাস উঠেছে
 গাছের ছায়া-তলে,
 স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা
 পাশ দিয়ে তার চলে।
 কুটিরেতে বেড়ার 'পরে
 দোলে ঝুমকা-লতা,
 সকাল হতে মোমাছিদের
 ব্যস্ত ব্যকুলতা।
 ভোরের বেলা পথিকেরা
 কী কাজে যায় হেসে,
 সাথে ফেরে বিনা-বেতন
 সব-পেয়েছি'র দেশে।

আঙিনাতে দপদুবেলা
 মৃদুকরুণ গেয়ে
 বকুলতলার ছায়ায় বসে
 চরকা কাটে মেয়ে।
 মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে
 নতুন কচি ধানে,

কিসের গন্ধ, কাহার বাঁশ
হঠাৎ আসে প্রাণে।
নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেরেছি'র দেশে।

সদাগরের নৌকা যত
চলে নদীর 'পরে—
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ
কেনা-বেচার তরে।
সৈন্যদলে উড়িয়ে ধুজা
কপিপে চলে পথ—
হেথায় কড়ু নাহি থাকে
মহারাজের রথ।
এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কী আছে এই
সব-পেরেছি'র দেশে।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,
নাইকো হাটে গোল,
ওরে কবি, এইখানে তোম
কুটিরখানি তোল।
ধূয়ে ফেল' রে পথের ধূলো,
নামিয়ে দে রে বোকা,
বেঁধে নে তোম সেতারখানা,
রেখে দে তোম খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বোস' রে হেথায়
সারা দিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশ-ডলে
সব-পেরেছি'র দেশে।

৯ আষাঢ় ১৩১০

সার্থক নৈরাশ্য

তখন ছিল যে গভীর রাত্রিকোলা
নিদ্রা ছিল না চোখের কোণে;
আষাঢ়-আধারে আকাশে মেঘের মেলা,
কোথাও বাতাস ছিল না বনে।

বিরাম ছিল না তন্ত শমনতলে,
 কাঙাল ছিল বসে মোর প্রাণে;
 দ হাত বাড়িয়ে কী জানি কী কথা বলে.
 কাঙাল চায় যে করে কে জানে।
 দিল আধারের সকল রম্ব ভরি
 তাহার ক্ষুধা ক্ষুধিত ভাষা;
 মনে হল যেন বর্ষার বিভাবরী
 আজি হারাল রে সব আশা।
 অনাথ জগতে যেন এক সুখ আছে,
 তাও জগৎ খুঁজে না মেলে;
 আধারে কখন সে এসে যায় গো পাছে
 বৃকে রেখেছে আগুন জেলে।
 দাও দাও বলে হাঁকিন্দু সুদূরে চেয়ে
 আমি ফুকারি ডাকিন্দু করে।
 এমন সময়ে অরুণতরণী বেয়ে
 প্রভাত নামিল গগনপারে।
 পেরেছি পেরেছি নিবাও নিশার বাতি,
 আমি কিছুই চাই নে আর।
 ওগো নিষ্ঠুর শূন্য নীরব রাত
 তোমায় করি গো নমস্কার।
 বাঁচালে, বাঁচালে—বধির আধার তব
 আমার পেঁপীছিন্না দিল কূলে।
 বঞ্চিত করি যা দিয়েছ করে কব,
 আমার জগতে দিয়েছ ভূলে।

ধন্য প্রভাতরবি,
 আমার লহো গো নমস্কার।
 ধন্য মধুর বারু,
 তোমায় নমি হে বারংবার।
 ওগো প্রভাতের পাখি,
 তোমার " কল-নির্মল স্বরে
 আমার প্রণাম লয়ে
 বিছাও দূর গগনের 'পরে।
 ধন্য ধরার মাটি
 জগতে ধন্য জীবের মেলা।
 ধূলার নমিয়া মাথা
 ধন্য আমি এ প্রভাতবেলা।

প্রার্থনা

আমি বিকাব না কিছুতে আর
আপনারে।
আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
সবার সাথে এক সারে।
সকালবেলার আলোর মাঝে
মলিন ঘেন না হই লাজে,
আলো ঘেন পলিতে পায়
মনের মধ্যে একবারে।
বিকাব না, বিকাব না
আপনারে।

আমি বিশ্ব-সাথে রব সহজ-
বিশ্বাসে।
আমি আকাশ হতে বাতাস নেব
প্রাণের মধ্যে নিশ্বাসে।
পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ
পূণ্য হবে সর্ব দেহ,
গাছের শাখা উঠবে দলে
আমার মনের উল্লাসে।
বিশ্বের রব সহজ সূত্রে
বিশ্বাসে।

আমি সবার দেখে খুশি হব
অন্তরে।
কিছুর বেসুর ঘেন বাজে না আর
আমার বীণা-স্বন্তরে।
যাহাই আছে নয়ন ভরি
সবই ঘেন গ্রহণ করি,
চিন্তে নামে আকাশ-গঙ্গা
আনন্দিত মন্ত্র রে।
সবার দেখে তৃপ্ত রব
অন্তরে।

কলিকাতা
২০ আষাঢ় ১৩১০

খেয়া

তুমি এ পার ও পার কর কে গো,
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে
দেখি যে তাই চেয়ে,

ওগো খেয়ার নেয়ে।
 ভাঙিলে হাট দলে দলে
 সবাই যবে ঘাটে চলে
 আমি তখন মনে করি
 আমিও যাই ধেরে,
 ওগো খেয়ার নেয়ে।

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে
 তরঙ্গী যাও বেয়ে,
 দেখে মন আমার কেমন স্নরে
 ওঠে যে গান গেয়ে,
 ওগো খেয়ার নেয়ে।
 কালো জলের কলকলে
 অঁখি আমার ছলছলে,
 ও পার হতে সোনার আভা
 পরান ফেলে ছেয়ে,
 ওগো খেয়ার নেয়ে।

দেখি তোমার মূখে কথাটি নেই,
 ওগো খেয়ার নেয়ে।
 কী যে তোমার চোখে লেখা আছে
 দেখি যে তাই চেরে,
 ওগো খেয়ার নেয়ে।
 আমার মূখে কণতরে
 যদি তোমার অঁখি পড়ে
 আমি তখন মনে করি
 আমিও যাই ধেরে,
 ওগো খেয়ার নেয়ে।

গীতাঞ্জলি

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
৩১ শ্রাবণ ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শূন্য ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবনমাঝে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরানে তোমার পরম কাম্বিত,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

১০১০

আমি বহু বাসনার প্রাণপণে চাই,
সম্পত্তি করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সম্পত্তি মোর
জীবন ভরে।

না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিভেছ আমার
সে মহাদানেরই যোগ্য করে,
অতি-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচালে মোরে।

আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চাই
তোমার পদের লক্ষ্য ধরে;

তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখে হতে
 যাও যে সরে।
 এ যে তব দয়া জানি জানি হাস,
 নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়,
 পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
 তব মিলনেরই যোগ্য করে,
 আধা-ইচ্ছার সংকট হতে
 বাঁচিয়ে মোরে।

১০১০

৩

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
 কত ঘরে দিলে ঠাই.
 দূরকে করিলে নিকট, বন্ধ,
 পরকে করিলে ভাই।
 পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
 মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
 নতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
 সে কথা যে ভুলে যাই।
 দূরকে করিলে নিকট, বন্ধ,
 পরকে করিলে ভাই।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
 যথনি যেখানে লবে,
 চিরজনমের পরিচিত ওহে
 তুমিই চিনাবে সবে।
 তোমারে জানিলে নাহি কেত পর
 নাহি কোনো ঘানা, নাহি কোনো ডর,
 সবারে মিলিয়ে তুমি জাগিতেছ
 দেখা যেন সদা পাই।
 দূরকে করিলে নিকট, বন্ধ,
 পরকে করিলে ভাই।

১০১০

৪

বিপদে মোরে রক্ষা করো,
 এ নহে মোর প্রার্থনা,
 বিপদে আমি না যেন করি ভ্রম।

দুঃখতাপে ব্যাধিত চিতে
 নাই বা দিলে সান্ধনা,
 দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
 সহায় মোর না যদি জুটে
 নিজের বল না যেন টুটে,
 সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
 লভিলে শুদ্ধ বণ্টনা
 নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে গাণ
 এ নহে মোর প্রার্থনা,
 তরিতে পারি শক্তি যেন রয়।
 আমার ভার লাঘব করি
 নাই বা দিলে সান্ধনা,
 বাহিতে পারি এমনি যেন হয়।
 নম্রাশিরে সুখের দিনে
 তোমারি মুখ লইব চিনে,
 দুঃখের রাতে নিখিল ধরা
 যেদিন করে বণ্টনা
 তোমারে যেন না করি সংশয়।

৫

অন্তর মম বিকশিত করো
 অন্তরতর হে।
 নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
 সুন্দর করো হে।
 জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
 নির্ভয় করো হে।
 মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।
 অন্তর মম বিকশিত করো,
 অন্তরতর হে।

যুগ্ম করো হে সবার সঙ্গে,
 যুগ্ম করো হে বন্ধ,
 সঙ্গার করো সকল কর্মে
 শান্ত তোমার হৃদয়।

চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
 নন্দিত করো, নন্দিত করো,
 নন্দিত করো হে।
 অন্তর মম বিকশিত করো
 অন্তরতর হে।

শিলাইদহ
 ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪

৬

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পূলকে
 প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভুলোকে
 তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
 দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
 মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ:
 জীবন উঠিল নিবিড় সূয়ায় ভরিয়া।

চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
 শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
 সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
 নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
 উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
 অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪

৭

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
 এসো গন্ধে বরনে, এসো গানে।
 এসো অঙ্গে পূজকময় পরশে,
 এসো চিন্তে অমৃতময় হরষে,
 এসো মৃগ মৃদিত দৃ নয়ানে।
 তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্তি,
 এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্তি,
 এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
 এসো দঃখে সুখে এসো মর্মে,
 এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,
 এসো সকল কর্ম-অবসানে।
 তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪?

৮

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ডেলা।

আজ প্রমত্ত ভোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে;
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা।

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে,
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।

যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

১৩১৫?

৯

আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই,
টান্ রে সবাই টান।

বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
টেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি
ষায় যদি থাক প্রাণ।
আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।

কে ডাকে রে পিছন হতে
কে করে রে মানা,
ভুলেই কথা কে বলে আজ
ভুল আছে সব জানা।

কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে,

পালের রশি ধরব কষি,
চলব গেয়ে গান।
আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।

১০১১

১০

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অগ্রদূত।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মন্তাহার।
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বদকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।

ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমার
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোমার প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার।

১০১২

১১

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমাল্য।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শয়মল
আলো-ঝলমল
বর্নগিরিপর্বতে,
এসো মদকুটে পরিয়া দেবত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা।

ঝরা মালতীর ফুলে
 আসন বিছানো নিছত কুঞ্জ
 ভরা গঙ্গার কুলে,
 ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
 তোমার চরণমূলে।
 গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
 সোনার বীণার তারে
 মৃদু মৃদু ঝংকারে,
 হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
 ক্ষণিক অশ্রুধারে।
 রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
 ঝলকে অলককোণে,
 পলকের তরে সক্রন্দণ করে
 বদলায়ো বদলায়ো মনে।
 সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
 অধার হইবে আলা।

শান্তিনিকেতন
 ৩ ডায় ১৩১৫

১২

লেগেছে অমল ধবল পালে
 মন্দ মধুর হাওয়া।
 দেখি নাই কভু দেখি নাই
 এমন তরঙ্গী বাওয়া।
 কোন্ সাগরের পার হতে আনে
 কোন্ স্রবতের ধন।
 ভেসে যেতে চায় মন,
 ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
 সব চাওয়া সব পাওয়া।

পিছনে ঝরিছে ঝরঝর জল,
 গুরুগুরু দেয়া ডাকে,
 মখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
 ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
 ওগো কান্ডারী, কে গো তুমি, কার
 হাসিকামার ধন।
 ভেবে মরে মোর মন,
 কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র,
 কী মন্ত্র হবে গাওয়া।

শান্তিনিকেতন
 ৩ ডায় ১৩১৫

আমার নরন-ভুলানো এলে।
 আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
 শিউলিতলার পাশে পাশে
 ঝরা ফুলের রাশে রাশে
 শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
 অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
 নরন-ভুলানো এলে।

আলোছায়ার আঁচলখানি
 লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
 ফুলগন্ধি ওই মৃধে চেয়ে
 কী কথা কয় মনে মনে।
 তোমার মোরা করব বরণ,
 মৃধের ঢাকা করো হরণ,
 ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
 দ্রুত হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
 নরন-ভুলানো এলে।

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
 শূন্য গভীর শঙ্খধ্বনি,
 আকাশবীণার তারে তারে
 জাগে তোমার আগমনী।
 কোথায় সোনার নৃপদ্র বাজে,
 বদ্বী আমার হিয়ার মাঝে,
 সকল ভাবে সকল কাজে
 পাষণ-গালা সূধা ঢেলে—
 নরন-ভুলানো এলে।

শান্তিনিকেতন
 ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
 হেরিন্দু আজি এ অরুণকিরণ-রূপে।
 জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
 নীরব গগনে ভরি উঠে চূপে চূপে।

তোমাতে নমি হে সকল ভুবনমাঝে,
 তোমাতে নমি হে সকল জীবনকাছে;

তন্দ্র মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাশন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিন্দু আজি এ অরুণকিরণ-রূপে।

১৩১৫

১৫

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়ামাঝে।

বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা কাজে।

নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাব তুষি।

রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবনমাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধরনিবে সব কাজে।

কলকাতা
আষাঢ় ১৩১৬

১৬

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,
অধীর করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা স্মারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা স্মারের পাশে।

তুমি যদি না দেখা দাও
 কর আমার হেলা,
 কেমন করে কাটে আমার
 এমন বাদল-বেলা।
 দূরের পানে মেলে আঁখি
 কেবল আমি চেয়ে থাকি,
 পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
 দূরন্ত বাতাসে।
 আমার কেন বসিয়ে রাখ
 একা দ্বারের পাশে।

কোলপুর
 আশ্বিন ১৩১৬

১৭

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো !
 বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
 রয়েছে দীপ না আছে লিখা
 এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
 ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
 বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
 তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
 নিশীথে ঘন অন্ধকারে
 ডাকেন তোরে প্রেমভিসারে,
 দূঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
 তোমার লাগি জাগেন ভগবান।'

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
 বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
 এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
 পরান মম সহসা জাগি
 এমন কেন করিছে মরি মরি।
 বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।

বিজ়ালি পুখু, ক্ষণিক আভা হানে,
 নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
 জানি না কোথা অনেক দূরে
 বাজিল গান গভীর সুরে,
 সকল প্রাণ টানিছে পথপানে।
 নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না বাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৮

আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়িয়ে এলে।
প্রভাত আজি মৃদেছে অঁখি,
বাতাস বৃথা বেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।

কৃষ্ণনহীন কাননভূমি,
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক ভূমি
পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপনসম
বেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৯

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিরে এল,
গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে ররে ররে।
একলা বসে ঘরের কোণে
কী ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া বৃথীর বনে
কী কথা যায় করে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে ররে ররে।

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিলেছে
 খুঁজে না পাই কদল;
 সৌরভে প্রাণ কাঁদিলে ভুলে
 ভিজে বনের ফুল।
 অধার রাতে প্রহরগুলি
 কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
 কোন্ ভুলে আজ সকল তুলি
 আছি আকুল হয়ে।
 বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
 ঝরেছে রয়ে রয়ে।

শিলাইদহ
 ২৯ অক্টো ১০১৬

২০

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
 পরানসখা বন্ধ হে আমার।
 আকাশ কাঁদে হতাশসম,
 নাই যে ঘুম নয়নে মম,
 দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
 চাই যে বারে বার।
 পরানসখা বন্ধ হে আমার।

বাহিরে কিছু দেখিতে নাই পাই,
 তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
 সুদূর কোন্ নদীর পারে,
 গহন কোন্ বনের ধারে,
 গভীর কোন্ অন্ধকারে
 হতেছ তুমি পার।
 পরানসখা বন্ধ হে আমার।

‘পদ্মা’ হোট
 ব্রহ্ম ১০১৬

২১

জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে
 ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
 সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে
 রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন।

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
 এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,

অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শ্ৰুত পরশন।

সংগীত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরুণের কত রূপ দরশন।

কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরানে
কত স্নেহে দহে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরষন।

বোলপুর
১০ ভাদ্র ১৩১৬

২২

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী,
অবাক হয়ে শুনিনি, কেবল শুনিনি।
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেলে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাখাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধোয়ে
বহিরা যায় সুরের সুরধুনী।

মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে,
হার মেনে যে পুরান আমার কীদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন কীদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুননি।

শ্রীতি
১০ ভাদ্র ১৩১৬

২৩

অমন আড়াল দিলে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না।

বিশ্ব জোয়ার লুকোচুরি,
দেশ-বিদেশে কতই ছুঁনি,

এবার বলো, আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
ভবু কি প্রাণ গলবে না।

না হয় আমার নাই সাধনা,
ঝরলে তোমার কুপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল,
চকিতে ফল ফলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।

বোলপুর
রাতি
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

২৪

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শরনে স্বপনে।

এ সংসারের হাতে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দৃ হাত ভরে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শরনে স্বপনে।

যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধূলোয় শরন পাতি সমতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে।

যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আরোজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

১২ ভাদ্র ১৩১৬

২৫

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে কাননে ভূষরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়।
পল্লবদলে শ্রাবণধারায়
তোমার বিরহ বাজে হে।

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনার
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হার কত বাসনার
কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া
আমার হিম্মত মাঝে হে।

শ্রাবণ
১২ ভাদ্র ১৩১৬

২৬

আর নাই রে বেলা নামল ছায়া
ধরণীতে,
এখন চল্ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আবুল করে,

ওরে ডাকে আমার পথের 'পরে
সেই ধরনিত্তে।
চল্ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।

এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা-যাওয়া,
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরঙ্গীতে।
চল্ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।

১০ ভাদ্র ১৩১৬

২৭

আজ বারি ঝরে ঝরঝর
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকেবেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।

ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ওই ঝড়ে,
বৃক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পারে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল,
স্বারে স্বারে ভাঙল আগল,
হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে।
আজ এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।

১৪ ভাদ্র ১৩১৬

২৮

প্রভু তোমা লাগি অঁখি জাগে;
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

ধূলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারী হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে।
কৃপা নাই পাই
শব্দ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

আজি এ জগত-মাঝে
কত স্বেদে কত কাজে
চলে গেল সব আশে।
সাথী নাই পাই
তোমার চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

চারি দিকে স্বেদভরা
বাকুল শ্যামল ধরা
কাদায় রে অনুরাগে।
দেখা নাই নাই,
বাথা পাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

২৯

ধনে জনে আছি জড়িয়ে হার
তবু জ্ঞান, মন তোমারে চায়।
অন্তরে আছি হে অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমার জানিছ শ্বামী,
সব স্বেদে দ্বেদে ভুলে থাকায়
জ্ঞান মম মন তোমারে চায়।

ছাড়িতে পারি নি অহংকারে,
ঘুরে ঘুরি শিরে বহিরা তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি বে হার—

তুমি জ্ঞান, মন তোমারে চায়।
 যা আছে আমার সকলি কবে
 নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে।
 সব ছেড়ে সব পাব তোমায়,
 মনে মনে মন তোমারে চায়।

১৫ ভাদ্র ১৩১৬

৩০

এই যে তোমার প্রেম, ওগো
 হৃদয়হরণ।
 এই-যে পাতার আলো নাচে
 সোনার বরন।
 এই-যে মধুর আলস-ভরে
 মেষ ভেসে যায় আকাশ-পরে,
 এই-যে বাতাস দেহে করে
 অমৃত করণ।
 এই তো তোমার প্রেম, ওগো
 হৃদয়হরণ।

প্রভাত-আলোর ধারায় আমার
 নয়ন ভেসেছে।
 এই তোমারি প্রেমের বাণী
 প্রাণে এসেছে।
 তোমারি মধু ওই নুয়েছে,
 মধু আমায় চোখ খুঁয়েছে,
 আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
 তোমারি চরণ।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩১

আমি হেথায় থাকি শূন্য
 গাইতে তোমার গান,
 দিয়ো তোমার জগৎসভায়
 এইটুকু মোর স্থান।
 আমি তোমার ভুবনমাঝে
 লাগি নি নাথ কোনো কাজে,
 শূন্য কেবল সুরে বাজে
 অকাজের এই প্রাণ।

নিশায় নীরব দেবালয়ে
তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো
গাইতে হে রাজন্।

ভোরে যখন আকাশ জুড়ে
বাজবে বীণা সোনার সুরে,
আমি যেন না রই দূরে
এই দিয়ে মোর মান।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

৩২

নাও হে আমার ভর ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও।
পাশে থেকে চিনতে নারি,
কোন দিকে যে কী নেহারি,
তুমি আমার হৃদবিহারী
হৃদয়পানে হাসিয়া চাও।

বলো আমার বলো কথা,
গায়ে আমার পরশ করো।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ো
আমায় তুমি তুলে ধরো।
যা বদ্বি সব ভুল বদ্বি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে, কান্না মিছে,
সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

৩৩

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে যে আবরণ।
আবার এ যে নানা কথাই জমে,
চিস্তা আমার নানা দিকেই ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে,
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।

সবার মাঝে আমার সাথে থাকো,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,
নিম্নত মোর চেতনা-পরে রাখো
আলোকে-ভরা উদার হৃদয়ন।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩৪

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

ওগো পথিক, আজকে আমার
সকল পরান বোপে
থেকে থেকে হরষ যেন
উঠছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় এসেছে আজ,
ফুরাল মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ,
তোমার গন্ধ মেখে।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩৫

এসো হে এসো, সজ্জল ঘন,
বাদলবরিষনে;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে।
এসো হে গিরিশিখর চূমি,
ছায়ার ঘিরি কাননভূমি:
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি
গভীর গরজনে।

বাধিয়ে উঠে নীপের বন
পুলকভরা ফুলে।
উছলি উঠে কলরোদন
নদীর কূলে কূলে।

এসো হে এসো হৃদয়ভরা,
এসো হে এসো পিপাসা-হরা,
এসো হে অঁখি-শীতল-করা
ঘনায়ে এসো মনে।

১৭ ভাদ্র ১৩১৬

৩৬

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
থসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।

পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগনমাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে।

পাগল-করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন-পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে।

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছর ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যার ধরাতে
বরন গীতে গন্ধে রে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।

বোলপূর
১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৭

নিশার স্বপন ছুটল রে এই
ছুটল রে।
টুটল বধিন টুটল রে।

ঝইল না আর আড়াল প্রাণে,
ঘোরিয়ে এলেন জগৎ-পানে,

হৃদয়শতদলের সকল

দলগলি এই ফুটল রে, এই

ফুটল রে।

দুরার আমার ভেঙে শেষে

দাঁড়ালে যেই আপনি এসে

নয়নজলে ভেসে হৃদয়

চরণতলে লুটল রে।

আকাশ হতে প্রভাত-আলো

আমার পানে হাত বাড়াল,

ভাঙা কারার দ্বারে আমার

জয়ধ্বনি উঠল রে, এই

উঠল রে।

১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৮

শরতে আজ কোন্ অতিথি

এল প্রাণের দ্বারে।

আনন্দগান গা রে হৃদয়,

আনন্দগান গা রে।

নীল আকাশের নীরব কথা

শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা

বেজে উঠুক আজি তোমার

বীণার তারে তারে।

শস্যখেতের সোনার গানে

যোগ দে রে আজ সমান তানে,

ভাসিয়ে দে স্নর ভরা নদীর

অমল জলধারে।

যে এসেছে তাহার মূখে

দেখ রে চেয়ে গভীর স্নখে,

দুরার খুলে তাহার সাথে

বাহির হয়ে যা রে।

শান্তিনিকেতন

১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৯

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার

হয় নি সে গান গাওয়া।

আজও কেবল স্নর সাধা, আমার

কেবল গাইতে চাওয়া।

আমার লাগে নাই সে সদর, আমার
বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।
আজও ফোটে নাই সে ফুল, শুধু
বহেছে এক হাওয়া।

আমি দেখি নাই তার মন্থ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শূন্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন
করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হল আমার
সারাটি দিন ধরে,
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকব কেমন করে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয় নি আমার পাওয়া।

কলিকাতা
২৭ ভাদ্র ১৩১৬

50

যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে
রইব কত আর।
আর পারি নে রাত জাগতে হে নাথ,
ভাবতে অনিবার।
আছি রাত্রিদিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ করে,
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বার।

তাই তো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।
ভূমিও বৃষ্টি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখতে যা চাই নয় না তাও
ধূলোয় একাকার।

কলিকাতা
১ জানুয়ারি ১৩১৬

৪১

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
 হবে গো এইবার,
 আমার এই মলিন অহংকার।
 দিনের কাজে ধূলা লাগি
 অনেক দাগে হল দাগি,
 এমনি তন্ত হসে আছে
 সহ্য করা ভার।
 আমার এই মলিন অহংকার।

এখন তো কাজ সাঙ্গ হল
 দিনের অবসানে,
 হল রে তাঁর আসার সময়
 আশা এল প্রাণে।
 স্নান করে আয় এখন তবে
 প্রেমের বসন পরতে হবে,
 সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে
 গাঁথতে হবে হার।
 ওরে আয় সময় নেই যে আর।

১৯ আশ্বিন ১৩১৬

৪২

গায়ে আমার পলক লাগে,
 চোখে ঘনায় ঘোর,
 হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
 রাঙা রাখীর ডোর।
 আজিকে এই আকাশতলে
 জলে স্থলে ফুলে ফলে
 কেমন করে মনোহরণ
 ছড়ালে মন মোর।

কেমন খেলা হল আমার
 আজি তোমার সনে।
 পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
 ভেবে না পাই মনে।
 আনন্দ আজ কিসের ছলে
 কাদিতে চার নয়নজলে,
 বিরহ আজ মধুর হয়ে
 করেছে প্রাণ ডোর।

শিল্পীদহ
 ২৫ আশ্বিন ১৩১৬

৪৩

প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত
 রেখো না ঢাকি।
 এসেছি তোমারে হে নাথ,
 পরাতে রাখী।
 যদি বাঁধি তোমার হাতে
 পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
 যেখানে যে আছে, কেহই
 রবে না থাকি।

আজি যেন ভেদ নাই রয়
 আপনা পরে,
 আমায় যেন এক দেখি হে
 বাহিরে ঘরে।
 তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
 ঘরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
 ক্রণেক-তরে ঘূচাতে তাই
 তোমারে ডাকি।

শিলাইদহ
 ২৭ আশ্বিন ১৩১৬

৪৪

ভগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
 ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।
 নয়ন আমার রূপের পূরে
 সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘূরে,
 শ্রবণ আমার গভীর সূরে
 হয়েছে মগন।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
 বাজাই আমি বাঁশ।
 গানে গানে গেঁথে বেড়াই
 প্রাণের কান্নাহাসি।
 এখন সময় হয়েছে কি।
 সজায় গিয়ে তোমার দেখি
 জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব
 এ মোর নিবেদন।

শিলাইদহ
 ৩০ আশ্বিন ১৩১৬

৪৫

আলোর আলোকময় করে হে
 এলে আলোর আলো।
 আমার নয়ন হতে অধার
 মিলাল মিলাল।

সকল আকাশ সকল ধরা
 আনন্দে হাসিতে ভরা,
 যে দিক-পানে নয়ন মেলি
 ভালো সবই ভালো।

তোমার আলো গাছের পাতায়
 নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
 তোমার আলো পাখির বাসায়
 জাগিয়ে তোলে গান।

তোমার আলো ভালোবেসে
 পড়েছে মোর গায়ে এসে,
 হৃদয়ে মোর নির্মল হাত
 বদলাল বদলাল।

বোলপুর
 ২০ আগস্ট ১৯১৬

৪৬

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
 তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
 কেন আমার মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
 চিরজনম এমন করে ভুলিয়ে নাকো,
 অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
 তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

আমি তোমার বাতীদলের রব পিছে,
 স্থান দিয়ে হে আমায় তুমি সবার নীচে।
 প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধৈর্যে,
 আমি কিছুই চাইব না তো রইব চেয়ে:
 সবার শেষে থাকি যা রয় তাহাই লব।
 তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

শান্তিনিকেতন
 ২০ পৌষ ১৩১৬

৪৭

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
 অরূপ রতন আশা করি;
 ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
 ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
 সময় যেন হয় রে এবার
 ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
 সন্ধ্যায় এবার তলিয়ে গিয়ে
 অমর হয়ে রব য়ি।

যে গান কানে যায় না শোনা
 সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
 প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
 সেই অতলের সভামাঝে।
 চিরদিনের সুরটি বেঁধে
 শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
 নীরব যিনি তাহার পারে
 নীরব বীণা দিব ধরি।

শান্তিনিকেতন
 ১২ পৌষ ১৩১৬

৪৮

আকাশতলে উঠল ফুটে
 আলোর শতদল।
 পাপড়িগুলি ধরে ধরে
 ছড়াল দিক্-দিগন্তরে,
 ঢেকে গেল অন্ধকারের
 নিবিড় কালো জল।
 মাঝখানেতে সোনার কোষে
 আনন্দে ভাই আছি বসে,
 আমার ঘিরে ছড়ায় ধীরে
 আলোর শতদল।

আকাশেতে ঢেউ দিয়ে রে
 বাতাস বহে যায়।
 চার দিকে গান বেজে ওঠে,
 চার দিকে প্রাণ নাচে ছোটে,
 গগনভরা পরশখানি
 লাগে সকল গায়।

ডুব দিয়ে এই প্রাণসাগরে
 নিতেছি প্রাণ বন্ধ ভরে,
 ফিরে ফিরে আমার ঘিরে
 বাতাস বহে যায়।

দশ দিকেতে আঁচল পেতে
 কোল দিয়েছে মাটি।
 রয়েছে জীব বে বেষ্মানে
 সকলকে সে ডেকে আনে,
 সবার হাতে সবার পাতে
 অন্ন সে দেয় বাঁটি।
 ভরেছে মন গীতে গন্ধে,
 বসে আছি মহানন্দে,
 আমার ঘিরে আঁচল পেতে
 কোল দিয়েছে মাটি।

আলো, তোমায় নমি, আমার
 মিলাক অপরাধ।
 ললাটেতে রাখো আমার
 পিতার আশীর্বাদ।
 বাতাস, তোমায় নমি, আমার
 ঘুচুক অবসাদ,
 সকল দেহে বুলিয়ে দাও
 পিতার আশীর্বাদ।
 মাটি, তোমায় নমি, আমার
 মিটুক সর্ব সাধ।
 গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো
 পিতার আশীর্বাদ।

পৌষ ১৩১৬

৪৯

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
 আমাদের এই ঘরে।
 আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই,
 মনের মতো করে।
 গান গেয়ে আনন্দমনে
 কাটিয়ে দে সব ধূলা।
 যত্ন করে দ্রব করে দে
 আবর্জনাগুলো।

জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ্
 সাজিখানি ভরে—
 আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই,
 মনের মতো করে।

দিনরজনী আছেন তিনি
 আমাদের এই ঘরে,
 সকালবেলার তাঁর হাসি
 আলোক ঢেলে পড়ে।
 যেমনি ভোরে জেগে উঠে
 নরন মেলে চাই,
 খুশি হলে আছেন চেয়ে
 দেখতে মোরা পাই।
 তাঁর মৃধের প্রসন্নতায়
 সমস্ত ঘর ভরে।
 সকালবেলার তাঁর হাসি
 আলোক ঢেলে পড়ে।

একলা তিনি বসে থাকেন
 আমাদের এই ঘরে।
 আমরা যখন অন্য কোথাও
 চলি কাজের তরে,
 সবার কাছ তিনী মোদের
 এগিয়ে দিয়ে যান—
 মনের সুখে ধাই রে পথে,
 আনন্দে গাই গান।
 দিনের শেষে ফিরি যখন
 নানা কাজের পরে,
 দেখি তিনি একলা বসে
 আমাদের এই ঘরে।

তিনি জেগে বসে থাকেন
 আমাদের এই ঘরে
 আমরা যখন অচেতনে
 ঘুমাই শয্যা-পরে।
 জগতে কেউ দেখতে না পার
 লুকানো তাঁর বাতি,
 অচল দিয়ে আড়াল করে
 জ্বালান সারা রাত।

ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই
 আনাগোনা করে,
 অন্ধকারে হাসেন তিনি
 আমাদের এই ঘরে।

পৌষ ১৩১৬

৫০

নিভৃত প্রাণের দেবতা
 যেখানে জাগেন একা,
 ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার
 আজ লব তাঁর দেখা।
 সারাদিন শূন্য বাহিরে
 ঘরে ঘরে করে চাহি রে,
 সন্ধ্যাবেলার আরতি
 হয় নি আমার শেখা।

তব জীবনের আলোতে
 জীবন-প্রদীপ জ্বালি
 হে পূজারী, আজ নিভতে
 সাজাব আমার থালি।
 যেথা নিখিলের সাধনা
 পূজালোক করে রচনা,
 সেথায় আমিও ধরিব
 একটি জ্যোতির রেখা।

শান্তিনিকেতন
 ১৭ পৌষ ১৩১৬

৫১

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
 জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
 সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
 পাগল ওগো, ধরায় আস।

এই অকল সংসারে
 দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।
 ঘোর বিপদ-মাঝে
 কোন জননীর মূখের হাসি দেখিয়া হাস।

তুমি কাহার সম্মানে
সকল স্নেহে আগুন জ্বলিবে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস।

তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।

১৭ পৌষ ১৩১৬

৫২

তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।

আমায় দাও স্নেহাময় স্নেহ,
আমার বাণী করো স্নেহময়,
আমার প্রিয়তম তুমি, এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

এই নিখিল আকাশ ধরা
এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমায় হৃদয় হতে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

দুখী জেনেই কাছে আস,
ছোটো বলেই ভালোবাস,
আমার ছোটো মনে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

মাঘ ১৩১৬

৫৩

নামাও নামাও আমার তোমার
চরণতলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নরনরজে।

একা আমি অহংকারের
উচ্চ অচলে,
পাষণ-আসন ধূলার লুটীও
ভাঙো সবলে।
নামাও নামাও আমার তোমার
চরণতলে।

কী লগ্নে বা গর্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।
দিনের কর্ম ডুবেছে মোর
আপন অতলে,
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন
যায় না বিফলে।
নামাও নামাও আমার তোমার
চরণতলে।

শ্রাব ১০১৬

৫৪

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধ্যানে ফিরি বনে বনে।
আজি ক্ষুধা নীলাম্বর-মাঝে
এ কী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সঙ্করুণ সংগীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।

ওগো জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আশ্রমকুল-সৌগন্ধ্যে,
নব-পল্লব-মর্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আমি পূজকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।

বোলপুর
ফাল্গুন ১০১৬

৫৫

আজি বসন্ত জাগ্রত স্বারে।

তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে

কোরো না বিড়ম্বিত তারে।

আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,

আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো,

এই সংগীত-মুখরিত গগনে

তব গন্ধ তরঙ্গিয়া ভুলিয়ো।

এই বাহির ভুবনে দিশা হারিয়ে

দিয়ো ছড়িয়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে

আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে—

দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া

আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।

মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে,

কারে স্বারে স্বারে কর হানি মাগিছে,

এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী

কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।

ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,

তব গম্ভীর আহ্বান করে।

বোলপুর
২৬ মে ১৩১৬

৫৬

তব সিংহাসনের আসন হতে

এলে তুমি নেমে,

মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে

দাঁড়ালে নাথ, থেমে।

একলা বসে আপন মনে

গাইতেছিলেম গান,

তোমার কানে গেল সে সুস্বর

এলে তুমি নেমে,

মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে

দাঁড়ালে নাথ, থেমে।

তোমার সভায় কত-না গান

কতই আছেন গুণী;

গুণহীনের গানখানি আজ

বাজল তোমার প্রেমে।

লাগল বিশ্বতানের মাঝে
একটি করুণ সুর,
হাতে লয়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে।

২৭ চৈত্র ১৩১৬

৫৭

তুমি এবার আমার লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।
যে দিন গেছে তোমা বিনা
তারে আর ফিরে চাহি না।
যাক সে ধূলাতে।
এখন তোমার আলোর জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।

কী আবেশে কিসের কথায়
ফিরেছি হে ষথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বৃকের কাছে ও মৃধ রেখে
তোমার আপন বাণী কহো।

কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না,
তারে আগুন দিয়ে দহো।

২৮ চৈত্র ১৩১৬

৫৮

জীবন যখন লুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।

কর্ম যখন প্রবল-আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার,
হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ,
শান্তচরণে এসো।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ,
রাজ-সমারোহে এসো।

বাসনা যখন বিপুল ধূলোয়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্ধ আলোকে এসো।

২৮ চৈত্র ১৩১৬

৫৯

এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।
তার হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে।
নিশীথরাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাও হে পুরে,
যে তান দিয়ে অবাক কর
গ্রহশশীরে।

যা-কিছুর মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন-স্রগে,
গানের টানে মিলনুক এসে
তোমার চরণে।

বহুদিনের বাক্যরাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা বসে শুনব বাঁশি
অকূল ভিমিরে।

৩০ চৈত্র ১৩১৬

৬০

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
 গগন অন্ধকার;
 কে দেয় আমার বাণীর তারে
 এমন স্বাক্ষর।
 নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
 উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
 মেলে আঁধি চেরে থাকি
 পাই নে দেখা তার।

গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
 প্রাণ উঠিল পুরে
 জানি নে কোন্ বিপুল বাণী
 বাজে ব্যাকুল সুরে।
 কোন্ বেদনায় বঁধি না রে
 হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
 পরিষে দিতে চাই কাহারে
 আপন কণ্ঠহার।

৪ বৈশাখ ১৩১৭

৬১

সে যে পাশে এসে বসেছিল
 তবু জাগি নি।
 কী ঘুম তোরে পোরেছিল
 হতভাগিনী।
 এসেছিল নীরব রাতে
 বাঁগাখানি ছিল হাতে,
 স্বপনমাঝে ব্যজিয়ে গেল
 গভীর রাগিণী।

জুগে দেখি দখিন হাওয়া
 পাগল করিয়া
 গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
 আঁধার ভরিয়া।
 কেন আমার রক্তনী যার
 কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
 কেন গো তার মালার পরশ
 বৃকে লাগে নি।

বোলপুর
 ১২ বৈশাখ ১৩১৭

৬২

তোরা শূন্য নি কি শূন্য নি তার পায়ের ধ্বনি,
 ওই যে আসে, আসে, আসে।
 যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
 সে যে আসে, আসে, আসে।
 গেয়েছি গান যখন যত
 আপন মনে খ্যাপার মতো
 সকল সুরে বেজেছে তার
 আগমনী—
 সে যে আসে, আসে, আসে।

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
 সে যে আসে, আসে, আসে।
 কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
 সে যে আসে, আসে, আসে।
 দুখের পরে পরম দুখে,
 তারি চরণ বাজে বৃকে,
 সুরে কখন বুলিয়ে সে দেয়
 পরশমণি।
 সে যে আসে, আসে, আসে।

কলিকাতা
 ৩ ডিসেম্বর ১৩১৭

৬৩

মেনেছি, হার মেনেছি।
 ঠেলাতে গেছি তোমার যত
 আমার তত হেনেছি।
 আমার চিস্তাগগন থেকে
 তোমায় কেউ যে রাখবে ঢেকে
 কোনোমতেই সইবে না সে
 বারেবারেই জেনেছি।

অতীত জীবন ছাড়ার মতো
 চলছে পিছে পিছে,
 কত মায়ার বাঁশির সুরে
 ডাকছে আমার মিছে।

মিল ছুটেছে তাহার সাথে,
ধরা দিলেম তোমার হাতে,
যা আছে মোর এই জীবনে
তোমার দ্বারে এনেছি।

তিনধারিয়া
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৪

একটি একটি করে তোমার
পুরানো তার খোলো,
সেতারখানি নতুন বেঁধে তোলো।
ভেঙে গেছে দিনের মেলা,
বসবে সভা সম্ম্যাবেলা,
শেষের সুর যে বাজাবে তার
আসার সময় হল—
সেতারখানি নতুন বেঁধে তোলো।

দুয়ার তোমার খুলে দাও গো
আঁধার আকাশ-পরে,
সন্তলোকের নীরবতা
আসুক তোমার ঘরে।
এতদিন যে গিয়েছে গান
আজকে তারি হোক অবসান,
এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র
সেই কথাটাই ভোলো।
সেতারখানি নতুন বেঁধে তোলো।

তিনধারিয়া
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৫

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে যেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন আনন্দে চলেছি, তার
ঠিকানা না পেয়ে—

সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

তিনশ্রীয়া
৯ ইন্ডা ১৩১৭

৬৬

তোমার প্রেম যে বহিতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ
অনেক ব্যবধান—
দুঃখসুখের অনেক বেড়া
ধনজনমান।

আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা—
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।
শক্তি ধারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পদা
ঘুচায়ে দাও তার।

না রাখ তার ঘরের আড়াল
না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
কর অকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান,
লজ্জা শরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্বভুবনময়।
এমন করে মৃদুমুখি
সামনে তোমার থাকা,

কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে, তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাই।

তিনধারিয়া
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৭

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরন পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পদরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক ধামিয়া মোর বাতায়নপানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

স্বপন আমার ভরেছিল কোন গন্ধে,
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধূলায় লটোনো নীরব আমার বাঁণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আশ্বাতে।

কতবার আমি ভেবেছিলাম উঠি-উঠি
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি
উঠিন্, যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বৃষ্টি আর হল না তোমার সাথে;
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

তিনধারিয়া
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৮

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।

তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত,
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলাম ছুটে
সেদিন কত-না বন-বনান্ত।

ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জানত।
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি,
সুতীক্ষ্ণ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণপানে নয়ন করি' নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৯

ওই রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে
থাক-না পিছন পিছে পড়ে,
পিঠে তারে বইতে গেলি,
একলা পড়ে রইলি কলে।

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হল গেলি ভুলে।
ডাক রে আবার মাঝারে ডাক,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,
জীবনখানি উজাড় করে
সঙ্গে দে তার চরণমূলে।

তিনখরিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭০

চিন্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে।

বিজুলি তার বঁগার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।

পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়াল রে অঙ্গ আমার,
ছড়াল প্রাণে।

পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি
হল আমার সাথে সাথী,
অটুহাসে ধায় কোথা সে
বারণ না মানে।

তিনধারিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭১

ওগো মৌন না যদি কও
না-ই কহিলে কথা।
বন্ধ ভরি বইব আমি
তোমার নীরবতা।

স্তম্ভ হয়ে বইব পড়ে,
রজনী রয় যেমন করে
জ্বালিয়ে তারা নিমেষহারা
ধৈর্যে অবনতা।

হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে।
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।

তখন আমার পাখির বাসায়
জাগবে কি গান তোমার ভাষায়।
তোমার তানে ফোটাবে ফুল
আমার বনলতা ?

তিনধারিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭২

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
 নিবে যায় বারে বারে।
 আমার জীবনে তোমার আসন
 গভীর অন্ধকারে।

যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
 কুণ্ডি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
 আমার জীবনে তব সেবা তাই
 বেদনার উপহারে।

পূজাগৌরব পূর্ণাবিভব
 কিছুর নাহি, নাহি লেশ,
 এ তব পূজারী পরিয়া এসেছে
 লজ্জার দীন বেশ।

উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
 বাজে নাই বাঁশি সাজে নাই গেহ,
 কর্দিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া
 ভাঙা মন্দির-দ্বারে।

তিনখরিয়া
 ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৩

সবা হতে রাখব তোমায়
 আড়াল করে
 হেন পূজার ঘর কোথা পাই
 আমার ঘরে।

যদি আমার দিনে রাতে,
 যদি আমার সবার সাথে
 দয়া করে দাও ধরা, তো
 রাখব ধরে।

মান দিব যে তেমন মানী
 নই তো আমি,
 পূজা করি সে আয়োজন
 নাই তো স্বামী।

যদি তোমায় ভালোবাসি
 আপনি বেজে উঠবে বাঁশি,
 আপনি ফুটে উঠবে কুসুম
 কানন ভরে।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৪

বজ্জে তোমার বাজ্জে বাঁশ,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।

ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমোখে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সেই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সম্পদ সিদ্ধ দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।

আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সম্ভব।

তিনধরিত্রা
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৫

দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে।
তোমার দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালি,
পরান আমার পারি নে তাই
পায়ে থুতে।

এতদিন তো ছিল না মোর
কোনো বাধা,
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।

আজ ওই শূন্য কোলের তরে
ব্যাकुल হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়ে না গো দিয়ে না আর
ধুলায় শূতে।

কলিকাতা
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৬

সভা যখন ভাঙবে তখন
শেষের গান কি যাব গেয়ে।
হয়তো তখন কণ্ঠহারী
মুখের পানে রব চেয়ে।
এখনো বে সুর লাগে নি
বাজবে কি আর সেই রাগিণী,
প্রেমের ব্যথা সোনার তানে
সন্ধ্যাগগন ফেলবে ছেয়ে?

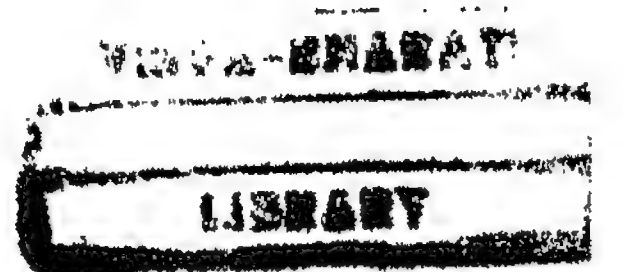
এতদিন যে সেধেছি সুর
দিনে রাতে আপন মনে
ভাগ্যে যদি সেই সাধনা
সমাপ্ত হয় এই জীবনে--
এ জনমের পূর্ণ বাণী
মানস-বনের পশ্মখানি
ভাসাব শেষ সাগরপানে
বিশ্বগানের ধারা বেয়ে।

কলিকাতা
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৭

চিরজনমের বেদনা,
ওহে চিরজীবনের সাধনা।
তোমার আগুন উঠুক হে জ্বলে,
কৃপা করিয়ো না দুর্বল বলে,
যত তাপ পাই সহিবারে চাই,
পুড়ে হোক ছাই বাসনা।

অমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও
আর দেরি কেন মিছে।
যা আছে বাধন বন্ধ জড়ারে
ছিঁড়ে পড়ে থাক পিছে।



গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
 বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
 গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
 জাগুক তীর চেতনা।

কলিকাতা
 ২৬ জৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৮

তুমি যখন গান গাহিতে বল
 গর্ব আমার ভরে ওঠে বুক্কে :
 দুই অর্ধি মোর করে ছলছল
 নিমেষহারা চেয়ে তোমার মূখে।
 কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
 গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
 সব সাধনা আরাধনা মম
 উড়িতে চায় পাখির মতো সূখে।

তুস্ত তুমি আমার গীতরাগে,
 ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে,
 জানি আমি এই গানেরই বলে
 বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
 মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
 গান দিয়ে সেই চরণ ছুয়ে যাই,
 সূরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
 বন্দু বলে ডাকি মোর প্রভুকে।

২৭ জৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৯

যায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
 প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
 যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
 প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।

চিন্ত মম যখন বেধায় থাকে
 সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে,
 যত বাধা সব টুটে যায় যেন
 প্রভু তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।

বাহিরের এই ভিক্ষাভরা খালি
 এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
 অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
 প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।

হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর,
 এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর
 সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে
 প্রভু তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

কলিকাতা
 ২৮ জৈষ্ঠ ১৩১৭

৮০

তারা দিনের বেলা এসেছিল
 আমার ঘরে,
 বলেছিল, একটি পাশে
 রইব প'ড়ে।
 বলেছিল, দেবতা সেবায়
 আমরা হব তোমার সহায়—
 যা-কিছু পাই প্রসাদ লব
 পূজার পরে।

এমনি করে দরিদ্র ক্ষীণ
 মলিন বেগে
 সংকোচেতে একটি কোণে
 রইল এসে।
 রাতে দেখি প্রবল হয়ে
 পশে আমার দেবালয়ে,
 মলিন হাতে পূজার বলি
 হরণ করে।

কোলপুর
 ২৯ জৈষ্ঠ ১৩১৭

৮১

তারা তোমার নামে ঘাটের মাঝে
 মাসুল লয় যে ধরি।
 দেখি শেষে ঘাটে এসে
 নাইকো পারের কড়ি।

তারা তোমার কাজের ভানে
নাশ করে গো ধনে প্রাণে,
সামান্য যা আছে আমার
লয় তা অপহরি।

আজকে আমি চিনেছি সেই
ছদ্মবেশী-দলে।
তারাও আমায় চিনেছে হায়
শক্তিবিহীন বলে।
গোপন মূর্তি ছেড়েছে তাই,
লজ্জা শরম আর কিছুর নাই,
দাঁড়িয়েছে আজ মাথা তুলে
পথ অবরোধ করি।

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

৮২

এই জ্যেষ্ঠস্নাত্রে ভাগে আমার প্রাণ;
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান।
দেখতে পাব অপূর্ব সেই মূখ,
রইবে ঢেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে
ফিরবে আমার অশ্রুভরা গান।

সাহস করে তোমার পদমূলে
আপনারে আজ ধরি নাই যে তুলে,
পড়ে আছি মাটিতে মূখ রেখে,
ফিরিলে পাছে দাও এ আমার দান।
আপনি যদি আমার হাতে ধরে
কাছে এসে উঠতে বল মোরে,
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রতা
এই নিমেষেই হবে অবসান।

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮৩

কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে:
গ্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশ।

কদলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনার গান একলা তোমার কানে,
চেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।

আজও সময় হয় নি কি তার, কাজ কি আছে বাকি।
ওগো ওই যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিঁধুপারের পাখি
আপন কুলায়-মাঝে সবাই এল ফিরে।
কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে।
অন্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।

কলকাতা
১৩ জুলাই ১৩১৭

৮৪

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধৈর্যে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।

নিখিল আশা-আকাঙ্ক্ষায়
দুঃখে সুখে,
ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গপাত
ধরব বদকে।
মন্দভালোর আঘাতবেগে,
তোমার বদকে উঠব জেগে,
শুনব বাণী বিশ্বজনের
কলরবে।
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।

৮৫

একা আমি ফিরব না আর
 এমন করে—
 নিজের মনে কোণে কোণে
 মোহের ঘোরে।
 তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে
 ছোটো করে ঘিরতে গিয়ে
 আপনাকে যে বাঁধি কেবল
 আপন ডোরে।

যখন আমি পাব তোমায়
 নিখিলমাক্কে
 সেইখানে হৃদয়ে পাব
 হৃদয়রাজ্যে।

এই চিত্ত আমার বৃত্ত কেবল,
 তারি 'পরে' বিশ্বকমল;
 তারি 'পরে' পূর্ণ প্রকাশ
 দেখাও মোরে।

২ আষাঢ় ১৩১৭

৮৬

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
 ফিরো না তবে ফিরো না, করো
 করুণ আঁখিপাত।
 নিবিড় বন-শাখার 'পরে'
 আষাঢ়-মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
 বাদলভরা আলসভরে
 ঘুমায়ে আছে রাত।
 ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
 করুণ আঁখিপাত।

বিরামহীন বিজুলিঘাতে
 নিদ্রাহারা প্রাণ
 বরষা-জলধারার সাথে
 গাহিতে চাহে গান।
 হৃদয় মোর চোখের জলে
 বাহির হল তিমিরতলে,

আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
 বাড়িয়ে দুই হাত।
 ফিরো না ভূমি ফিরো না, করো
 করুণ অধিপাত।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৭

ছিন্ন করে লও হে মোরে
 আর বিলম্ব নয়।
 ধূলায় পাছে ঝরে পড়ি
 এই জাগে মোর ভয়।
 এ ফুল তোমার মালার মাঝে
 ঠাই পাবে কি, জানি না যে,
 তবু তোমার আঘাতটি তার
 ভাগ্যে ঘেন রয়।
 ছিন্ন করো ছিন্ন করো
 আর বিলম্ব নয়।

কখন যে দিন ফুরিয়ে যাবে,
 আসবে আঁধার করে,
 কখন তোমার পূজার বেলা
 কাটবে অগোচরে।
 সেটুকু এর রঙ ধরেছে,
 গন্ধে সুখায় বুক ভরেছে,
 তোমার সেবার লও সেটুকু
 থাকতে সুসময়।
 ছিন্ন করো ছিন্ন করো
 আর বিলম্ব নয়।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৮

চাই গো আমি তোমারে চাই
 তোমায় আমি চাই—
 এই কথাটি সদাই মনে
 বলতে ঘেন পাই।

আর যা-কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

রাগি যেমন লুপ্তকরে রাখে
আলোর প্রার্থনাই—
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তিরে ঝড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় সে প্রাণে,
তেমনি তোমায় আঘাত করি
তবু তোমায় চাই।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৯

আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু,
নয় তো হীনবল,
শুদ্ধ কি এ ব্যাকুল হয়ে
ফেলবে অশ্রুতল।
মন্দমন্দুর সুখে শোভায়
প্রেমকে কেন ঘূমে ভোবায়।
তোমার সাথে জাগতে সে চায়
আনন্দে পাগল।

নাচ' যখন ভীষণ সাজে
তীর তালের আঘাত বাজে
পালায় গ্রাসে পালায় লাজে
সন্দেহ-বিহীন।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে
প্রেম যেন মোর বরণ করে,
কুদ্র আশার স্বর্গ তাহার
দিক সে রসাতল।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯০

আরো আঘাত সহিবে আমার
সহিবে আমারো,
আরো কঠিন সূরে জীবনভারে ঝংকারো।

যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে
বাজে নি তা চরম ভানে,
নিষ্ঠুর মর্ছনায় সে গানে
মর্তি সঞ্চারে।

লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
নন্দ সুরের খেলায় এ প্রাণ
বার্থ কোরো না।
জ্বলে উঠুক সকল হৃদাশ,
গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯১

এই করেছ ভালো, নিষ্ঠুর,
এই করেছ ভালো।
এনি করে হৃদয়ে মোর
তীর দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছই আলো।

যখন থাকে অচেতনে
এ চিস্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্জে তোলো আগুন করে
আমার যত কালো।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯২

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ালে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ের,
বন্ধু বলে দৃ হাত ধরি নে।

আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় স্নেহে বন্ধুর মধ্যে ধরে
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে।

ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন
তোমার মদঠা কেন ভরি নে।

ছুটে এসে সবার স্নেহে দহে
দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্রান্তিবিহীন কাজে
প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে।

৫ আষাঢ় ১৩১৭

৯৩

তুমি যে কাজ করছ, আমায়
সেই কাজে কি লাগাবে না।
কাজের দিনে আমায় তুমি
আপন হাতে জাগাবে না?

ভালোমন্দ ওঠাপড়ায়
বিশ্বশালার ভাঙাগড়ায়
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন
তোমার সাথে হয় গো চেনা।

ভেবোঁছিলেম বিজন ছারায়
নাই যেখানে আনাগোনা,
সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায়
সেথায় হবে জানাশোনা।

অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচাকেনা।

৬ আষাঢ় ১৩১৭

৯৪

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন ভূমি হৈ প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

সবার পানে যেথায় বাহু পসার',
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মতো ছাড়িয়ে পড়ে.
সবার ভূমি আনন্দধন হৈ প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।

৭ আষাঢ় ১৩১৭

৯৫

ডাকো ডাকো ডাকো আমারে,
তোমার স্নিগ্ধ শীতল গভীর
পবিত্র আধারে।
ভূচ্ছ দিনের ক্রান্তি প্লানি
দিতেছে জীবন ধূলাতে টানি
সারাক্ষণের বাক্যমনের
সহস্র বিকারে।

মদ্রু করো হৈ মদ্রু করো আমারে,
তোমার নিবিড় নীরব উদার
অনন্ত আধারে।
নীরব রাতে হারাইয়া বাক্
বাহির আমার বাহিরে মিশাক্.
দেখা দিক মম অন্তরতম
অখণ্ড আকারে।

৭ আষাঢ় ১৩১৭

৯৬

ষেথায় তোমার লুট হতেছে ডুবনে
সেইখানে মোর চিস্ত যাবে কেমনে।
সোনার ঘটে সূর্য তারা
নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছাড়িয়ে পড়ে গগনে।
সেইখানে মোর চিস্ত যাবে কেমনে।

ষেথায় তুমি বস দানের আসনে,
চিস্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে।
নিত্য নতুন রসে ঢেলে
আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে।
সেইখানে মোর চিস্ত যাবে কেমনে।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯৭

ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান।
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি,
দয়া করে প্রভু রাখো মোর অভিমান।

তার পরে যদি পূজার বেলার শেষে
এ গান ঝরিয়া ধরার ধূলোয় মেশে,
তবে ক্ষতি কিছু নাই—তব করতলপুটে
অজস্র ধন কত লুটে কত টুটে,
তারা আমার জীবনে ক্ষণকালতরে ফুটে,
চিরকাল তরে সার্থক করে প্রাণ।

৯ আষাঢ় ১৩১৭

৯৮

মৃধ ফিরায়ে রব তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সকল করো প্রাণে।
কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা,
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজেরই মাঝখানে।

নানা ইচ্ছা ধায় নানা দিকপানে,
একটি ইচ্ছা সফল করো প্রাণে।
সেই ইচ্ছাটি রাতের পরে রাতে
জাগে যেন একের বেদনাতে,
দিনের পরে দিনকে যেন গাঁথে
একের সূত্রে এক আনন্দগানে।

১০ আষাঢ় ১৩১৭

৯৯

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুঃলিয়া উঠিছে আবার বাজি,
নতুন মেঘের ঘনিমার পানে চেরে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে
নবভৃগদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
'এসেছে এসেছে' এই কথা বলে প্রাণ,
'এসেছে এসেছে' উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেরে।
আবার আষাঢ় এসেছে আকাশ ছেয়ে।

১০ আষাঢ় ১৩১৭

১০০

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে;
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা,
কোন তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বন্ধে বন্ধে মিলিয়া বহু বাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পূজে পূজে দূর সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে।
জানে না কিছই কোন মহাদ্রিতলে
গভীর প্রাণে গলিয়া পড়িবে জলে,

নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে
কোন সে ভীষণ জীবন-মরণ রাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

ঈশান কোণেতে ওই যে ঝড়ের বাণী
গদগদগদ রবে কী করিছে কানাকানি।
দিগন্তরালে কোন ভবিতব্যতা
স্তম্ভ তিমিরে বহে ভাষাহীন বাথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠিছে কোন আসন্ন কাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

১১ আষাঢ় ১৩১৭

১০১

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নরনে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মৃন্ময় প্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

আমার চিন্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগানে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেই করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

১৩ আষাঢ় ১৩১৭

১০২

এই মোর সাধ যেন এ জীবনমাঝে
তব আনন্দ মহাসংগীতে বাজে।
তোমার আকাশ, উদার আলোকধারা,
স্বার ছোটো দেখে ফেরে না যেন গো তারা,

ছয় ঋতু যেন সহজ নৃত্যে আসে
অন্তরে মোর নিত্য নূতন সাজে।

তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে
বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে।
তব আনন্দ পরম দৃঃখে মম
জ্বলে উঠে যেন পূণ্য আলোকসম,
তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি
ফুটে উঠে ফেটে আমার সকল কাজে।

১০ আষাঢ় ১৩১৭

১০০

একলা আমি বাহির হলেম
তোমার অভিসারে,
সাথে সাথে কে চলে মোর
নীরব অন্ধকারে।
ছাড়াতে চাই অনেক করে
ঘুরে চলি, যাই যে সরে,
মনে করি আপদ গেছে,
আবার দেখি তারে।

ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে,
বিষম চঞ্চলতা।
সকল কথার মধ্যে সে চায়
কইতে আপন কথা।
সে যে আমার আমি প্রভু,
লজ্জা তাহার নাই যে কভু,
তারে নিয়ে কোন্ লাজে বা
যাব তোমার স্ফারে।

১৪ আষাঢ় ১৩১৭

১০৪

আমি চেরে আছি তোমাদের সবাপানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।
নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,

যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছ্,
 যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে,
 স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে।

যেথা বাহিরের আবরণ নাহি রয়,
 যেথা আপনার উলঙ্গ পরিচয়।
 আমার বলিয়া কিছ্ নাই একেবারে
 এ সত্য যেথা নাহি ঢাকে আপনারে,
 সেথায় দাঁড়ায়ে নিলাজ দৈন্য মম
 ভরিয়া লইব তাহার পরম দানে।
 স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।

১৫ আষাঢ় ১৩১৭

১০৫

আর আমার আমি নিজের শিরে
 বইব না।
 আর নিজের দ্বারে কাঙাল হইবে
 রইব না।
 এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে
 বেরিয়ে পড়ব অবহেলে,
 কোনো খবর রাখব না ওর
 কোনো কথাই কইব না।
 আমার আমি নিজের শিরে
 বইব না।

বাসনা মোর যারেই পরশ
 করে সে,
 আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে
 নিমেষে।
 ওরে সেই অশ্রুটি, দুই হাতে তার
 যা এনেছে চাই নে সে আর,
 তোমার প্রেমে বাজবে না যা
 সে আর আমি সইব না।
 আমার আমি নিজের শিরে
 বইব না।

১৫ আষাঢ় ১৩১৭

১০৬

হে মোর চিত্ত, পদ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

হেথায় দাঁড়ায়ে দূর বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহবানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।

হেথায় আর্ষ, হেথা অনাৰ্ষ,
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রূপধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল সবে,

তারা মোর মাঝে সবাই খিন্নাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে খনিতে
তারি বিচিত্র সুর।

হে রত্নবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।

তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগারে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আঁজি ধ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আঁজি জ্বলে
দুখের রক্ত লিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।

এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে থাক।

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপদে নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃস্টান।

এসো স্বাক্ষণ, শূঁচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো স্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

১৮ আষাঢ় ১৩১৭

১০৭

যেথায় থাকে সবার অধম দীনীর হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় আমি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি—
সঙ্গী হলে আছি যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

১৯ আষাঢ় ১৩১৭

১০৮

হে মোর দূর্ভাগা দেশ, যাদের করেছে অপমান,
 অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
 মানুষের অধিকারে
 বঞ্চিত করেছে যারে,
 সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
 অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
 ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
 বিধাতার রুদ্ধরোধে
 দূর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
 ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
 অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
 সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
 চরণে দলিত হয়ে
 ধূলায় সে যায় বয়ে,
 সেই নিম্নে নেমে এসো নাহিলে নাহি রে পরিগ্রহ।
 অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যারে তুমি নীচে ফেল' সে তোমারে বাঁধবে যে নাচে
 পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
 অজ্ঞানের অন্ধকারে
 আড়ালে ঢাকিছ যারে
 তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর বাধধান।
 অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
 মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
 তবু নত করি আঁখি
 দেখিবারে পাও না কি
 নেমেছে ধূলায় তলে হীন-পতিতের ভগবান,
 অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
 অভিপাশ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।

সবারে না যদি ডাক',
এখনো সরিয়া থাক',
আপনারে বেঁধে রাখ' চৌদিকে জড়ালে অভিমান—
মৃত্যুমারি হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

২০ আষাঢ় ১৩১৭

১০৯

ছাঁড়স নে, ধরে থাক এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বৃষ্টি কেটে,
ওরে আর নেই ভয়।
ওই দেখ্ পূর্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়।
ওরে আর নেই ভয়।

এরা যে কেবল নিশাচর—
অবিশ্বাস আপনার 'পর,
নিরাশ্বাস, আলস্য, সংশয়,
এরা প্রভাতের নয়।
ছুটে আর, আর রে বাহিরে,
চেয়ে দেখ্, দেখ্ উদ্দেশিরে,
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ময়।
ওরে আর নেই ভয়।

২১ আষাঢ় ১৩১৭

১১০

আছে আমার হৃদয় আছে ভরে
এখন তুমি যা-খুঁশি তাই করো।
এমনি যদি বিরাজ' অন্তরে
বাহির হতে সকলি মোর হরো।
সব পিপাসার যেথায় অবসান
সেথায় যদি পূর্ণ কর প্রাণ,
তাহার পরে মরুপথের মাঝে
উঠে রৌদ্র উঠুক ঋতর।

এই যে খেলা খেলছে কত ছলে
 এই খেলা তো আমি ভালোবাসি।
 এক দিকেতে ভাসাও আঁখিজলে
 আরেক দিকে জাগিয়ে তোল হাসি।
 যখন ভাবি সব খোয়ালেম বুঝি,
 গভীর করে পাই তাহারে খুঁজি,
 কোলের থেকে যখন ফেল' দূরে
 বৃকের মাঝে আবার ভুলে ধর।

রেলপথে। ই. আই. আর.
 ২১ আষাঢ় ১৩১৭

১১১

গর্ব করে নিই নে ও নাম, জ্ঞান অন্তর্ধামী,
 আমার মূখে তোমার নাম কি সাজে।
 যখন সবাই উপহাসে তখন ভাবি আমি
 আমার কণ্ঠে তোমার নাম কি বাজে।
 তোমা হতে অনেক দূরে থাকি
 সে যেন মোর জ্ঞানতে না রয় থাকি,
 নামগানের এই ছন্দবেশে দিই পরিচয় পাছে
 মনে মনে মরি যে সেই সাজে।

অহংকারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে
 রাখো আমার যেথা আমার স্থান।
 আর-সকলের দৃষ্টি হতে সরিয়ে দিয়ে মোরে
 করো তোমার নত নয়ন দান।
 আমার পূজা দয়া পাবার তরে,
 যান যেন সে না পায় কারো ঘরে,
 নিত্য তোমার ডাকি আমি ধূলার 'পরে বসে
 নিত্যনূতন অপরাধের মাঝে।

রেলপথে। ই. বি. এস. আর.
 ২২ আষাঢ় ১৩১৭

১১২

কে বলে সব ফেলে যাবি
 মরণ হাতে ধরবে যবে।
 জীবনে তুই যা নিরোজিস
 মরণে সব নিতে হবে।

এই ভরা ভাঙারে এসে
শুন্য কি তুই যাবি গেবে।
নেবার মতো যা আছে তোর
ভালো করে নে তুই তবে।

আবজ্ঞানার অনেক বোকা
জমিয়েছিল যে নিরবধি,
বেঁচে যাবি, যাবার বেলা
ক্ষয় করে সব হাস রে যদি।
এসেছি এই পৃথিবীতে,
হেথায় হবে সেজে নিতে,
রাজার বেশে চল রে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৩

নদীপারের এই আষাঢ়ের
প্রভাতখানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।
সবুজ নীলে সোনার মিলে
যে সূর্য্য এই ছড়িয়ে দিলে,
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে
গভীর ঝালী—
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।

এখন করে চলতে পথে
জন্মের কালে
দুই ধারে যা ফুল কটে সব
নিস রে ভুলে।
সেগদলি তোর চেতনাতে
গেথে তুলিস দিবস-রাতে,
প্রতি দিনটি মতন করে
ভাগ্য মানি'
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৪

মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দ্বারেরে
সেদিন তুমি কী ধন দিবে উহারে।
ভরা আমার পরানখানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দ্বারেরে।

কত শরৎ বসন্তরাত,
কত সন্ধ্যা, কত প্রভাত
জীবনপাথে কত যে রস বরষে;
কতই ফলে কতই ফুলে
হৃদয় আমার ভরি তুলে
দুঃখসুখের আলোছায়ার পরশে।
যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দ্বারেরে।

২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৫

দয়া করে উচ্চা করে আপনি ছোটো হয়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্যসুধা
ঘুচায় আমার অগ্নির ক্ষুধা,
জলে স্নেহে দাও যে ধরা
কত আকার লয়ে।

বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোটো হয়ে এস হৃদয়ে।
আমিও কি আপন হাতে
করব ছোটো বিশ্বনাথে।
জানাব আর জানব তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে?

শিলাইদহ
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৬

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই
দুঃখসুখের ব্যথা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

যা পেয়েছি, যা হারিয়েছি,
যা-কিছু মোর আশা,
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শূভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধু হবে তোমার
নিভা অনুগতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমাঝে
আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রাবে না ঘর,
কেই-বা আপন, কেই-বা অপর,
বিজ্ঞান রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিরতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

শিলাইদহ
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৭

যাত্রী আমি ওরে।
পারবে না কেউ রাখতে আমার ধরে।
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় মিছে,

বিশ্ববোধটা টানে আমার নীচে,
ছিঁস হয়ে ছিঁড়িয়ে যাবে পড়ে।

যাত্রী আমি ওরে।
চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভরে।
দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার,
ছিঁস হবে শিকল বাসনার,
ভালোমন্দ কাটিয়ে হব পার,
চলতে সব লোকে লোকান্তরে।

যাত্রী আমি ওরে।
যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে।
আকাশ আমার ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল-সাঁঝে পরান মম টানে
কাহার বাঁশি এমন গভীর সুরে।

যাত্রী আমি ওরে—
বাহির হলেন না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায় নি কোনো পাখি,
কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষহারা শূন্য একটি অঁখি
জেগেছিল অন্ধকারের 'পরে।

যাত্রী আমি ওরে।
কোন দিনান্তে পেঁপীছাষ কোন ঘরে।
কোন ভারকা দীপ জ্বালে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন কুসুমের স্নানে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দৃ নরানে
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।

গোরাই নদী
২৬ আশ্বিন ১৩১৭

১১৮

উড়িয়ে ধরজা অপ্রভেদী রথে
ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে।
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।

ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাই করে তুই নে রে কোনোমতে।

কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ,
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিন্তাকারী,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর-গ্রামে অরণ্যে পর্বতে।

ওই যে ঢাকা ঘুরছে কনকানি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধনি।
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ।
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর কন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে।

গোরাই
২৬ আশ্বাঢ় ১৩১৭

১১১

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তঁার মতন শূঁচি বসন ছাড়ি
আম্ন রে ধূলার পরে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
 মুক্তি কোথায় আছে।
 আপনি প্রভু সৃষ্টিবান প'রে
 বাঁধা সবার কাছে।
 রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
 ছিঁড়ুক বসন্ত, লাগুক ধূলাবালি,
 কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
 ঘর্ম পড়ুক বারে।

কল্যাণ। গোরাই
 ২৭ আষাঢ় ১৩১৭

১২০

সীমার মাঝে অসীম, তুমি
 বাজাও আপন সুর।
 আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
 তাই এত মধুর।
 কত বর্ণে কত গন্ধে,
 কত গানে কত ছন্দে,
 অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
 জাগে হৃদয়পুর।
 আমার মধ্যে তোমার শোভা
 এমন সুমধুর।

তোমায় আমার মিলন হলে
 সকলি যায় খুলে—
 বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
 উঠে তখন দলে।
 তোমায় আলোয় নাই তো ছায়া,
 আমার মাঝে পায় সে কান্না,
 হয় সে আমার অশ্রুজলে
 সুন্দর বিধুর।
 আমার মধ্যে তোমার শোভা
 এমন সুমধুর।

গোরাই। জানিপুর
 ২৭ আষাঢ় ১৩১৭

১২১

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
 তুমি তাই এসেছ নীচে।
 আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
 তোমার প্রেম হত যে মিছে।
 আমার নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
 আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
 মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
 তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
 তবু আমার হৃদয় লাগি
 ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে
 প্রভু নিত্য আছ জাগি।

তাই তো প্রভু, হেথায় এল নেমে
 তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
 মর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
 সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

জানিপদর। গোরাই
 ২৮ আশ্বাঢ় ১৩১৭

১২২

মানের আসন, আরাম-শয়ন
 নয় তো তোমার তরে।
 সব ছেড়ে আজ খুঁশি হয়ে
 চলো পথের 'পরে।
 এসো বন্ধু তোমরা সবে
 একসাথে সব বাহির হবে,
 আজকে যাত্রা করব মোরা
 অমানিতের ঘরে।

নিন্দা পরব ভূষণ করে
 কাঁটার কণ্ঠহার,
 মাথায় করে তুলে লব
 অপমানের জ্বর।

দুঃখীর শেষ আলয় যেথা
সেই ধূলাতে লুটাই মাথা,
ত্যাগের শূন্যপাত্রটি নিই
আনন্দরস ভরে।

গোরাই
২৯ আষাঢ় ১৩১৭

১২৩

প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় ছিল যে লুকানো
বিপুল বল।
কোথায় বর্ম, অস্ত্র কোথায়,
ক্ষীণ দরিদ্র অতি অসহায়,
চারি দিক হতে এসেছে আঘাত
অনর্গল,
প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল।

প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় লুকাল আবার
বিপুল বল।
ধনুশর অসি কোথা গেল খাঁস,
শান্তির হাতি উঠিল বিকাঁশ,
চলে গেলে রাখি সারা জীবনের
সকল ফল,
প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল।

কলিকাতা
৩১ আষাঢ় ১৩১৭

১২৪

ভেবেছিলাম মনে যা হবার তারি শেষে
যাচা আমার বদ্বি থেমে গেছে এসে।
নাই বদ্বি পথ, নাই বদ্বি আর কাজ,
পাথের যা ছিল ফুরিয়েছে বদ্বি আজ,
যেতে হবে সরে নীরব অন্তরালে
জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে।

কী নির্ঝি আঁজি, এ কী অফুরান লীলা,
এ কী নবীনতা বহে অন্তঃশীলা।
পুরাতন ভাষা মরে এল যবে মৃখে,
নবগান হয়ে গুমরি উঠিল বৃকে,
পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনিলে নতুন দেশে।

কলিকাতা। ঠিকানগাড়িতে
৩১ আষাঢ় ১৩১৭

১২৫

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার,
তোমার কাছে রাখে নি আর
সাজের অহংকার।
অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝংকার।

তোমার কাছে খাটে না মোর
কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।
জীবন লয়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার।

কলিকাতা
১ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৬

নিন্দা দংশে অপমানে
যত আঘাত খাই
তবু জানি কিছুই সেথা
হারাবার তো নাই।
থাকি যখন ধূলার 'পরে
ভাবতে না হয় আসনতরে,
দৈন্যমাঝে অসংকোচে
প্রসাদ তব চাই।

লোকে যখন ভালো বলে,
 যখন স্নেহে থাকি,
 জানি মনে তাহার মাঝে
 অনেক আছে ফাঁকি।
 সেই ফাঁকিরে সাজিয়ে লয়ে
 ঘুরে বেড়াই মাথায় বয়ে,
 তোমার কাছে যাব, এমন
 সময় নাহি পাই।

বোলপুর
 ২ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৭

রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
 পরাও যারে মণিরতন-হার—
 খেলাধুলা আনন্দ তার সকলি যায় ঘুরে,
 বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।
 ছেঁড়ে পাছে আঘাত লাগি,
 পাছে ধূলায় হয় সে দাগি,
 আপনাকে তাই সরিয়ে রাখে সবায় হতে দূরে,
 চলেতে গেলে ভাবনা ধরে তার—
 রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
 পরাও যারে মণিরতন-হার।

কী হবে মা অমনতরো রাজার মতো সাজে,
 কী হবে ওই মণিরতন-হারে।
 দয়ার খুলে দাও যদি তো ছুটি পথের মাঝে
 রৌদ্রবারু-ধূল্যাকাদার পাড়ে।
 যেথায় বিশ্বজনের মেলা
 সমস্ত দিন নানান্ খেলা,
 চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,
 সেথায় সে যে পায় না অধিকার,
 রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
 পরাও যারে মণিরতন-হার।

বোলপুর
 ২ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৮

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
 দড়টো তারে
 জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই
 বাজে না রে।

এই বেসরো জটিলতায়
পরান আমার মরে ব্যথায়,
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়
 বারে বারে।
জীবন-বীণা ঠিক সুরে আর
 বাজে না রে।

এই বেদনা বইতে আমি
 পারি না যে,
তোমার সভার পথে এসে
 মরি লাজে।
তোমার যারা গুণী আছে
বসতে নারি তাদের কাছে,
দাঁড়িয়ে থাকি সবার পাছে
 বাহির-স্বারে।
জীবন-বীণা ঠিক সুরে আর
 বাজে না রে।

বোলপুর
৩ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৯

গাবার মতো হয় নি কোনো গান,
দেবার মতো হয় নি কিছু দান।
 মনে যে হয় সবই রইল বাকি,
 তোমায় শুধু দিয়ে এলেম ফাঁকি,
 কবে হবে জীবন পূর্ণ করে
 এই জীবনের পূজা অবসান।

আর-সকলের সেবা করি যত
 প্রাণপণে দিই অর্ঘ্য ভরি ভরি।
সত্য মিথ্যা সাজিয়ে দিই যে কত
 দীন বলিয়া পাছে ধরা পড়ি।
 তোমার কাছে গোপন কিছু নাই,
 তোমার পূজায় সাহস এত তাই,
 যা আছে তাই পারের কাছে আনি
 অনাবৃত দরিদ্র এই প্রাণ।

৭ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩০

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
 তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
 এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
 ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
 আনন্দময় তোমার এ সংসারে
 আমার কিছু আর বাকি না রবে।

মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
 আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
 সব বাসনা যাবে আমার থেমে
 মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
 দঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
 তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।

৭ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩১

দুঃস্বপন কোথা হতে এসে
 জীবনে বাধায় গন্ডগোল।
 কেন্দ্রে উঠে জেগে দেখি শেষে
 কিছু নাই আছে মার কোল।
 ভেবেছিলাম আর-কেহ বদ্বি,
 ভয়ে তাই প্রাণপণে বদ্বি,
 তব হাসি দেখে আজ বদ্বি
 তুমিই দিয়েছ মোরে দোল।

এ জীবন সদা দেয় নাড়া
 লয়ে তার সুখ দুখ ভয়;
 কিছু যেন নাই গো সে ছাড়া,
 সেই যেন মোর সমুদয়।
 এ ঘোর কাটিয়া যাবে চোখে
 নিমেষেই প্রভাত-আলোকে,
 পরিপূর্ণ তোমার সম্মুখে
 থেমে যাবে সকল কল্লোল।

৮ শ্রাবণ ১৩১৭

১০২

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।
নিরে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে শ্বারে শ্বারে,
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে।

কত শেখা সেই শেখালো,
কত গোপন পথ দেখালো,
চিনিয়ে দিল কত তারা
হৃদগগনে।
বিচিত্র সুখদুঃখের দেশে
রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে
সন্ধ্যাবেলায় নিরে এল
কোন ভবনে।

৯ প্রাবণ ১৩২৭

১০৩

তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চলে যাব নবজীবন-লোকে,
নতুন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নতুন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন-ভোর।
তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর।

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই,
বারে বারে নতুন লীলা তাই।
আবার তুমি জানি নে কোন বেষ্টে
পথের মাঝে দাঁড়াবে নাথ, হেসে,
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে,
লাগবে প্রাণে নতুন ভাবের ঘোর।
তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর।

১০ প্রাবণ ১৩১৭

১৩৪

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে—
 আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
 যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে
 অধীর হয়ে তরুলতায় ঘাসে,
 যে আনন্দে দুই পাগলের মতো
 জীবন-মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে—
 সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে,
 ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অটু হেসে।
 যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে
 দুঃখ-ব্যথার রক্তশতদলে,
 যা আছে সব খুলায় ফেলে দিয়ে
 যে আনন্দে বচন নাই ফুরে—
 সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

১১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৫

যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে,
 মনে করি আর পাব না ছাড়া।
 যখন আমায় ফেল তুমি নীচে,
 মনে করি আর হব না খাড়া।
 আবার তুমি দাও যে বাঁধন খুলে,
 আবার তুমি নাও আমারে তুলে,
 চিরজীবন বাহুদোলায় তব
 এমনি করে কেবলি দাও নাড়া।

ভয় লাগায় তন্দ্রা কর ক্ষয়,
 ঘুম ভাঙায় তখন ভাঙ ভয়।
 দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে,
 তাহার পরে লুকাও যে কোন্‌খানে,
 মনে করি এই হারালেম বদ্বীপ,
 কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া।

১১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৬

যতকাল তুই শিশুর মতো
রইবি বলহীন,
অন্তরেরই অন্তঃপদ্রে
থাক্ রে ততদিন।

অল্প ঘায়ে পড়বি ঘূরে,
অল্প দাহে মরবি পুড়ে,
অল্প গায়ে লাগলে ধূলা
করবে যে মলিন—
অন্তরেরই অন্তঃপদ্রে
থাক্ রে ততদিন।

যখন তোমার শক্তি হবে
উঠবে ভরে প্রাণ,
আগুন-ভরা সূক্ষ্ম তাহার
করবি যখন পান—

বাইরে তখন বাস রে ছুটে,
থাকবি শূঁচি ধূলায় লুটে,
সকল বাধন অঙ্গে নিলে
বেড়াবি স্বাধীন—
অন্তরেরই অন্তঃপদ্রে
থাক্ রে ততদিন।

১৪ প্রাক্ষ ১০১৭

১৩৭

আমার চিস্তা তোমায় নিত্য হবে
সত্য হবে—
ওগো সত্য, আমার এমন সূদিন
ঘটবে কবে।

সত্য সত্য সত্য জপি,
সকল বৃদ্ধি সত্যে সপি,
সীমার বাধন পেরিয়ে যাব
নিখিল ভবে,
সত্য, তোমায় পূর্ণ প্রকাশ
দেখব কবে।

তোমায় দূরে সরিয়ে, মরি
আপন অসত্যে।
কী যে কান্ড করি গো সেই
ভূতের রাজত্বে।

আমার আমি বুয়ে মূছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘূচে,
সত্য, তোমায় সত্য হব
বাঁচিব তবে,
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে।

২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৮

তোমায় আমার প্রভু করে রাখি
আমার আমি সেইটুকু থাকি বাকি।
তোমায় আমি হেরি সকল দিশি,
সকল দিলে তোমার মাঝে মিশি,
তোমাতে প্রেম জোগাই দিবাশি,
ইচ্ছা আমার সেইটুকু থাকি বাকি
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

তোমায় আমি কোথাও নাহি তাঁর
কেবল আমার সেইটুকু থাকি বাকি।
তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরি
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরি
রইব বাঁধা তোমার বাহুডোরে
বাঁধন আমার সেইটুকু থাকি বাকি
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

২৬ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৯

যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি
খেদ হবে না এখন যদি মরি।
রজনীদিন কত দুঃখে সুখে
কত যে সুখ বোঝেছে এই বুকে,
কত বেশে আমার ঘরে ঢুকে
কত রূপে নিয়েছ মন হরি,
খেদ হবে না এখন যদি মরি।

জানি তোমায় নিই নি প্রাণে বরি,
পাই নি আমার সকল পূর্ণ করি।
যা পেয়েছি ভাগ্য বলে মানি,
দিয়েছ তুমি তব পরশখানি।

আছ তুমি এই জানা তো জানি—
যাব ধরি সেই ভরসার তরী।
খেদ হবে না এখন যদি মরি।

১৬ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪০

ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুনতে কি পাস দূরের থেকে
পারের বাঁশি উঠছে বাজি।
তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেকবে এনার ঘাটে এসে।
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে
দেখ কি দেখা প্রদীপরাজি।

যেন আমার লাগছে মনে,
মন্দগধুর এই পবনে
সিন্দূরপারের হাসিটি কার
আধার বেয়ে আসছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগর্দলি
কিছু এনেছিলেম তুলি,
যেগর্দলি তার নবীন আছে
এইবেলা নে সাজিয়ে সাজি।

১৭ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪১

মনকে, আমার কাষাকে,
অমি একেবারে মিলিয়ে দিতে
চাই এ কালো ছায়াকে।
ওই আগুনে জ্বলিয়ে দিতে,
ওই সাগরে তলিয়ে দিতে,
ওই চরণে গলিয়ে দিতে,
দলিয়ে দিতে মাঝাকে—
মনকে, আমার কাষাকে।

যেখানে যাই সেথায় একে
আসন জুড়ে বসতে দেখে
লাজে মরি, লগ্ন গো হরি

এই স্নানিবিড় ছায়াকে—
 মনকে, আমার কায়াকে।
 তুমি আমার অনুভবে
 কোথাও নাহি বাধা পাবে,
 পূর্ণ একা দেবে দেখা
 সরিয়ে দিয়ে মায়াকে—
 মনকে, আমার কায়াকে।

১৯ প্রাবণ ১৩১৭

১৪২

যাবার দিনে এই কথাটি
 বলে যেন যাই—
 যা দেখেছি যা পেয়েছি
 তুলনা তার নাই।
 এই জ্যোতিঃসমুদ্র-মাঝে
 যে শতদল পদ্ম রাজে
 তারি মধু পান করেছি
 ধন্য আমি তাই—
 যাবার দিনে এই কথাটি
 জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
 কতই গেলেম খেলে,
 অপরূপকে দেখে গেলেম
 দুটি নয়ন মেলে।
 পরশ যারে যায় না করা
 সকল দেহে দিলেন ধরা।
 এইখানে শেষ করেন যদি
 শেষ করে দিন তাই—
 যাবার বেলা এই কথাটি
 জানিয়ে যেন যাই।

২০ প্রাবণ ১৩১৭

১৪৩

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে
 মরছে সে এই নামের কায়াগারে।
 সকল জুড়ে যতই দিবারাতি
 নামটারে ওই আকাশপানে গাঁথি,
 ততই আমার নামের অন্ধকারে
 হারাই আমার সত্য আপনারে।

জড়ো ক'রে ধূলির 'পরে ধূলি
 নামটারে মোর উচ্চ ক'রে তুলি।
 ছিদ্র পাছে হয় রে কোনোখানে
 চিস্ত মম বিরাম নাহি মানে,
 যতন করি যতই এ মিথ্যারে
 ততই আমি হারাই আপনারে।

২১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৪

নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ,
 বাঁচব সেদিন মৃত্ত হই—
 আপন-গড়া স্বপন হতে
 তোমার মধ্যে জনম লয়ে।
 ঢেকে তোমার হাতের লেখা
 কাটি নিজের নামের রেখা,
 কতদিন আর কাটবে জীবন
 এমন ভীষণ আপদ বয়ে।

সবার সজ্জা হরণ করে
 আপনাকে সে সাজাতে চায়।
 সকল সদরকে ছাপিয়ে দিলে
 আপনাকে সে বাজাতে চায়।
 আমার এ নাম থাক-না চুকে,
 তোমারি নাম নেব মৃধে,
 সবার সঙ্গে মিলব সেদিন
 বিনা-নামের পরিচয়ে।

২১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৫

জড়িয়ে আছে বাধা, ছাড়িয়ে যেতে চাই,
 ছাড়তে গেলে ব্যথা বাজে।
 মর্দু চাহিবারে তোমার কাছে বাই
 চাহিতে গেলে মরি লাজে।
 জানি হে তুমি মম জীবনে প্রেরণতম,
 এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
 তবু বা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
 ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তোমারে আবারিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া
 মরণ আনে রাশি রাশি,
 আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
 তবুও তাই ভালোবাসি।

এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
 কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,
 আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
 ভয় যে আসে মনোমাকে।

২২ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৬

তোমার দয়া যদি
 চাহিতে নাও জানি
 তবুও দয়া করে
 চরণে নিয়ো টানি।

আমি যা গড়ে তুলে
 আরামে থাকি ভুলে
 সুখের উপাসনা
 করি গো ফলে ফলে
 সে ধূলা-খেলাঘরে
 রেখো না ঘৃণাভরে,
 ভাগ্যেরো দয়া করে
 বহি-শেল জানি।

মৃত্যু মূর্খে আছে
 শ্বিধার মাঝখানে,
 হাহারে তুমি ছাড়া
 ফুটাতে কে বা জানে।

মৃত্যু ভেদ করি
 অমৃত পড়ে ঝরি,
 অতল দীনতার
 শূন্য উঠে ভরি।
 পতন-ব্যথা মাঝে
 চেতনা আসি বাজে,
 বিরোধ কোলাহলে
 গভীর তব বাণী।

২২ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৭

জীবনে যত পূজা
 হল না সারা,
 জানি হে জানি তাও
 হয় নি হারা।
 যে ফুল না ফুটিতে
 করেছে ধরণীতে,
 যে নদী মরুপথে
 হারাল ধারা,
 জানি হে জানি তাও
 হয় নি হারা।

জীবনে আজো বাহা
 রয়েছে পিছে,
 জানি হে জানি তাও
 হয় নি মিছে।
 আমার অনাগত
 আমার অনাহত
 তোমার বীণা-তারে
 বাজিছে তারা,
 জানি হে জানি তাও
 হয় নি হারা।

২০ ব্রাহ্মণ ১০১৭

১৪৮

একটি নমস্কারে প্রভু,
 একটি নমস্কারে
 সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
 তোমার এ সংসারে।
 ঘন প্রাণ-মেঘের মতো
 রসের ভারে নর নর
 একটি নমস্কারে প্রভু,
 একটি নমস্কারে
 সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
 তব ভবন-স্বারে।

নানা সুরের আবুলধারা
 মিলিয়ে দিলে আশ্বহারা
 একটি নমস্কারে প্রভু,

একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,
তেমনি সারা দিবসরাতি
একটি নমস্কারে প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক
মহামরণ-পারে।

২০ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৯

জীবনে যা চিরদিন
রয়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,
জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে,
হে দেবতা, তাই আজি
দিব তব সকাশে,
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে।

কথা তারে শেষ করে
পারে নাই বাঁধিতে,
গান তারে সুর দিয়ে
পারে নাই সাধিতে।
কী নিভতে চুপে চুপে
মোহন নবীনরূপে
নিখিল নয়ন হতে
ঢাকা ছিল, সখা, সে।
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

ভ্রমেছি তাহারে লয়ে
দেশে দেশে ঘিরিয়া,
জীবনে যা ভাঙাগড়া
সবই তারে ঘিরিয়া।

ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।

ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।
ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ
ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ

ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।
ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ
ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ

ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଦି ନକ୍ଷତ୍ରାଂଶୁ
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।
~~ଅନ୍ୟାନ୍ୟ~~ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତାଦି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଦି ।

୨୨୭
୨୨୭
✓

આમાર આલે એક ટિલોર
આર આંરના -
દિલ દિલે ઉઠેલ નામ
જોડેલેવા ।

અવાર આંત્રિ અડાઈ રોજ
પ્રાપ્ત કરે નામ એમ
માનિત નામ નીકળે રોજ
માવ રહેવા ।

કિ હાવાર ટિલોર
જોર ફાલે નામ ને હવ,
આમાર નામ જોવા કર્ય
આર રહેવા ।

પિતાપુત્ર એક જાત,
પત્નિના અપમાનને માંર,
જે આમાર જવા તાલે સિદ્ધિ રોજ !
॥ સુર રજાના મેલ રંગ જોવા રહેવા રજા

। સુર રજાના મેલ રંગ જોવા રહેવા રજા

રજાના મેલ
રજાના મેલ

সব ভাবে সব কাজে
আমার সবার মাঝে
শয়নে স্বপনে থেকে
তবু ছিল একা সে,
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

কত দিন কত লোকে
চেরেছিল উহারে,
বৃথা ফিরে গেছে তারা
বাহিরের দুরারে।
আর কেহ বদ্বিবে না,
তোমা-সাথে হবে চেনা
সেই আশা লয়ে ছিল
আপনারি আকাশে,
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

২৭ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫০

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ
আর সহ না—
দিনে দিনে উঠছে জমে
কতই দেনা।
সবাই তোমার সভার বেশে
প্রণাম করে গেল এসে,
মলিন বাসে লুকিয়ে বেড়াই
মান রহে না।

কী জানাব চিস্তাবেদন,
বোঝা হলে গেছে যে মন,
তোমার কাছে কোনো কথাই
আর কহে না।

ফিরায়ো না এবার ডারে
লও গো অপমানের পারে,
করো তোমার চরণতলে
চির-কেনা।

বোলপুর
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫১

প্রেমের হাতে ধরা দেব
 তাই রয়েছি বসে ;
 অনেক দেরি হয়ে গেল,
 দোষী অনেক দোষে ।
 বিধিবিধান-বাধনডোরে
 ধরতে আসে, যাই যে সরে,
 উঁর লাগি যা শাস্তি নেবার
 নেব মনের তোষে ।
 প্রেমের হাতে ধরা দেব
 তাই রয়েছি বসে ।

লোকে আমার নিন্দা করে,
 নিন্দা সে নয় মিছে.
 সকল নিন্দা মাথায় ধরে
 রব সবার নীচে ।
 শেষ হয়ে যে গেল বেলা,
 ভাঙল বেচা-কেনার মেলা,
 ডাকতে যারা এসেছিল
 ফিরল তারা রোষে ।
 প্রেমের হাতে ধরা দেব
 তাই রয়েছি বসে ।

২৫ প্রাক্ষ ১০১৭

১৫২

সংসারেতে আর-বাহারা
 আমার ভালোবাসে
 তারা আমার ধরে রাখে
 বেঁধে কঠিন পাখে ।
 তোমার প্রেম যে সবার বাজ
 তাই তোমারি নতুন ধারা,
 বাঁধ' নাকো, লুকিয়ে থাক'
 ছেড়েই রাখ' দাসে ।

আর-সকলে, ভুলি পাছে
 তাই রাখে না একা ।
 দিনের পরে কাটে যে দিন,
 তোমারি নেই দেখা ।

তোমার ডাকি নাই বা ডাকি,
যা খুঁশি তাই নিরে খাকি;
তোমার খুঁশি চেয়ে আছে
আমার খুঁশির আশে।

ই. আই. আর. রেলপথে
২৫ প্রাচল ১০১৭

১৫৩

প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে।
সকল স্বন্দ্র খুঁচবে আমার তবে।

আর-বাহারা আসে আমার ঘরে
ভয় দেখানে তারা শাসন করে,
দুরন্ত মন দুরার দিয়ে থাকে,
হার মানেন না, ফিরিয়ে দেয় সবে।

সে এলে সব আগল যাবে ছুটে,
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে,
ঘরে তখন রাখবে কে আর ধরে
তার ডাকে যে সাড়া দিতেই হবে।

আসে যখন, একলা আসে চলে,
গলায় তাহার ফুলের মালা দোলে,
সেই মালাতে বাঁধবে যখন টেনে
হৃদয় আমার নীরব হয়ে রবে।

রেলপথে
২৫ প্রাচল ১০১৭

১৫৪

গান গাওয়ালে আমার ভূমি
কতই ছলে যে,
কত স্নেহের খেলায়, কত
নয়নজলে হে।

ধরা দিয়ে দাও না ধরা,
এস কাছে, পালাও স্বরা,
পরান কর ব্যাথায় ভরা
পলে পলে হে।
গান গাওয়ালে এমনি করে
কতই ছলে যে।

কত তীর তারে তোমার
 বীণা সাজাও যে,
 শত ছিদ্র করে জীবন
 বাঁশি বাজাও হে।

তব সুরের লীলাতে মোর
 জনম যদি হয়েছে ভোর,
 চূপ করিয়ে রাখো এবার
 চরণতলে হে,
 গান গাওয়ালে চিরজীবন
 কতই ছলে যে।

রেলপথে
 ২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৫

মনে করি এইখানে শেষ
 কোথা বা হয় শেষ।
 আবার তোমার সভা থেকে
 আসে যে আদেশ।

নূতন গানে নূতন রাগে
 নূতন করে হৃদয় জাগে,
 সুরের পথে কোথা যে যাই
 না পাই সে উদ্দেশ।

সন্ধ্যাবেলার সোনার আভাস
 মিলিয়ে নিয়ে তান
 পূরবীতে শেষ করেছি
 যখন আমার গান--

নিশীথ রাতের গভীর সুরে
 আবার জীবন উঠে পুরে,
 তখন আমার নয়নে আর
 রয় না নিদ্রালেশ।

রেলপথে
 ২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৬

শেষের মধ্যে অশেষ আছে,
 এই কথাটি মনে
 আজকে আমার গানের শেষে
 আগছে কণে কণে।

সদর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু,
নীরবতায় বাজছে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

তারে যখন আঘাত লাগে,
বাজে যখন সুরে—
সবার চেয়ে বড়ো যে গান
সে রয় বহুদূরে।

সকল আলাপ গেলে থেমে
শান্ত বীণায় আসে নেমে,
সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে
বাজে গভীর স্বনে।

কলিকাতা
২৬ প্রাৰণ ১৩১৭

১৫৭

দিবস যদি সাঙ্গ হ'ল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে—
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমিরতলে।
স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে,
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মৃদিয়া-পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।

পাথের যার ফুঁরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতের রেখা উঠেছে যার ফুঁটে,
বসনভূষা মলিন হল ধূলোয় অপমানে
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে—
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যাথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুঁটাও তারে নবীন উষাপানে
জুড়ায়ে তারে আঁধার সুধাজলে।

কলিকাতা
২৯ প্রাৰণ ১৩১৭

সংযোজন

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি।
বলো ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্য পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে
ধন্য হরি ধন্য হরি।

সুখা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বদকে
ধন্য হরি হাসি মুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি ধন্য হরি।

আপনি কাছে আসেন হেসে
ধন্য হরি ধন্য হরি।
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে
ধন্য হরি ধন্য হরি।
ধন্য হরি মথল জলে,
ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে
চরণ আলোয় ধন্য করি।

গীতিমালা

রাতি এসে যেথায় মেশে
 দিনের পারাবারে
 তোমায় আমায় দেখা হল
 সেই মোহানার ধারে।
 সেইখানেতে সাদায় কালোয়
 মিলে গেছে অধার-আলোয়,
 সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
 এপারে ওইপারে।

নিতল নীল নীরব মাঝে
 বাজল গভীর বাণী:
 নিকষেতে উঠল ফুটে
 সোনার রেখাখানি।
 মৃধের পানে তাকাতে যাই
 দেখি দেখি দেখতে না পাই,
 স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা,
 করি আকুল ধারে।

শান্তিনিকেতন
 নিশীথে
 ১৬ আশ্বিন [১৩১৭]

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
 তাই ভোরে উঠেছি।
 আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী
 তাই বাইরে ছুটেছি।
 এই হল মোদের পাওয়া
 তাই ধরেছি গান-গাওয়া,
 আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
 সোনার রেনু লুটেছি।

আজ পারুলদিদির বনে
 মোরা চলব নিমন্ত্রণে,
 আজ চাঁপা ডালের লাখা-ছায়ের তুলসী
 মোরা সবাই জুটেছি।
 আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
 সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,

আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটোঁছি।

শান্তিনিকেতন
১৩১৬?

৩

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা।
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলারে পবনে পবনে।
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না।
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা।

আজ মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি,
নামো তালপল্লব-বীজনে
নামো জলে ছায়াছবি-সজনে;
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুন্দরীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে কণেক থামো-না।
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা।

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা,
ভরি' নিশীথ-তিমির-থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝের বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।

ওই বসেছ শূন্য আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে;
আহা শ্বেতচন্দন-তিলাকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে।
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দঃখ-লয়ন তেরাজি,

তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাদনা ।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা ।

গীতিনিকেতন
১৩১৬?

৪

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে ।
ঘোরাফেরা যান যে ঘুরে ।
গভীরধারা জলের ধারে,
অধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চুড়া
উঠেছে ওই বিজন পুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে ।

দিনের শেষে মলিন আলোয়
কোন নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি
উড়েছে সেই পারের পানে ।
ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে
উদাস ধনি উষাও আসে,
বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানে
তান তুলেছে কোন নুপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে ।

নিচল জলে নীল নিকষে
সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা,
পারাপারের সময় গেল
খেয়াতরীর নাইকো দেখা ।
পশ্চিমে ওই সৌখন্দ্যে
স্বপ্ন লাগে ভ্রম চাঁদে,
একলা কে যে বাজার বাঁশ
বেদনভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে ।

সারাটা দিন দিনের কাজে
হয় নি কিছুই দেখাশোনা,
কেবল মাথার বোকা বঁহে
হাটের মাঝে আনাগোনা ।
এখন আমার কে দেয় আনি
কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি;

সন্ধ্যাদীপের আলোয় ব'সে
ওগো আমার নয়ন ঝরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

শিলাইদহ
১৫ চৈত্র ১৩১৮

৫

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম
কাজের পথে।
নইলে অভাবিতের দেখা
ঘটত না তো কোনোমতে।
এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর যাওয়া-আসা,
সূর্য উঠে অস্তে মিলায়
এই রাঙা পর্বতে,
প্রতিদিনের ভার বহে যাই
এই কাজেরই পথে।

জেনেছিলাম কিছুই আমার
নাই অজানা।
যেখানে যা পাবার আছে
জানি সবার ঠিক-ঠিকানা।
ফসল নিয়ে গেছি হাটে,
ধেনুর পিছে গেছি মাঠে,
বর্ষা-নদী পার করেছি
খেয়ার তরীখানা।
পথে পথে দিন গিয়েছে,
সকল পথই জানা।

সেদিন আমি জেগেছিলাম
দেখে করে।
পসরা মোর পূর্ণ ছিল
চলেছিলাম রাজার দ্বারে।
সেদিন সবাই ছিল কাজে
গোঠের মাঝে মাঠের মাঝে,
ধরা সেদিন ভরা ছিল
পাকা ধানের ভারে।
ভোরের বেলা জেগেছিলাম
দেখেছিলাম করে।

সেদিন চলে যেতে যেতে
চমক লাগে।

মনে হল বনের কোণে
 হাওয়াতে কার গন্ধ জাগে।
 পথের বাকি বটের ছায়ে
 গেল কে যে চপল পারে
 চকিতে মোর নয়ন দুটি
 ভরিয়ে অরুণ-রাগে।
 সেদিন চলে যেতে যেতে
 মনে হল কেমন জাগে।

এত দিনের পথ হারালেম
 এক নিমেষে;
 জানি নে তো কোথায় এলেম
 একটু পথের বাইরে এসে।
 কেটেছে দিন দিনের পরে
 এমনি পথে এমনি ঘরে,
 জানি নে তো চলেছিলাম
 হেন অচিন দেশে।
 চিরকালের জানাশোনা
 ঘুচল এক নিমেষে।

রইল পড়ে পসরা মোর
 পথের পাশে।
 চারি দিকের আকাশ আজি
 দিক-ভোলানো হাসি হাসে।
 সকল-জানার বৃকের মাঝে
 দাঁড়িয়েছিল অজানা যে
 তাই দেখে আজ বেলা গেল
 নয়ন ভরে আসে।
 পসরা মোর পারসরিলাম
 রইল পথের পাশে।

শিলাইদহ
 ৬ মে ১৩১৮

৬

আমি হাল ছাড়লে তবে
 তুমি হাল ধরবে জানি।
 যা হবার আপনি হবে
 মিছে এই টানাটানি।
 ছেড়ে দে দে গো ছেড়ে,
 নীরবে যা তুই হেরে,
 যেখানে আছিস বসে
 বসে থাক্ ভাগ্য মানি।

আমার এই আলোগদুলি
 নেবে আর জ্বালিয়ে তুলি,
 কেবলি তারি পিছে
 তা নিয়েই থাকি ভুলি।
 এবার এই আধারেতে
 রহিলাম আঁচল পেতে,
 যখন খুঁশি তোমার
 নিয়ে সেই আসনখানি।

শিলাইদহ
 ১৭ মে [১৩১৪]

৭

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
 আনন্দ।
 খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
 বর্ষা আসে
 বসন্ত।
 কারা এই সমুখ দিয়ে
 আসে যায় খবর নিয়ে,
 খুঁশি রই আপন মনে,
 বাতাস বহে
 সুমন্দ।

সারাদিন আঁখি মেলে
 দুরারে রব একা।
 শূন্যখন হঠাৎ এলে
 তখন পাব দেখা।
 ততখন ক্লেবে ক্লেবে
 হাসি গাই মনে মনে,
 ততখন রহি রহি
 ভেসে আসে
 সুগন্ধ।

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
 আনন্দ।

শিলাইদহ
 ১৭ মে ১৩১৪

৮

কোলাহল তো বারণ হল
 এবার কথা কানে কানে।
 এখন হবে প্রাণের আলাপ
 কেবলমাত্র গানে গানে।

রাজার পথে লোক ছুটেছে
বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই
দিনদুপুরের মধ্যখানে,
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক তবে মৃঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনে মৌমাছির
বেড়াক মৃদু গৃঞ্জরিয়া।
মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্ব খেটে
গেছে তো দিন অনেক কেটে,
অলস বেলার খেলার সাথী
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা-কাজের ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

শিল্পীদ্বয়
১৪ মে ১৩১৪

৯

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলে নি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হত খবর আসে
উঠত হিয়া চমকে।
শুধু যেদিন দখিন হাওয়ার
বিরহ-গান মনকে গাওয়ার
পরান-উনমাদনি,
পাতায় পাতায় কপিন ধরে,
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি,
সেদিন আমার লাগে মনে
আছ বেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জানি যেন সকল জানি,
হৃদে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে।

এ কী গভীর, এ কী মধুর,
 এ কী হাসি পরান-ব'ধুর
 এ কী নীরব চাহনি,
 এ কী ঘন গহন মায়ী,
 এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া,
 নয়ন-অবগাহনি।
 লক্ষ তারের বিশ্ববীণা
 এই নীরবে হয়ে লীনা
 নিতেছে সুর কুড়িয়ে,
 সন্তলোকের আলোকধারা
 এই ছায়াতে হল হারা,
 গেল গো তাপ জুড়িয়ে।
 সকল রাজার রতন-সম্ভা
 লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
 বিনা-সাজের কী বেশে।
 আমার চির-জীবনেরে
 লও গো তুমি লও গো কেড়ে
 একটি নিবিড় নিমেষে।

শিলাইদহ
 ১৯ চৈত্র ১৩১৪

১০

কে গো তুমি বিদেশী।
 সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
 বাজালো সুর কী দেশী।
 নৃত্য তোমার দলে দলে,
 কুন্তলপাশ পড়ছে খলে,
 কাঁপছে ধরা চরণে,
 ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
 উত্তরী যে যাচ্ছে উড়ে
 ইন্দ্রধনুর বরনে।
 আজকে তো আর ঘুমায় না কেউ,
 জলের 'পরে লেগেছে ঢেউ,
 শাখায় জাগে পাখিতে।
 গোপন গৃহের মাঝখানে যে
 তোমার বাঁশি উঠছে বেজে
 ধৈর্য নারি রাখিতে।

মিশিয়ে দিলে উঁচু নিচু
 সুর ছুটেছে সবার পিছ,
 রম না কিছই গোপনে।

ডুবিয়ে দিয়ে সূর্যচন্দ্রে
 অন্ধকারের রম্বে রম্বে
 পশিছে সূর স্বপনে।
 নাটের লীলা হয় গো এ কি,
 পলক জাগে আজকে দেখি
 নিদ্রা-ঢাকা পাতালে।
 তোমার বাঁশি কেমন বাজে,
 নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
 বিদ্যুতেরে মাতালে।
 লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
 ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
 ফুটায়ে ভুইচাঁপারে।
 রুদ্ধঘরের ছিদ্রে ফাঁকে,
 শূন্য ভরে তোমার ডাকে,
 রইতে যে কেউ না পারে।

কত কালের আঁধার ছেড়ে
 বাহির হয়ে এল যে রে
 হৃদয়-গদহার নাগিনী,
 নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
 ডাকো তারে পায়ের কাছে
 বাজিয়ে তোমার রাগিণী।
 তোমার এই আনন্দ-নাচে
 আছে গো ঠাই তারো আছে,
 লও গো তারে ভুলায়ে;
 কালোতে তার পড়বে আলো,
 তারো শোভা লাগবে ভালো,
 নাচবে ফণা দুলিয়ে।
 মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
 মিলবে দখিন-সমীরণে,
 মিলবে আলোয় আকাশে।
 তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,
 বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
 রবে না আর ঢাকা সে।

শিলাইদহ
 ২০ চৈত্র ১৩১৪

“ওগো পথিক দিনের শেষে
 যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
 এ পথ গেছে কোন্‌খানে।”
 “কে জানে ভাই, কে জানে।

চন্দ্রসূৰ্য-গ্রহতারার
 আলোক দিয়ে প্রাচীর-ঘেরা
 আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
 চরাচরের হিয়ার কাছে
 তারি গোপন দুয়ার আছে
 সেইখানে ভাই, করব গমন নিশীথে।”

“ওগো পথিক, দিনের শেষে
 চলেছ যে এমন বেশে
 কে আছে বা সেইখানে।”
 “কে জানে ভাই, কে জানে।
 বৃকের কাছে প্রাণের সেতার
 গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,
 শুনেনিহিলাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে।
 অপূৰ্ব তার চোখের চাওয়া,
 অপূৰ্ব তার গায়ের হাওয়া,
 অপূৰ্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে।”

“ওগো পথিক, দিনের শেষে
 চলেছ যে এমন হেসে,
 কিসের বিলাস সেইখানে।”
 “কে জানে ভাই, কে জানে।
 জগৎ-জোড়া সেই সে ঘরে
 কেবল দুটি মানুষ ধরে
 আর সেখানে ঠাই নাহি তো কিছুদি:
 সেথা মেঘের কোণে কোণে
 কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
 একটি নাচে আনন্দময় বিজুদি।”

“ওগো পথিক, দিনের শেষে
 চলেছ যে, কেই বা এসে
 পথ দেখাবে সেইখানে।”
 “কে জানে গো, কে জানে।
 শুনেনিহি সেই একটি বাণী
 পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
 লেখা আছে সকল আকাশ-মাঝে গো:
 সে মন্ত্র এই প্রাণের পারে
 অনাহত বীণার তারে
 গভীর সুরে বাজে সকাল-সায়ের গো।”

১২

এই দুরারটি থোলা ।
 আমার খেলা খেলবে বলে
 আপনি হেথায় আস চলে
 ওগো আপন-ভোলা ।
 ফুলের মাল্য দোলে গলে,
 পলক লাগে চরণতলে
 কাঁচা নবীন ঘাসে ।
 এস আমার আপন ঘরে,
 বস আমার আসন-পরে
 লহ আমার পাশে ।
 এমনিরো লীলার বেশে
 যখন তুমি দাঁড়াও এসে
 দাও আমারে দোলা ।
 ওঠে হাসি, নয়নবারি,
 তোমায় তখন চিনতে নারি
 ওগো আপন-ভোলা ।

কত রাতে, কত প্রাতে,
 কত গভীর বরষাতে,
 কত বসন্তে,
 তোমায় আমার সকৌতুকে
 কেটেছে দিন দুঃখে সুখে
 কত আনন্দে ।
 আমার প্রশ্ন পাবে বলে
 আমার তুমি নিলে কোলে
 কেউ তো জানে না তা ।
 রইল আকাশ অবাক মানি,
 করল কেবল কানাকানি
 বনের লতাপাতা ।
 মোদের দৌহার সেই কাহিনী
 ধরেছে আজ কোন্‌ রাগিণী
 ফুলের সুগন্ধে ।
 সেই মিলনের চাওয়া-পাওয়া
 গেয়ে বেড়ায় দখিন হাওয়া
 কত বসন্তে ।

মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে
 যেন তোমায় ছল মনে
 ধরা পড়েছে ।

মন বলেছে, “তুমি কে গো,
 চেনা মানুষ চিনি নে গো,
 কী বেশ ধরেছ?”
 রোজ দেখেছি দিনের কাজে
 পথের মাঝে ঘরের মাঝে
 করছ যাওয়া-আসা;
 হঠাৎ কবে এক নিমেষে
 তোমার মূখের সামনে এসে
 পাইনে খুঁজে ভাষা।
 সেদিন দেখি পাখির গানে
 কী যে বলে কেউ না জানে—
 কী গুণ করেছে।
 চেনা মূখের ঘোমটা-আড়ে
 অচেনা সেই উর্শক মারে,
 ধরা পড়েছ।

শিলাইদহ
 ২২ মে ১৩১৮

১৩

এই যে এরা আঁঙিনাতে
 এসেছে জুড়ি।
 মাঠের গোরু গোষ্ঠে এনে
 পেয়েছে ছুড়ি।
 দোলে হাওয়া বেগুনের শাখে
 চিকন পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
 অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
 উঠেছে ফুড়ি।

ঘরের ছেলে ঘরের মেয়ে
 বসেছে মিলে।
 তারি মাঝে তোমার আসন
 তুমি যে নিলে।
 আপন চেনা লোকের মতো
 নাম দিয়েছে তোমায় কত,
 সে নাম ধরে ডাকে ওরা
 সন্ধ্যা নামিলে।

মানীর দ্বারে মান ওরা হাস
 পায় না তো কেহ।
 ওদের তরে রাজার ঘরে
 বন্ধ যে গেহ।

জীর্ণ আঁচল ধুলায় পাতে,
বসিয়ে তোমায় নৃত্যে মাতে,
কোন ভরসায় চরণ ধরে
মলিন ওই দেহ।

রাতের পাখি উঠছে ডাকি
নদীর কিনারে।
কৃষ্ণপঙ্কে চাঁদের রেখা
বনের ওপারে।

গাছে গাছে জোনাক জ্বলে,
পল্লীপথে লোক না চলে,
শূন্য মাঠে শৃগাল হাঁকে
গভীর আধারে।

জ্বলে নেভে কত সূর্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজার ভবনে।
তারি মাঝে আঁধার রাতে
পল্লীঘরের আঁঙিনাতে
দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার
উঠছে গগনে।

শিলাইদহ
২০ মে ১০১৮

১৪

অনেককালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেকে বেকে
পথের চিহ্ন এলুম একে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পৰ্বতে।

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সূর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে,

বাহির-ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।

“এই যে তুমি” এই কথাটি
বলব আমি বলে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চলে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
“আছ-আছ”র স্রোত বহে যায়
“কই তুমি কই” এই কাদনের
নয়ন-জলে গ’লে।

শিলাইদহ
২৪ মে ১৩১৮

১৫

আমি আশ্রয় করব বড়ো
এই তো তোমার মায়া—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙিন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে তারে নানা সূরে,
আপনারি বিরহ তোমার
আশ্রয় নিজ কায়া।

বিরহ-গান উঠল বেজে
বিশ্বগগনময়।
কত রঙের কান্নাহাসি
কতই আশা-ভয়।
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,
কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে
আপন পরাজয়।

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা—
এরি মাঝে আপনাকে যে
বাঁধা রেখে বসলে সেজে,
সোজা কিছুর রাখলে না, সব
মধুর বাক্যে বঁকা।

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া-আসার
কাটে সকল বেলা।

শিলাইদহ
২৬ মে ১০১৮

১৬

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা
মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল স'রে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি।

জল উঠেছে ছলছলিয়ে
ঢেউ উঠেছে দলে,
মর্ম্মরিয়ে ঝরে পাতা
বিজন তরুন্মূলে।
শূন্য মনে কোথায় তাকাস?
সকল বাতাস সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি।

শিলাইদহ
২৬ মে ১০১৮

১৭

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলাম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিন্না আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে চম্কে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে।

ওগো সেই স্ফুটন্তে ফিরায় উদাসিয়া
 আমার দেশে দেশান্তে
 যেন সম্মানে তার উঠে নিব্বাসিয়া
 ভুবন নবীন বসন্তে।
 কে জানিত দূরে তো নেই সে,
 আমারি গো আমারি সেই যে,
 এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
 আমার হৃদয়-উপবনে।

শিলাইদহ
 ২৬ মে ১৩১৮

১৮

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে
 মেলে না তোর আঁখি,
 কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
 জানিস নে তুই তা কি।
 ওরে অলস, জানিস নে তুই তা কি।
 জাগো এবার জাগো,
 বেলা কাটাস না গো।

কঠিন পথের শেষে
 কোথায় অগম বিজন দেশে
 ও সেই বন্ধ আমার একলা আছে গো
 দিস নে তারে ফাঁকি।
 চির জীবন দিস নে তারে ফাঁকি।
 জাগো এবার জাগো,
 বেলা কাটাস না গো।

প্রথর রবির তাপে
 না-হয় শূন্য গগন কাঁপে,
 না-হয় দম্ব বালু তন্তু অঁচলে
 দিক চারি দিক ঢাকি।
 পিপাসাতে দিক চারি দিক ঢাকি।

মনের মাঝে চাহি
 দেখে রে আনন্দ কি নাহি।
 পথে পায় পায় দূতের বাঁশরি
 বাজবে তোরে ডাকি।
 মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি।
 জাগো এবার জাগো,
 বেলা কাটাস না গো।

শিলাইদহ
 ২৭ মে ১৩১৮

১৯

ঝড়ে	যায় উড়ে যায় গো
আমার	মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা	থাকে না হয় গো
তারে	রাখতে নারি টানি।
আমার	রইল না লাজলজ্জা,
আমার	ঘুচল গো সাজসজ্জা,
তুমি	দেখলে আমারে
এমন	প্রলয়মাঝে আনি.
আমায়	এমন মরণ হানি।

হঠাৎ	আকাশ উজ্জলি
কারে	খুঁজে কে ওই চলে।
চমক	লাগায় বিজলি
আমার	আঁধার ঘরের তলে।
তবে	নিশীথ-গগন জুড়ে
আমার	যাক সকলি উড়ে.
এই	দারুণ কল্লোলে
বাজুক	আমার প্রাণের বাণী.
কোনো	বাঁধন নাহি মানি।

শিলাইদহ
২৪ চৈত্র ১৩১৮

২০

তুমি	একটু কেবল বসতে দিয়েো কাছে
আমায়	শুধু কণেক তরে।
আজি	হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে
আমি	সাপা করব পরে।
	না চাইলে তোমার মুখপানে
	হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে.
	কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি	কলহারা সাগরে।

বসন্ত আজ উজ্জ্বলসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুজুরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রান্তাগে।

আজকে শুধু একান্তে আসীন
 চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
 আজকে জীবন-সমর্পণের গান
 গাব নীরব অবসরে।

শিলাইদহ
 ২৯ চৈত্র ১৩১৮

২১

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
 সবাই জয়ধ্বনি কর্।
 ভোরের আকাশ রাঙা হল রে
 আমার পথ হল সুন্দর।
 কী নিয়ে যা যাব সেথা
 ওগো তোরা ভাবিস নে তা,
 শূন্য হাতেই চলব, বহিরে
 আমার ব্যাকুল অন্তর।

মালা পরে যাব মিলন-বেশে
 আমার পথিক-সজ্জা নয়।
 বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে
 মনে রাখি নে সেই ভয়।
 যাত্রা যখন হবে সারা
 উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
 পূরবীতে করুণ বাঁশরি
 দ্বারে বাজবে মধুর স্বর।

শিলাইদহ
 ৩০ চৈত্র ১৩১৮

২২

কে গো অন্তরতর সে।
 আমার চেতনা আমার বেদনা
 তারি সুগভীর পরশে।
 আঁখিতে আমার বদলায় মল্ল,
 বাজায় হৃদয়বাঁগার তল্ল,
 কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
 কত সুখে দুখে হরষে।

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে
 সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
 তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
 ছুঁবালে সে সুধাসরসে।

কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পয়ান ছুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে।

শান্তিনিকেতন
৬ বৈশাখ ১৩১৯

২৩

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরিয়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদীতীরে
বেড়ালে বাহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।

তোমারি ওই অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারাল সীমা বিপুল হরষে
উথলি উঠে বাণী।
আমার শব্দ একটি মৃষ্টি ভরি
দিতেছ দান দিবসবিভাবরী,
হল না সারা কত-না যুগ ধরি,
কেবলি আমি লব।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩১৯

২৪

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
দূরে রব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষণ তখন গলিবে নয়নজলে।

শতদল-দল খুলে যাবে ধরে ধরে
লুকানো রবে না মধু চিরদিনতরে।

আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না থাকি
পরম মরণ লভিব চরণতলে।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩১৯

২৫

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।
যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য ছুটে
সে পথতলে পড়িব লুটে।
সবার পানে রহিব শূন্য চাহি রে।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে।

তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে।
যে বাঁশখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু-পবনে।
তাকায় রব স্নানের পানে,
সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায় বীণা বেড়াব গান গাহি রে।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে।

শান্তিনিকেতন
৯ বৈশাখ ১৩১৯

২৬

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
ফিরারে দিন্দু স্নানের চাবি
রাখি না আর ঘরের দাবি,
সবার আজ প্রসাদবাণী চাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
 দিইছি ষত নিয়োছি তার বেশি।
 প্রভাত হলে এসেছে রাত্তি,
 নিবিয়া গেল কোণের ব্যতি,
 পড়েছে ডাক চলিছি আমি ভাই,
 সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

শান্তিনিকেতন
 ৯ বৈশাখ ১৩১৯

২৭

আজিকে এই সকালবেলাতে
 বসে আছি আমার প্রাণের
 সুরটি মেলাতে।
 আকাশে ওই অরুণরাগে
 মধুর তান করুণ লাগে,
 বাতাস মাতে আলোছায়ার
 মায়ার খেলাতে।

নীলিমা এই নিলীন হল
 আমার চেতনায়।
 সোনার আভা জড়িয়ে গেল
 মনের কামনায়।
 লোকান্তরের ওপার হতে
 কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
 ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ওই
 মেঘের ভেলাতে।

শান্তিনিকেতন
 ১৩ বৈশাখ ১৩১৯

২৮

প্রাণ ভরিয়া তুষা হরিয়া
 মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
 তব ভুবনে তব ভবনে
 মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।
 আরো আলো আরো আলো
 এই নয়নে, প্রভু, ঢালো।
 সুরে সুরে বাঁধি পদরে
 ভূমি আরো আরো আরো দাও তান।

আরো বেদনা আরো বেদনা
 দাও মোরে আরো চেতনা।
 দ্বার ছুটায় বাধা টুটায়
 মোরে করো দ্রাণ মোরে করো দ্রাণ।
 আরো প্রেমে আরো প্রেমে
 মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
 স্নানধারে আপনারে
 তুমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিত সমুদ্র
 ৩ জুন ১৯১২

২৯

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
 এ আমার ধরণীতে।
 সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
 কী আছে কী চায় নিতে।
 রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে জানি
 নিয়ে যায় বহি মেঘ-আবরণখানি,
 নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
 খচিত ললিত গীতে।

নব নব রূপে বরনে বরনে ভরি
 বকে লহ তুলি সেই মেঘ-উত্তরী।
 লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো,
 হে নিরঞ্জন, তাই বাস তারে ভালো,
 তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
 সকলুগ ছায়াটিতে।

The Heath
 [2] Holford Road
 Hampstead
 ২৩ জুন ১৯১২

৩০

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
 তারায় তারায় খচিত,
 স্বর্ণে রঙে শোভন শোভন জানি
 বর্ণে বর্ণে রচিত।

খজা তোমার আরো মনোহর লাগে
 বঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
 গরুড়ের পাখা রক্তরবির রাগে
 যেন গো অস্ত-আকাশে।
 জীবন-শেষের শেষ জাগরণসম
 বলসিছে মহাবেদনা—
 নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম
 তীর ভীষণ চেতনা।
 সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
 তারায় তারায় খচিত—
 খজা তোমার, হে দেব বল্পাণি,
 চরম শোভায় রচিত।

The Heath
 2 Holford Road
 Hampstead
 ২৫ জুন ১৯১২

৩১

“কে নিবি গো কিনে আমার, কে নিবি গো কিনে।”
 পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
 এমনি করে হাস, আমার
 দিন যে চলে যায়,
 মাথার 'পরে বোকা আমার বিষম হল দায়।
 কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
 মৃকুট-মাথে অস্ত-হাতে রাজা এল রথে।
 বললে হাতে ধরে, “তোমার
 কিনব আমি জোরে।”
 জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে।
 মৃকুট-মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে।

রুদ্ধ স্ফারের সমুখ দিলে ফিরতেছিলেম গলি।
 দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।
 বললে বিবেচনা, বললে,
 “কিনব দিলে সোনা।”
 উজাড় করে দিলে থলি করলে আনাগোনা।
 বোকা মাথায় নিলে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মৃকুলভরা গাছে ।
 সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে ।
 বললে কাছে এসে, “তোমার
 কিনব আমি হেসে।”
 হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে ।
 ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে ।

সাগরতীরে রোদ পড়েছে ঢেউ দিয়েছে জলে,
 কিনক নিয়ে খেলে শিশু বাজতটের তলে ।
 যেন আমায় চিনে বললে,
 “অমনি নেব কিনে।”
 বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেইদিনে ।
 খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে ।

508 High Street
 Urbana, Illinois, U.S.A.
 ২৫ পৌষ ১৩১১

তোমারি নাম বলব নানা ছলে ।
 বলব একা বসে, আপন
 মনের ছায়াতলে ।
 বলব বিনা ভাষায়,
 বলব বিনা আশায়,
 বলব মুখের হাসি দিয়ে,
 বলব চোখের জলে ।

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
 ডাকব তোমার নাম,
 সেই ডাকে মোর শূন্য শূন্যই
 পূরবে মনস্কাম ।
 শিশু যেমন মাকে
 নামের নেশায় ডাকে,
 বলতে পারে এই সুখেতেই
 মায়ের নাম সে বলে ।

16 More's Garden
 Cheyne Walk, London
 ৮ ভাদ্র ১৩২০

৩৩

অসীম ধন তো আছে তোমার
 তাহে সাধ না ঘেটে।
 নিতে চাও তা আমার হাতে
 কণায় কণায় বেঁটে।
 দিয়ে তোমার রতনমণি
 আমার করলে ধনী,
 এখন দ্বারে এসে ডাক,
 রয়েছি দ্বার এঁটে।

আমায় তুমি করবে দাতা
 আপনি ভিক্ষু হবে,
 বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
 হাসির কলরবে।
 তুমি রইবে না ওই রথে,
 নামবে ধূল্যাপথে,
 যুগযুগান্ত আমার সাথে
 চলবে হেঁটে হেঁটে।

৮ ভাদ্র ১৩২০

৩৪

এ মণিহার আমার নাই সাজে।
 পরতে গেলে লাগে, এরে
 ছিঁড়তে গেলে বাজে।
 কণ্ঠ যে রোধ করে,
 সুর তো নাই সরে,
 ওই দিকে যে মন পড়ে রয়
 মন লাগে না কাজে।

তাই তো বলে আছি,
 এ হার তোমায় পরাই যদি
 তবেই আমি বাঁচি।
 ফুলমালার ডোরে
 বরিয়া লও মোরে,
 তোমার কাছে দেখাই নে মদ্য
 মণিমালার লাজে।

Cheyne Walk

৮ ভাদ্র ১৩২০

৩৫

ভোরের বেলায় কখন এসে
 পরশ করে গেছ হেসে।
 আমার ঘুমের দয়ার ঠেলে
 কে সেই খবর দিল মেলৈ,
 জেগে দেখি আমার আঁখি
 আঁখির জলে গেছে ভেসে।

মনে হল আকাশ যেন
 কইল কথা কানে কানে।
 মনে হল সকল দেহ
 পূর্ণ হল গানে গানে।
 হৃদয় যেন শিশিরনত
 ফুটল পূজার ফুলের মতো,
 জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে
 ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে।

Cheyne Walk
 ৯ ভাদ্র [১৩২০]

৩৬

প্রাণে খুঁশির তুফান উঠেছে।
 ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।
 দুঃখকে আজ কঠিন বলে
 জড়িয়ে ধরতে বৃকের তলে
 উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।
 প্রাণে খুঁশির তুফান উঠেছে।

হেথায় কারো ঠাই হবে না,
 মনে ছিল এই ভাবনা,
 দয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
 ষতন করে আপনাকে যে
 রেখেছিলেন ধরে মেজে,
 আনন্দে সে ধুলার লুটেছে।
 প্রাণে খুঁশির তুফান উঠেছে।

Cheyne Walk
 ৯ ভাদ্র [১৩২০]

৩৭

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি জেহার ছিল শত শত।
বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দৃ-চারটে তার পাতা,
তবুও যে তার বাকি রইত কত।

আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় হল এবি
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত।

Far Oakridge, Glos.
১১ জুন [১৯২০]

৩৮

ভেলার মতো বৃকে টানি
কলমখানি
মন যে ভেসে চলে।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ায় দলে
কলে কলে
স্রোতের কলকলে।
ভবের স্রোতের কলকলে।

এবার কেড়ে লও এ ভেলা
ঘুচাও খেলা
জলের কোলাহলে।
অধীর জলের কোলাহলে।
এবার তুমি ডুবাও তারে
একেবারে
রসের রসাতলে।
গভীর রসের রসাতলে।

S. S. City of Lahore
মধ্যাহ্ন সাগর
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০

বাজাও আমারে বাজাও।

বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মৃদু-তাকানো হাসিতে—
সেই সুরে মোরে বাজাও।

সাজাও আমারে সাজাও।

যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও।

S. S. City of Lahore

মধ্যাহ্ন সাগর

১৪ সেপ্টেম্বর [১৯১৩]

জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে।

একদা কোন্ বেলাগেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।

পথের ধারে বাজবে বেগু,
নদীর কূলে চরবে খেন্দু,
আঙিনাতে খেলবে শিশু,
পাখিরা গান গাবে।

তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে।

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি।

যাবার আগে জানি যেন
আমার ডেকেছিল কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে
গ্যামল বসুমতী?

কেন নিশার নীরবতা
 শুনিয়েছিল তারার কথা,
 পরানে ঢেউ তুলেছিল
 কেন দিনের জ্যোতি?
 তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

সাপা যবে হবে
 ধরার পালা
 যেন আমার গানের শেষে
 থামতে পারি সম্মে এসে,
 ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
 ভরতে পারি ডালা।
 এই জীবনের আলোকেতে
 পারি তোমায় দেখে যেতে,
 পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
 আমার গলার মালা,
 সাপা যবে হবে ধরার পালা।

S. S. City of Lahore
 রোহিত সাগর
 ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১০

৪১

নয় এ মধুর খেলা,
 তোমায় আমার সারাজীবন
 সকাল-সন্ধ্যাবেলা
 নয় এ মধুর খেলা।
 কতবার যে নিবল বাতি
 গর্জে এসে ঝড়ের রাতি,
 সংসারের এই দোলায় দিলে
 সংশয়েরই ঠেলা।

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
 বন্যা ছুটেছে।
 দারুণ দিনে দিকে দিকে
 কামা উঠেছে।
 ওগো রদ্র, দঃখে সঃখে
 এই কথাটি বাজল বৃকে—
 তোমার প্রেমে আঘাত আছে
 নাইকো অবহেলা।

রোহিত সাগর
 ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১০

৪২

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
 কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
 এমন গানে গানে।
 কেন তারার মালা গাঁথা,
 কেন ফুলের শয়ন পাতা,
 কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
 জানায় কানে কানে।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
 কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
 চায় এ মধুর পানে।
 তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
 আমার হৃদয় পাগল-হেন,
 তরী সেই সাগরে ভাসায়, বাহার
 কল সে নাহি জানে।

শান্তিনিকেতন
 ২৪ আশ্বিন ১৩২০

৪৩

তারি নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
 মধু কেন মন-মধুরে খাওয়াও না।
 নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
 তোমার ভূতেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না।

সে যে বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
 তোমার মধুরে মধুর তুলে চায় উন্মনে,
 আমার চিস্ত-কমলটিরে সেই রসে
 কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।

তোমার আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে,
 বিরামহারা নদীরা ধায় সিংহুতে,
 তেমনি করে সুখাসাগর-সংখ্যানে
 আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না।

তুমি পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
 ফুলের বন্ধে ভারি দাও সুগন্ধ;
 তেমনি করে আমার হৃদয়ভিত্তরে
 কেন সবারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না।

শান্তিনিকেতন
 ২৯ আশ্বিন [১৩২০]

৪৪

আমার মনের কথা তোমার
 নাম দিয়ে দাও ধরে,
 আমার নীরবতার তোমার
 নামটি রাখো ধরে।
 রক্তধারার ছন্দে আমার
 দেহবীণার তার
 বাজাক আনন্দে তোমার
 নামেরি স্বংকার।
 ঘরের 'পরে জেগে থাকুক
 নামের তারা তব,
 জাগরণের ভালে আঁকুক
 অরুণলোখা নব।
 সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার
 নামটি জ্বলুক লিখা।
 সকল ভালোবাসার তোমার
 নামটি রহুক লিখা।
 সকল কাজের শেষে তোমার
 নামটি উঠুক ফলে,
 রাখব কেঁদে হেসে তোমার
 নামটি বদকে কোলে।
 জীবনপন্থে সংগোপনে
 রবে নামের মধু,
 তোমায় দিব মরণক্ষণে
 তোমারি নাম বধু।

গীতিমালা
 ২ কার্তিক ১৩২০

৪৫

আমার	যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু	পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন	এই কথাটি বাজে মনের সুরে তুমি আমার কাছে এসেছ।
কভু	মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু	নিষ্ঠুর বাজে প্রিয়মুখের বাণী,
ডবু	নিত্য যেন এই কথাটি জানি তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ।
ওগো	কভু স্নেহের কভু দূরের দোলে
মোর	জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,

যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে
 তুমি আমার ভালোবেসেছ।
 যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহম্বারে,
 যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে
 যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
 এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

শান্তিনিকেতন
 ১ কার্তিক [১৩২০]

৪৬

কেবল থাকিস স'রে স'রে
 পাস নে কিছই হৃদয় ভ'রে।
 আনন্দভান্ডারের থেকে
 দূত যে তোরে গেল ডেকে,
 কোণে বসে দিস নে সাড়া
 সব খোয়ালি এমনি করে।

জীবনকে আজ তোল্ জাগিয়ে,
 মাঝে সবার আশ আগিয়ে।
 চলিস নে পথ মেপে মেপে,
 আপনাকে দে নিখিল ব্যোপে,
 যেটুকু দিন থাকি আছে—
 কাটাস নে তা ঘূমের ঘোরে।

শান্তিনিকেতন
 ৫ কার্তিক [১৩২০]

৪৭

লুকিয়ে আস আশার রাতে
 তুমিই আমার বন্ধ,
 লও যে টেনে কঠিন হাতে
 তুমি আমার আনন্দ।

দুঃখরথের তুমিই রথী
 তুমিই আমার বন্ধ,
 তুমি সংকট তুমিই ক্ষতি
 তুমি আমার আনন্দ।

শব্দ আমারে কর গো জয়
তুমিই আমার বন্ধ,
রুদ্ধ তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ।

বজ্র এস হে বন্ধ চিরে
তুমিই আমার বন্ধ,
মৃত্যু লও হে বান্দন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ।

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০

৪৮

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে।
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে।

যখন মোহ আমার ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে।
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারি
তখন পরান আমার কোন্ কোণে যে
লজ্জাতে মদ্য ঢাকে।

শান্তিনিকেতন
১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]

৪৯

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া
আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল করে
সুগন্ধ ধন লুটবে।

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব
 দেবার মতো ধন।
 যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
 প্রাণের আরাধন।
 আমার বন্ধু যখন রাগিশেষে
 পরশ তারে করবে এসে,
 ফুরিয়ে গিয়ে দলগদলি সব
 চরণে তার লুটবে।

১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]

৫০

গাব তোমার সুরে
 দাও সে বীণায়ন্ত।
 শুনব তোমার বাণী
 দাও সে অমর মন্ত্র॥
 করব তোমার সেবা
 দাও সে পরম শক্তি,
 চাইব তোমার মৃত্যু
 দাও সে অচল ভক্তি॥
 সইব তোমার আঘাত
 দাও সে বিপুল ধৈর্য।
 বইব তোমার খুজা
 দাও সে অটল স্থৈর্য॥
 নেব সকল বিশ্ব
 দাও সে প্রবল প্রাণ,
 করব আমার নিঃশ্ব
 দাও সে প্রেমের দান॥
 যাব তোমার সাথে
 দাও সে দখিন হস্ত,
 লড়ব তোমার রণে
 দাও সে তোমার অস্ত্র॥
 জাগব তোমার সত্য
 দাও সেই আহ্বান।
 ছাড়ব স্নেহের দাস্য
 দাও দাও কল্যাণ॥

৫১

প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে
আখার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধরা।

তখন নতুন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে।

তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠবে আসি
চিস্তাগগনপারে।

তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি
ওগো কবি
আমায় পড়বে আঁকা—

তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা
ওই মহিমা
আর যাবে না ঢাকা।

তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন-পরে।

তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে।

শান্তিনিকেতন
১৪ পৌষ ১৩২০

৫২

তোমায় আমার মিলন হবে বলে
আলোর আকাশ ডরা।

তোমায় আমার মিলন হবে বলে
ফুল শ্যামল ধরা।

তোমায় আমার মিলন হবে বলে
রাতি জাগে জাগে লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুরার খোলে
কলকণ্ঠস্বর।

চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদি স্রোত বেয়ে ।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি
বরণডালি ছেয়ে ।
তোমায় আমার মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধুর বেশে চলে
চিরস্বয়ংবরা ।

১৫ পৌষ ১৩২০

৫৩

জীবন-স্রোতে ঢেউয়ের 'পরে
কোন আলো ওই বেড়ায় দূলে ।
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই
বসে বসে বিজন কূলে ।
ভাসে তবু যায় না ভেসে,
হাসে আমার কাছে এসে,
দু-হাত বাড়াই ঝাঁপ দিতে চাই
মনে করি আনব তুলে ।

শান্ত হ রে শান্ত হ মন,
ধরতে গেলে দেয় না ধরা—
নয় সে ঘনি নয় সে ঘানিক
নয় সে কুসুম ঝরে-পড়া ।
দূরে কাছে আগে পাছে,
মিলিয়ে আছে ছেয়ে আছে,
জীবন হতে ছানিয়ে তারে
তুলতে গেলে মরাবি তুলে ।

শান্তিনিকেতন
১৫ পৌষ ১৩২০

৫৪

কতদিন যে ভূমি আমার
ডেকেছ নাম ধরে—
কত জাগরণের বেলার
কত ঘুমের ঘোরে ।

পদকে প্রাণ ছেঁয়ে সেদিন
উঠেছি গান গেয়ে,
দুটি অঁখি বেয়ে আমার
পড়েছে জল ঝরে।

দূর যে সেদিন আপন হতে
এসেছে মোর কাছে।
খুঁজি যারে, সেদিন এসে
সেই আমারে বাচে।
পাশ দিয়ে যাই চলে, যারে
যাই নে কথা বলে
সেদিন তারে হঠাৎ যেন
দেখেছি চোখ ভরে।

শান্তিনিকেতন
২৯ মার্চ ১০২০

৫৫

বসন্তে আজ ধরার চিত্র
হল উত্তলা।
বৃকের 'পরে দোলে রে তার
পরান-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উত্তলা।

আমার দুটি মৃদু নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজ আমার হৃদয়-দোলার
কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা-অতলা।

শান্তিনিকেতন
মাঘী পূর্ণিমা। ২৮ মার্চ ১০২০

৫৬

সভায় তোমায় থাকি সবার হাসনে।
 আমার কণ্ঠে সেখায় সুর কেঁপে যায় হাসনে।
 তাকায় সকল লোকে
 তখন দেখতে না পাই চোখে
 কোথায় অভয় হাসি হাস আপন আসনে।

কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
 তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
 যা শোনাবার আছে
 গাথ ওই চরণের কাছে,
 দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না শোনে।

শিলাইদহ
 ১২ ফাল্গুন ১৩২০

৫৭

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
 তোমায় জানাতাম।
 কে যে আমার কঁদায়, আমি
 কী জানি তার নাম।
 কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে,
 ফিরি আমি কাহার পিছে,
 সব যেন মোর বিকিন্নেছে
 পাই নি তাহার দাম।

এই বেদনার ধন সে কোথায়
 ভাবি জনম ধরে।
 ভুবন ভরে আছে যেন
 পাই নে জীবন ভরে।
 স্নেহ যারে কম সকল জনে
 বাজাই তারে কণে কণে,
 গভীর সুরে 'চাই নে, চাই নে'
 বাজে অবিলম্বে।

শিলাইদহ
 ১২ ফাল্গুন [১৩২০]

৫৮

বেসুর বাজে রে
 আর কোথা নয় কেবল তোরি
 আপন-মাঝে রে।
 মেলে না সুর এই প্রভাতে
 আনন্দিত আলোর সাথে,
 সবারে সে আড়াল করে,
 মরি লাজে রে।

ধামা রে ঝংকার।
 নীরব হয়ে দেখ্ রে চেয়ে
 দেখ্ রে চারি ধার।
 তোরি হৃদয় ফুটে আছে
 মধুর হয়ে ফুলের গাছে,
 নদীর ধারা ছুটেছে ওই
 তোরি কাজে রে।

শিলাইদহ
 ১৪ ফাল্গুন ১৩২০

৫৯

তুমি জান ওগো অন্তর্যামী,
 পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
 ভাবনা আমার বাঁধল নাকো বাসা,
 কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা,
 তবু আমার মনে আছে আশা
 তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামী।

টেনেছিল কতই কামাহাসি,
 বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি।
 শূন্য সবাই হতভাগ্য বলে,
 "মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে।"
 জানি জানি নামবে তোমার কোলে
 আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি।

শিলাইদহ
 ১৪ ফাল্গুন ১৩২০

৬০

সকল দাবি ছাড়বি যখন
 পাওয়া সহজ হবে।
 এই কথাটা মনকে বোঝাই,
 বুঝবে অবোধ কবে?
 নালিশ নিয়ে বেড়াস মেতে
 পাস নি যা তার হিসাব পেতে,
 শুনিস নে তাই ভান্ডারেতে
 ডাক পড়ে তোর যবে।

দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যার
 অশ্রু মূছে মূছে,
 চোখের জলে দেখতে না পাস
 দুঃখ গেছে ঘূচে।
 সব আছে তোর ভরসা যে নেই,
 দেখ্ চেয়ে দেখ্ এই যে সে এই,
 মাথা তুলে হাত বাড়ালেই
 অর্মানি পারি তবে।

শিলাইদহ
 ১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬১

রাজপুরীতে বাজার বারি
 বেলাশেষের তান।
 পথে চলি, শূন্য পথিক,
 “কী নিলি তোর দান।”
 দেখাব যে সবার কাছে
 এমন আমার কী বা আছে।
 সঙ্গে আমার আছে শূন্য
 এই ক’খানি গান।

ঘরে আমার রাখতে যে হয়
 বহুলোকের মন।
 অনেক বারি অনেক কান্না
 অনেক আরোজন।
 ব’ধুর কাছে আসার বেলায়
 গানটি শূন্য নিলেম গলায়,
 তারি গলার মালা ক’রে
 করব মজাবান।

শিলাইদহ
 ১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬২

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে
 ঘাব কাহার দ্বার।
 পথ আমারে পথ দেখাবে,
 এই জেনেছি সার।
 শূন্যে যাই যার কাছে,
 কথার কি তার অন্ত আছে।
 যতই শূন্য চক্ষে ততই
 লাগায় অন্ধকার।

পথের ধারে ছায়াতরু
 নাই তো তাদের কথা,
 শূন্য তাদের ফুল-ফোটানো
 মধুর ব্যাকুলতা।
 দিনের আলো হলে সারা
 অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
 শূন্য প্রদীপ তুলে ধরে,
 কর না কিছুর আর।

শিলাইদহ
 সন্ধ্যা। কলিকাতার যাত্রার পূর্বে
 ১৫ ফাল্গুন ১৩২০

৬৩

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
 পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।
 তারি গলার মালা হতে
 পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন।
 এল যখন সাড়াটি নাই,
 গেল চলে জানালো তাই,
 এমন করে আমারে হার
 কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন।

তখন তরুণ ছিল অরুণ-আলো,
 পথটি ছিল কুসুমকীরণ।
 বসন্ত যে রঙিন বেলে
 ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।

সেদিন খবর মিলল না যে,
রইন্দু বসে ঘরের মাঝে,
আজকে পথে বাহির হব
বহি আমার জীবন জীর্ণ।

কুষ্টিয়ার মধ্যে। পার্ক পথে
১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬৪

আমার ব্যথা যখন আনে আমার
তোমার স্মারে,
তখন আপনি এসে স্মার খুলে দাও
ডাক তারে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে,
চলেছে তাই সকল তোজে,
কাঁটার পথে ধার সে তোমার
অভিসারে;
আপনি এসে স্মার খুলে দাও
ডাক তারে।

আমার ব্যথা যখন বাজার আমার
বাজি সুরে
সেই গানের টানে পার না আর
রইতে দূরে।
লুটটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখি সম,
বাহির হয়ে এস তুমি
অন্ধকারে;
আপনি এসে স্মার খুলে দাও
ডাক তারে।

কলিকাতা
১৬ ফাল্গুন ১৩২০

৬৫

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাল্গুন দিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাল্গুন দিনের সকালে।

গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে
লুকিয়ে তুমি ওই গানের আড়ালে,
আজ ফাগুন দিনের সকালে।

শান্তিনিকেতন
১৮ ফাল্গুন ১৩২০

৬৬

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন ক'রে
ফেল আমার মূখের 'পরে
আপনি থাক আলোর পিছনে।

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে—
সব আলো তার কেমন ক'রে
পড়ে তোমার মূখের 'পরে
আপনি পড়ি আলোর পিছনে।

শান্তিনিকেতন
২০ ফাল্গুন ১৩২০

৬৭

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে।

অন্ধকারে রইন্দ পড়ে
স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি।

সকালবেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছি তুমি এ কি
ঘরভরা মোর শূন্যতারই
বুকের 'পরে।

শান্তিনিকেতন
২০ ফাল্গুন ১৩২০

৬৮

প্রাণের	ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারি	সুঁচিটি আমার মূখের 'পরে বুকের 'পরে।
পূর্বের	আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের	অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,
নিশিদিন	এই জীবনের সুখের 'পরে দুখের 'পরে
প্রাণের	ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে।

যে শাখায়	ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ওই	বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু	জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারী
তাহারি	স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুখের ধারা।
নিশিদিন	এই জীবনের তুষার 'পরে দুখের 'পরে
প্রাণের	ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে।

শান্তিনিকেতন
২৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬৯

তোমার কাছে শান্তি চাষ না।
থাক্-না আমার দুঃখ ভাবনা।
অশান্তির এই দোলার 'পরে
বোসো বোসো লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা।

নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে—
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে,
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা।

শান্তিনিকেতন
২৬ ফাল্গুন ১৩২০

৭০

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
 গানের ওপারে।
 আমার সদরগর্দলি পায় চরণ, আমি
 পাই নে তোমারে।
 বাতাস বহে মরি মরি
 আর বেঁধে রেখে না তরী,
 এসো এসো পার হয়ে মোর
 হৃদয়-মাঝারে।

তোমার সাথে গানের খেলা
 দূরের খেলা যে,
 বেদনাতে বঁশি বাজায়
 সকল বেলা যে।
 কবে নিরে আমার বঁশি
 বাজাবে গো আপনি আসি,
 আনন্দময় নীরব রাতের
 নিবিড় আঁধারে।

শান্তিনিকেতন
 ২৮ ফাল্গুন ১৩২০

৭১

আমার ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়।
 আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার
 প্রেমের তো নাই ক্ষয়।
 দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘর,
 সে দূর শুধু আমারি দূর—
 তোমার কাছে দূর কতু দূর নয়।

আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,
 তোমার বসন্তবার নাই কি গো তাই বলে।
 এই খেলাতে আমার সনে
 হার মান যে ক্ষণে ক্ষণে,
 হারের মাঝে আছে তোমার জয়।

শান্তিনিকেতন
 ২৯ ফাল্গুন [১৩২০]

৭২

জানি নাই গো সাধন তোমার
 বলে করে।
 আমি ধূলার বসে খেলোছি এই
 তোমার স্মারে।
 অবোধ আমি ছিলাম বলে
 যেমন খুঁশি এলোম চলে
 ভয় করি নি তোমার আমি
 অন্ধকারে।

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
 তিরস্কারে,
 “পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে
 ফিরে যা রে।”
 ফেরার পন্থা বন্ধ করে
 আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
 ওরা আমার মিথ্যা ডাকে
 বারে বারে।

শান্তিনিকেতন
 ১ মে ১৯২০

৭৩

ওদের কথার খাঁদা লাগে
 তোমার কথা আমি বৃদ্ধি।
 তোমার আকাশ তোমার বাতাস
 এই তো সবি সোজাসুঁজি।
 হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
 জীবন আমার ভরে ওঠে,
 দূরার খুলে চেয়ে দেখি
 হাতের কাছে সকল পুঁজি।

সকাল-সাঁজে সুর যে বাজে
 ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
 আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
 তরী আসে আমার ঘাটে।
 শুনব কী আর বুঝব কী বা,
 এই তো দেখি রাত্রিদিবা
 ঘরেই তোমার আনাগোনা,
 পথে কি আর তোমার খুঁজি।

শান্তিনিকেতন
 ২ মে ১৯২০

৭৪

এই আসা-যাওয়ার খেলার কালে
আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এপারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাণি শুনে
যে সদর আনে সঙ্গে করে
তাই যে আমার দিবানিশি
সকল পয়ান লয় রে কাড়ি।

কার কথা যে জানায় তারা
জানি নে তা।
হেথা হতে কী নিয়ে বা
যায় রে সেথা।
সূরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি
তাই শুনে যে উদাস হিয়া
চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি।

শান্তিনিকেতন
৩ জুন ১০২০

৭৫

জীবন আমার চলছে যেমন
তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন স্বন্দেহ হৃন্দে
চলে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হবে সবার সাথে
তাদের আমি চাব, তারা
আমায় চাবে।

জীবন আমার পলে পলে
এমনি ভাবে
দুঃখসুখের রঙে রঙে
রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে
খেলে যেজন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সেও
আমায় চাবে।

শান্তিনিকেতন
৫ জুন ১০২০

৭৬

হাওয়া লাগে গানের পালে,
 মাঝি আমার বসো হালে।
 এবার ছাড়া পেলে বাঁচে,
 জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
 এই বাতাসের তালে তালে।
 মাঝি, এবার বসো হালে।

দিন গিয়েছে এস রাত্তি,
 নাই কেহ মোর ঘাটের সাথী।
 কাটো বাঁধন দাও গো ছাড়ি,
 তারার আলোর দেব পাড়ি,
 সদূর জেগেছে ধাবার কালে।
 মাঝি, এবার বসো হালে।

শান্তিনিকেতন
 ৬ জুলাই ১৩২০

৭৭

আমারে দিই তোমার হাতে
 নতুন করে নতুন প্রাতে।
 দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
 তেমনি করেই ফুটে ওঠে
 জীবন তোমার আঙিনাতে
 নতুন করে নতুন প্রাতে।

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
 মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
 আলো-অন্ধকারের তীরে,
 হারানো পাই ফিরে ফিরে,
 দেখা আমার তোমার সাথে
 নতুন করে নতুন প্রাতে।

শান্তিনিকেতন
 ৭ জুলাই ১৩২০

৭৮

আরো চাই যে, আরো চাই গো—
 আরো যে চাই।
 ভান্ডারী যে সুখা আমার
 বিতরে নাই।

সকালবেলার আলোর ভরা
এই যে আকাশ-বসুন্ধরা
এরে আমার জীবন-স্বার্থে
কুড়ানো চাই—
সকল ধন যে বাইরে আমার
ভিতরে নাই।
ভাণ্ডারী যে সুখ আমার
বিতরে নাই।

প্রাণের বীণায় আরো আঘাত
আরো যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।
দিন-রজনীর বাঁশি পূরে
যে গান বাজে অসীম সুরে,
তারে আমার প্রাণের তারে
বাজানো চাই।
আপন গান যে দূরে তাহার
নিয়ড়ে নাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।

শান্তিনিকেতন
৮ চৈত্র ১৩২০

৭৯

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমার ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমার চাওয়া
সেও আমার পাওয়া,
তাই তো পরান পরানপণে
হাত বাড়িয়ে মাগে।

হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে।
লাগলে সেবার অশক্তি তোর
আপনি হবে মিছে।
পথ দেখাবার তরে
যাব কাহার ঘরে,
যেমনি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে।

৯ চৈত্র [১৩২০]

৮০

তুমি যে নিশিদিন আমি চোখ তোমার ওই এ আকাশ	চেয়ে আছ অনিমেঘে এই আলোকে চেয়ে-দেখা দিন গুনিছে	আকাশ ভরে দেখছ মোরে। মেলব হবে সফল হবে, তারি তরে।
ফাগুনের আমার এই সেদিনে তোমার এই আমার এই	কুসুম-ফোটা একটি কুঁড়ি ধন্য হবে লোকে লোকে আধারটুকু	হবে ফাঁকি, রইলে থাকি। তারার মালা, প্রদীপ জ্বালা ঘুচলে পরে।

১৩ জুন [১৩২০]

৮১

তোমার পূজার বুঝতে নারি ফুলের মালা পিছন হতে স্তবের বাণীর তোমার পূজার	ছলে তোমায় কখন তুমি দীপের আলো পাই নে সুযোগ আড়াল টানি ছলে তোমায়	ভুলেই থাকি। দাও যে ফাঁকি। ধূপের ধোঁয়ার চরণ ছোঁয়ার, তোমায় ঢাকি। ভুলেই থাকি।
দেখব বলে আছে তো মোর কাজ কী আমার পাতব আসন সরল প্রাণে তোমার পূজার	এই আরোজন ভূষা-কাতর মন্দিরেতে আপন মনের নীলব হয়ে ছলে তোমায়	মিথ্যা রাখি, আপন আঁখি। আনাগোনার, একটি কোনায়; তোমায় ঢাকি। ভুলেই থাকি।

শান্তিনিকেতন
১৪ জুন ১৩২০

৮২

হে অন্তরের ধন,
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন।
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী,
কোথায় যে বাহিরে আমি
যদি সকল ক্ষণ।

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ডুবন।
তোমার বাঁশি মানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হল বসন্তের এই
দখিন সমীরণ।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

৮৩

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ডুবনে।
নাহিলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে,
গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে।
দিয়ে দুঃখ-সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে।

শান্তিনিকেতন
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

৮৪

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানায়ই সঙ্গ সঙ্গ
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ওই চরণেতে
আপনাকে যে দেব, তবু
ঝড়বে দেনা।

আমারে যে নামতে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ডুবনের
প্রাণের হাটে।

ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চলবে বেড়ে দিনে রাতে,
আপনা নিয়ে করব যতই
বেচা-কেনা।

শান্তিনিকেতন
১৭ মে ১৩২০

৮৫

বল তো এই বারের মতো
প্রভু, তোমার আঁঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত।
কিছু বা ফল গেছে ঝরে,
কিছু বা ফল আছে ধরে,
বছর হয়ে এল গত।
রোদের দিনে ছায়ায় বসে
বাজায় বাঁশি রাখাল যত।

হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ওই যে মেতে ওঠে নদী।
পার করে নিই ভরা তরী,
মাঠের যা কাজ সারা করি
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা
পায়ে তোমার করি নত।

২২ মে [১৩২০]

৮৬

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাব না গো যাব না যে,
থাকব পড়ে ঘরের মাঝে,
এই নিরালস্য রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে।

আমার এ ঘর বহু যতন করে
ধুতে হবে মৃদুতে হবে মোরে।

আমারে যে জাগতে হবে,
কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমার পড়ে তাহার মনে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে।

২২ চৈত্র [১৩২০]

৮৭

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার খেন্দু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেগু।
পাষণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু।

কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইশারা তুণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখির মুখে এই যে খবর পেনু।

২৩ চৈত্র [১৩২০]

৮৮

সকাল-সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে।
আমি কেবল বসে আছি,
আপন মনে কাঁটা বাছি
পথের মাঝে,
সকাল-সাঁজে।

এ পথ বেয়ে
সে আসে তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে,
কতই ধূলা লাগে গায়ে,
মরি লাজে,
সকাল-সাঁজে।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

ভূমি যে সূর্যের আগুন লাগিয়ে দিলে
 মোর প্রাণে,
 এ আগুন ছড়িয়ে গেল
 সব খানে।
 যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
 নাচে আগুন তালে তালে,
 আকাশে হাত তোলে সে
 কার পানে।

আঁধারের তারা যত অবাক হয়ে
 রয় চেয়ে,
 কোথাকার পাগল হাওয়া
 বয় ধেরে।
 নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
 উঠল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
 আগুনের কী গুণ আছে
 কে জানে।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

আমায় বাঁধবে যদি কালের ডোরে,
 কেন পাগল কর এমন করে।
 বাতাস আনে কেন জানি
 কোন্‌ গগনের গোপন বাণী,
 পরানখানি দেয় যে ভরে।
 পাগল করে এমন করে।

সোনার আলো কেমনে হে
 রঙে নাচে সকল দেহে।
 করে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
 আমার খোলা বাতায়নে,
 সকল হৃদয় লয় যে হ'রে।
 পাগল করে এমন করে।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

৯১

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
 শূন্যকনো ধূলো যত ।
 কে জানিত আসবে তুমি গো
 অনাহুতের মতো ।

তুমি পার হয়ে এসেছ মরু,
 নাই যে সেখায় ছায়াভরু,
 পথের দূঃখ দিলেম তোমায়
 এমন ভাগ্যহত ।

তখন আলসেতে বসে ছিলাম আমি
 আপন ঘরের ছায়ে,
 জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা
 বাজবে পারে পারে ।

তবু ওই বেদনা আমার বৃকে
 বেজেছিল গোপন দূখে,
 দাগ দিয়েছে ঘর্ষে আমার
 গভীর হৃদয়-কত ।

শান্তিনিকেতন
 ১৪ মে [১৩২০]

৯২

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
 দেখতে আমি পাই নি ।
 বাহিরপানে চোখ মেলেছি
 হৃদয়পানেই চাই নি ।
 আমার সকল ভালোবাসায়
 সকল আঘাত সকল আশায়
 তুমি ছিলে আমার কাছে,
 তোমার কাছে যাই নি ।

তুমি মোর আনন্দ হয়ে
 ছিলে আমার খেলায় ।
 আনন্দে তাই ভুলে ছিলাম,
 কেটেছে দিন হেলায় ।

গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দঃখ-সুখের গানে
সুদূর দিয়েছ তুমি, আমি
তোমার গান তো গাই নি।

কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে
২৫ চৈত্র [১৩২০]

৯৩

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিন্দু যে
বাঁশিতে সে গান শুজে।
প্রেমেরে বিদায় করে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পুজে।
বনে তোর লাগাস আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম-পরে মরিস শুঝে।

ওরে তোর নির্বিষে দিয়ে ঘরের বাতি
কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি।
যে আলো শত ধারায় অঁখি-তারায় পড়ে ঝরে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন শুজে।

কলিকাতা
২৬ চৈত্র [১৩২০]

৯৪

কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার
মন না মানে।
পাই নে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে,
পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন্ দিকের পানে,
গানে গানে।

দাও না ছুটি, ধর দুটি, নিই নে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম-ফোটোর বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে।

কলিকাতা
২৭ চৈত্র [১৩২০]

৯৫

সেদিনে আপদ আমার বাবে কেটে
 পদকে হৃদয় বোদিন পড়বে ফেটে।
 তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
 আপনি বাহির হবে বন্ধ হে,
 তারে আমার বলে ছলে বলে
 কে বলো আর রাখবে এটে।

আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে
 রাহিদিবা।
 আমি কি জানি নে তার অর্থ কী বা।
 তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
 অমৃতরূপ আছে বসে গো,
 তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
 তবে আমার দুঃখ মেটে।

কলিকাতা
 চৈত্র [১৩২০]

৯৬

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের
 কুসুমখানি,
 তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের
 আলোক হানি।
 সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা হাওয়ার দূলে,
 রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বন্ধে তুলে;
 ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
 ফুটেবে বাণী।

আমার বীণাখানি পড়ছে আজি
 সবার চোখে।
 হেরো তারগর্দল তার দেখছে গুনে
 সকল লোকে।
 ওগো কখন সে যে সভা তেজে আড়াল হবে,
 শব্দে সদরটুকু তার উঠবে বেজে করুণ রবে;
 যখন তুমি তারে বন্ধের 'পরে
 লবে টানি।

প্ৰিন্টিংহাউস
 বৈশাখ ১৩২১

তোমার মাঝে আমারে পথ
 ভুলিয়ে দাও গো, ভুলিয়ে দাও।
 বাঁধা পথের বাঁধন হতে
 টলিয়ে দাও গো, দুলিয়ে দাও।
 পথের শেষে মিলবে বাসা
 সে কভু নয় আমার আশা,
 যা পাব তা পথেই পাব
 দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও।

কেউ বা ওরা ঘরে বসে
 ডাকে মোরে পুথির পাতায়।
 কেউ বা ওরা অন্ধকারে
 মন্ত্র পড়ে মনকে মাতায়।
 ডাক শুনেছি সকলখানে
 সে কথা যে কেউ না মানে:
 সাহস আমার বাড়িয়ে দিয়ে
 পরশ তোমার বুলিয়ে দাও।

শান্তিনিকেতন
 ২ বৈশাখ ১৩২১

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
 এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
 বন্ধের অঁচলখানি ধুলায় পেতে
 অঁচনাতে মেলো গো।
 পথে সেচন কোরো গন্ধবারি
 মলিন না হয় চরণ তারি,
 তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে
 এল এল এল গো।
 আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার
 ছাড়িয়ে ফেলো ফেলো গো।

তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো।
 বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
 ঘরের দুয়ার খোলো গো।

হেরো রাঙা হল সকল গগন,
চিস্ত হল পদক-মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল ঘ্বারে
এল এল এল গো।
তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো
ওই আলোতে জেদলো গো।

শান্তিনিকেতন
১০২১

৯৯

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
তারে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন।
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
কত শব্দতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ।
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য।
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে সঞ্জিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমালা।
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

শান্তিনিকেতন
১০২১

১০০

তুমি আমার আঁঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
ওরা আমার হৃদয়পানে মদ্য তুলে যে থাকে।

ওয়া তোমার মৃদুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে।
 ওগো ওই তোমারি ফুল।
 তোমার কাছে কী যে আমি সেই কথাটি হেসে
 ওয়া আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে ছড়ায় দেশে দেশে।
 ওগো ওই তোমারি ফুল।
 দিন কেটে যায় অন্যমনে, ওদের মৃদুখে তবু
 প্রভু তোমার মৃদুখের সোহাগবাণী ক্লান্ত না হয় কভু।
 ওগো ওই তোমারি ফুল।
 প্রাতের পরে প্রাতে ওরা রাতের পরে রাতে
 তোমার অন্তর্বিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।
 ওগো ওই তোমারি ফুল।
 হাসিমুখে আমার যতন নীরব হয়ে যাচে।
 তোমার অনেক যুগের পথ-চাওয়াটি ওদের মৃদুখে আছে।
 ওগো ওই তোমারি ফুল।

শান্তিনিকেতন
 ৬ বৈশাখ ১৩২১

১০১

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি।
 আমার যত বিস্ত প্রভু আমার যত বাণী।
 আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা,
 আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
 সব দিতে হবে।

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপটে
 গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
 এখন সে যে আমার বাঁধা, হতেছে তার বাঁধা,
 বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
 সব দিতে হবে।

তোমারি আনন্দ আমার দৃষ্টিতে সুরে ভরে
 আমার করে নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে।
 আমার বলে যা পেয়েছি শূন্যকণে যবে
 তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে।
 সব দিতে হবে।

শান্তিনিকেতন
 ৭ বৈশাখ ১৩২১

১০২

এই লভিন্দু সঙ্গ তব
সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ-গগনে পবন হল
সৌরভেতে মগ্নর,
সুন্দর, হে সুন্দর।

এই তোমারি পরশরাগে
চিস্তা হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুখা
রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।

রামগড়। হিমালয়
৩১ বৈশাখ [১৩২১]

১০৩

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সুখ-ভারা দলে দলে;
কোথায় বসে বাজাও বেগু
চরাও মহা-গগনতলে।
তুণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোর-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে।

সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আধার হলে সাজের সূরে
ফিরিয়ে আন আপন গোটে।

আশা তুয়া আমার যত
ঘরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সম্মা হলে।

রামগড়
১০ জ্যৈষ্ঠ [১০২১]

১০৪

চরণ ধরিতে দিয়ে গো আমারে,
নিয়ো না নিয়ো না সরাসরে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্থলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে ভূমি গেষ্টে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকালে বিকালে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে।

রামগড়
৩ জ্যৈষ্ঠ ১০২১

১০৫

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা।
কোন সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা।
চিনি নাই তো আমি তারে,
আঘাত করি বারে বারে,
তার বাণীরে হাহাকারে
ডুবায় আমার কাদনা।

তারি পুজার মালপে ফুল ফুটে যে।
 দিনে রাতে চুরি করে
 এনেছি তাই লুটে যে।
 তারি সাথে মিলব আসি,
 এক সুরেতে বাজবে বাঁশি,
 তখন তোমার দেখব হাসি,
 ভরবে আমার চেতনা।

রামগড়
 ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৬

এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।
 হাসিতে আকাশ ভরিলে।
 পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
 ঝুঁলি ভরি রাখে যাহা-কিছু পায়,
 কতবার তুমি পথে এসে হয়
 ভিক্ষার ধন হরিলে।

ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে,
 কাঙাল মরণে জীবনে।
 ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে
 দিনশেষে এল তোমার আলয়ে,
 আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
 নিজ মালা দিয়ে বরিলে।

রামগড়
 ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৭

সন্ধ্যা হল গো—
 ওমা, সন্ধ্যা হল বদকে ধরো।
 অতল কালো স্নেহের মাঝে
 ডুবিয়ে আমার স্নিগ্ধ করো।
 ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো,
 সব যে কোথায় হারিয়েছে গো,
 হড়ানো এই জীবন, তোমার
 অধারমাঝে ছোক-না জড়ো।

আর আমারে বাইরে তোমার
 কোথাও যেন না যায় দেখা।
 তোমার রাতে মিলাক আমার
 জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।
 আমার ঘিরি আমার চুমি
 কেবল তুমি, কেবল তুমি।
 আমার বলে যা আছে মা,
 তোমার করে সকল হরো।

রামগড়
 রাঢ়
 ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৮

আকাশে	দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে।
সে সুধা	গুড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা	ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী	ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা	সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখিরা	পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা	কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা	দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ওই	দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই	অশ্রুধারায় পড়ল গলে।
সে যে ওই	বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল	মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ওই	ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায়	দেশে দেশে কালে কালে।

রামগড়
 ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৯

আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের
 ডাইনে বাঁয়ে
 পূজার ছায়ে।
 ওরা মিশায় ওদের নীরব কান্দি
 আমার গানে,
 আমার প্রাণে।

ওরা নেয় তুলে মোর কণ্ঠ ওদের
সকল গায়ে
পূজার ছায়ে।

হেথায় সাড়া পেল বাহির হল
প্রভাত-রবি
অমল-ছবি।
সে যে আলোটি তার মিলিয়ে দিল
আমার মাথে
প্রণাম-সাথে।
সে যে আমার চোখে দেখে নিল
আমার মায়ে
পূজার ছায়ে।

রামগড়
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১১০

আমার প্রাণের মাঝে যেমন ক'রে
নাচে তোমার প্রাণ
আমার প্রেমে তেমনি তোমার প্রেমের
বহুক-না তুফান।
রসের বরিষনে
তারে মিলাও সবার সনে,
অঞ্জলি মোর ছাপিয়ে দিয়ে
হোক সে তোমার দান।

আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হয়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মদুস্ত করো তাকে।
যেমন তোমার তারা,
তোমার ফুলটি যেমন ধারা,
তেমনি তারে তোমার করো
যেমন তোমার গান।

রামগড়
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
 তোমায় করি গো নমস্কার।
 মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
 তোমায় করি গো নমস্কার।
 এই নল্ল নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
 তোমায় করি গো নমস্কার।
 এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
 তোমায় করি গো নমস্কার।
 এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঙল আসনে
 তোমায় করি গো নমস্কার।
 এই স্তম্ভ তারার মৌন-মন্ত্র-ভাষণে
 তোমায় করি গো নমস্কার।
 এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
 তোমায় করি গো নমস্কার।
 এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
 তোমায় করি গো নমস্কার।

কলিকাতা
 ৩ আষাঢ় ১৩২১

গীতানি

আশীর্বাদ

এই আমি একমনে সর্পিপল্লব তঁারে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
যখন আমারি ব'লে ভাবি তোমাদের
মিথ্যা দিয়ে জাল ব'নি ভাবনা-ফাঁদের।

সার্থি চালাই যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শূন্য কার কোথা পথ।
আমি ভাবি আমি ব'ঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিন্দু ফেলে,
তঁার আলো তোমাদের নিক ব'হু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

দুঃখের বরষায়
চক্কের জল যেই
নামল
বক্কের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থামল।

মিষ্টানের পাঠটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায়;
অপির্ন হাতে তাঁর
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন-বর্ণিত
অন্তরে সঞ্চিত
কী আশা,
চক্কের নিমেষেই
মিটল সে পরশের
তিরাম্বা।

এতদিনে জানলেম
যে কাদন কাদলেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য।

শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩২১

ভূমি আড়াল পেলে কেমনে
এই মৃদু আলোর গগনে?

কেমন করে শূন্য সেজে
ঢাকা দিলে আপনাকে যে,

সেই খেলাটি উঠল বেজে
বেদনে—
আমার প্রাণের বেদনে।

আমি এই বেদনার আলোকে
তোমায় দেখব দ্যুলোক-ভুলোকে।

সকল গগন বসুন্ধরা
বসুন্ধতে মোর আছে ভরা,
সেই কথাটি দেবে ধরা
জীবনে—
আমার গভীর জীবনে।

শান্তিনিকেতন
৪ ভাদ্র ১৩২১

৩

বাধা দিলে বাধবে লড়াই,
মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই,
মরতে হবে।
লুঠ-করা ধন করে জুড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো,
এক নিমেষে পথের ধুলার
পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
নড়তে হবে।

নীচে বসে আছিস কে রে,
কাঁদিস কেন।
লজ্জাডোরে আপনাকে রে
বাঁধিস কেন।
ধনী যে তুই দুঃখধনে
সেই কথাটি রাখিস মনে,
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমায়
গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
লড়তে হবে।

শান্তিনিকেতন
৪ ভাদ্র ১৩২১

৪

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি,
 সেথায় চরণ পড়ে,
 তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
 তাই তো আমার সকল পন্নান
 কাঁপছে ব্যথার ভরে গো
 কাঁপছে ধরধরে।
 ব্যথাপথের পথিক তুমি,
 চরণ চলে ব্যথা চুমি,
 কাদিন দিয়ে সাধন আমার
 চিরদিনের তরে গো
 চিরজীবন ধরে।

নয়নজলের বন্যা দেখে
 ভয় করি নে আর,
 আমি ভয় করি নে আর।
 মরণ-টানে টেনে আমায়
 করিয়ে দেবে পার,
 আমি তরব পারাবার।
 ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
 বইছে আজি তোমার পানে,
 ডুবিয়ে তরী কাঁপিয়ে পড়ি
 ঠেকব চরণ-পরে,
 আমি বাঁচব চরণ ধরে।

কলিকাতা
 ৬ ডাঃ ১০২১

৫

আলো যে
 যায় রে দেখা—
 হৃদয়ের পদ-গগনে
 সোনার রেখা।
 এবারে ঘুচল কি ভয়।
 এবারে হবে কি জয়।
 আকাশে হল কি ক্ষয়
 কালির লেখা।

কারে ওই
 যায় গো দেখা,
 হৃদয়ের সাগরতীরে
 দাঁড়ায় একা?

ওরে তুই সকল ভুলে
 চেয়ে থাক্ নয়ন ভুলে—
 নীরবে চরণ-মূলে
 মাথা ঠেকা ।

কলিকাতা
 ৬ চাদ্র ১৩২১

৬

ও নিষ্ঠুর আরো কি বাণ
 তোমার তুণে আছে ।
 তুমি মর্মে আমায়
 মারবে হিয়ার কাছে ।
 আমি পালিয়ে থাকি, মর্দি অঁখি,
 অঁচল দিয়ে মৃখ যে ঢাকি,
 কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে ।

মারকে তোমার
 ভয় করেছি বলে
 তাই তো এমন
 হৃদয় ওঠে জ্বলে
 যেদিন সে ভয় ঘুচে যাবে
 সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে
 মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে ।

ললিতানন্দন
 ৭ চাদ্র ১৩২১

৭

সদখে আমায় রাখবে কেন,
 রাখো তোমার কোলে ;
 থাক-না গো সদখ জ্বলে ।
 থাক-না পায়ের তলার মাটি
 তুমি তখন ধরবে অঁটি,
 ভুলে নিরে দুলাবে ওই
 বাহু-দোলার দোলে ।

যেখানে ঘর বাঁধব আমি
 আসে আসুক বান—
 তুমি যদি ভাসাও মোরে
 চাই নে পরিচাল ।

হার মেনেছি, মিটেছে ভয়,
তোমার জয় তো আমারি জয়,
ধরা দেশ, তোমায় আমি
ধরষ যে তাই হলে।

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩২১

৮

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিষ্ঠুর।
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান-মাঝে এমন কঠিন সূর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর।

সুন্দর
বৃন্দাবন
৮ ভাদ্র ১৩২১

৯

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মূখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।

তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।
বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমার ছাড়লে না যে,
যখন আমার সব বিকাল
তখন আমায় নিলে কিনে।

সুন্দর
৮ ভাদ্র ১৩২১

১০

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে।
 কে রে এমন জাগায় তোকে।
 চেয়ে আছি আপন মনে
 ওই যে দূরে গগন-কোণে,
 রাতি মেলে রাঙা নয়ন
 রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে।

রক্ত-শতদলের সার্জ
 সার্জিয়ে কেন রাখিস সার্জ।
 কোন্ সাহসে একেবারে
 শিকল খুলে দিলি দ্বারে,
 জোড়-হাতে তুই ডাকিস কারে?
 প্রলয় যে তোর ঘরে ঢেকে।

সুন্দর
 ৯ ভাদ্র [১৩২১]

১১

আমি যে আর সইতে পারি নে।
 সূরে বাজে মনের মাঝে গো
 কথা দিয়ে কইতে পারি নে।
 হৃদয়-লতা নূয়ে পড়ে
 ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
 আমি সে আর বইতে পারি নে।

আজ আমার নির্বিড় অন্তরে
 কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
 পলক-লাগা আকুল মর্মরে।
 কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
 মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
 ঘরে যে আর বইতে পারি নে।

সুন্দর
 ৯ ভাদ্র [১৩২১]

১২

পথ চেয়ে যে কেটে গেল
 কত দিনে রাতে।
 আজ ধুলার আসন ধন্য করে
 বসবে কি মোর সাথে।

রচবে তোমার মৃৎখের ছায়া
 চোখের জলে মধুর মায়া,
 নীরব হয়ে তোমার পানে
 চাইব গো জোড়-হাতে ।

এরা সবাই কী বলে যে
 লাগে না মন আর,
 আমার হৃদয় ভেঙে দিল
 কী মাধুরীর ভার ।
 বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
 রাখবে না কি আড়াল করে,
 তোমার আঁখি চাইবে না কি
 আমার বেদনাতে ।

সুন্দর
 ৯ ভাদ্র ১৩২১

১৩

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
 মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে ।
 সূর্য হারায়, হারায় তারা,
 আঁধারে পথ হয় যে হারা,
 ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে ।

সকল আকাশ, সকল ধরা,
 বর্ষাণেরই বাণী-ভরা ।
 ঝরঝর ধারায় মাতি
 বাজে আমার আঁধার রাত।
 বাজে আমার শিরে শিরে ।

সুন্দর
 ১০ ভাদ্র [১৩২১]

১৪

আমার সকল রসের ধারা
 তোমাতে আজ হোক-না হারা ।
 জীবন জুড়ে লাগুক পরল,
 ভুবন বোপে জাগুক হরষ,
 তোমার রূপে মরুক ভূবে
 আমার দুটি আঁখিতারা ।

হারিয়ে-মাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার।
ছাড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে
গাথা তোমার করে সারা।

সুন্দর
১০ ভাদ্র [১৩২১]

১৫

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণমাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়
পড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয়মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তার চোখের চাওয়া
ছাড়িয়ে দিল নীল গগনে।

সুন্দর
১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৬

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ওই চরণ-মূলে :
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে।

কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
 পাকা ধানের তরাস লাগে
 শিউরে ওঠে ডরা খেতে।
 জ্বানি গো আজ হাহারবে
 তোমার পূজা সারা হবে
 নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে।
 মোহন রূপে কে রয় ভূলে।

সুন্দর
 ১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৭

যখন তুমি বাঁধাছিলে তার
 সে যে বিষম ব্যাধা;
 আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
 সকল দুঃখের কথা।
 এতদিন যা সংগোপনে
 ছিল তোমার মনে মনে
 আজকে আমার তারে তারে
 শূনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব কোরো না গো
 ওই যে নেবে বাতি।
 দুরারে মোর নিশীথিনী
 ররেছে কান পাতি।
 বাঁধলে যে সুদ তারায় তারায়
 অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
 সেই সুদে মোর বাজাও প্রাণে
 তোমার ব্যাকুলতা।

সুন্দর
 ১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৮

আগুনের
 পরশমণি
 ছোঁয়াও প্রাণে।
 এ জীবন
 পূণ্য করো
 দহন-দানে।
 আমার এই
 দেহখানি
 ভুলে ধরো,

তোমার ওই
 দেবালয়ের
 প্রদীপ করো,
 নিশিদিন
 আলোক-শিখা
 জ্বলন্ত গানে।
 আগুনের
 পরশমণি
 ছোঁয়াও প্রাণে।

আঁধারের
 গায়ে গায়ে
 পরশ তব
 সারা রাত
 ফোঁটাক তারা
 নব নব।
 নয়নের
 দৃষ্টি হতে
 ঘুচবে কালো,
 যেখানে
 পড়বে সেথায়
 দেখবে আলো,
 ব্যথা মোর
 উঠবে জ্বলে
 উর্ধ্ব-পানে।
 আগুনের
 পরশমণি
 ছোঁয়াও প্রাণে।

সুন্দর
 ১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৯

হৃদয় আমার প্রকাশ হল
 অনন্ত আকাশে।
 বেদন-বাঁশি উঠল বেজে
 বাতাসে বাতাসে।
 এই যে আলোর আকুলতা
 আমারি এ আপন কথা,
 উদাস হয়ে প্রাণে আমার
 আবার ফিরে আসে।

বাইরে ভুমি নানা বেশে
 ফের নানান ছলে;
 জানি নে তো আমার মালা
 দিয়েছি কার গলে।
 আজ কী দেখি পরানমাঝে
 তোমার গলার সব মালা যে,
 সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
 গভীর সর্বনাশে।
 সেই কথা আজ প্রকাশ হল
 অনন্ত আকাশে।

সুন্দর
 ১৩ ভাদ্র [১৩২১]

২০

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
 আর-এক হাতে হার।
 ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার!
 আসে নি ও ভিক্ষা নিতে,
 লড়াই করে নেবে জিতে
 পরানটি তোমার।
 ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

মরণেরই পথ দিয়ে ওই
 আসছে জীবনমাঝে,
 ও যে আসছে বীরের সাজে।
 আধেক নিয়ে ফিরবে না রে,
 যা আছে সব একেবারে
 করবে অধিকার।
 ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

সুন্দর
 ১৪ ভাদ্র [১৩২১]

২১

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
 ডাক দিয়ে সে যায়।
 আমার ঘরে থাকাই দায়।
 পথের হাওয়ান কী সুর বাজে,
 বাজে আমার বৃকের মাঝে,
 বাজে বেদনায়।
 আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
 ছুটে এল বান,
 আমার লাগল প্রাণে টান।
 আপন মনে মেলে আঁখি
 আর কেন বা পড়ে থাকি
 কিসের ভাবনার।
 আমার ঘরে থাকাই দায়।

সুন্দর
 ১৫ ভাদ্র [১৩২১]

২২

এই যে কালো মাটির বাসা
 শ্যামল সুখের ধরা—
 এইখানেতে আঁধার আলোয়
 স্বপনমাঝে চরা।
 এরই গোপন হৃদয়-পরে
 বাথার স্বর্গ বিরাজ করে
 দূঃখে-আলো-করা।

বিরহী তোর সেইখানে যে
 একলা বসে থাকে—
 হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
 নামটি তোমার ডাকে।
 দূঃখে যখন মিলন হবে
 আনন্দলোক মিলবে তবে
 সুধায় সুধায় ভরা।

সুন্দর
 সম্মুখ
 ১৬ ভাদ্র [১৩২১]

২৩

যে থাকে থাক-না পারে,
 যে থাকি যা-না পারে।
 যদি ওই ভোরের পাখি
 তোরি নাম যায় রে ডাকি,
 একা তুই চলে যা রে।

কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে
 শিশিরের রসে মাতে।
 ফোটা ফুল চায় না নিশা,
 প্রাণে তার আলোর তৃষা,
 কাঁদে সে অন্ধকারে।

সুন্দর
 সকাল
 ১৭ ভাদ্র [১৩২১]

২৪

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
 টুকরো করে কাঁছি
 ডুবতে রাজি আছি
 আমি ডুবতে রাজি আছি।
 সকাল আমার গেল মিছে,
 বিকেল যে যায় তারি পিছে:
 রেখো না আর, বেঁধো না আর
 কালের কাছাকাছি।

মাঝির লাগি আছি জাগি
 সকল রাতিবেলা,
 ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে
 করে কেবল খেলা।
 ঝড়কে আমি করব মিত্তে,
 ডরব না তার প্রকুটিতে:
 দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
 তুফান পেলে বাঁচি।

শান্তিনিকেতন
 বিকাল
 ১৭ ভাদ্র [১৩২১]

২৫

শুধু তোমার বাণী নয় গো
 হে বন্ধু, হে প্রিয়,
 মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
 পরশখানি দিও।
 সারা পথের ক্রান্তি আমার
 সারা দিনের তৃষা
 কেমন করে মোটাব যে
 খুঁজে না পাই দিশা।

এ আঁধার যে পূর্ণ তোমার
সেই কথা বলিযো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিযো।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা-কিছু সপ্তয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে
ধরব তারে, ভরব তারে,
রাখব তারে সাথে—
একলা পথের চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিযো।

শান্তিনিকেতন
১৮ ভাদ্র [১৩২১]

২৬

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছাড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির-ধোয়া কুন্তলে,
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অণ্ডলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

মানিক-গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরনের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গিতে,
শিউলি-বনের বৃক যে ওঠে আন্দোলি।

সরদুল
১৯ ভাদ্র [১৩২১]

২৭

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোমার মনের মানুষ এল প্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম—
ও তোমার ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।

মাটির 'পরে আঁচল পাতি'
 একলা কাটে নিশীথ রাত্তি,
 তার বাঁশি বাজে অধারমাঝে
 দেখি না যে চক্রে তারে।

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
 খুঁজে তারে পায় কি আঁখি।
 এখন পথে ফিরে পারি কি রে
 ঘরের বাহির করলি যারে।

সরুদল
 ২১ ভাদ্র [১৩২১]

২৮

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
 মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
 মোর দঃখ যে রাঙা শতদল
 আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
 মোর আনন্দ সে যে মণিহার
 মৃকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ভ্যাগে যে তোমার হবে জয়।
 মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
 মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ
 সে যে লজ্জাবে বন-পর্বত,
 মোর বীর্য তোমার জয়রথ
 তোমারি পতাকা শিরে বয়।

সরুদল
 ২২ ভাদ্র [১৩২১]

২৯

এবার আমায় ডাকলে দূরে
 সাগরপারের গোপন পূরে।
 বোঝা আমার নামিয়েছি যে,
 সঙ্গে আমায় নাও গো নিজের,
 স্তম্ভ রাতের স্নিগ্ধ সূধা
 পান করাবে তৃষ্ণাতুরে।

আমার সন্ধ্যাফুলের মধু
এবার যে ভোগ করবে বঁধু।
তারার আলোর প্রদীপখানি
প্রাণে আমার জ্বালবে আনি,
আমার যত কথা ছিল
ভেসে যাবে তোমার সুরে।

সরুল
২৩ ভাদ্র [১৩২১]

৩০

নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী।
কেবলি কি ঢেউ আছে তোর--
হায় রে লাজে মরি।
ঝড়ের কালো মেঘের পানে
তাকিয়ে আছি আকুল প্রাণে,
দেখিস নে কি কান্ডারী তোর
হাসে যে হাল ধরি।

নিশার স্বপ্ন তোর
সেই কি এতই সত্য হল,
ঘুচল না তার ঘোর?
প্রভাত আসে তোমার পানে
আলোর রথে, আশার গানে:
সে খবর কি দেয় নি কানে
অধার বিভাবরী:

শান্তিনিকেতন
২৪ ভাদ্র [১৩২১]

৩১

নাই বা ডাক, রইব তোমার দ্বারে:
মুখ ফিরায়ে ফিরব না এইবারে।
বসব তোমার পথের ধূলার পরে
এড়িয়ে আমার চলবে কেমন করে।
তোমার তরে যে জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুড়িয়ে দেব তারে।

রইব তোমার ফসল-খেতের কাছে
 যেথায় তোমার পারের চিহ্ন আছে।
 জেগে রব গভীর উপবাসে
 অথবা তোমার আপনি যেথায় আসে।
 যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বাল
 বসে রব সেথায় অন্ধকারে।

সুদূর হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
 গোরুর গাড়িতে
 ২৬ ভাদ্র [১৩২১]

৩২

না বাঁচাবে আমার যদি
 মারবে কেন তবে।
 কিসের তরে এই আয়োজন
 এমন কলরবে।
 অগ্নিবাণে তুণ যে ভরা,
 চরণভরে কাঁপে ধরা,
 জীবনদাতা মেতেছে যে
 মরণ-মহোৎসবে।

বন্ধ আমার এমন করে
 বিদীর্ণ যে কর
 উৎস যদি না বাহিরায়
 হবে কেমনতরো?
 এই যে আমার ব্যথার খনি
 জোগাবে ওই মুকুটমণি—
 মরণ-দুখে জাগাব মোর
 জীবন-বল্লভে।

সুদূর হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
 ২৬ ভাদ্র [১৩২১]

৩৩

যেতে যেতে একলা পথে
 নিবেছে মোর বাতি।
 ঝড় এসেছে, ওরে, এবার
 ঝড়কে পেয়েম সাথী।
 আকাশ-কোণে সর্বনেশে
 কলে কলে উঠছে হেসে,
 প্রলয় আমার কেশে বেশে
 কলছে মাতামাতি।

যে পথ দিয়ে যেতেছিলাম
 ভুলিয়ে দিল তারে,
 আবার কোথা চলতে হবে
 গভীর অন্ধকারে।
 বৃষ্টি বা এই বজ্ররবে
 নতুন পথের বার্তা কবে,
 কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
 প্রভাত হবে রাত্রি।

সুন্দর
 অপরাহ্ন
 ২৬ ভাদ্র [১৩২১]

মালা-হতে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল
 মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও।
 ওই মাধুরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল
 হোথায় আমায় ডুবতে দাও গো মরতে দাও।
 দাও গো মূছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
 নিভতে আজ বন্ধ তোমার আপন হাতের টিকা
 ললাটে মোর পরতে দাও গো পরতে দাও।

বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
 শূকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
 পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে
 দাও গো তাদের সরতে দাও গো সরতে দাও।
 তোমার মহাভান্ডারেতে আছে অনেক ধন,
 কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে, ভরে না তায় মন,
 অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও।

সুন্দর
 ২৭ ভাদ্র [১৩২১]

কোন্ বারতা পাঠালে মোর পরানে
 আজি তোমার অরুণ-আলোয় কে জানে।
 বাণী তোমার ধরে না মোর গগনে,
 পাতায় পাতায় কাঁপে হৃদয়-কাননে,
 বাণী তোমার ফোটে লতাবিতানে।

তোমার বাণী বাতাসে সদূর লাগালো,
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগালো।
তরী আমার আজ প্রভাতের আলোকে
এই বাতাসে পাল তুলে দিক পদকে,
তোমার পানে যাক সে ভেসে উজানে।

সুন্দর
২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৬

ষেতে ষেতে চায় না ষেতে
ফিরে ফিরে চায়,
সবাই মিলে পথে চলা
হল আমার দায়।
দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া হাজার ডাকে;
বাঁধন এদের সাধন-ধন,
ছিঁড়তে যে ভয় পায়।

আবেশভরে ধূলায় পড়ে
কতই করে ছল,
যখন বেলা যাবে চলে
ফেলবে আঁখিজল।
নাই ভরসা, নাই যে সাহস,
চিস্তা অবশ, চরণ অলস,
লতার মতো জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়।

শান্তিনিকেতন
২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৭

সেই তো আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।

এমনি করে মোর জীবনে
 অসীম ব্যাকুলতা,
 নিত্য নতুন সাধনাতে
 নিত্য নতুন বাধা।
 পেলোই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
 আবার আমি দৃ হাত মেলি;
 নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে
 নিত্য নেওয়া তাই।

শান্তিনিকেতন
 ২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৮

শেষ নাই যে
 শেষ কথা কে বলবে।
 আঘাত হয়ে দেখা দিল,
 আগুন হয়ে জ্বলবে।
 সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
 শব্দ হবে বৃষ্টি ঢালা,
 বরফ জমা সারা হলে
 নদী হয়ে গলবে।

ফুরায় যা, তা
 ফুরায় শব্দ চোখে,
 অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
 যায় চলে আলোকে।
 পুরাতনের হৃদয় টুটে
 আপনি নতুন উঠবে ফুটে,
 জীবনে ফুল ফোটা হলে
 মরণে ফল ফলবে।

সুন্দর
 অপরাহ্ন
 ২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৯

না রে তোদের ফিরতে দেব না রে—
 মরণ যেথায় লুকিয়ে বেড়ায়
 সেই আরামের দ্বারে।
 চলতে হবে সামনে সোজা,
 ফেলতে হবে মিথ্যা বোঝা,
 টলতে আমি দেব না যে
 আপন বাধা-ভারে।

না রে তোদের রইতে দেব না রে—
 দিবানিশি ধূলাখেলায়
 খেলাঘরের দ্বারে।
 চলতে হবে আশার গানে
 প্রভাত-আলোর উদয়-পানে;
 নিমেষতরে পারি নেকো
 বসতে পথের ধারে।

না রে তোদের থামতে দেব না রে—
 কানাকানি করতে কেবল
 কোণের ঘরের দ্বারে।
 ওই যে নীরব বহুবর্ণী
 আগুন বদকে দিচ্ছে হানি,
 সইতে হবে বইতে হবে
 মানতে হবে তারে।

সুন্দর
 অপরাহ্ন
 ২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৪০

মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস নে।
 তোর ফাটল-ধরা ভাঙা ঘরে
 ধূলার 'পরে পড়ে থাকিস নে।
 ওরে অবশ, ওরে খ্যাপা,
 মাটির 'পরে ফেলবি রে পা,
 তারে নিয়ে গায়ে মাখিস নে।

ওই প্রদীপ আর জ্বালিয়ে রাখিস নে—
 রাত্রি যে তোর ভোর হয়েছে
 স্বপন নিয়ে পড়ে থাকিস নে।
 উঠল এবার প্রভাত-রাবি,
 খোলা পথে বাহির হবি,
 মিথ্যা ধূলায় আকাশ ঢাকিস নে।

সুন্দর
 ২৯ ভাদ্র [১৩২১]

৪১

এতটুকু আধার যদি
 লুকিয়ে রাখিস বদকের 'পরে
 আকাশ-ভরা সূর্য-তারা
 মিথ্যা হবে তোদের তরে।

শিশির-ধোয়া এই বাতাসে
হাত বুলাল ঘাসে ঘাসে,
ক্যর্থ হবে কেবল যে সে
তোদের ছোটো কোণের ঘরে।

মুগ্ধ ওরে, ম্বস্নঘোরে
যদি প্রাণের আসনকোণে
ধূলায়-গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস আপন মনে—
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে,
বাইরে সে যে দাঁড়িয়ে রবে
কত-না যুগ-যুগান্তরে।

সুন্দর
৩০ ভাদ্র [১৩২১]

৪২

কাঁচা ধানের খেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো
তেমনি করে আমার প্রাণে
নিবিড় শোভা মেলেছ গো।
যেমন করে কালো মেঘে
তোমার আভা গেছে লেগে,
তেমনি করে হৃদয়ে মোর
চরণ তোমার ফেলেছ গো।

বসন্তে এই বনের বারে
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা
তেমনি করে অন্তরে মোর
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা।
দিয়ে তোমার রক্ত আলো
বহ্নি-আগুন যেমন জ্বাল
তেমনি তোমার আপন তাপে
প্রাণে আগুন জেদেলেছ গো।

সুন্দর
৩১ ভাদ্র [১৩২১]

৪০

দুঃখ যদি না পাবে তো
 দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।
 বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
 দহন করে মারতে হবে।
 জ্বলতে দে তোর আগুনটারে,
 ভয় কিছু না করিস তারে,
 ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
 জ্বলবে না আর কছু তবে।

এড়িয়ে তাঁরে পাল্লাস না রে
 ধরা দিতে হোস না কাতর।
 দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল
 দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।
 মরতে মরতে মরণটারে
 শেষ করে দে একেবারে,
 তার পরে সেই জীবন এসে
 আপন আসন আপনি লবে।

শান্তিনিকেতন
 ১ আশ্বিন [১৩২১]

৪৪

না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন—
 সেখানে যে মধুর বেলা
 ফাদ পেতে রস সুখের বাধন।
 ভেবেছিলাম দিনের শেষে
 তন্ত পথের প্রান্তে এসে
 সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে
 সারা দিনের সকল কাদন।

না রে না রে হবে না তোর হবে না তা—
 সন্ধ্যাতারার হাসির নীচে
 হবে না তোর শয়ন পাতা।
 পথিক বন্ধ পাগল করে
 পথে বাহির করবে তোরে,
 হৃদয় যে তোর ফেটে গিয়ে
 ফুটেবে তবে তাঁর আরাধন।

শান্তিনিকেতন
 ১ আশ্বিন [১৩২১]

৪৫

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে।
এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায়
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

তোমার ফুলে যে রঙ ঘূমের মতো লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল।
যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পূজকে
সংগীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে।

সুন্দর
সম্ভাষ

১ আশ্বিন [১০২১]

৪৬

না গো এই যে ধূলা, আমার না এ।
তোমার ধূলার ধরার পরে
উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে।
দিরে মাটি আগুন জ্বালি
রচলে দেহ পূজার থালি,
শেষ আর্তি সারা করে
ভেঙে যাব তোমার পায়ে।

ফুল যা ছিল পূজার তরে,
যেতে পথে ডালি হতে
অনেক যে তার গেছে পড়ে।
কত প্রদীপ এই থালাতে
সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত যে তার নিবল হাওয়ায়—
পৌছিল না চরণ-ছায়ে।

সুন্দর
প্রভাত

২ আশ্বিন [১০২১]

৪৭

এই কথাটা ধরে রাখিস
মুন্নি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।

অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ার
চেউ যে তোরে খেতেই হবে।

পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে
দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে
মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভয়ে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে।

সুন্দর
অপরূহ
২ আশ্বিন । ১৩২১ ।

৪৮

লক্ষ্মী বখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি রে ঠাই।
দেখ্ রে চেয়ে আপন-পানে
পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।
ফিরছে কেন্দ্রে প্রভাত-বাতাস,
আলোক যে তোর স্নান হতাস,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে
শুধায় আজি নীরবে তাই।

কত গোপন আশা নিয়ে
কোন্ সে গহন রাগিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে
অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।
হল না তার কুঁটে ওঠা,
কখন ভেঙে পড়ল ঘোঁটা,
মর্ত্য-কাছে স্বর্গ বা চার
সেই মাধুরী কোথা রে পাই।

সুন্দর
অপরূহ
২ আশ্বিন । ১৩২১ ।

ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে
 আপনি জ্বাল'
 এই তো আলো—
 এই তো আলো।
 এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ,
 এই তো পূজার পদ্পবিকাস,
 এই তো বিমল, এই তো মধুর,
 এই তো ভালো—
 এই তো আলো—
 এই তো আলো।

আঁধার মেঘের বন্ধে জেগে
 আপনি জ্বাল'
 এই তো আলো—
 এই তো আলো।
 এই তো ঝঞ্জা তড়িৎ-জ্বালা,
 এই তো দূধের অগ্নিমালা,
 এই তো মৃষ্টি, এই তো দীপ্তি,
 এই তো ভালো—
 এই তো আলো—
 এই তো আলো।

সুন্দর হইতে আশ্বিনিক্তনের পথে
 ৭ আশ্বিন [১০২১]

মোর হৃদয়ের গোপন বিজ্ঞান ঘরে
 একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে---
 প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
 রুদ্ধ স্বারের বাহিরে দাঁড়িয়ে আমি
 আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
 প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
 আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
 প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
 জীবনে আমার সংগীত দাও আনি,
 নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
 প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়পাশ সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

সুন্দর
প্রভাত
৮ আশ্বিন [১৩২১]

৫১

খুঁজি হ তুই আপন মনে।
রিক্ত হাতে চল-না রাতে
নিরুদ্দেশের অবেষণে।
চাস নে কিছু, কোস নে কিছু,
করিস নে তোর মাথা নিচু,
আছে রে তোর হৃদয় ভরা
শূন্য ঝুলির অলখ ধনে।

নাচুক-না ওই অধার আলো—
তুলুক-না ঢেউ দিবারিণি
চার দিকে তোর মন্দ ভালো।
তোর তরী তুই দে খুলে দে,
গান গোয়ে তুই পাল তুলে দে,
অক্ল-পানে ভাসবি রে তুই,
হাসবি রে তুই অকারণে।

সুন্দর
সন্ধ্যা
৮ আশ্বিন [১৩২১]

৫২

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি।
কাছের জিনিস দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রাবি।
কেন রে তোর দ হাত পাতা।
দান তো না চাই, চাই যে দাতা,
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল লবি।

সহজ হ'বি সহজ হ'বি
 ওরে মন, সহজ হ'বি—
 আপন বচন-রচন হতে
 বাহির হয়ে আর রে ক'বি।
 সকল কথার বাহিরেতে
 ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
 নীরব ফুলের নয়ন-পানে
 চেয়ে আছে প্রভাত-রাবি।

সুন্দর
 প্রভাত
 ৯ আশ্বিন [১০২১]

৫০

ওরে ভীরা, তোমার হাতে
 নাই ভুবনের ভার।
 হালের কাছে মাঝি আছে
 করবে তরী পার।

তুফান যদি এসে থাকে
 তোমার কিসের দায়—
 চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা,
 কাজ কি ভাবনায়।
 আসুক-নাকো গহন রাত,
 হোক-না অন্ধকার—
 হালের কাছে মাঝি আছে
 করবে তরী পার।

পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস
 মেঘে আকাশ ডোবা;
 আনন্দে তুই পূর্বের দিকে
 দেখ-না তারার শোভা।

সাথী যারা আছে, তারা
 তোমার আপন ব'লে
 ভাব কি তাই রক্ষা পাবে
 তোমারি ওই কোলে?
 উঠবে রে বড়, দুলবে রে বুক,
 জাগবে হাহাকার—
 হালের কাছে মাঝি আছে
 করবে তরী পার।

শান্তিনিকেতন
 অপরায়
 ৯ আশ্বিন [১০২১]

৫৪

চোখে দেখিস, প্রাণে কানা।
 হিম্মার মাঝে দেখ-না ধরে
 ভুবনখানা।
 প্রাণের সাথে সে যে গাঁথা,
 সেথায় তারই আসন পাতা,
 বাইরে তারে রাখিস তব্দ
 অন্তরে তার যেতে মানা ?

তারই কণ্ঠে তোমার বাণী।
 হোরই রঙে রঙিন তারই
 বসনখানি।
 যে জন তোমার বেদনাতে
 লুকিয়ে খেলে দিনে রাতে,
 সামনে যে ওই রূপে রসে
 সেই অজানা হল জানা।

শান্তিনিকেতন
 ১৩ আশ্বিন [১৩২১]

৫৫

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
 কেমন করে।
 আকাশ কাঁপে তারার আলোর
 গানের ঘোরে।
 তেমনি করে আপন হাতে
 ছুঁলে আমার বেদনাতে,
 নতুন সৃষ্টি জাগল বদ্বি
 জীবন-পরে।

বাজে বলেই বাজাও তুমি;
 সেই গরবে
 ওগো প্রভু আমার প্রাণে
 সকল সবে।
 বিষম তোমার বহিষ্কাতে
 বারে বারে আমার রাতে
 জ্বালিয়ে দিলে নতুন তারা
 বাধায় ভ'রে।

শান্তিনিকেতন
 রাঢ়
 ১৩ আশ্বিন [১৩২১]

৫৬

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
 কে এল মোর অঙ্গনে, কে জানে গো।
 হৃদয় আমার উদাস করে
 কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
 বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।

দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে
 কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।
 মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
 বাহির হল কাহার খোঁজে,
 সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো।

শান্তিনিকেতন
 ১৪ আশ্বিন [১৩২১]

৫৭

তোমার দয়ার খোলার ধ্বনি
 ওই গো বাজে
 হৃদয়-মাঝে।
 তোমার ঘরে নিশিভারে
 আগল যদি গেল সরে
 আমার ঘরে রইব তবে
 কিসের লাজে।

অনেক কলা বলেছি, সে
 মিথ্যা কলা।
 অনেক চলা চলেছি, সে
 মিথ্যা চলা।
 আজ যেন সব পথের শেষে
 তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
 ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে
 আপন কাজে।

শান্তিনিকেতন
 ১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৫৮

প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে—
 তোমার বেজ্ঞন সে যদি গো
 স্মারে স্মারে ঘোরে।
 কাঁদিয়ে তারে ফিরিয়ে আন,
 কিছুতেই তো হার না মান,
 তার বেদনায় তোমার অশ্রু
 রইল যে গো ভরে।

সামান্য নয় তব প্রেমের দান—
 বড়ো কঠিন ব্যথা এ যে
 বড়ো কঠিন টান।
 মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
 সাজাও তবে মিলন-বেশে,
 সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
 বাঁধো বাহুর ডোরে।

শান্তিনিকেতন
 ১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৫৯

ক্রান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
 পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
 এই যে হিয়া ধরধর
 কাঁপে আজি এমনতরো
 এই বেদনা ক্ষমা করো
 ক্ষমা করো প্রভু।

এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু
 পিছন-পানে তাকাই যদি কভু।
 দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায়
 শূকায় মালা পুজার থালায়,
 সেই স্মানতা ক্ষমা করো
 ক্ষমা করো প্রভু।

শান্তিনিকেতন
 ১৬ আশ্বিন [১৩২১]

আমার আর হবে না দেরি—
 আমি শূন্যেছি ওই বাজে তোমার ভেরী।
 তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে।
 মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে
 তোমায় যেন হেরি,
 আমার আর হবে না দেরি।

আমার কাজ হয়েছে সারা,
 এখন প্রাণে বাঁশি বাজায় সন্ধ্যাতারা।
 দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
 তোমার আশীর্বাদের মালা নেব কেবল মাথে
 আমার ললাট ঘেরি—
 এখন আর হবে না দেরি।

শান্তিনিকেতন
 ১৬ আশ্বিন [১৩২১]

ওই যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
 সোনার অলংকার।
 ওই সে আকাশে লুটায় আকুল চুল
 অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল,
 পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার।

ক্রান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধীরে
 স্তম্ভ পাখির নীড়ে।
 বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
 লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
 জপিল সে বারবার।

ওই যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
 গোপনে ফেলিল শ্বাস।
 ওই যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী
 শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি
 আপন বেদনাভার।

ওই যে নয়ন অবগদুষ্ঠনতলে
ভাসিল শিশিরজলে ।
ওই যে তাহার বিপদুল রূপের ধন
অরূপ আধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কার ।

শান্তিনিকেতন
সম্বা
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৬২

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো --
গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠল কোথায় বেজে ।
ছাড়িয়ে গৃহ ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমার জন্মমরণপারে—
এল পথিক সেজে ।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে ।

চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলো-আধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে ।
এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে,
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে,
কালিমা যায় মেজে ।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে ।

শান্তিনিকেতন
রায়
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৬৩

এদের পানে তাকাই আমি
বক্ষে কাঁপে ভয় ।
সব পেরিয়ে তোমায় দেখি
আর তো কিছু নয় ।
একটুখানি সামনে আমার আঁধার জেগে থাকে
সেইটুকুতে সূর্যতারা সবই আমার ঢাকে ।
তার উপরে চেয়ে দেখি
আলোয় আলোয় ।

ছোটো আমার বড়ো হয় যে
 যখন টানি কাছে—
 বড়ো তখন কেমন করে
 লুকায় তারি পাছে।
 কাছের পানে তাকিয়ে আমার দিন তো গেছে কেটে,
 এবার যেন সন্ধ্যাবেলায় কাছের ক্ষুধা মেটে—
 এতকাল যে রইলে দূরে
 তোমারি হোক জয়।

শান্তিনিকেতন
 রবি
 ১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৬৪

হিসাব আমার মিলবে না তা জানি,
 যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি।
 করজোড়ে রইন্দ চেয়ে মূখে
 বোঝাপড়া কখন যাবে চুকে,
 তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি।

গর্ব আমার নাই রহিল প্রভু,
 চোখের জল তো কাড়বে না কেউ কভু।
 নাই বসালে তোমার কোলের কাছে,
 পায়ের তলে সবারই ঠাই আছে,
 ধূলার 'পরে পাতব আসনখানি।

শান্তিনিকেতন
 রবি
 ১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৬৫

মেঘ বলেছে যাব যাব,
 রাত বলেছে যাই।
 সাগর বলে, কল মিলেছে
 আমি তো আর নাই।
 দঃখ বলে, রইন্দ চুপে
 তাহার পায়ের চিহ্নরূপে:
 আমি বলে, মিলাই আমি
 আর কিছ, না চাই।

ভুবন বলে, তোমার তরে
আছে বরণমালা।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে।
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

শান্তিনিকেতন
প্রভাত
১৭ আশ্বিন [১৩২১]

৬৬

কাঁড়ারী গো, যদি এবার
পৌঁছে থাক কদলে,
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার
হাত ধরে লও তুলে।
ক্ষণেক তোমার বনের ঘাসে
বসাও আমার তোমার পাশে,
রাত্রি আমার কেটে গেছে
চেউয়ের দোলায় দুলে।

কাঁড়ারী গো, ঘর যদি মোর
না থাকে আর দূরে,
ওই যদি মোর ঘরের বাঁশ
বাজে ভোরের সুরে,
শেষ বাজিয়ে দাও গো চিতে
অশ্রুজলের রাগিণীতে
পথের বাঁশখানি তোমার
পথতরুর মূলে।

শান্তিনিকেতন
প্রভাত
১৭ আশ্বিন [১৩২১]

৬৭

ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে,
শেষ হল মোর গান;
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি,
ওই হাতে মোর হাত দুটি লও,
লও গো আমার প্রাণ।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

ঘুঁচিয়ে লও গো সকল লজ্জা
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে লও জয়।
লও গো আমার নিশীথরাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি,
সকল অভিমান।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

শান্তিনিকেতন
প্রভাত
১৭ আশ্বিন [১৩২১]

৬৮

তোমার ভুবন মমের আমার লাগে।
তোমার আকাশ অসীম কমল
অন্তরে মোর জাগে।
এই সবুজ এই নীলের পরশ
সকল দেহ করে সরস,
রক্ত আমার রঙিয়ে আছে
তব অরুণরাগে।

আমার মনে এই শরতের
আকুল আলোখানি
এক পলকে আনে যেন
বহুযুগের বাণী।
নিশীথরাতে নিমেষহারা
তোমার যত নীরব তারা
এমন করে হৃদয়স্বারে
আমায় কেন মাগে।

শান্তিনিকেতন
প্রভাত
১৭ আশ্বিন [১৩২১]

৬৯

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেমন নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পুরে
গানের সুরে।

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে
গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয়-মাঝে বেড়ায় ঘুরে
গানের সুরে।

শান্তিনিকেতন
সম্মা
১৭ আশ্বিন [১৩২১]

৭০

আপন হতে বাহির হয়ে
বাইরে দাঁড়া,
বৃকের মাঝে বিশ্বলোকের
পারি সাড়া।
এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরান দিক-না নাড়া--
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

বোস্-না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন লয়ে
অরুণ-আলোর স্বর্ণরেনু-
মাখা হয়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুঁটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পারি ছাড়া--
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

শান্তিনিকেতন
সম্মা
১৭ আশ্বিন [১৩২১]

৭১

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
 এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।
 চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
 বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
 এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে।

রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচবে যে,
 হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচবে যে।
 কাঁপবে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
 দুলবে তোমার তারা-মণির হারে সে,
 বাসনা তার ছাড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।

শান্তিনিকেতন
 প্রভাত
 ১৮ আশ্বিন [১০২১]

৭২

ওগো আমার হৃদয়বাসী,
 আজ কেন নাই তোমার হাসি।
 সন্ধ্যা হল কালো মেঘে,
 চাঁদের চোখে অঁধার লেগে:
 বাজল না আজ প্রাণের বাঁশি।

রেখোঁছি এই প্রদীপ মেখে,
 জ্বালিয়ে দিলেই জ্বলবে সে যে।
 একটুকু মন দিলেই তবে
 তোমার মালা গাঁথা হবে,
 তোলা আছে ফুলের রাশি।

শান্তিনিকেতন
 সন্ধ্যা
 ১৮ আশ্বিন [১০২১]

৭৩

পদ্প দিলে মার যারে
 চিনল না সে মরণকে।
 বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
 ধরে তোমার চরণকে।
 সবার নীচে ধুলার পরে
 ফেল যারে মৃত্যুশরে
 সে যে তোমার কোলে পড়ে,
 ভয় কী বা তার পড়নকে।

আরামে বার আশাত ঢাকা,
কলঙ্ক বার সুগন্ধ,
নয়ন মেলে দেখল না সে
রুদ্র মদনের আনন্দ।
মজল না সে চোখের জলে,
পেঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে
মল যেজন পালঙ্কে।

শান্তিনিকেতন
প্রভাত
১৯ আশ্বিন [১০২১]

৭৪

আমার সুরের সাধন রইল পড়ে।
চেরে চেরে কাটল বেলা
কেমন করে।
দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে,
কী যে দেখি বলব কী এ।
গানের মতো চোখে বাজে
রূপের ঘোরে।

সবুজ সুখা এই ধরণীর
অঞ্জলিতে
কেমন করে ওঠে ভরে
আমার চিতে।
আমার সকল ভাবনাগুলি
ফুলের মতো নিল ভুলি,
আশ্বিনের ওই আঁচলখানি
গেল ভরে।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১০২১]

৭৫

কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে—
সাগরমাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।
যেখানে ওই কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।

যেখানে ওই গ্রামের বধু আসে জলে—
সেখানে নয়।
যেখানে নীল ময়ূরঙ্গীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

এবার, বীণা, তোমায় আমায়
আমরা একা।
অন্ধকারে নাই বা কারে
গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়।
বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

শান্তিনিকেতন
১৯ অশ্বিন [১৩২১]

৭৬

ঘরের থেকে এনোঁছিলেম
প্রদীপ জেলে—
ডেকেছিলেম, 'আয় রে তোরা
পথের ছেলে।'
বলোঁছিলেম, 'সন্ধ্যা হল,
তোমরা পূজার কুসুম তোলো,
আমার প্রদীপ দেবে পথে
কিরণ মেলে।'

পথের আঁধার পথে রেখে
এলেম ফিরে;
প্রদীপ হাতে পথ দেখানো
ছেড়েছি রে।
এবার বলি, 'ওগো আলো,
আমায় তুমি আপনি জ্বালো,
ভাঙা প্রদীপ পথের ধুলায়
দিলেম ফেলে।'

শান্তিনিকেতন
১৯ অশ্বিন [১৩২১]

৭৭

সম্মুখ হ'ল, একলা আছি ব'লে
 এই যে চোখে অশ্রু পড়ে গ'লে
 ওগো বন্ধু, বলো দেখি
 শ্রু শুধু কেবল আমার এ কি।
 এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে।

থাক্-না তোমার লক্ষ গ্রহতারা,
 তাদের মাঝে আছ আমায়-হারা।
 সইবে না সে, সইবে না সে,
 টানতে আমায় হবে পাশে,
 একলা তুমি, আমি একলা হলে।

শান্তিনিকেতন
 সম্মুখ
 ১৯ অশ্বিন [১৩২১]

৭৮

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ,
 কেমনে দিই ফাঁকি।
 আধেক ধরা পড়েছি গো,
 আধেক আছে বাকি।
 কেন জানি আপনা ভুলে
 বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
 বারেক তারে ঢাকি—
 আধেক ধরা পড়েছি যে
 আধেক আছে বাকি।

বাহির আমার শ্রুতি যেন
 কঠিন আবরণ—
 অন্তরে মোর তোমার লাগি
 একটি কামা-ধন।
 হৃদয় বলে তোমার দিকে
 রইবে চেয়ে অনিমিখে,
 চায় না কেন আঁখি--
 আধেক ধরা পড়েছি যে
 আধেক আছে বাকি।

শান্তিনিকেতন
 স্মৃতি
 ১৯ অশ্বিন [১৩২১]

৭৯

তোমায় সৃষ্টি করব আমি
 এই ছিল মোর পণ।
 দিনে দিনে করেছিলাম
 তারি আলোজন।
 তাই সাজালেম আমার ধূলো,
 আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাগূলো,
 আমার যত রঙিন আবেশ,
 আমার দৃঃস্বপন।

‘তুমি আমায় সৃষ্টি করো’
 আজ তোমারে ডাকি—
 ‘ভাঙো আমার আপন মনের
 মায়া-ছায়ার কাঁকি।
 তোমার সত্য, তোমার শান্তি,
 তোমার শূদ্র অরূপ কান্তি,
 তোমার শক্তি, তোমার বহি
 ভরুক এ জীবন।’

শান্তিনিকেতন
 প্রভাত
 ২০ আশ্বিন [১০২১]

৮০

সারা জীবন দিল আলো
 সূর্য গ্রহ চাঁদ,
 তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
 তোমার আশীর্বাদ।
 ঘেঘের কলস ভরে ভরে
 প্রসাদ-বারি পড়ে ঝরে,
 সকল দেহে প্রভাত-বায়ু
 ঘুচায় অবসাদ—
 তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
 তোমার আশীর্বাদ।

তৃণ যে এই ধূলার 'পরে
 পাতে আঁচলখানি,
 এই যে আকাশ চির-নীরব
 অমৃতময় বাণী—
 ফুল যে আসে দিনে দিনে
 বিনা রেখার পথটি চিনে,

এই যে ভুবন দিকে দিকে
 পুরায় কত সাধ---
 তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
 তোমার আশীর্বাদ।

শান্তিনিকেতন
 প্রভাত
 ২০ আশ্বিন [১৩২১]

৮১

সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের
 পর্দাখানি
 ডেকে গেল নিশীথরাতে
 কে না জানি।
 কোন্ গগনের দিশাহারা
 তন্দ্রাবিহীন একটি তারা :
 কোন্ রজনীর দৃশ্যপনের
 আত্মবাণী :
 ডেকে গেল নিশীথরাতে
 কে না জানি।

আঁধার রাতে ভয় এসেছে
 কোন্ সে নীড়ে।
 বোঝাই তরী ডুবল কোথায়
 পাষাণ তীরে।
 এই ধরণীর বক্ষ টুটে
 এ কী রোদন এল ছুটে
 আমার বক্ষে বিরামহারা
 বেদন হানি?
 ডেকে গেল নিশীথরাতে
 কে না জানি।

শান্তিনিকেতন
 ২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮২

বাথার বেগে এল আমার দ্বারে
 কোন্ অতিথি, ফিরিয়ে দেব না রে।
 জাগব বসে সকল রাত্তি :
 ঝড়ের হাওয়ার ব্যাকুল বাতি
 আগুন দিয়ে জ্বালব বায়ে বায়ে।

আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
 ধরার কামা আমার কেন ডাকে।
 দূরুথ দিয়ে জানাও, রুদ্র,
 ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র,
 ভয় দিয়েছ ভয় করি নে তারে।
 বাধা যখন এল আমার প্বারে
 তারে আমি ফিরিয়ে দেব না রে।

শান্তিনিকেতন
 ২১ আশ্বিন । ১৩২১।

৮৩

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।
 দিন সে কাটায় গণি গণি
 বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
 তারার আলোয় গায় সে সারা রাত্রি।
 কত যুগের রথের রেখা
 বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,
 কত কালের ক্রান্ত আশা
 ঘুমায়ে তাহার ধূলায় আঁচল পাতি।

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
 যাত্রা আমার চলার পাকে
 এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
 নতুন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
 যত আশা পথের আশা,
 পথে যেতেই ভালোবাসা,
 পথে চলার নিত্যরসে
 দিনে দিনে জীবন ওঠে গাতি।

শান্তিনিকেতন
 ২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮৪

বৃন্ত হাতে ছিন্ন করি শূদ্র কমলগর্দল
 কে এনেছে তুলি।
 তবু ওরা চায় যে মৃথে নাই তাহে ভৎসনা,
 শেষ-নিমেষের পেয়লা-ভরা অম্লান সান্ধনা,
 মরণের মন্দিরে এসে মাধুরী-সংগীত
 বাজায় ক্রান্তি তুলি
 শূদ্র কমলগর্দল।

এরা তোমার কণকালের নিবিড়-নন্দন
 নীরব চুম্বন,
 মৃদু নয়ন-পল্লবেতে ঝিলার ঘরি ঘরি
 তোমারি সুগন্ধ-স্বাসে সকল চিস্ত ভরি;
 হে কল্যাণলক্ষ্মী, এরা আমার মর্মে তব
 করুণ অঙ্গুলি
 শূদ্র কমলগদলি।

শান্তিনিকেতন
 ২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮৫

বাঁজিয়েছিলে বীণা তোমার
 দিই বা না দিই মন।
 আজ প্রভাতে ভারি ধনি
 শূনি সকল কণ।
 কত সুরের লীলা সে যে
 দিনে রাতে উঠল বেজে,
 জীবন আমার গানের মালা
 করেছে কল্পন।

আজ শরতের নীলাকাশে,
 আজ সবুজের খেলায়,
 আজ বাতাসের দীর্ঘস্বাসে,
 আজ চার্মেলির মেলায়
 কত কালের গাঁথা বাণী
 আমার প্রাণের সে গানখানি
 তোমার গলার দোলে ঘন
 করিন্দু দর্শন।

বৃন্দাবন
 ২০ আশ্বিন [১৩২১]

৮৬

আবার যদি ইচ্ছা কর
 আবার আসি ফিরে
 দুঃখসুখের ঢেউ-খেলায়
 এই সাগরের তীরে।
 আবার জলে ভাসাই ডেলা,
 ধুলার পরে করি খেলা,
 হাসির মায়ামুগীর পিছে
 জাসি নয়ন-নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
 আবার যাত্রা করি;
 আঘাত খেয়ে বাঁচি কিংবা
 আঘাত খেয়ে মরি।
 আবার তুমি ছদ্মবেশে
 আমার সাথে খেলাও হেসে,
 নতুন প্রেমে ভালোবাসি
 আবার ধরণীরে।

বৃন্দগঙ্গা
 ২০ আশ্বিন [১০২১]

৮৭

অচেনাকে ভরি কী আমার ওরে।
 অচেনাকেই চিনে চিনে
 উঠবে জীবন ভরে।
 জানি জানি আমার চেনা
 কোনো কালেই ফুরাবে না,
 চিহ্নহারা পথে আমার
 টানবে অচিন-ডোরে।

ছিল আমার মা অচেনা,
 নিল আমার কোলে।
 সকল প্রেমই অচেনা গো,
 তাই তো হৃদয় দোলে।
 অচেনা এই ভুবন-মাঝে
 কত সুরেই হৃদয় বাজে,
 অচেনা এই জীবন আমার,
 বেড়াই তারি ঘোরে।

বৃন্দগঙ্গা
 ২০ আশ্বিন [১০২১]

৮৮

যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর-মাঝখানে
 কালের কথা ভাবে না সে,
 চায় না কছু তরীর আশে,
 আপন সূখে সাতার-কাটা সেই জানে
 ভবসাগর-মাঝখানে।

রক্ত যে তার মেতে ওঠে
মহাসাগর-কল্লোলে,
ওঠা-পড়ার ছন্দে হৃদয়
ঢেউয়ের সাথে ঢেউ তোলে।

অরুণ-আলোর আশিস লয়ে
অন্তরবির আদেশ বয়ে
আপন সূখে যায় সে চলে কার পানে
ভবসাগর-মাঝখানে।

বৃন্দগয়া
২০ আশ্বিন [১০২১]

৮৯

সম্মাতারা যে ফুল দিল
তোমার চরণতলে
তারে আমি ধরে দিলেম
আমার নয়নজলে।
বিদায়-পথে যাবার বেলা স্নান রবির রেখা
সারা দিনের ভ্রমণ-বাণী লিখল সোনার লেখা,
আমি তাতেই সুর বসালেম
আপন গানের ছলে।

স্বর্ণ আলোর রথে চড়ে
নেমে এল রাত্তি,
তারি আখার ডরে আমার
হৃদয় দিন্দু পাতি।
মৌন-পারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথা,
বিষহৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতার
আমার বাণীর স্রোত মিলিছে
নীরব কোলাহলে।

বৃন্দগয়া
সম্মাতা
২০ আশ্বিন [১০২১]

৯০

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার।

কাহার অভিব্যেকের ভরে
সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিস বহি
হল অধার পার।

বনে বনে ফুল ফুটেছে,
দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হল
তাদের মালা গাঁথা।
বহু যুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে।
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার।

বৃন্দগয়া
প্রভাত
২৪ আশ্বিন [১৩২১]

৯১

তোমার কাছে চাই নে আমি
অবসর।
আমি গান শোনাব গানের পর।
বাইরে হোথায় দ্বারের কাছে
কাজের লোকে দাঁড়িয়ে আছে,
আশা ছেড়ে থাক-না ফিরে
আপন ঘর।
আমি গান শোনাব গানের পর।

জানি না এর কোন্টা ভালো কোন্টা নয়।
জানি না কে কোন্টা রাখে কোন্টা লয়।
চলবে হৃদয় তোমার পানে
ধুধু আপন চলার গানে,
করার সন্ধে করবে সন্দের
এ নিব্বরি।
আমি গান শোনাব গানের পর।

বৃন্দগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]

৯২

এখানে তো বাঁধা পথের
 স্রম না পাই,
 চলতে গেলে পথ ভুলি যে
 কেবলি তাই।
 তোমার জলে, তোমার স্থলে,
 তোমার সুনীল আকাশতলে,
 কোনোখানে কোনো পথের
 চিহ্নটি নাই।

পথের খবর পাখির পাখার
 লুকিয়ে থাকে।
 তারার আগুন পথের দিশা
 আপনি রাখে।
 ছয় ঋতু ছয় রঙিন রথে
 যায় আসে যে বিনা পথে,
 নিজেরে সেই অচিন-পথের
 খবর শুধাই।

বৃন্দগয়া
 ২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৩

যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে
 এই তো তোমার কথা ছিল আমার সাথে।
 তাই তো আমার অশ্রুজলে
 তোমার হাসির মৃদা ফলে,
 তোমার বীণা বাজে আমার বেদনাতে।
 যা-কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

পরের কথায় চলতে পথে ভুল করি যে।
 জানি আমার নিজের মাঝে আছি নিজে।
 ভুল আমারে বারে বারে
 ভুলিয়ে আনে তোমার দ্বারে,
 আপন মনে চলি গো তাই দিনে রাতে।
 যা-কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

বৃন্দগয়া
 ২৪ আশ্বিন [১৩২১]

১৪

পথে পথেই বাসা বাঁধি,
 মনে ভাবি পথ ফুরাল,
 কোন্ অনাদি কালের আশা
 হেথায় বৃষ্টি সব পুরাল।
 কখন দেখি অধার ছুটে
 স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে,
 পূর্ব দিকের তোরণ খুলে
 নাম ডেকে যায় প্রভাত-আলো।

আবার কবে নবীন ফুলে
 ভরে নতুন দিনের সাজি।
 পথের ধারে তরুণুলে
 প্রভাতী সুর ওঠে বাজি।
 কেমন করে নতুন সাথী
 জোটে আবার রাতারাতি,
 দেখি রথের চড়ার পরে
 নতুন ধ্বজা কে উড়ালো।

বৃষ্টিগয়া
 ২৫ আশ্বিন [১০২১]

১৫

পান্থ ভূমি, পান্থজনের সখা হে,
 পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
 যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
 তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
 চায় না সে জন পিছন-পানে ফিরে,
 বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
 ভুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
 যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া।
 পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

পান্থ ভূমি, পান্থজনের সখা হে,
 পথিক-চিন্তে তোমার তরী বাওয়া।
 দুরার খুলে সমুদ্র-পানে যে চাহে
 তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।

বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
 রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
 যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
 যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া,
 পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া।

বেলা স্টেশন
 ২৫ আশ্বিন [১৩২১]

১৬

জীবন আমার যে অমৃত
 আপন-মাঝে গোপন রাখে
 প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে
 কবে আমি দেখব তাকে।
 তাহারি স্বাদ ক্ষণে ক্ষণে
 পেয়েছি তো আপন মনে,
 গন্ধ তারি মাঝে মাঝে
 উদাস করে আমায় ডাকে।

নানা রঙের ছায়ার বোনা
 এই আলোকের অন্তরালে
 আনন্দরূপ লুকিয়ে আছে
 দেখব না কি যাবার কালে।
 যে নিরালস্য তোমার দৃষ্টি
 আপনি দেখে আপন সৃষ্টি
 সেইখানে কি বারেক আমায়
 দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে।

বেলা
 পান্থিক-পথে
 ২৫ আশ্বিন [১৩২১]

১৭

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
 দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।
 হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
 পেয়ে আবার হারাই মিলন-ঘোরে।
 চিরজীবন আমার বীণা-তারে
 তোমার আঘাত লাগল বারে বারে,
 তাই তো আমার নানা সুরের তানে
 তোমার পরশ প্রাণে নিলেম ধরে।

আজ তো আমি ভয় করি নে আর
 লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
 নতুন আলোয় নতুন অন্ধকারে
 লও যদি বা নতুন সিঁধুপারে
 তবু তুমি সেই তো আমার তুমি,
 আবার তোমায় চিনব নতুন করে।

বেলা
 পার্ক-পথে
 ২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৮

পথের সাথী, নমি বারংবার।
 পথিকজনের লহো নমস্কার।
 ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
 ওগো দিনশেষের পতি,
 ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।

ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি,
 ওগো চিরদিনের গতি,
 নতুন আশার লহো নমস্কার।
 জীবন-রথের হে সার্থী,
 আমি নিত্য পথের পথী,
 পথে চলার লহো নমস্কার।

বেলা হইতে গরায়
 রেল-পথে
 ২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৯

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
 সেই তো তোমার আলো।
 সকল শব্দ-বিরোধ-মাঝে আগ্রত যে ভালো,
 সেই তো তোমার ভালো।

পথের ধুলায় বন্ধ পেতে রয়েছে যেই গেহ
 সেই তো তোমার গেহ।
 সমর-ঘাতে অমর করে রক্ত নিষ্ঠুর স্নেহ
 সেই তো তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকি রয়ে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পায়ে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার ভূমি।

এলাহাবাদ

প্রভাত

২৯ আশ্বিন [১৩২১]

১০০

গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন স্কার।
যেথা আমার গান
হয় গো অবসান
সেথা গানের নীরব পারাবার।

যেথা আমার আঁখি
আঁধারে যায় ঢাকি
অলখ লোকের আলোক সেথা জ্বলে।
বাইরে কুসুম ফুটে
ধূলায় পড়ে টুটে,
অন্তরে তো অমৃত-ফল ফলে।

কর্ম বৃহৎ হয়ে
চলে যখন বয়ে
তখন সে পায় বৃহৎ অবকাশ।
যখন আমার আমি
ফুরায় যার থামি
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ।

এলাহাবাদ

২৯ আশ্বিন [১৩২১]

১০১

ভেঙেছে দুরার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদায় উদার অভ্যাস,
তোমারি হউক জয়।

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খন্ড তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্ধসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবাহি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

এলাহাবাদ
প্রভাত
৩০ আশ্বিন [১০২১]

১০২

তোমার ছেড়ে দূরে চলার
নানা ছলে
তোমার মাঝে পড়ি এসে
স্বিগুণ বলে।
নানান পথে আনাগোনা
মিলনেরই জাল সে বোনা,
যতই চাঁল ধরা পড়ি
পলে পলে।

শুধু যখন আপন কোণে
পড়ে থাকি
তখনি সেই স্বপন-ঘোরে
কেবল ফাঁকি।
বিশ্ব তখন কয় না বাণী,
মুখেতে দেয় বসন টানি,
আপন ছায়া দেখি, আপন
নয়ন-জলে।

এলাহাবাদ
১ কার্তিক [১০২১]

১০৩

যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।
শব্দ হয়ে দাঁড়াই যখন
লও যে জিনি।
এ প্রাণ যত নিজের তরে
তোমারি ধন হরণ করে
ততই শব্দ তোমার কাছে
হয় সে ধনী।

উজিয়ে যেতে চাই যতবার
গর্বসুখে,
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
পাই যে বৃকে।
আলো যখন আলসভরে
নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
নিশীথিনী।

এলাহাবাদ
সন্ধ্যা
১ কার্তিক [১০২১]

১০৪

কেমন করে তড়িৎ আলোয়
দেখতে পেলেম মনে
তোমার বিপুল সৃষ্টি চলে
আমার এই জীবনে।
সে সৃষ্টি যে কালের পটে
লোকে লোকান্তরে রটে,
একটু তারি আভাস কেবল
দেখি কণে কণে।

মনে ভাবি, কাম্বাহাসি
আদর অবহেলা
সবই যেন আমায় নিয়ে
আমারি টেউ-থেলা।
সেই আমি তো বাহনমাত্র
যায় সে ভেঙে মাটির পাত্র,
যা রেখে যায় তোমার সে ধন
রয় তা তোমার সনে।

তোমার বিশ্ব জড়িয়ে থাকে
 আমার চাওয়া পাওয়া।
 ভরিয়ে তোলে নিত্যকালের
 ফাল্গুনেরই হাওয়া।
 জীবন আমার দুঃখে সুখে
 দোলে ত্রিভুবনের বন্ধে,
 আমার দিবানিশির মালা
 জড়ায় শ্রীচরণে।

আপন-মাঝে আপন জীবন
 দেখে যে মন কাঁদে।
 নিমেষগুলি শিকল হয়ে
 আমায় তখন বাঁধে।
 মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ,
 আমার মাঝে হে আনন্দ,
 তোমার প্রকাশ দেখে মোহ
 ঘুচল এ নয়নে।

এলাহাবাদ
 সন্ধ্যা
 ১ কার্তিক [১৩২১]

১০৫

এই নিমেষে গণনাহীন
 নিমেষ গেল টুটে—
 একের মাঝে এক হয়ে মোর
 উঠল হৃদয় ফুটে।
 বন্ধে কুঁড়ির কারায় বন্ধ
 অন্ধকারের কোন্ সুগন্ধ
 আজ প্রভাতে পূজার বেলায়
 পড়ল আলোয় লুটে।

তোমায় আমায় একটুখানি
 দূর যে কোথাও নাই।
 নয়ন মূদে নয়ন মেলে
 এই তো দেখি তাই।
 যেই খুলেছি আঁখির পাতা,
 যেই তুলেছি নত মাথা,
 তোমার মাঝে অমনি আমার
 জন্মখানি উঠে।

এলাহাবাদ
 প্রভাত
 ২ কার্তিক [১৩২১]

১০৬

যাস নে কোথাও ধৈয়ে,
 দেখে রে কেবল চেয়ে।
 ওই যে পূরব গগন-মূলে
 সোনার বরন পালটি তুলে
 আসছে তরী বেয়ে,
 দেখে রে কেবল চেয়ে।

ওই যে আঁধার তটে
 আনন্দগান রটে।
 অনেক দিনের অভিসারে
 অগম গহন জীবন-পারে
 পেঁপীছিল তোর নেয়ে,
 দেখে রে কেবল চেয়ে।

ওই যে রে তার তরী
 আলোয় গেল ভরি।
 চরণে তার বরণডালা
 কোন্ কাননের বহে মালা
 গন্ধে গগন ছেয়ে?
 দেখে রে কেবল চেয়ে।

এলাহাবাদ
 প্রভাত
 ২ কার্তিক [১০২১]

১০৭

মৃদিত আলোর কমল-কলিকটিরে
 রেখেছে সম্মা আঁধার-পর্ণপুটে।
 উত্তরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
 তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
 উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
 চলছি একেলা সম্মার অনুগামী,
 দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
 আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
 আকাশে যে গান ঘুমায়েছে নিঃস্পন্দ
 ভারাদীপগুণি কাঁপছে তাহারি শ্বাসে।

অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা,
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাঠেঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলোঁছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা-কিছু ছিল সাথে
রাখিন্দু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায়বেলায় আজিও রহিল বাকি।

যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে বাখা বিধিল বৃকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

এলাহাবাদ

সন্ধ্যা

২ কার্তিক [১০২১]

১০৮

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইন্দু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনিবার্ণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেন্দু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মূখে
সে আশ্রয় নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে

হে মোর অতিথি যত । তোমরা এসেছ এ জীবনে
 কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, প্রাণ-বরিষনে ;
 কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
 এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দরন্ত ঝটিকা
 বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে । যখন গিয়েছ চলে
 দেবতার পদাচছ রেখে গেছ মোর গৃহতলে ।
 আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
 রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম ।

এলাহাবাদ

প্রভাত

০ কার্তিক [১০২১]

સંયોજન

ગીતાઙ્ગલિ ગીતિમાળા ગીતાંજલિ

কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে।
 আপনাকে যে আপনি হারায়
 কেমনে তার জয় হবে।
 শত্রু বাধা আলিঙ্গনে
 যত প্রণয় তারি সনে—
 মৃত্ত উদার কোন্ প্রেমে তার লয় হবে।
 কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে।

যে মন্ততা বারে বারে
 ছোটে সর্বনাশের পারে
 কোন্ শাসনে কবে তাহার ভয় হবে।
 কুহেলিকার অন্ত না পাই,
 কাটবে কখন ভাবি যে তাই—
 এক নিমেঘে তুমি হৃদয়ময় হবে।
 কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে।

বোলপুর
 ৩ শ্রাবণ ১৩১৭

জাগো নির্মল নেত্রে
 রাশির পরপারে,
 জাগো অন্তরক্ষেত্রে
 মৃত্তির অধিকারে।
 জাগো ভক্তির তীর্থে
 পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
 জাগো উন্মুখ চিত্তে,
 জাগো অম্লান প্রাণে।
 জাগো নন্দনভো
 সূধাসিন্ধুর ধারে,
 জাগো স্বার্থের প্রান্তে
 প্রেমমন্দিরস্বারে।
 জাগো উজ্জ্বল পদ্যে,
 জাগো নিশ্চল আশে,
 জাগো নিঃসীম শূন্যে
 পূর্ণের বাহুপাশে।

জাগো নিভয়ধামে,
 জাগো সংগ্রামসাজে,
 জাগো স্বপ্নের নামে,
 জাগো কল্যাণকাজে।
 জাগো দুর্গমযাত্রী,
 দুঃখের অভিসারে,
 জাগো স্বার্থের প্রান্তে
 প্রেমমন্দিরস্বারে।

৪ আশ্বিন [১৩১৭]

৩

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে।
 চির পথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।
 তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর,
 মর্দু আমার বন্ধনভোর,
 দুঃখসুখের চরম আমার জীবনমরণ হে।

আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে।
 নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
 ওগো সবার, ওগো আমার,
 বিশ্ব হতে চিন্তে বিহার—
 অন্তবিহীন লীলা তোমার নতন নতন হে।

৫ আশ্বিন [১৩১৭]

৪

তব গানের সুরে হৃদয় মম রাখো হে রাখো ধরে,
 তারে দিয়ো না কভু ছুটি।
 তব আদেশ দিয়ে রজনীদিন দাও হে দাও ভরে,
 প্রভু আমার বাহু দুটি।
 তব পলকহারা আলোক-দিগ্ধি মরম-'পরে রাখো,
 যত শরমে মোর শরম দিয়ে নীরবে চেয়ে থাকো,
 প্রভু সকল-ভরা ক্ষমায় তব রাখো আবৃত করে
 মোর বেখানে যত দুটি।

মোরে দিয়ো না দিন সুখের আশে করিতে দিন গত
 শূন্য শয়ন-'পরে দুটি।
 আমি চাই নি বাহা তাই দিয়ো হে আপন ইচ্ছামতো
 আমার ভরিয়া দুই মৃতি।

মোর যতই তৃষা ততই কৃপা-বরষা এসো নেমে,
মোর যত গভীর দৈন্য তত ভরিয়া তোলো প্রেমে,
মোর যত কঠিন গর্ব তারে হানো ততই বলে—
তাহা পড়ুক পারে টুটি।

১৯ আশ্বিন ১৩১৭

৫

আঁজ নিভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে কে জাগে।
ঘন সৌরভমন্থর পবনে জাগে কে জাগে।
কত নীরব বিহঙ্গ-কুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বদলায়ে জাগে কে জাগে।
কত অক্ষুট পুষ্পের গোপনে জাগে কে জাগে।
এই অপার অম্বর-পাথারে
স্তুম্ভিত গম্ভীর আধারে জাগে কে জাগে।
মম গম্ভীর অন্তর-বেদনে জাগে কে জাগে।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩১৭

৬

আমি অধম অবিশ্বাসী,
এ পাপমুখে সাজে না যে
'তোমায় আমি ভালোবাসি'।
গুণের অভিমানে মেতে
আর চাহি না আদর পেতে,
কঠিন ধূলায় বসে এবার
চরণসেবার অভিলাষী।

হৃদয় যদি জ্বলে, তারে
জ্বলিতে দাও, জ্বলিতে দাও।
ঘরুয় না আর আপন ছায়ার,
কদম্ব না আর আপন আয়ার—
তোমার পানে রাখব ধরে
অটল প্রাণের অচল হাসি।

? ১৩১৭

৭

যদি আমার তুমি বাঁচাও তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।
যদি আমার মলিন মনের কালি
ঘুচাও পদ্য সলিল ঢালি,
তোমার চন্দ্র সূর্য নূতন আলোয়
জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে।

আজো ফোটে নি মোর শোভার কুঁড়ি,
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।
যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে
আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মধুর হবে সকল আকাশ
আনন্দময় গানের রবে।

? ১০১৭

৮

বলো, আমার সনে তোমার কী শত্রুতা।
আমায় মারতে কেন এতই ছুঁতা।
একে একে রতনগুঁলি
হার থেকে মোর নিলে খুলি,
হাতে আমার রইল কেবল সূতা।

গেয়েছি গান, দিয়েছি প্রাণ ঢেলে,
পথের 'পরে হৃদয় দিলেম মেলে।
পাবার বেলা হাত বাড়াতাই
ফিরিয়ে দিলে শূন্য হাতেই—
জানি জানি তোমার দয়ালুতা।

৭ ভাদ্র [১০২১]

৯

দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন।
পায় আছে এর—এই সাগরের
বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের কথা বত
এইখানে সব হবে গত—
চিরপ্রাণের আলয়-মাঝে
বিপুল সাম্রাজ্য।

মরণ যে তোর নয় রে চিরন্তন।
 দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি,
 ছিঁড়বে রে বন্ধন।
 এ বেলা তোর যদি ঝড়ে
 পূজার কুসুম ঝরে পড়ে
 যাবার বেলায় ভরবি থালায়
 মালা ও চন্দন।

সুন্দর
 ১ আশ্বিন [১০২১]

১০

আমার বোঝা এতই করি ভারী—
 তোমার ভার যে বইতে নাহি পারি।
 আমারি নাম সকল গায়ে লিখা,
 হয় নি পরা তব নামের টিকা—
 তাই তো আমার দ্বার ছাড়ে না দ্বারী।

আমার ঘরে আমিই শূন্য থাকি,
 তোমার ঘরে লও আমারে ডাকি।
 বাঁচিয়ে রাখি যা-কিছু মোর আছে
 তার ভাবনায় প্রাণ তো নাহি বাঁচে—
 সব যেন মোর তোমার কাছি হারি।

শান্তিনিকেতন
 ১৫ আশ্বিন ১০২১

বলাকা

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্সন্ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জনা,
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।

তোমা যারু আহুত
বঙ্গসাগর
৭ মে ১৯১৬

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
 ওরে সবুজ, ওরে অবুজ,
 আধমরাদের ঘা মেরে তুই কাঁচা।
 রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
 আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
 সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
 পদুচ্ছটি তোর উচ্ছে তুলে নাচা।
 আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
 আর তো কিছুই নড়ে না রে
 ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
 ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা,
 চক্ষু কণ্ঠ দুইটি ডানায় ঢাকা,
 বিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
 অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
 আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ,
 দেখে না যে বান ডেকেছে
 জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
 চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
 মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
 আছে অচল আসনখানা মেলে
 যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচার।
 আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
 হঠাৎ আলো দেখবে যখন
 ভাববে, এ কী বিষম কান্ডখানা।
 সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
 শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
 সেই সন্ধ্যোগে ঘুমের থেকে জেগে
 লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচার।
 আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।

শিকল-দেবীর ওই যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।

পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অটুহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জার্নি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বন্ধে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে তাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তিড়িং ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মালাগাছা।
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ ১৩২১

২

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন পাগল ওই বারে বারে
উঠছে অটুহেসে গো।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে।
 এইবেলা নে বরণ করে
 সব দিয়ে তোর ইহারে।
 চাহিস নে আর আগুপিছ,
 রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছ,
 চরণে কর্ মাথা নিচু
 সিন্ত আকুল কেশে গো।
 এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ে রে।
 গৃহ অধার হল, প্রদীপ
 নিবল শয়ন-শিয়রে।
 ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
 এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
 শুনিস নি কি ডাক পড়েছে
 নিরুদ্দেশের দেশে গো।
 এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

ছি ছি রে, ওই চোখের জল আর ফেলিস নে।
 ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে
 কোণে আঁচল মেলিস নে।
 কিসের তরে চিস্ত বিকল,
 ভাঙুক-না তোর দ্বারের শিকল,
 বাহিরপানে ছোট্-না, সকল
 দৃঃখসুখের শেষে গো।
 এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটেবে না।
 চরণে তোর রক্ত তালে
 নুপুর বেজে উঠবে না?
 এই লীলা তোর কপালে যে
 লেখা ছিল—সকল তোজে
 রক্তবাসে আয় রে সেজে
 আম-না বধুর বেশে গো।
 ওই বদ্বি তোর এল সর্বনেশে গো।

আমরা চলি সমুদ্রপানে,
 কে আমাদের বাধবে।
 রইল যারা পিছুর টানে
 কাঁদবে তারা কাঁদবে।
 ছিঁড়ব বাধা রক্ত-পায়ে,
 চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
 জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
 কেবলই ফাদ ফাদবে।
 কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্ধ মোদের হাঁক দিয়েছে
 বাজিয়ে আপন তুর্ষ।
 মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
 মধ্যদিনের সূর্য।
 মন ছড়াল আকাশ ব্যোপে,
 আলোর নেশায় গেছি খেপে,
 ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
 চক্ষু ওদের ধাববে।
 কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর-গিরি করব রে জয়
 যাব তাদের লঙ্ঘি।
 একলা পথে করি নে ভয়,
 সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
 আপন ঘোরে আপনি মেতে
 আছে ওরা গন্ডি পেতে,
 ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
 বাধবে ওদের বাধবে।
 কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজবে বিধান,
 পড়বে সকল বন্ধ।
 উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
 ঘুচবে দ্বিধাম্বল্লব।
 মৃত্যুসাগর মথন করে
 অমৃতরস আনব হরে,
 ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
 মরণ-সাধন সাধবে।
 কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

৪

তোমার লগ্ন ধূলায় পড়ে,
 কেমন করে সহিব?
 বাতাস আলো গেল মরে
 এ কী রে দুর্দৈব।
 লড়বি কে আর ধ্বজা বেয়ে,
 গান আছে যার ওঠ-না গেয়ে,
 চলবি যারা চল্ রে খেয়ে,
 আর-না রে নিঃশঙ্ক।
 ধূলায় পড়ে রইল চেয়ে
 ওই যে অভয় লগ্ন।

চলেছিলাম পূজার ঘরে
 সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
 খুঁজি সারাদিনের পরে
 কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
 এবার আমার হৃদয়-কৃত
 ভেবেছিলাম হবে গত,
 ধূয়ে মলিন চিহ্ন যত
 হবে নিষ্কলঙ্ক।
 পথে দেখি ধূলায় নত
 তোমার মহাশঙ্ক।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা।
 এই কি আমার সন্ধ্যা।
 গাঁথব রক্তজবার মালা?
 হায় রজনীগন্ধা!
 ভেবেছিলাম যোঝাযুঝি
 মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
 চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
 লব তোমার অঙ্ক।
 হেনকালে ডাকল বৃষ্টি
 নীরব তব লগ্ন।

ষোড়শেরই পরশমণি
 করাও তবে স্পর্শ।
 দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
 দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
 নিশার বন্ধ বিদার ক'রে
 উন্মোচনে গগন ভ'রে

অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়গীত।

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্রে।
জানি শ্রাবণধারা-সম
বাণ বাজিবে বন্ধে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে গ্রাসে
সদ্বস্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাগীত।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শূন্য লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বন্ধে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অস্ত্র তব গীত।

রামগড়
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৫

মস্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ওই যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালি-ঢালা ভরের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছিত পড়ে সাগরসাথে মিশে,
উত্তল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূলছাড়া মোর নেয়ে।

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
 আসে আমার নেয়ে?
 সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
 আসছে তরী বেয়ে।
 কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
 পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
 কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পুজার বাতি
 রয়েছে পথ চেয়ে?
 অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
 বিরহী মোর নেয়ে।

এই ভুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
 বিবাগী মোর নেয়ে?
 নাই জানি পূর্ণ করে কোন্ রতনের বোঝা
 আসছে তরী বেয়ে।
 নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার,
 একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
 সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
 আনমনে গান গেয়ে।
 কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
 নবীন আমার নেয়ে?

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
 বাহির হল নেয়ে।
 তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
 আসছে তরী বেয়ে।
 রুদ্ধ অলক উড়ে পড়ে, সিন্ধু-পলক অঁধি,
 ডাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
 দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
 ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
 তোমরা বাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
 ওই যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে বাহির হল কবে
 উদ্মনা মোর নেয়ে।
 এখনো রাত হয় নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে
 আসতে তরী বেয়ে।
 বাজবে নাকো তরী ডেরী, জানবে নাকো কেহ,
 কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোর ভরবে গেহ,

দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পদ্য হবে দেহ
 পদ্যক-পরশ পেয়ে।
 নীরবে তার চিরদিনের ঘৃণেবে সন্দেহ
 কলে আসবে নেয়ে।

কলিকাতা
 ৫ ডায় ১০২১

৬

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।
 ওই যে সুন্দর নীহারিকা
 যারা করে আছে ভিড়
 আকাশের নীড়;
 ওই যারা দিনরাতি
 আলো-হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী
 গ্রহ তারা রবি
 তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?
 হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।
 পথিকের সঙ্গ লও
 ওগো পথহীন।
 কেন রাতিদিন
 সকলের মাঝে থেকে সব হতে আছ এত দূরে
 স্থিরতার চির অন্তঃপূরে?
 এই ধূলি
 ধূসর অঞ্চল ভূলি
 বায়ুতরে ধায় দিকে দিকে;
 বৈশাখে সে বিধবার আভরণ ধূলি
 তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে;
 অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
 বসন্তের মিলন-উষায়—
 এই ধূলি এও সত্য হায়;
 এই ভূল
 বিশ্বের চরণভলে লীন
 এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবই—
 তুমি স্থির, তুমি ছবি,
 তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলোছিলে আমাদের পাশে।
 বন্ধ তব দুলিত নিশ্বাসে;
 অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
 কত গানে কত নাচে

রচিয়াছে
 আপনার ছন্দ নব নব
 বিশ্বতালে রেখে তাল;
 সে যে আজ হল কত কাল।
 এ জীবনে
 আমার ভুবনে
 কত সত্য ছিলে।
 মোর চক্ষে এ নিখিলে
 দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
 রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
 সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
 এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
 রজনীর আড়ালেতে
 তুমি গেলে আমি।
 তার পরে আমি
 কত দুঃখে সুখে
 রাত্রিদিন চলছি সম্মুখে।
 চলেছে জোয়ার-ভাটা আলোকে অধারে
 আকাশ-পাথারে;
 পথের দুধারে
 চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
 বরনে বরনে;
 সহস্রধারায় ছোটে দূরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
 মরণের বাজারে কিষ্কিণী।
 অজানার সূরে
 চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
 মেতেছি পথের প্রেমে।
 তুমি পথ হতে নেমে
 যেখানে দাঁড়ালে
 সেখানেই আছ থেমে।
 এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
 সবার আড়ালে
 তুমি ছবি, তুমি শব্দ ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি।
 তুমি ছবি?
 নহে, নহে, নও শব্দ ছবি।
 কে বলে রয়েছে স্থির রেখার বন্ধনে
 নিস্তব্ধ কল্পনে।

মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
 এই নদী
 হারাত তরঙ্গবেগ;
 এই মেঘ
 মর্দিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
 তোমার চিকন
 চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
 তবে
 একদিন কবে
 চঞ্চল পবনে লীলায়িত
 মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
 হ'ত স্বপনের।
 তোমায় কি গিয়েছিল ভুলে।
 তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
 তাই ভুল।
 অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল।
 ভুলি নে কি তারা।
 তবুও তাহারা
 প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
 ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুদর।
 ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা;
 বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
 নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
 নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই;
 আজি তাই
 শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
 আমার নিখিল
 তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
 নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
 তব সুদর বাজে মোর গানে;
 কবির অন্তরে তুমি কবি,
 নও ছবি, নও ছবি, নও শব্দ ছবি।
 তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
 তার পরে হারিয়েছি রাতে।
 তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
 নও ছবি, নও তুমি ছবি।

৭

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।

শুদ্ধ তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সন্ধ্যাটের ছিল এ সাধনা।

রাজশক্তি বহুসুদকঠিন
সন্ধ্যারকুরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বাসিত হয়ে সক্রিয় করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুদ্ধ থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শূন্য সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাতে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাতে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই কণে দেয় ভরি
মালতীর চঞ্চল অঞ্চল,
বিদ্যার-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ারে ছিন্নদল।
সময় যে নাই;
আবার শিশিররায়ে তাই
নিকুঞ্জে ফুটোয়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চার
দিনান্তে নিশান্তে শূন্য পথপ্রান্তে ফেলে বেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
 চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
 সৌন্দর্যে ডুলায়ে।
 কণ্ঠে তার কী মালা দুলিয়ে
 করিলে বরণ
 রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
 রয়ে না যে
 বিলাপের অবকাশ,
 বারো ঘাস,
 তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
 চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
 জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
 প্রেমসীরে
 যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
 সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
 অনন্তের কানে।
 প্রেমের করুণ কোমলতা
 ফুটিল তা
 সৌন্দর্যের পুষ্পপুষ্পে প্রশান্ত পাষাণে।
 হে সম্রাট করি,
 এই তব হৃদয়ের ছবি,
 এই তব নব মেঘদূত,
 অপূর্ব অদ্ভুত
 ছন্দে গানে
 উঠিয়াছে অলঙ্কারে পানে
 যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
 রয়েছে মিশিয়া
 প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
 ক্রান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
 পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে,
 ভাষার অতীত তীরে
 কাঙাল নয়ন যেথা ম্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
 তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
 এড়াইয়া কালের প্রহরী
 চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া,
 “ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।”

চলে গেছে তুমি আজ,
 মহারাজ;
 রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
 সিংহাসন গেছে টুটে;

তব সৈন্যদল
 যাদের চরণভরে ধরলী করিত টলমল
 তাহাদের স্মৃতি আজ বারুড়রে
 উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি-পরে।
 বন্দীরা গাহে না গান;
 যমুনা-কল্লোলসাথে নহবত মিলায় না তান;
 তব পদসন্দর্শীর নৃপদরশিকণ
 ভস্ম প্রাসাদের কোণে
 ম'রে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
 কাদায় রে নিশার গগন।
 তবও তোমার দূত অমলিন,
 প্রান্তিকপ্রান্তিকহীন,
 তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
 তুচ্ছ করি জীবনমত্যুর ওঠাপড়া,
 যুগে যুগান্তরে
 কহিতেছে একস্বরে
 চিরবিরহীর বাণী নিয়া,
 “ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।”

মিথ্যা কথা—কে বলে যে ভোল নাই।
 কে বলে যে খোল নাই
 স্মৃতির পিঞ্জরস্বার।
 অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
 আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
 বিস্মৃতির মৃতিপথ দিয়া
 আজিও সে হয় নি বাহির?
 সমাধিসন্দির
 এক ঠাই রহে চিরস্থির;
 ধরায় ধূল্যায় থাকি
 স্মরণের আবরণে মরণেরে ধরে রাখে ঢাকি।
 জীবনেই কে রাখিতে পারে।
 আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
 তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
 নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
 স্মরণের গ্রন্থি টুটে
 সে যে যায় ছুটে
 বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
 মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
 পারে নাই তোমারে ধরিতে;
 সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ধরিতে
 নাহি পারে—
 তাই এ ধরায়ে

জীবন-উৎসব-শেষে দৃষ্ট পায় তেলে
 মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
 তোমার কীর্তির চরে তুমি যে মহৎ,
 তাই তব জীবনের রথ
 পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
 ব্যর্থবার।

তাই

চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
 যে প্রেম সম্মুখপানে
 চলিতে চালাতে নাহি জানে,
 যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
 তার বিলাসের সম্ভাষণ
 পথের ধূলার মতো জড়ালে ধরেছে তব পায়,
 দিয়েছে তা ধূলিরে ফিরালে।
 সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-পরে
 তব চিত্ত হতে ব্যর্থভরে
 কখন সহসা

উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মালা হতে খসা।
 তুমি চলে গেছ দূরে
 সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
 উঠেছে অম্বরপানে,
 কহিছে গম্ভীর গানে—
 'যত দূর চাই
 নাই নাই সে পার্থক্য নাই।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
 রাখিল না সমুদ্র পর্বত।

আজি তার রথ
 চলিয়াছে রাগির আহবানে
 নক্ষত্রের গানে
 প্রভাতের সিংহম্বরপানে।

তাই

স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
 ভারমস্ত সে এখানে নাই।'

এলাহাবাদ
 রাতি
 ১৪ কার্তিক ১০২১

৮

হে বিরাট নদী,
 অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
 অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন
 চলে নিরবধি।

[illegible]

5-20-60

~~संस्कृत-विश्वकोष-प्रकाशन-मंडल~~

31/10/2010

ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਕਰਾਮਤ, +

આપના અંગ્રીકીય વિદ્યાર્થીને ૩૦. જાન્યુઆરી ૧૯૦૭

အသံအသံ အသံအသံ အသံအသံ

मृगश्रवणः

2000

27-23

ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਭਲਾ ਡੇਕਰੇਸ਼ਨ

ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ।

अनुसार

निदेश: क्या आप ?

1954

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রূপ কায়াহীন বেগে;
 বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
 পূজ পূজ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
 আলোকের তীরচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
 ধাবমান অন্ধকার হতে;
 ঘর্গাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
 স্তরে স্তরে
 সূর্যচন্দ্রতারা যত
 বদ্বদদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,
 চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী,
 শব্দহীন সুর।
 অন্তহীন দুর
 তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
 সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই ভূমি ঘরছাড়া।
 উন্মত্ত সে অভিসারে
 তব বন্ধোহারে
 ঘন ঘন লাগে দোলা— ছড়ায় অমনি
 নক্ষত্রের মণি;
 আধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল;
 দূলে উঠে বিদ্রুতের দুল;
 জগল আকুল
 গড়ায় কম্পিত তুলে,
 চঞ্চল পল্লবপুঞ্জ বিপিনে বিপিনে;
 বারংবার করে করে পড়ে ফুল
 জুই চাঁপা বকুল পারুল
 পথে পথে
 তোমার ঝড়ুর খালি হতে।
 শূন্য ধাও, শূন্য ধাও, শূন্য বেগে ধাও
 উদ্দাম উধাও;
 ফিরে নাহি চাও,
 যা-কিছু তোমার সব দূই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
 কুড়িয়ে লও না কিছুর, কর না সঙ্গর;
 নাই শোক, নাই ভয়,
 পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথের কর ক্ষয়।
 যে মূহুর্তে পূর্ণ ভূমি সে মূহুর্তে কিছুর তব নাই,
 ভূমি তাই
 পবিত্র সদাই।
 তোমার চরণস্পর্শে কিঞ্চিৎখালি
 মলিনতা যায় তুলি

পলকে পলকে—

মৃত্যু ওঠে প্রাণ হরে কলকে কলকে।

যদি তুমি মৃত্যুতের তরে

ক্লান্তিভরে

দাঁড়াও ধর্মিক,

তখন চমকি

উচ্ছিন্না উঠবে বিশ্ব পদ পদ বস্তুর পর্বতে;

পল্লব মৃক কবন্ধ বধির আধা

স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা

সবারে ঠেকায় দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;

অনুতম পরমাণু আপনার ভারে

সঞ্জয়ের অচল বিকারে

বিন্দু হবে আকাশের মর্ম্মলে

কলুষের বেদনার শূলে।

ওগো নটী, চঞ্চল অঙ্গরী,

অলঙ্কা সুন্দরী,

তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি

ভুলিতেছে শূচি করি

মৃত্যুস্থানে বিশ্বের জীবন।

নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উত্তলা

ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,

অলঙ্কিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।

নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শূনি পদধ্বনি,

বন্ধ তোর উঠে রনরনি।

নাহি জানে কেউ

রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ডেউ,

কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;

মনে আজি পড়ে সেই কথা—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া

স্থলিয়া স্থলিয়া

রূপে রূপে

রূপ হতে রূপে

প্রাণ হতে প্রাণে।

নিশীথে প্রভাতে

যা-কিছু পেয়েছি হাতে

এসেছি করিয়া ক্ষর দান হতে দানে,

গান হতে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মৃদু,

তরঙ্গী কাঁপিছে ধরধর।

তীরের সঙ্গর তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহান্নোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অভল আধারে—অকূল আলোতে।

এলাহাবাদ
রাতি
০ পৌষ ১৩২১

৯

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষণ।
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ।
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী;
তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারো মাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষন্ন নিম্বাস;
মিলনরজনীপ্রান্তে ক্রান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েছে ষত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান
হে পাষণ, অমর পাষণ।

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি
সে রাজবিরহী
বিরহের রক্তখানি;
দিল আনি
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।
নাই সেথা সন্ধ্যাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশ দিক।
আকাশ তাহার 'পরে
বহুভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তগোড়া

দেয় তারে প্রভাত-অরুণ,
বিরহের স্মানহাসে
পান্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ।

সম্মাটমহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অন্ধর আলোকে।
অঙ্গা ধরি সে অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্মাটের প্রীতি।
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেমসী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

সম্মাটের মন,
সম্মাটের ধনজন
এই রাজকীর্তি হতে করিয়াছে বিদায়গ্রহণ।
আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষণ-সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

এলাহাবাদ
প্রভাতে
৫ পৌষ ১৩২১

১০

হে প্রিয়, আজ এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান।
প্রভাতের গান?
প্রভাত যে ক্রান্ত হয় তন্ত রবিকরে
আপনার বৃত্তিটির 'পরে;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।
হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে।

কী তোমারে দিব আনি।
 সম্বাদীপখানি?
 এ দীপের আলো এ যে নিরালো কোণের,
 স্তম্ভ ভবনের।
 তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতার?
 এ যে হায়
 পথের বাতাসে নিবে যায়।

কী মোর শক্তি আছে তোমারে যে দিব উপহার।
 হোক ফুল, হোক-না গলার হার,
 তার ভায়
 কেনই বা সবে,
 একদিন হবে
 নিশ্চিত শূন্যে তারা স্মান ছিন্ন হবে।
 নিজ হতে তব হাতে বাহা দিব ভুলি
 তারে তব শিখিল অঙ্গুলি
 যাবে ভুলি—
 ধূলিতে খসিয়া গেবে হয়ে যাবে ধূলি।

তার চোরে হবে
 কণকাল অবকাশ হবে,
 বসন্তে আমার পুষ্পবনে
 চলিতে চলিতে অন্যমনে
 অজানা গোপন গন্ধে পূসকে চমকি
 দাঁড়াবে ধমকি,
 পথহারা সেই উপহার
 হবে সে তোমার।
 যেতে যেতে বীথিকায় মোর
 চোখেতে লাগিবে ঘোর,
 দেখিবে সহসা—
 সম্ভার কবরী হতে খসা
 একটি রঙিন আলো কাঁপি ধরথরে
 ছোঁয়ার পরশমাণি স্বপনের পরে,
 সেই আলো, অজানা সে উপহার
 সেই তো তোমার।

আমার যা প্রেচ্ছন সে তো শূন্য চমকে ঝলকে,
 দেখা দেয় মিলার পলকে।
 বলে না আপন নাম, পথেরে লিহরি দিয়া সুরে
 চলে যায় চকিত নৃপদে।
 সেথা পথ নাহি জানি,
 সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।

বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
 আপনার ভাবে,
 না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
 সেই তো তোমার।
 আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
 হোক ফুল, হোক তাহা গান।

শান্তিনিকেতন
 ১০ পৌষ ১৩২১

১১

হে মোর সুন্দর,
 যেতে যেতে
 পথের প্রমোদে মেতে
 যখন তোমার গায়
 কারা সবে ধূলা দিয়ে যায়,
 আমার অন্তর
 করে হায় হায়।
 কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
 আজ তুমি হও দণ্ডধর,
 করহ বিচার।
 তার পরে দেখি,
 এ কী,
 খোলা তব বিচারঘরের দ্বার,
 নিত্য চলে তোমার বিচার।
 নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
 তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে;
 শূদ্র বনমালিকার বাস
 স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিম্বাস;
 সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
 সন্তর্ষির পূজাদীপমালা
 তাদের মস্ততাপানে সারাক্ষতি চায়—
 হে সুন্দর, তব গায়
 ধূলা দিয়ে যারা চলে যায়।
 হে সুন্দর,
 তোমার বিচারঘর
 পদ্পবনে,
 পদ্যসমীরণে,
 তৃণপদজে পতঙ্গগদজনে,
 বসন্তের বিহঙ্গকদজনে,
 উরঙ্গচূড়িত ভীরে মর্ষরিত পল্লব-বীজনে।

প্রেমিক আমার,
 তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বীর।
 লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
 তব আভরণ,
 সাজাবারে
 আপনার নগ্ন বাসনারে।
 তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাপে বাজে,
 সহিতে সে পারি না যে;
 অশ্রু-অধি
 তোমারে কাঁদিয়া ডাকি—
 খজা ধরো, প্রেমিক আমার,
 করো গো বিচার।
 তার পরে দেখি
 এ কী,
 কোথা তব বিচার-আগার।
 জননীর স্নেহ-অশ্রু করে
 তাদের উগ্রতা-পরে;
 প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
 তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবন্ধে করি লয় গ্রাস।
 প্রেমিক আমার,
 তোমার সে বিচার-আগার
 বিনিত্র স্নেহের স্তম্ভ নিঃশব্দ বেদনামাঝে,
 সতীর পবিত্র লাজে,
 সখার হৃদয়রক্তপাতে,
 পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
 অশ্রু-প্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্ধ আমার,
 লুপ্ত তারা, মৃগ্য তারা, হরে পার
 তব সিংহম্বার,
 সংগোপনে
 বিনা নিমন্ত্রণে
 সিংহ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।
 চোরা-ধন দুর্বহ সে ভার
 পলে পলে
 তাহাদের মর্ম দলে,
 সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
 তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি ব্যর্থবার—
 এদের মার্জনা করো, হে রুদ্ধ আমার।
 চেরে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
 প্রচণ্ড কল্লার বেশে;

সেই ঝড়ে
 ধূলোয় তাহার পড়ে;
 চুরির প্রকান্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
 সে বাতাসে কোথা যায় বয়ে।
 হে রত্ন আমার,
 মার্জনা তোমার
 গর্জমান বজ্রান্নিগিথায়,
 সূর্যাস্তের প্রলয়লিথায়,
 রক্তের বর্ষণে,
 অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

শান্তিনিকেতন
 ১২ পৌষ ১৩২১

১২

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
 গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
 সন্ধে দঃন্ধে উঠে নেবে
 বাড়িয়েছি হাত
 দিনরাত;
 কেবল ভেবেছি, দেবে, দেবে,
 আরো কিছুর দেবে।

দিলে, তুমি দিলে, শূন্য দিলে;
 কড় পলে পলে তিলে তিলে,
 কড় অকস্মাৎ বিপুল স্রাবনে
 দানের প্রাণে।
 নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়িয়ে,
 হাতে পায়ে রেখেছি জড়িয়ে
 জালের মতন;
 দানের রতন
 লাগিয়েছি ধূলোর খেলায়
 অথরে হেলায়,
 আলস্যের ভরে
 ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।
 তবু তুমি দিলে, শূন্য দিলে, শূন্য দিলে,
 তোমার দানের পাত্র নিজ ভরে উঠিছে নিখিলে।

অজস্র তোমার
 সে নিত্য দানের ভার
 আজি আর
 পারি না বহিতে।

পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষর প্রত্যাশা,
স্বারে তব নিত্য বাওয়া-আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেরে চেরে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শূন্য বেড়ে যায়;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হার
জীবনে প্রভাত-সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে।
শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধূলার ফেলিয়া টানি,
সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীকার দীপ মোর
নিমেবে নিবাসে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় পরে
লবে মোরে, লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে।

শ্রীমতিনিকেতন
১৩ পৌষ ১৩২১

১০

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস:
নাই লজ্জা, নাই হাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্ছ্বাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশির-মন্থর।

বহুদিনকার
ভুলে-বাওয়া ঘোঁষন আমার
সহসা কী মনে করে
পদ তার পাঠিয়েছে মোরে
উজ্জ্বল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেছে সে—

আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দিরের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।
বিরহী তোমার জাগি
আছি জাগি
দক্ষিণ বাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
কত মধু মধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।

লিখেছে সে—

এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহম্বার
হয়ে এসো পার;
ফেলে এসো ক্লান্ত পদ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার
জীবনের এপার ওপার।

সুন্দর
২০ পৌষ ১৩২১

১৪

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলঙ্কার বন্ধের আঁচলে।

সেইমতো আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে

একবেলাকার মূখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

শান্তিনিকেতন
২৬ পৌষ ১৩২১

১৫

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করে নি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শব্দ পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই, নাইকো সঙ্গ,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নামে দর্শনবার মেঘে,
দুই কল ডোবে স্নোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

সুন্দর
২৭ পৌষ ১৩২১

১৬

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অটহাসি;
ধূলা বালি
দিরে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে;
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে যন্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলার হতে সাথী।

স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
 খুঁজে মরে কুল;
 অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
 চায় এরা প্রাণপণে ধনণীরে ধরিতে আঁকড়ি
 কাষ্ঠ-লোষ্ট-সদৃশ মৃষ্টিতে,
 ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।
 চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
 স্তূপে স্তূপে
 উঠিতেছে ভরি—
 সেই তো নগরী।
 এ তো শূন্য নহে ঘর,
 নহে শূন্য ইটক প্রস্তর।

অতীতের গৃহছাড়া কত-ষে অশ্রুত বাণী
 শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
 খোঁজে তারা আমার বাণীরে
 লোকালয়-তীরে-তীরে।
 আলোকতীরের পথে আলোহীন সেই বাণীদল
 চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
 তাদের নীরব কোলাহলে
 অক্ষুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
 মোর চিত্তগৃহ ছাড়ি,
 দেয় পাড়ি
 অদৃশ্যের অন্ধ মরু, বাগ্ৰ উদ্‌বাসে
 আকারের অসহ্য পিয়সে।

কী জানি কে তারা কবে
 কোথা পার হবে
 যুগান্তরে,
 দূর সৃষ্টি-পরে
 পাবে আপনার রূপ অগ্নি আলোতে।
 আজ তারা কোথা হতে
 মেলোছিল ডানা
 সেদিন তা রহিবে অজানা।

অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
 বাঁধবে তাহারে কোন্ ছবি,
 গাঁথবে তাহারে কোন্ হর্ম্যচূড়,
 সেই রাজপুরে
 আজ যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।
 তার তরে কোথা রচে ঠাই

অরচিত দর যজ্ঞভূমে।
কামানের ধমে
কোন ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশব্দে আহবান করিছে তার নাম।

সরুল
২৭ পৌষ ১৩২১

১৭

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছি ন্দ ভালো
ততক্ষণ তব আলো
থুঁজে থুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে;
কী যে হল কানাকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুখচক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছ্ যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে।

সরুল
২৮ পৌষ ১৩২১

১৮

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত-কিছ্ বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই;
ততক্ষণ এ বিশ্বে কেটে কেটে থাই
কীটের মতন;
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যার নুতন নুতন;
এ জীবন
সতর্ক বৃদ্ধির ভায়ে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংসারের দীর্ঘ পঙ্কজেন্দ্রে।

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
 বিশ্বের আঘাত লেগে
 আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
 বেদনার বিচিত্র সঞ্জয়
 হতে থাকে ক্ষয়।
 পূর্ণা হই সে চলার স্নানে,
 চলার অমৃতপানে
 নবীন যৌবন
 বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

ওগো আমি যাত্রী তাই—
 চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
 কেন মিছে
 আমারে ডাকিস পিছে।
 আমি তো মৃত্যুর গদ্যস্ত প্রেমে
 রব না ঘরের কোণে থেমে।
 আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
 হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
 ফেলে দিব আর সব ভার,
 বার্ষিক্যের স্তম্ভপাকার
 আরোজন।

ওরে মন,
 যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
 তোমর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
 গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

সুন্দর
 প্রাতঃকাল
 ২৯ পৌষ ১৩২১

১৯

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতে;
 পাকে পাকে ফেরে ফেরে
 আমার জীবন দিয়ে জড়িয়েছি এরে;
 প্রভাত-সন্ধ্যার
 আলো-অন্ধকার
 মোর চেতনার গোছে ভেসে;
 অবশেষে
 এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
 আর আমার ভুবন।

ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।
তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর-বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহবানে;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেইমতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল
এতবড়ো নিদারুণ প্রবণতা
হাসিমুখে এতকাল কিছতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

সুন্দর
প্রাতঃকাল
২৯ পৌষ ১৩২১

২০

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।

যাবার হাওয়া ওই যে উঠেছে—ওগো
ওই যে উঠেছে,
সারারাত্রি চপ্পে আমার
ঘুম যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠছে দূলে দূলে
অকূল জলের অটুহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
 বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
 হঠাৎ এবার উজান হাওয়ার তব
 পারের তরী থাক্-না ভাসিতে।

কোনো কালে হয় নি যারে দেখা—ওগো
 তারি বিরহে
 এমন করে ডাক দিয়েছে,
 ঘরে কে রহে।

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘরে,
 ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে;
 পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
 তান দিয়ে মোর ব্যথার বাঁশিতে।

রেলগাড়ি
 ২৯ পৌষ ১৩২১

২১

ওরে তোদের স্বর সহে না আর?
 এখনো শীত হয় নি অবসান।
 পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
 সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান?
 ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
 কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল।

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
 ভাবলি নে তো সময় অসময়।
 শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
 গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
 সফর আগে উড়ে হেসে ঠেলাঠেলি করে
 উঠলি ফুটে, রাশি রাশি পড়লি ঝরে ঝরে।

বসন্ত সে আসবে যে ফাল্গুনে
 দখিন হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি'
 তাহার লাগি রইলি নে দিন গুনে
 আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি।
 রাত না হতে পথের শেষে পেঁছবি কোন্ মতে।
 যা ছিল তোর কপে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে।

ওরে খ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা,
দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধূলা
তোরা আপন মরণ দিলি পেতে।
না দেখে না শব্দেই তোদের পড়ল বাধন খসে,
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলি নে আর বসে।

কলিকাতা
৮ মার্চ ১৩২১

২২

যখন আমার হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রিদিবস ছিলেম ঘাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছুর হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছামতে
কোনোদিকে এক পা বাড়াই,
পাছে বিরাগ-কুশাস্কুরের একটি কাঁটা একটু মড়াই।

মৃষ্টি, এবার মৃষ্টি আজি
উঠল বাজি
অনাদরের কঠিন ঘাসে,
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হল ছুটি,
ভাঙল আমার মানের খুঁটি,
খসল বেড়ি হাতে পাল্লো;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতে কে রে থামার।
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমার
মৃষ্টি-মদে কল্লল মাতাল।
খসে-পড়া তারার সাথে
নি-গাঁথরাতে
কাঁপ দিয়েছি অভয়পানে
মরণ-টানে।

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাধনছাড়া,
ঝড় তাহারে দিল তাড়া;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে;
একলা আপন তেজে
ছুটল সে যে
অনাদরের মৃদুস্তপথের 'পরে
তোমার চরণধূলায় রঙিন চরম সমাদরে।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যোদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি।

শিলাইদা। কৃষ্টিবাড়ি
রাহি
১৯ মার্চ ১৩২১

২৩

কোন ক্ষণে
সুজনের সমুদ্রমঞ্চে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতে ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অঙ্গরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্ছ্বাস-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত ভরি
নিরে যায় প্রাণমন হরি,
দু-হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পদ্পিত প্রমাপে,
রাগরস কিংবদুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন ঘোবনের গানে।

আর-জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতার;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদপানে
অচণ্ডল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

পশ্চাতীরে
২০ মার্চ ১৯২১

২৪

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই।
তার ঠিক-ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফান্দস।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পদ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূল্যমাটির মান্দ্যে।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল যুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দঃখে সঃখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুই তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটার খেলায় সে যে রঙে।

আমার গানে স্বর্গ আজি
ওঠে বাজি,
আমার প্রাণে ঠিকানা তার পার,
আকাশভরা আনন্দে সে আমারে তাই চার।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজল যে তাই শব্দ,
সন্ত সাগর বাজার বিজয়-ডঙ্ক;

তাই ফুটেছে ফুল,
বনের পাতায় ঝরনাধারায় তাই রে হৃদয়স্থল।
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।

শিলাইদা। কুঠিবাড়ি
২০ মাঘ ১৩২২

২৫

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাণ্ডনে পারুলে :
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে :
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে :
অনিমেষে
নিম্নতম্ব বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামলী মর্হিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

পদ্মা
২০ মাঘ ১৩২২

২৬

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিংহুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন-সত্যিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরন হৃদয়ব্যথার মতো ;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠল কেবল মর্মর কল্লোল।
এবার শব্দ গানের মৃদু গুঞ্জে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাল্গুনদিনের কাল
দখিন-হাওয়ার উড়িয়ে ঝঞ্জন পাল,
সেবারে এই সিংহুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-সত্যিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল ;
হয় যেন আকুল

নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে;
আনন্দ মোর জনম নিরে
ভালি দিলে ভালি দিলে
নাচে খেন গানের গুঞ্জনে।

পদ্মা
২২ মাঘ ১৩২১

২৭

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি.
রাখব দেনা বাকি।
যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারি আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেছি, আমি তাহার নইকো অজানা।
তাই জেনেছি ধনের দায়ে
ডাইনে বারে
বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা।
তাই ভেবেছি জীবন-মরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে।
তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরই স্বপ্নে
মিলবে আমার আপন বাসা তাহার রাজস্বে।

পদ্মা
২২ মাঘ ১৩২১

২৮

পাখিরে দিচ্ছে গান, গায় সেই গান.
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিচ্ছে স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছে স্বাধীন,
সহজে সে ছুতা তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিচ্ছে বত বোঝা,
তাই নিরে চলি পথে কড়ু বাকি কড়ু সোজা।

একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
 নিয়ে যাই তোমার চরণে
 একদিন রিক্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন;
 বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মর্জিতে বিলীন।

পূর্ণিমায়ে দিলে হাসি;
 সুখস্বপ্ন-রসরাশি
 ঢালে তাই, ধরণীর করপদে সুধায় উচ্ছ্বাসি।
 দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালো ধরে,
 অশ্রুজলে তারে ধরে ধরে
 আনন্দ করিয়া তারে ফিরিয়ে আনিয়া দিই হাতে
 দিনশেষে মিলনের রাতে।

তুমি তো গড়েছ শূন্য এ মাটির ধরণী তোমার
 মিলাইয়া আলোকে অধার।
 শূন্যহাতে সেথা মোরে রেখে
 হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
 দিয়েছ আমার 'পরে ভার
 তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও,
 শূন্য মোর কাছে তুমি চাও।
 আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
 সিংহাসন হতে নেমে
 হাসিমুখে বন্ধে তুলে নাও।
 মোর হাতে যাহা দাও
 তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

পদ্মাতীর
 ২৪ মাঘ ১৩২১

২৯

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
 আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
 সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া;
 এপার হতে ওপার বেয়ে
 বর নি খেয়ে
 কাদন-ভরা বাধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
 শুন্যে শুন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
 আমার তুমি ফুলে ফুলে
 ফুটিয়ে তুলে
 দুর্লভে দিলে নানা রূপের দোলে।
 আমার তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
 আমার তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
 ফিরে ফিরে নতুন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
 আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
 আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
 জীবন-মরণ-ভূতান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
 আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
 আমার মূখে চেয়ে
 আমার পরশ পেয়ে
 আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লক্ষ্মী আছে, আমার বুকে ভয়,
 আমার মূখে ঘোমটা পড়ে রয়;
 দেখতে তোমার বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
 ওগো আমার প্রভু,
 জানি আমি তবু
 আমার দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল,
 নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।

পদ্মাতীর
 ২৫ মার্চ ১৩২১

০০

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিগন্তেছি সাঁতার গো,
 এই দুদিনের নদী হ'ব পার গো।
 তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
 ভাসিয়ে দেব ভেলা,
 তার পরে তার খবর কী যে ধারি নে তার ধার গো,
 তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার স্বার্থী সেই আমার আনন্দ।
 সেই তো বাধার সেই তো মেটায় স্রব্দ।
 জানা আমার যেমনি আপন ফাঁদে
 লজ্জা করে বাঁধে

অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় বন্ধ,
এক নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মৃতি,
তার সনে মোর চিরকালের চুতি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দয়।

মানে না সে বৃদ্ধিসৃষ্টি বৃদ্ধজনার যুক্তি,
মৃত্যুরে সে মৃত্তক করে ভেঙে তাহার শূন্য।

ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে।
সেই কালে কি এই তরী আর ভিড়বে।
ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না,
সেই কালে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে ঘিরবে
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা? ছিঁড়বে বাধন ছিঁড়বে।

ঘণ্টা যে ওই বাজল কবি, হোক রে সভাভঙ্গ,
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ।
এখনো সে দেখায় নি তার মূখ,
তাই তো দোলে বুক।
কোন রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন সাগরের কোন কালে গো কোন নবীনের রঙ্গ।

পদ্মাতীর

২৬ মাঘ ১৩২১

৩১

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনোখানে অভাব কিছ্ নাই।
পূর্ণ ভূমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই তো একে একে
যা-কিছ্ ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবে।
এমনি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য তব
তোমার আপন কাছে প্রভু, নিত্য নব নব।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে

তোমার সূর্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমাণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরণ্ময়।

পদ্মা
২৭ মাঘ ১৩২১

৩২

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ওই মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনিসদুতার গোপন গলার হারে।
চক্ৰবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই সে সন্ধ্যা ছুইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পায়;
ওই যে মরি মরি
ভরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী;
ওই যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাভের আঙিনায়
ঘুমে অলস কায়;
ওই যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিলে আগুন-খুঁলি নিজ সে বিদায়;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে;
তোমার ওই অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই প্রভু
এক নিমেষের পত্নপদে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার কণকালে লও যে নতন করি।

পদ্মা
২৭ মাঘ ১৩২১

৩৩

জানি আমার পায়ের শব্দ রাতে দিনে শুনতে ছুঁমি পাও,
খুঁশি হয়ে পছের পানে চাও।
খুঁশি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ-আজাসে।

খুঁশি তোমার ফাগুনবনে আকুল হয়ে পড়ে
 ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।
 আমি ষতই চলি তোমার কাছে
 পথটি চিনে চিনে
 তোমার সাগর অধিক করে নাচে
 দিনের পরে দিনে।

জীবন হতে জীবনে মোর পক্ষ্মিটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
 ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
 সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘরে ঘরে বেড়ায় কুলে কুলে
 কৌতূহলের ভরে।
 তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
 পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
 তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
 একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

পক্ষ্মিটির
 ২৭ মার্চ ১৩২১

৩৪

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
 তোমার মনের দিকে।
 সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম ভুলে
 রইন্দু অনিমিখে।
 দেখতে পেলেম ভূমি মোরে
 সদাই ডাক যে-নাম ধরে
 সে নামটি এই চৈতন্যসের পাতায় পাতায় ফুলে
 আপনি দিলে লিখে।
 সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
 রইন্দু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
 তোমার গানের পানে।
 সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
 ভরা আমার গানে।
 মনে হল আমারি প্রাণ
 তোমার বিশেষ ভুলেছে তান,

আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইন্দু অনিমিখে।

সুরঙ্গ
২১ চৈত্র ১৩২১

৩৫

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-হুলহুল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ওই
রোদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় করে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে
তাই তো আমি জানি
বিপ্লব বিশ্বভূবনখানি
অক্ল মানস-সাগরজলে
কমল টলমল।
তাই তো আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান,
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল।

শ্রীনগর। কাশ্মীর
৭ কার্তিক ১৩২২

৩৬

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলিমের স্রোতখানি বাঁকা
অধারে মলিন হল—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে;
মনে হল স্পষ্ট যেন স্পন্দে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পদ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শূন্যনিদ্রা সেই ক্ষণে
 সম্ভার গগনে
 শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
 মৃদুহৃৎ ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
 হে হংস-বলাকা,
 ঝঞ্জা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
 রাশি রাশি আনন্দের অটুহাসে
 বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
 ওই পক্ষধ্বনি,
 শব্দময়ী অস্বর-রমণী,
 গেল চলি স্তম্ভতার তপোভঙ্গ করি।
 উঠিল শিহরি
 গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
 শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হল এ পাখার বাণী
 দিল আনি
 শূন্য পলকের তরে
 পূর্নকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
 বেগের আবেগ।
 পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ :
 তরঙ্গশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
 মাটির বন্ধন ফেলি
 ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
 আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
 এ সম্ভার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
 সূদূরের জাগি,
 হে পাখা বিবাগী।
 বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
 “হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।”

হে হংস-বলাকা,
 আজ রাতে মোর কাছে খুলে দিলে স্তম্ভতার ঢাকা।
 শূন্যতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
 শূন্যে জলে স্থলে
 অমনি পাখার লক্ষ উদ্দাম চঞ্চল।

তুলসি
 মাটির আকাশ-পরে আপটিছে ডানা :
 মাটির আধার-নীচে কে জানে ঠিকানা
 মেলিতেছে অন্ধুরের পাখা
 লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উদ্ভূত ডানায়
শবীপ হতে শবীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শর্দীনাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলঙ্কিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্পষ্ট সদূর যুগান্তরে।
শর্দীনাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধর্নিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
“হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে।”

শ্রীনগর
কার্তিক ১৩২২

৩৭

দূর হতে কী শর্দীনস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মৃত্ত রক্তের কল্লোল।
বহির্বন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন;
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কান্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সপ্তয় নিয়ে ফিরে ফিরে শূন্য বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বণনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পূজি,
কান্ডারী ডাকিছে তাই বৃষ্টি—
“ভূফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীরপানে

দিতে হবে পাড়ি।”
 ভাড়াভাড়ি
 তাই ঘর ছাড়ি
 চারি দিক হতে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।

“নতুন উষার স্বর্ণস্বার
 খুলিতে বিলম্ব কত আর।”
 এ কথা শুনায় সবে
 ভীত আতঁরবে
 ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
 ঝড়ের পঙ্খিত মেঘে
 কালোয় ঢেকেছে আলো—জানে না তো কেউ
 রাতি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায় উঠে ঢেউ—
 তারি মাঝে ফুকারে কান্ডারী—
 “নতুন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।”
 বাহিরিয়া এল কারা? মা কঁদিছে পিছে,
 প্রেমসী দাঁড়ায় স্ফারে নয়ন মন্দিছে।
 ঝড়ের গর্জনমাঝে
 বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
 ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাভল;
 “যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল”,
 উঠেছে আদেশ,
 “বন্দরের কাল হল শেষ।”

মৃত্যু ভেস করি’
 দুলিয়া চলেছে তরী।
 কোথায় পেঁপীছবে ঘাটে, কবে হবে পার,
 সময় তো নাই শূন্যবার।
 এই শূন্য জানিয়াছে সার
 তরঙ্গের সাথে লড়ি
 বাহিয়া চলিতে হবে তরী;
 টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
 আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল—
 বাঁচি আর মরি
 বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
 এসেছে আদেশ—
 বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
 মেঘাকার লাগি
 উঠিয়াছে জাগি
 ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শুন্যে শুন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।

মরণের গান
 উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
 ঘোর অন্ধকারে।
 যত দঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
 যত অশ্রুজল,
 যত হিংসা হলাহল,
 সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া,
 কল উল্লিখিয়া,
 উর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
 তবু বেয়ে তরী
 সব ঠেলে হতে হবে পার,
 কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
 গিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দীন,
 চিন্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
 হে নিভীক, দঃখ-অভিহত!
 ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত!
 এ আমার এ তোমার পাপ।
 বিধাতার বক্ষে এই তাপ
 বহু যুগ হতে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
 ভীরুর ভীরুতাপজ, প্রবলের উন্মত্ত অন্যায়,
 লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
 বণিজের নিত্য চিত্তকোভ,
 জাতি-অভিমান,
 মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
 বিধাতার বক্ষ আজ বিদীরিয়া
 ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
 ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
 নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
 রাখো নিন্দাবাগী, রাখো আপন সাধু-অভিমান,
 শূন্য একমনে হও পার
 এ প্রলয়-পারাবার
 নতুন সৃষ্টির উপকূলে
 নতুন বিজয়ধ্বজা তুলে।
 দঃখে দেখিছি নিত্য, পাপেরে দেখিছি নানা ছলে;
 অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
 মৃত্যু করে লুকাচুরি
 সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
 ভেসে যায় তারা সরে যায়
 জীবনেরে করে যায়
 কণিক বিদ্রুপ।
 আজ দেখো তাহাদের অপ্রভেনী বিরাট স্বরূপ।

তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বদকে—
“তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।”

মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভান্ডারী শোধাবে না
এত ধন?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

কলিকাতা
২০ কার্তিক ১৩২২

৩৮

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী,
তাই আমার এই নতন বসনখানি।
নতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখতে কি পায় কেউ।
সেই নতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নতন বসনখানি।
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বদকে টানি।

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
নতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নতন হাসি ফোটে,

ভারি সপ্পে, যতনভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয়-যে তারে আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদনভরা শূন্য চোখের গানে।
মিলব তখন বিশ্বমাঝে আমরা দৌঁছে একা,
যেন নূতন দেখা।

তখন আমার অঙ্গ ভারি' নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ,
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ,
তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানি,
কখনো জাফরানি,
আজ তোরা দেখ্ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোয়া আকাশ যেন নবীন আসমানি।

অকুলের এই বর্ণ, এ যে দিশাহারার নীল,
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইছে দূরের হাওয়া
সাগরপানে ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টিভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী।

পদ্মা
১২ অগ্রহায়ণ ১৩২২

৩৯

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলন্ডের দিক্ প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বন্ধের কাছে, ভেবেছিল বৃষ্টি তারি তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি'
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অণ্ডল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত ভূগঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। স্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্য-বন্দনাসংগীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি' শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে;

নিষেছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিহ্ন উদ্ভাসিয়া; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপদ্মে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

শিলাইদহ
১০ অগ্রহায়ণ ১০২২

৪০

এইক্ষণে

মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে
যে তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
সে তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিন্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সংগীত,
নিঃশব্দের উদার ইংগিত।

আজি মনে হয় বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছ কত দেখা
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা।
সেই-সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেগুনবনে ঝিলিঝিলি পাতার ঝলক-ঝিকঝিক।

কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেমসীর মূখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝংকারি উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।
তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

শিলাইদহ
৭ ফাল্গুন ১০২২

যে কথা বলিতে চাই,
 বলা হয় নাই,
 সে কেবল এই—
 চিরদিবসের বিশ্ব আধিসম্মুখেই
 দেখিন্দু সহস্রবার
 দুরারে আমার।
 অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
 এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
 সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
 আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;
 নদীর এপারে ঢালু তটে
 চাষী করিতেছে চাষ;
 উড়ে চলিয়াছে হাঁস
 ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
 চলে কি না-চলে
 ক্রান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
 আধো-জাগা নরনের মতো।
 পথখানি বাঁকা
 বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
 চলেছে মাঠের ধারে—ফসল-খেতের ঘেন মিতা—
 নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
 ওই খেয়াঘাট,
 ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
 নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলি-কল্লোলে
 যেখানে বসায় মেলা—এই-সব ছবি
 কতদিন দেখিয়াছে কবি।
 শূন্য এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
 এই আলো, এই হাওয়া,
 এইমতো অক্ষুটধ্বনির গুঞ্জন,
 ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
 অকস্মাৎ নদীস্রোতে
 ছায়ার নিঃশব্দ সংগঠন,
 যে আনন্দ-বেদনার এ জীবন ধারে ধারে করেছে উদাস
 হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

তোমাতে কি বার বার করেছি ন্দ্র অপমান।
 এসেছিলে গেয়ে গান
 ভোরবেলা;
 ঘুম ভাঙাইলে ব'লে মেরেছি ন্দ্র ঢেলা
 বাতায়ন হতে,
 পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে!
 ক্ষুধিত দরিদ্রসম
 মধ্যাহ্নে এসেছ স্বারে মম।
 ভেবেছি ন্দ্র, 'এ কী দায়,
 কাজের ব্যাঘাত এ-যে।' দূর হতে করেছি বিদায়।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
 জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অশ্রুত
 দৃঃস্বপ্নের মতো।
 দস্যু ব'লে শত্রু ব'লে ঘরে স্বার যত
 দিনে রোধ করি।
 গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি।
 এরি লাগি এসেছিলে, হে বন্ধু অজানা—
 তোমাতে করিব মানা,
 তোমাতে ফিরায়ে দিব, তোমাতে মারিব,
 তোমা-কাছে যত ধার সকলি ধারিব,
 না করিয়া শোধ
 দুরার করিব রোধ।

তার পরে অধরাতে
 দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধূলাতে
 মনে হবে আমি বড়ো একা
 যাহারে ফিরায়ে দিনে বিনা তারি দেখা।
 এ দীর্ঘ জীবন ধরি
 বহুমান্যে যাহাদের নিয়েছি ন্দ্র বরি
 একাগ্র উৎসুক,
 আধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মূখ।
 যে আসিলে ছিন্দ্র অন্যমনে,
 যাহারে দেখি নি চেরে নয়নের কোণে,
 যারে নাহি চিনি,
 যার ভাষা বুদ্ধিতে পারি নি,

অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মৃদু নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারেবারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারেবারে-ফিরে-আসা হয়ে।

শিলাইদা
৮ ফাল্গুন ১৩২২

৪৩

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে।
দুঃখ-সুখের লীলা
ভাবিস এ কি রইবে বন্ধে চেপে
জগন্দলন-শিলা।
চলোঁছিস রে চলাচলের পথে
কোন সার্থির উধাও মনোরথে?
নিমেষতরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ ঢিলা।

শিশু হয়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরই বিষম দোলার দোলে
কাটল কেঁদে হেসে।
রাগে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা।
আবার কবে কী সুর বাঁধা হবে
আজকে পালার শেষে।

চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইকো তাদের ভার।
কোথা তাদের রইবে খলি-খালি,
কোথা বা সংসার।
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া যাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া;
বেঁকে বেঁকে আকার একে একে
চলছে নিরাকার।

ওরে পখিক, ধর-না চলার গান,
বাজা রে একতারা।
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইকো কূল-কিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কাষা-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,

প্রাণ-বসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধন-হারা।

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ;
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মৃখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সামনে সে-ও প্রেমের কাঁদন-ভরা
চির-নিরুদ্দেশ।

বন্ধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এমনি ভালোবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজবে গো এই সূরে
কোন্ মৃখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুটবে আবার হেসে।

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলোছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলেম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরে
নেব যে তার গান।

সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলি-বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালাখানি
পরালো মোর শিরে।

পথের বাকি হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুদ্ধ নিমেষতরে।

সন্ধ্যা-আলোর রয় সে বসে একা
উদাস প্রান্তরে।
এমনি করেই তার সে আসা-যাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
মর্মরে মর্মরে।

জোয়ার-ভাটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হল না ঘর-বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরই জাল-বোনা।

শান্তিনিকেতন
২৯ ফাল্গুন ১৩২২

৪৪

যৌবন রে, তুই কি রবি স্বেচ্ছা খাঁচাতে।
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের 'পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগরপারের পাশে,
তোমর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোমর বাসার সম্মানে রে
অবাধ যে তোমর ধাওয়া;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোমর যে দাবিদাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আরদ্র ভিখারী।
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারী।
মৃত্যু যে তার পারে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে;
বসে আছে মানিনী তোমর প্রিয়া
মরণ-ছোমটা টানি।
সেই আবরণ দেখে রে উতারিয়া
মৃৎ সে মৃৎখানি।

যৌবন রে, রয়েছ কোন্‌ তানের সাধনে।
 তোমার বাণী শ্রবণ পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
 পুথির বাঁধনে।
 তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
 অরণ্যে আপনাকে তার চিনায়,
 তোমার বাণী জাগে প্রলয়মেঘে
 ঝড়ের ঝংকারে;
 ঢেউয়ের 'পরে বাজিয়ে চলে বেগে
 বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গন্ডিতে।
 বয়সের এই মায়াজালের বানধনখানা তোরে
 হবে খন্ডিতে।
 খজাসম তোমার দীপ্ত শিখা
 ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা,
 জীর্ণতারই বন্ধ দৃ-ফাঁক করে
 অমর পদ্প তব
 আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
 ফুটুক নিত্য নব।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধূলার সন্নিহিত।
 আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন শ্লানিভারে
 রইবি কুন্ঠিত?
 প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি
 তোমার তরে প্রত্যাষে দেয় আনি,
 আগুন আছে উষ্মশিখা জেদলে
 তোমার সে যে কবি।
 সূর্য তোমার মূখে নয়ন মেলে
 দেখে আপন ছবি।

শান্তিনিকেতন
 ৪ মে ১৩২২

৪৫

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাগি
 ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
 তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
 রুদ্ধের ভৈরব গান।
 দূর হতে দূরে
 বাজে পথ শীর্ণ তীর দীর্ঘতান সূরে,
 যেন পথহারা
 কোন্‌ বৈরাগীর একতারা।

ওরে ষাঠী,
 ধূসর পথের ধূলা সেই তোমার ধাঠী;
 চলার অণ্ডলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বন্ধেতে আবরি
 ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি'
 দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
 ঘরের মঙ্গলশব্দ নহে তোমার তরে,
 নহে রে সম্ভার দীপালোক,
 নহে প্রেমসীর অশ্রু-চোখ।
 পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
 শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
 পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
 পথে পথে গদ্যন্তসর্প গদ্যফণা।
 নিন্দা দিবে জয়শব্দনাদ
 এই তোমার রুদ্ধের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
 চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
 সে তো নহে সুখ ওরে, সে নহে বিজ্ঞান,
 নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
 মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
 দ্বারে দ্বারে পারি মানা,
 এই তোমার নব বৎসরের আশীর্বাদ,
 এই তোমার রুদ্ধের প্রসাদ।
 ভয় নাই, ভয় নাই, ষাঠী,
 ঘরছাড়া দিকহারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাঠী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
 ওই কেটে গেল, ওরে ষাঠী।
 এসেছে নিষ্ঠুর,
 হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
 হোক রে মদের পাত্র চূর।
 নাই বদ্বি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
 ধরো তার পাণি;
 ধনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।
 ওরে ষাঠী
 গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।

পলাতকা

পলাতকা

ওই ষেখানে গিরীষ গাছে
ঝরু-ঝরু কাঁচ পাতার নাচে
ঘাসের 'পরে ছায়াখানি কাঁপায় ধরধর
ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর—
ওইখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে
হেনা-বেড়ার কোণে
শীতের রোদে সারা সকালবেলা।
তারি সঙ্গে করত খেলা
পাহাড়-থেকে-আনা
ঘন রাঙা রৌরায় ঢাকা একটি কুকুরছানা।
যেন তারা দুই বিদেশের দুটি ছেলে
মিলেছে এক পাঠশালাতে, একসাথে তাই বেড়ায় হেসে খেলে।
হাটের দিনে পথের কত লোকে
বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেত, দেখত অবাক-চোখে।

ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন হাওয়া,
শিউরে উঠে আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙিন-চিঠি-পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হল শরুদ,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে জাগল কাঁপন দরুদদরুদ।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা তা কি জানি।
তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে;
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে
চমকে দাঁড়ায় বোঁকে।

একদা এক বিকালবেলায়
আমলকী-বন অধীর যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলার,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমার বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে।
সম্মুখে তার জীবনমরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।

ভেবেছিলেন আঁধার হলে পরে
ফিরবে ঘরে
চেনা হাতের আঁধার পাবার ভরে।

কুকুরছানা বারে বারে এসে
 কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে
 কেঁদে কেঁদে চোখের চাওয়ায় শূন্যায় জনে জনে,
 'কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দেখি অঙ্গনে।'
 আহা ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তার সাথী।
 অধার হল, জ্বলল ঘরে বাতি:
 উঠল তারা; মাঠে মাঠে নামল নীরব রাত্তি।
 আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে,
 'নাই সে কেন, যার কেন সে কাহার তরে।'

কেন যে তা সে-ই কি জানে। গেছে সে যার ডাকে
 কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে।
 আকাশ হতে, আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে
 দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
 স্রোতে তাহার কেমন এলোমেলো
 কিসের খবর এল।
 বৃকে যে তার বাজল বর্ষা বহুদূরের ফাগুন-দিনের সুরে—
 কোথায় অনেক দূরে
 রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন,
 তারেই অন্বেষণ।
 জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
 আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
 আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে।
 কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
 সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে।
 অধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
 আলোক তারে রাখল না আর বেঁধে।

চিরদিনের দাগা

ওপার হতে এপার পানে খেঁয়া নৌকো বেয়ে
 ভাগ্য নেয়ে
 দলে দলে আনছে ছেলেমেয়ে।
 সবাই সমান তারা
 এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপাফুলের পারা।
 তাহার পরে অন্ধকারে
 কোন্ ঘরে সে পৌঁছিয়ে দেয় কারে!
 তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনী-জাল বোনা—
 দৃষ্টিতে সৃষ্টি দিন-মুহূর্ত গোনা।

একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে,
জননী তার লজ্জা পেল; ভাবল কোথা থেকে
অবাহিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইছে যখন চাষী
নামল যেন শিলাবৃষ্টিরশি।

বিনা-দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হল গুরু,
পদে পদে অপরাধের বোঝা হল গুরু।
কারণ বিনা যে-অনাদর আপনি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় 'পোড়ারমুখী', শাসন করে বাপ—
এ কোন্ অভিশাপ
হতভাগী আনলি বয়ে—শুদ্ধ কেবল বেঁচে-থাকার পাপ।
যতই তারা দিত ওরে গালি
নির্মলারে দেখত মলিন মাখিয়ে তারে আপন কথার কালি।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিন্দু ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামেশি।
'দাদা' বলে
গলা আমার জড়িয়ে ধরে বসত আমার কোলে।
নাম শুধালে শৈল আমায় বলত হাসি হাসি—
'আমার নাম যে দুষ্টু, সর্বনাশী!'
যখন তারে শুধাতেম তার মুখটি তুলে ধরে
'আমি কে তোমার বল দেখি ভাই মোরে?'
বলত 'দাদা, তুই যে আমার বর।'—
এমনি করে হাসাহাসি হত পরস্পর।

বিয়ের বয়স হল তবু কোনোমতে হয় না বিয়ে তার—
তাঁহে বাড়ায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্মা থেকে পাছ গেল জুটি।
অল্পদিনের জুটি;
শুভকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেরেটিরে সঙ্গে নিয়ে রেগুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বলতে গেলেম হেসে—
'বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে ভাই বরণ করলি শেষে?'
অমনি যে তার দৃ-চোখ পেল জেগে

ঝরঝরিয়ে চোখের জলে। আমি বলি, 'ছি ছি,
কেন শৈল, কাদিস মিছিমিছি,
করিস অমঙ্গল।'

বলতে গিয়ে চক্ষে আমার রাখতে নারি জল।

সাজল বিয়ের বাঁশি,
অনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল দৃষ্টে সর্বনাশী।
যাবার বেলা বলে গেল, 'দাদা, তোমার রইল নিমন্ত্রণ,
তিন-সত্যি—ষেয়ো যেয়ো।' 'যাব, যাব, যাব বৈকি বোন।'
আর কিছু না বলে
আশীর্বাদের মোতির মালা পরিয়ে দিলেম গলে।

চতুর্থ দিন প্রাতে
খবর এল, ইরাকতীর সাগর-মোহানাতে
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে।
আবার ভাগ্য নেয়ে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্ পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে!
কেন এল কেনই গেল কেই বা তাহা জানে।
নিমন্ত্রণটি রেখে গেল শুধু আমার প্রাণে।
যাব যাব যাব, দিদি, অধিক দেরি নাই,
তিন-সত্যি আছে তোমার, সে কথা কি ভুলতে পারি ভাই।
আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে
খবর পেলেম পরে।
গালিয়ে বৃকের বাথা
লিখে রাখি এইখানে সেই কথা।

দিনের পরে দিন চলে যায় ওদের বাড়ি বাই নে আমি আর।
নিরে আপন একলা প্রাণের ভার
আপন মনে
থাকি আপন কোণে।
হেনকালে একদা মোর ঘরে
সন্ধ্যাবেলায় বাপ এল তার কিসের তরে।
বললে, "খুড়ো একটা কথা আছে,
বলি তোমার কাছে।
শৈল যখন ছোটো ছিল, একদা মোর বাস্ন খুঁলে দেখি
হিসাব-লেখা খাতার 'পরে এ কী
হিজিবিজি কালির আঁচড়। মাথায় যেন পড়ল ক্রোধের বাজ।
বোঝা গেল শৈলরই এ কাজ।
খান্না-খন্ন গালিমন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল—
হঠাৎ তখন মনে এল আশ্রিতর কৌশল।

মানা করে দিলেম তারে
তোমার বাড়ি যাওয়া একেবারে।
সবার চেয়ে কঠিন দৃষ্ট! চূপ করে সে রইল বাক্যহীন
বিদ্রোহিণী বিষম ক্রোধে। অবশেষে বারো দিনের দিন
গরবিনী গর্ব ভেঙে বললে এসে, 'আমি
আর কখনো করব না দৃষ্টামি।'
আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই ক'খানা পাতা
আজকে আমার মৃৎখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো।
হিসাবের সেই অঙ্কগুণার সময় হল গত :
সে শাস্তি নেই, সে দৃষ্ট নেই :
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশু-হাতের আঁচড় ক'টি আমার বুকে লাগা।"

মৃষ্টি

ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিওরের ওই জানলা দৃষ্টো—গায়ের লাগুক হাওয়া।
ওষুধ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
ভিত্তো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে।
বেঁচে থাকা সেই বেন এক রোগ :
কত রকম কবিরাজী, কতই মৃষ্টিযোগ,
একটুমাথ অসাবধানেই বিষম কর্মভোগ।
এইটে ভালো, ওইটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চন্দ্র, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমার বললে লক্ষ্মী সতী,
ভালোমানুষ অতি!

এ সংসারে এসেছিলাম ন-বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পেঁপেছিলাম আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি জবাব এমন সময় ছিল কোথা।
এই জীবনটা ভালো, কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হোক-একটা-কিছু
সে-কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু।

একটানা এক ক্লান্ত সুরে
 কাজের ঢাকা চলছে ঘরে ঘরে।
 বাইশ বছর রয়েছি সেই এক-চাকাতেই বাঁধা
 পাকের ঘোরে আঁধা।
 জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
 কী অর্থে যে ভরা।
 শূনি নাই তো মানুষের কী বাণী
 মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
 রাখার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাখা,
 বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
 মনে হচ্ছে সেই চাকাটা—ওই যে থামল যেন:
 থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন।

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঁঙিনায়।
 গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়
 দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম-দোলায় দোল:
 হেঁকেছিল, “খোল্ রে দুয়ার খোল্।”
 সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে।
 হয়তো মনের মাঝে
 সংগোপনে দিত নাড়া; হয়তো ঘরের কাজে
 আচম্বিতে ভুল ঘটাত; হয়তো বাজত বৃকে
 জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ-ভোলা দৃঃখে সূখে
 হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়েল শব্দ শূনে,
 বিহ্বল ফাল্গুনে।
 তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যাবেলায়
 পাড়ায় কোথা শতরঞ্জ খেলায়।
 থাক্ সে-কথা।
 আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
 বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
 জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
 আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
 আমি নারী, আমি মহীয়সী,
 আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিম্নাবিহীন শশী।
 আমি নইলে মিথ্য হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
 মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।

বাইশ বছর ধরে
 মনে ছিল, বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
 দৃষ্ট্য তবু ছিল না তার তরে,
 অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।

ষেথায় যত জ্যাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মূখের কথা!
আজকে কখন মোর
কাউল বাধন-ডোর।
জনম-মরণ এক হয়েছে ওই যে অকূল বিরাট মোহানায়,
ওই অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্।
মরণ-বাসরঘরে আমার যে দিয়েছে ডাক
স্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমার করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সন্ধানস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ওই যে আমার মূখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
বার্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

ফাঁকি

বিন্দুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কোটো হল জড়ো।
বছর-দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, “হাওয়া বদল করো।”
এই সুযোগে বিন্দু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শব্দরবাড়ি।
নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে;
মিলন ছিল ছাড়া ছাড়া,
চাপা হাসি ঢুকরো কথার নানান জোড়াজোড়ি।

আজকে হঠাৎ ধরিয়া তার আকাশভরা সকল আলো ধরে
 বর-বধূরে নিলে বরণ করে।
 রোগা মৃৎখের মস্ত বড়ো দৃষ্টি চোখে
 বিন্দুর যেন নতুন করে শব্দদৃষ্টি হল নতুন লোকে।
 রেল-লাইনের ওপার থেকে
 কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
 বিন্দু আপন বাস্র খুলে
 টাকা সিকে বা হাতে পায় ভুলে
 কাগজ দিয়ে মৃড়ে
 দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
 সবার দৃষ্টি দূর না হলে পরে
 আনন্দ তার আপনারি ভার বইবে কেমন করে।
 সংসারের ওই ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
 আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে—
 তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
 ভরতে হবে সে-যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
 বিন্দুর মনে জাগছে বায়েবার
 নিখিলে আজ একলা শব্দ আমিই কেবল তার;
 কেউ কোথা নেই আর
 শব্দর ভাসুর সামনে পিছে ডাইনে বায়ে;
 সেই কথাটা মনে করে পলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইন্স্টেশনে বদল হবে গাড়ি;
 তাড়াতাড়ি
 নামতে হল, ছ-ঘণ্টা কাল থামতে হবে যাত্রীশালার,
 মনে হল এ এক বিষম বালাই!
 বিন্দু বললে, “কেন, এই তো বেশ।”
 তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।
 পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা—
 আনন্দে তাই এক হল তার পৌছনো আর চলা।
 যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে—
 “দেখো, দেখো, একাগাড়ি কেমন চলে।
 আর দেখেছ বাছুরটি ওই, আ মরে বাই, চিকন নখর দেহ,
 মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ।
 ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি—
 সিসুগাছের তলাটিতে পাঁচলঘেরা ছোট বাড়ি
 ওই যে রেলের কাছে—
 ইন্স্টেশনের বাবু থাকে?—আহা ওরা কেমন সুখে আছে।”

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
 বলে দিলেম, “বিন্দু, এবার চুপটি করে শুয়োও আরামেতে।”

স্প্যাটফরমে চেয়ার টেনে
 পড়তে শুরুর করে দিলেম ইংরেজি এক নম্বল কিনে এনে।
 গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
 ঘণ্টা-তিনেক হয়ে গেল পার।
 এমন সময় যাত্রীঘরের স্ৱারের কাছে
 বাহির হয়ে বললে বিন্দু, “কথা একটা আছে।”
 ঘরে ঢুকে দেখি কে-এক হিন্দুস্থানী মেয়ে
 আমার মুখে চেয়ে
 সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার ধাম।
 বিন্দু বললে, “রুক্মিণী ওর নাম।
 ওই যে হোথায় কুয়ার ধারে সারবাধা ঘরগদলি
 ওইখানে ওর বাসা আছে, স্ৱামী রেলের কুলি।
 তেরোশো কোন্ সনে
 দেশে ওদের আকাল হল—স্ৱামী-স্ৱাী দুইজনে
 পারিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
 সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গায়ে কী-এক নদীর ধারে—”
 বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,
 “রুক্মিণীর এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে।
 আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সার
 অধিক ক্রতি হবে না তার কারো।”
 বাকিয়ে ভুরদু, পারকিয়ে চক্কদু, বিন্দু বললে খেপে—
 “কথখনো না, বলব না সংক্ষেপে।
 আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে।
 আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।”
 নম্বল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে।
 রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
 বিস্তারিত শুনেনে গেলেম আমি।
 আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামী।
 কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
 পইচে তাবিজ বাজুবন্ধ গাড়িয়ে দেওয়া চাই;
 অনেক টেনেটুনে তবু পশ্চিম টাকা খরচ হবে তারি;
 সে ভাবনাটা ভারি
 রুক্মিণীয়ে করেছে বিরত।
 তাই এবারের মতো
 আমার 'পরে ভার
 কুলি নারীর ভাবনা ঘোচাবার।
 আজকে গাড়ি চড়ার আগে একেবারে খোকে
 পশ্চিম টাকা দিতেই হবে ওকে।

অবাক কান্ড এ কী।

এমন কথা মান্দু শুনেনেছে কি।

জাভে হরতো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ঠাচা,

যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,

পাঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে!

এমন হলে দেউলে হতে কদিন বাকি থাকে।

“আচ্ছা আচ্ছা, হবে হবে। আমি দেখছি, মোট

একশো টাকার আছে একটা নোট,

সেটা আবার ভাঙানো নেই!”

বিন্দু বললে, “এই

ইন্সট্রিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।”

“আচ্ছা, দেব তবে”

এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,

আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে—

“কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি!

প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও! ঘোচাব নষ্টামি!”

কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধরে

দু টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে।

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।

ফিরে এলেম দু মাস যেই ফুরাল।

বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,

একলা আমি।

শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি

বিন্দু আমার বলেছিল, “এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি

শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় হবে মম

বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিন্ধের পরে নিত্য-সিন্ধুর সম।

এই দুটি মাস সন্ধ্যায় দিলে ভরে

বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।”

ওগো অন্তর্যামী,

বিন্দুরে আজ জানাতে চাই আমি

সেই দু-মাসের অর্ধে আমার বিষম বাকি,

পাঁচিশ টাকার ফাঁকি।

দিই যদি আজ রুক্মিণীয়ে লক্ষ টাকা

তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।

বিন্দু যে সেই দু-মাসটিয়ে নিয়ে গেছে আপন সাথে,

জানল না তো ফাঁকিসদৃশ দিলেম তারি হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি শূন্যই সবার কাছে,

“রুক্মিণী সে কোথায় আছে।”

প্রশ্ন শূন্যে অবাক মানে—

রুক্মিণী কে তাই বা কজন জানে।

অনেক ভেবে “ঝামরু কুলির বউ” বললেম যেই,
 বললে সবে, “এখন তারা এখানে কেউ নেই।”
 শূধাই আমি, “কোথায় পাব তাকে।”
 ইস্টেশনের বড়োবাবু রোগে বলেন, “সে খবর কে রাখে।”
 টিকিটবাবু বললে হেসে, “তারা মাসেক আগে
 গেছে চলে দার্জিলিং কিংবা খসরুবাগে,
 কিংবা আরাকানে।”
 শূধাই যত, “ঠিকানা তার কেউ কি জানে।”—
 তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ।
 কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো আমার আজ
 সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন;
 ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
 “এই দুটি মাস শূধায় দিলে ভরে”
 বিন্দুর মূখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
 রয়ে গেলেম দায়ী
 মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী।

মায়ের সম্মান

অপূর্বদের বাড়ি
 অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা-সাতটা গাড়ি;
 ছিল কুকুর, ছিল বেড়াল, নানান রঙের ঘোড়া
 কিছু না হয় ছিল ছ-সাতজোড়া;
 দেউড়ি-ভরা দোবে-চোবে, ছিল চাকর দাসী,
 ছিল সহিস বেহারা চাপরাসি।
 —আর ছিল এক মাসি।
 স্বামীটি তার সংসারে বৈরাগী,
 কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি
 স্ত্রীর হাতে তার ফেলে
 বালক দুটি ছেলে।
 অনাথীদের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
 তাই সে হেথায় আছে
 ধনী বোনের স্বারে।
 একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কী করে আপনারে
 মূছবে একেবারে।
 পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে
 কেউ বা বলে ওঠে, “আপদ জুটল কোথা থেকে”—
 আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জারগা জোড়ে কম,
 সবার চেয়ে বেশি পরিগ্রহ।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্ট ছেলে,
 তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
 বিধাতা যে প্রকান্ড এই ধরা;
 অঙ্গে তাদের দূরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।
 শিশুচিন্ত-উৎসধারা বন্ধ করে দিতে
 বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে।
 কাতর চোখে করুণ সুরে মা বলে, “চুপ চুপ—”
 একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ।
 ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা,
 তাদের মূখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা;
 খুশি হলে রাখবে চাপি
 কোনোমতেই করবে নাকো লাফালাফি।
 অপূর্ণ আর পূর্ণ ছিল এদের একবয়সী:
 তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হত পদে পদেই দোষী।
 তারা এদের মারত ধড়াধড়ু:
 এরা যদি উলটে দিত চড়,
 থাকত নাকো গন্ডগোলের সীমা—
 উভয় পক্ষেরই মা
 কানাই বলাই দৌহার পরে পড়ত ঝড়ের মতো,
 বিষম কান্ড হত
 ডাইনে বাঁয়ে দু-ধার থেকে মারের পরে মেরে।
 বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
 ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি
 থাকত উপবাসী—
 চোখের জলে বন্ধ যেত ভাসি।

অবশেষে দুটি ছেলে মেনে নিল নিজের এই দশা।
 তখন তাদের চলাফেরা ওঠাবসা
 স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
 পাখিহারা পক্ষীনীড়ের প্রায়।
 এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
 ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল দাবি;
 ঘুচে গেল ন্যায়বিচারের আশা,
 রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা।
 সকল দুঃখ দুটি ভাইয়ে করল পরিপাক
 নিঃশব্দ নির্বাক।

চক্ষে অঁধার দেখত ক্ষুধার ঝোঁকে—
 পাছে খাবার না থাকে, আর পাছে মায়ের চোখে
 জল দেখা দেয়, তাই
 বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত, “ক্ষুধা নাই।”
 অসুখ করলে দিত চাপা: দেবতা মানুষ পারে
 একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে।

প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ পেজ এরা
 ক্লাসে সবার সেরা,
 অপূর্ব আর পূর্ণ এল শূন্যহাতে বাড়ি।
 প্রমাদ গণি, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি
 মা ডেকে কয় কানাই বলাইয়েরে—
 “ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে
 তোদের প্রাইজ দুটি।
 তার পরে যা ছুটি
 খেলা করতে চৌধুরীদের ঘরে।
 সন্ধ্যা হলে পরে
 আঁসিস ফিরে, প্রাইজ পেলি কেউ যেন না শোনে।”
 এই বলে মা নিয়ে ঘরের কোণে
 দুটি আসন পেতে
 আপন হাতের খইয়ের মোয়া দিল তাদের খেতে।

এমনি করে অপমানের তলে
 দুঃখদহন বহন করে দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে।
 এই জীবনের ভার
 যত হালকা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার।
 সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান –
 আগুন তারি শিখার সমান
 জ্বলছে এদের প্রাণপ্রদীপের মুখে।
 সেই আলোটি দৌহার দুঃখে সুখে
 যাচ্ছে নিয়ে একটি লক্ষ্যপানে—
 জননীয়ে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে।

কানাই বলাই
 কালেজেতে পড়ছে দুটি ভাই।
 এমন সময় গোপনে এক রাতে
 অপূর্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙল আপন হাতে,
 করল চুরি পাল্লামোতির হার;
 থিয়েটারের শখ চেপেছে তার।
 পুঁলিস-ডাকডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে;
 যখন ধরা পড়ে-পড়ে
 অপূর্ব সেই মোতির মালাটিরে
 ধীরে ধীরে
 কানাইদাদার শোবার ঘরে বালিশ দিয়ে ঢেকে
 লুকিয়ে দিল রেখে।
 যখন বাহির হল শেষে
 সবাই বললে এসে—
 “তাই না শাস্তে করে মানা
 দুখে কলার পুষতে সাপের ছানা।

ছেলেমানুষ, দোষ কী ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।”

কানাই বলাই জ্বলে ওঠে প্রলয়বাহিপ্রায়,
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।
মা বললেন, “আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁর অপমান।”
দুই ছেলে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি;
রইল চেয়ে দোবে-চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী,
ঘোড়ার সহিস, বেহারা চাপরাসি।

অপমানের তীর আলোক জেলে
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চলে চলে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড়ো আদালতে।
মনের মতো বউ এসেছে, একটি-দুটি আসছে নাতনী নাতি—
জুটল মেলা সুখের দিনের সাথী।
মা বললেন, “মিটেবে এবার চিরদিনের আশ—
মরার আগে করব কাশীবাস।”
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পূজোর ছুটির দিনে
মনের মতো বাড়ি দেখে
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছরখানেক না পেরোতেই শ্রাবণমাসের শেষে
হঠাৎ কখন মা ফিরলেন দেশে।
বাড়িসুন্দর অবাধ সবাই—মা বললেন, “তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বৃদ্ধি হল, অপূর্বকে পূরতে দিবি জেলে?”
কানাই বললে, “তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্বলেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের 'পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।”

মা বললেন, “ভুলবি কেন। মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তা হলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর কাহারো 'পরে
বাইরে কিংবা ঘরে।

মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেন তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে
তখন আমার মনে হল, আমি যদি স্বপ্নমাত্র হই
জেনে দেখি আমি যদি কোথাও কিছু নই
তা হলে হয় ভালো।

মনে হল শত্রু আমার আকাশভরা আলো,
দেবতা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা—
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা।
তাই তো বলি বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায় না যেন কোনো জনা
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।”

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল অল্প লোকেই জানে,
বলে রাখি সে-কথা এইখানে।

বারো বছর পরে
অপূর্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিনটে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ করে সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
তবিল-ভাঙার জাল হিসাবে দায়ে ঠেকেছে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল বন্ধি; তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বললে, “মনে কি নেই।” অপূর্ব কয় নতমুখে,
“অনেকদিন সে গেছে চুকেবুকে।”
“চুকে গেছে?” কানাই উঠল বিষম রাগে জ্বলে,
“এতদিনের পরে যেন আশা হচ্ছে চুকে যাবে বলে।”
নীচের তলায় বলাই আপিস করে—
অপূর্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুকল তারি ঘরে।
বললে, “আমায় স্বাক্ষর করো।”
বলাই কেঁপে উঠল থরথর।
অধিক কথা কয় না সে যে; ঘণ্টা নেড়ে ডাকল দরওয়ানে।
অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে মানে।

অপূর্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে;
এদের ঘরে নিজে
আসতে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।
অনেক স্বাক্ষর করে ইতস্তত
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।
পূর্ণ বললে, “স্বাক্ষর করো মাসি।”

এরি পরে কাশী থেকে মা আসলেন ফিরে।
 কানাই তাঁরে বললে ধীরে ধীরে—
 “জান তো মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য,
 এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য।
 বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,
 উচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে।”
 কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে
 অপ্রসন্ন মুখে।
 বললে, “হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে
 দেখব তখন বিবেচনা করে।”

মা বললেন, “তোরা বলিস কী এ।
 একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে
 আরেক দুঃখে বিম্ব করবি মর্ম!
 এই কি তোদের ধর্ম!”
 এত বলি বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি:
 তারা বলে, “যাচ্ছ কোথায়।” মা বললেন, “অপূর্বদের বাড়ি।
 দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে,
 রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে।”
 “রোসো রোসো, থামো থামো, করছ এ কী।
 আচ্ছা, ভেবে দেখি।
 তোমার ইচ্ছা যবে
 আচ্ছা না-হয় যা বলছ তাই হবে।”
 আর কি থামেন তিনি!
 গেলেন একাকিনী
 অপূর্বদের ঘরে তাদের মাসি।
 ছিল না আর দোবে-চোবে, ছিল না চাপরাসি।
 প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী।

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, “মঞ্জুলী মোর ওই তো কচি মেয়ে,
 ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে?—বয়সে ওর চেয়ে
 পাঁচগুনো সে বড়ো;
 তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
 এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।”

বাপ বললে, “কাল্মা তোমার রাখো!
 পণ্ডাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
 জান না কি মস্ত কুলীন ও যে।
 সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব।

ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব।”

মা বললে, “কেন ওই যে চাটুজ্জদের পদলিন,
নাই বা হল কুলীন—

দেখতে যেমন, তেমনি স্বভাবখানি,
পাস করে ফের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুকরো ছেলে।

এক-পাড়াতে থাকে ওরা— ওরি সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুস হল; ওকে যদি বলি আমি আজই
এখুঁখনি হয় রাজি।”

বাপ বললে, “খামো,
আরে আরে রামোঃ!

ওরা আছে সমাজের সব তলায়।
বামুন কি হয় পৈতে দিলেই গলায়?
দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল! রাধে!
স্বীবদ্বি কি শাস্ত্রে বলে সাধে!”

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শূন্যে
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হানছে যেন বেদনা-বিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে—
সুখে দুঃখে স্বেষে রাগে
ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য।
তার জীবনের রথের চাকা চলল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঁপুখানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই।

তিনি বলেন, তার সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য,
মেয়েমানুষ বদ্বাবে না তার মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রুদানীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হল পণ্ডাননের সাথে।
বিদায়বেলায় মেয়েকে বাপ বলে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি,
“হও তুমি সাক্ষীর মতো এই কামনা করি।”

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
 আশীর্বাদের প্রথম অংশ দৃ মাস যেতেই ফলল কেমন করে—
 পণ্ডাননকে ধরল এসে যমে;
 কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
 ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে,
 মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মূছে শিরে।

দৃখে সৃখে দিন হয়ে যায় গত
 স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো,
 অবশেষে হল
 মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
 কখন শিশুকালে
 হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে
 বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
 প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি;
 জানত না তো আপনাকে সে,
 শূন্য নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে খ্যাপা বাতাস এসে,
 সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
 মধুর রসে ভরে উঠে।
 সে যে প্রেমের ফুল
 আপন রাঙা পার্শ্বভারে আপনি সমাকুল।
 আপনাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাকি,
 তাইতো থাকি থাকি
 চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
 আকাশপারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝরনা বেয়ে;
 রাতের অন্ধকারে
 কোন্ অসীমের রোদনভরা বেদন লাগে তারে।
 বাহির হতে তার
 ঘুচে গেছে সকল অলংকার;
 অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
 তাই দেখে সে আপনি ভেবে মরে।
 কখন কাজের ফাঁকে
 জানলা ধরে চূপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
 যেখানে ওই শঙ্কনে গাছের ফুলের ঝড়ি বেড়ার গায়ে
 রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
 আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি।

যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথী
 আজ সে কেমন করে
 জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে।
 অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
 মিলিয়ে গেল চূপে চূপে।

পায়ের শব্দ তারি
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গদগদনানি।

মেয়ের নীরব মূখে
কী দেখে মা, গেল বাজে তার বুক।
না-বলা কোন গোপন কথার মায়।
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া;
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরৎনিশির স্তম্ভ ব্যাকুলতা।
মায়ের মূখে অম্ল রোচে নাকো—
কেঁদে বলে, “হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাক।”

একদা বাপ দুপুরবেলায় ভোজন সাঙ্গ করে
গড়গড়িটার নলটা মূখে ধরে,
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বললেন, বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
“যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্বরে
আমি কিন্তু পারি যেমন করে
মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে।”

বাপ বললেন, কঠিন হেসে, “তোমরা মায়ে বিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে,
সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।”
এই বলে তারি গড়গড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বললেন, “উঃ কী পাষণ্ড প্রাণ,
স্নেহমায়া কিচ্ছ কি নেই ঘটে।”
বাপ বললেন, “আমি পাষণ্ড বটে।
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননির পদতুল হলে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গলে।”

মা বললেন, “হায় রে কপাল! বোঝাবই বা পারে।
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এটে
পলে পলে শূন্য হয়ে মরবে ছাতি কেটে
একলা কেবল একটুকু ওই মেয়ে,
টিভুবনে অধর্ম আর নেই কিচ্ছ এর চেয়ে।
তোমার পুণ্ড্রের শূন্যকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্মামী জানেন ভগবান।”

বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, 'মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফান্দুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন—নেই সে ওদের জ্ঞান।'
এই বলে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।

দুখের তাপে জ্বলে জ্বলে অবশেষে নিবল মায়ের তাপ;
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাটনাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্‌ বিন্ধ্যাগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার 'পরে বাপের সেবাভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হত না তাঁর রুচি।
সকালবেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিংবা লুচি:
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হত পাঁচটা-ছটা:
পাঁঠা হত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দুবেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ এই।
বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে,
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে।
ডেস্কের বাস্কে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে রাখে।
গয়লানি আর মৃদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে স্কুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসন্দা তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তার কত
নাশিশ শুনতে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে-পদেই ঘটে যে তার ঘুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হয়ে নীরব নত
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।

যেমন করে মাতা বারংবার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেমনি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।

বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান
সেই কথাটা মনে করে গর্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ।
“আমার মায়ের যত্ন যে জন পেয়েছে একবার
আর-কিছু কি পছন্দ হয় তার।”

হোলির সময় বাপকে সে-বার বাতে ধরল ভারি।
পাড়ায় পুর্লিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুর্লিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয়।
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো।
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনোদিন।
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি।
পশ্চপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বৃকে
দিব্যরাশি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে।

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত-পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যুধীবনের পরানখানি মেলা,
আধার যখন চাঁদের সঙ্গ কথ্য বলতে যেয়ে
চূপ করে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুর্লিন রোগী-সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলীয়ে পাশের ঘরে ডেকে বলে—
“জান তুমি তোমার মায়ের সাথ ছিল এই চিঠে
মোদের দৌহার বিয়ে দিতে।”

সে ইচ্ছাটি তাঁর
পূরাতে চাই যেমন করেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি।”

“না না, ছি ছি, ছি ছি।”
এই বলে সে মঞ্জুলিকা দূ-হাত দিয়ে মুখখানি তার ডেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে দূয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের ‘পরে—
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে বৃক ফেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে।
ভাবলে, ‘পোড়া মনের কথা এড়ায় নি ঠুর চোখ।
আর কেন গো! এবার মরণ হোক।’

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল দ্বিগুণ করে
অষ্টপ্রহর ধরে।
আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে।
দু-তিন ঘণ্টা পর
একবার যে ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শান্ত হয়ে আপনি ঘুমে মেঝের ‘পরে লোটায়।
যে দেখল সে-ই অবাক হয়ে রইল চেয়ে,
বললে, “ধান্য মেয়ে!”

বাপ শূনে কর বৃক ফুলিয়ে, “গর্ব করি নেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচর্য-ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর। নইলে দেখতে অন্যরকম হত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরই কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাধ,
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।”

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শূনে মঞ্জুলিকার হৃদয়নিকো বিশ্বাস,
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিশ্বাস।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব
আসছে ঘরে নানা রকম বিলিতি আসবাব।

দেখলে বাপের নতুন করে সাজসজ্জা শূন্য,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ড়র,
পাকাচুল সব কখন হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাথার ঘটা।

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়ল মনে
বুকভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হোক-না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু।
কল্যাণী সেই মূর্তিখানি স্খামাখা
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা;
সাধনার সেই সাধনপূণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁর পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জাভয়
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,
“তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে।
আমরা তোমার ছেলেমেয়ে নাতনী-নাতি যত
সবার মাথা করবে নত?
মায়ের কথা ভুলবে তবে?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে।”

বাবা বললে শূন্য হাসে,
“কঠিন আমি কেই বা জানে না সে:
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়
গন্য হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দ্বন্দ্ব নিতে দ্বন্দ্ব দিতে
সে কাপড়রুষ কেনই আসে পৃথিবীতে।”

বাথরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেখায় গেলেন বর
বিয়ের কদিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে করে

গেছে দৌঁহে ফরাঙ্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে বলে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

মালা

আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে,
সিংহাসনে রানীর হাতে
ছিল সোনার থালা,
তারি 'পরে একটি শূন্য ছিল মণির মালা।

কাশী কাণ্ডী কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
বহুদুখী জনধারার স্রোতে
দলে দলে যাত্রী আসে
ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।
যারে শূন্যই 'কোথায় যাবে' সে-ই তখন বলে,
“রানীর সভাতলে।”
যারে শূন্যই 'কেন যাবে' কয় সে তেজে চক্ষে দীপ্ত জ্বালা,
“নেব বিজয়মালা।”

কেউ বা ঘোড়ায়, কেউ বা রথে
ছুটে চলে, বিরাম চায় না পথে।
মনে যেন আগুন উঠল খেপে,
চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কে'পে কে'পে।
মনে মনে কইনু হর্ষে, “ওগো জ্যোতির্ময়ী,
তোমার সভায় হব আমি জয়ী।
শূন্য করে থালা
নেব বিজয়মালা।”

একটি ছিল তরুণ যাত্রী, করুণ তাহার মুখ,
প্রভাত-তারার মতো যে তার নয়ন-দুটি কী লাগি উৎসুক।
সবাই যখন ছুটে চলে
সে যে তরুর তলে
আপন মনে বসে থাকে।
আকাশ যেন শূন্য তাকে—
যার কথা সে ভাবে কী তার নাম।
আমি তারে যখন শূন্যলাম—
“মালার আশায় যাও বৃদ্ধি ওই হাতে নিয়ে শূন্য তোমার ডালা?”
সে বলে, “জাই, চাই নে বিজয়মালা।”

তারে দেখে সবাই হাসে ;
 মনে ভাবে, 'এও কেন মোদের সাথে আসে
 আশা করার ভরসাও যার নাইকো মনে,
 আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে।'
 সবার তরে জায়গা সে দেয় মেলে,
 আগেভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে।
 কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে ;
 পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে
 হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা ;
 তবু বলে, চায় না বিজয়মালা।

সিংহাসনে একলা বসে রানী
 মূর্তিমতী বাণী।
 ঝংকারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে
 আমার বীণা বাজে।
 কখনো বা দীপক রাগে
 চমক লাগে,
 তারা বৃষ্টি করে ;
 কখনো বা মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে।
 আর-সকলে গান শুনিয়ে নর্তকিরে
 সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে ধীরে ধীরে
 গেছে ঘরে ফিরে।
 তারা জানে, যেই ফুরাবে আমার পালা,
 আমি পাব রানীর বিজয়মালা।

আমাদের সেই তরুণ সাথী বসে থাকে ধূলায় আসনতলে ;
 কথাটি না বলে।
 দৈবে যদি একটি-আধটি চাঁপার কলি
 পড়ে স্থলি
 রানীর আঁচল হতে মাটির 'পরে,
 সবার অগোচরে
 সেইটি যত্নে নিয়ে তুলে
 পরে কণ্ঠমূলে।
 সভাভঙ্গ হবার বেলায় দিনের শেষে
 যদি তারে বলি হেসে—
 “প্রদীপ জ্বালায় সময় হল সাঁঝে
 এখনো কি রইবে সভামাঝে।”
 সে হেসে কয়, “সব সময়েই আমার পালা,
 আমি যে ভাই চাই নে বিজয়মালা।”

আষাঢ় প্রাৰণ অবশেষে
 গেল ভেসে
 ছিন্নমেঘের পালে,
 গরুদ গরুদ মৃদঙ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে।
 শরৎ এল, শরৎ গেল চলে:
 নীল আকাশের কোলে
 রৌদ্রজলের কান্নাহাসি হল সারা:
 আমার সুরের থরে থরে ছড়িয়ে গেল শিউলিফলের কাঁরা।
 ফাগুন-চৈত্র আম-মউলের সৌরভে আতুর,
 দাঁখন হাওয়ায় আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের সুর।
 কণ্ঠে আমার একে একে সকল স্বতুর গান
 হল অবসান।
 তখন রানী আসন হতে উঠে,
 আমার করপুটে
 তুলে দিলেন, শূন্য করে থালা,
 আপন বিজয়মালা।

পথে যখন বাহির হলেম মালা মাথায় পরে
 মনে হল বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘারে
 ঘূর্ণি ধুলার মতো।
 মানুষ শত শত
 ঘিরল আমায় দলে দলে—
 কেউ বা কোত্‌হলে,
 কেউ বা স্তুতিচ্ছলে,
 কেউ বা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়।
 হায় রে হায়
 এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়।
 এই ধরণীর লাজুক যত সুখ,
 ছোটোখাটো আনন্দেরই সরল হাসিটুক,
 নদীচরের ভীরু হংসদলের মতো
 কোথায় হল গত।
 আমি মনে মনে ভাবি, 'এ কি দহনজ্বালা
 আমার বিজয়মালা।'

ওগো রানী, তোমার হাতে আর কিছ, কি নেই।
 শুধু কেবল বিজয়মালা এই?
 জীবন আমার জুড়ায় না যে:
 বন্ধে বাজে
 তোমার মালার ভার:
 এই যে পদস্কার

এ তো কেবল বাইরে আমার গলার মাথায় পরি;
 কী দিয়ে যে হৃদয় ভরি
 সেই তো খুঁজে মরি।
 তুষা আমার বাড়ে শুধু মালার তাপে;
 কিসের শাপে
 ওগো রানী শূন্য করে তোমার সোনার থালা
 পেলেম বিজয়মালা?

আমার কেমন মনে হল, আরো যেন অনেক আছে বাকি—
 সে নইলে সব ফাঁকি।
 এ শুধু আধখানা,
 কোন্ মানিকের অভাব আছে, এ মালা তাই কানা।
 হয় নি পাওয়া, সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে
 এমন করে বাজে।
 চল্ রে ফিরে বিড়ম্বিত, আবার ফিরে চল্,
 দেখবি খুঁজে বিজন সভাতল—
 যদি রে তোর ভাগ্যদোষে
 ধুলায় কিছু পড়ে থাকে খসে।
 যদি সোনার থালা
 লুকিয়ে রাখে আর-কোনো এক মালা।

সন্ধ্যাকাশে শান্ত তখন হাওয়া;
 দেখি সভার দুয়ার বন্ধ, ক্ষান্ত তখন সকল চাওয়া-পাওয়া।
 নাই কোলাহল, নাইকো ঠেলাঠেলি,
 তরুশ্রেণী স্তম্ভ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি।
 বিজন পথে অধার গগনতলে
 আমার মালার রতনগুলি আর কি তেমন জ্বলে।
 আকাশের ওই তারার কাছে
 লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে আছে।
 দিনের আলোয় ভুলিয়েছিল মুখ অর্ধি
 অধারে তার ধরা পড়ল ফাঁকি।
 এরি লাগি এত বিবাদ, সারাদিনের এত দুখের পালা?
 লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা।

ঘনিয়ে এল রাত।
 হঠাৎ দেখি তারার আলোয় সেই যে আমার পথের তরুণ সাথী
 আপন মনে
 গান গেয়ে যায় রানীর কুঞ্জবনে।

আমি তারে শূন্যই ধীরে, “কোথায় তুমি এই নিভূতের মাঝে
 রয়েছে কোন্ কাজে।”
 সে হেসে কয়, “ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
 ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
 তখন রানীর আসন পড়ে বকুলবীথিকাতে,
 আমি একা বীণা বাজাই রাতে।”
 শূন্যই তারে, “কী পেলো তাঁর কাছে।”
 সে কয় শূন্যে, “এই যে আমার বৃকের মাঝে আলো করে আছে।
 কেউ দেখে নি রানীর কোলে পশ্মপাতার ডালা,
 তাঁর মধ্যে গোপন ছিল, জয়মালা নয়, এ যে বরণমালা।”

ভোলা

হঠাৎ আমার হল মনে
 শিবের জটীর গঙ্গা যেন শূন্যকিয়ে গেল অকারণে—
 থামল তাহার হাস্য-উছল বাণী,
 থামল তাহার নৃত্য-নৃপদর করকরানি,
 সূর্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি,
 হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
 স্তব্ধ হল এক নিমেষে,
 বিজ্ঞ যখন চলে গেল মরণ-পারের দেশে
 বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।
 মনে হল আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বৃক ফেটে।
 ভোরবেলা তার বিষম গন্ডগোলে
 ঘুম-ভাঙনের সাগরমাঝে আর কি তুফান তোলে।
 ছুটোছুটির উপদ্রবে
 ব্যস্ত হত সবে,
 হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত ‘আরে আরে করিস কী তুই’ বলে;
 ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠত যেন টলে।
 আজ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁকিডাক
 চাক-ভরা মোঁমাছির মতো উড়ে গেছে শূন্য করে চাক।
 আমার এ সংসারে
 অত্যাচারের সূচী-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে;
 তাই এ ঘরের প্রাণ
 মোটায় ঝিয়মাণ
 জল-পালানো দিঘির পশ্ম যেন।
 খাট পালঙ্ক শূন্যে চেয়ে শূন্যায় শূন্য, “কেন, নাই সে কেন।”
 সবাই তারে দৃষ্ট বসন্ত, ধরত আমার দোষ,
 মনে করত, শাসন বিনা বড়ো হলে ঘটাযে আপসোস।

সমুদ্র-টেউ যেমন বাঁধন টুটে
 ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জে ছুটে
 ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কুলে কুলে দুলে দুলে পড়ে লুটে লুটে
 ধরার বক্ষতলে,
 দুরন্ত তার দৃষ্টমিটি তেমনি বিষম বলে
 দিনের মধ্যে সহস্রবার করে
 বাপের বক্ষ দিত অসীম চণ্ডলতার ভরে।
 বয়সের এই পর্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে
 আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে;
 বিজুর হাতে পেলে নাড়া
 সেই যে দিত সাড়া।
 সমান-বয়স ছিল আমার কোন্‌খানে তার সনে,
 সেইখানে তার সাথী ছিলেম সকল প্রাণে মনে।
 আমার বক্ষ সেইখানে এক তালে
 উঠত বেজে তারি খেলার অশান্ত গোলমালে।
 বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা
 কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা
 অটু হেসে আমরা দৌঁছে
 মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে।
 পাকা আমের কালে
 তারে নিয়ে বসে গাছের ডালে
 দুপুরবেলায় খেয়েছি আম করে কাড়াকাড়ি—
 তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, “বিষম বাড়াবাড়ি।”
 বারে বারে
 আমার লেখার ব্যাঘাত হত, বিজুর মা তাই রেগে বলত তারে
 “দেখিস নে তোরা বাবা আছেন কাজে?”
 বিজু তখন লাজে
 বাইরে চলে যেত। আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায়;
 মনে হত, ‘টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায়।’

ভোর না হতে রাত্রি
 সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথী,
 মনে হল এতদিনে বড়ো-বয়সখানা
 পুরল যোলো আনা।
 কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
 চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে
 লক্ষ্য করে বৈতরণীর ঘাট,
 গম্ভীরতার স্তম্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ।
 সময় নষ্ট হবে না আর দিনে রাতে
 দৌঁড়বে মন লেখার খাতায় শুকনো পাতে পাতে—
 বৈঠকেতে চলবে আলোচনা
 কেবলি সংপর্শ কেবলি সদ্বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যোপে
 দারুণ শূন্য রয়েছে মোর চৌকি-টেবিল চেপে।
 তাই সেখানে টিকতে নাহি পারি
 বৈরাগ্যে মন ভারী,
 উঠোনেতে করছিঁন্দু পায়চারি।
 এমন সময় উঠল মাটি কেঁপে
 হঠাৎ কে এক ঝড়ের মতো বৃকের 'পরে পড়ল আমার কোঁপে।
 চমক লাগল শিরে শিরে,
 হঠাৎ মনে হল বৃষ্টি বিজুই আমার এল আবার ফিরে।
 আমি শূন্যে, "কে রে, কী রে।"
 "আমি ভোলা", সে শূন্যে এই কয়,
 এই যেন তার সকল পরিচয়,
 আর-কিছু নেই বাকি।
 আমি তখন অচেনারে দু হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি,
 সে বললে, "ওই বাইরে তেঁতুলগাছে
 ঘুড়ি আমার আটকে আছে,
 ছাড়িয়ে দাও-না এসে।"
 এই বলে সে
 হাত ধরে মোর চলল নিয়ে টেনে।

ওরে ওরে এইমতো যার হাজার হুকুম মেনে
 কেটেছিল নটা বছর, তারি হুকুম আজো মর্ত্যতলে
 ঘুরে বেড়ায় তেমনি নানান ছলে।
 ওরে ওরে বৃক্ষে নিলেম আজ
 ফুরোয় নি মোর কাজ।
 আমার রাজা, আমার সখা, আমার বাছা আজো
 কত সাজেই সাজ'।
 নতুন হয়ে আমার বৃকে এলে,
 চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে।
 আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল নড়ে,
 আবার হঠাৎ উলটে পড়ে
 দোয়াত হল খালি,
 খাতার পাতার ছড়িয়ে গেল কালি।
 আবার কুড়োই কিনুক শামুক নুড়ি,
 গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছড়ি।
 আবার আমার নষ্ট সময় প্রমত্ত কাজে
 উলটপালট গন্ডগোলের মাঝে
 ফেলাছড়া-ভাঙাচোরার 'পর
 আমার প্রাণের চিরবালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর
 বয়সের এই দস্যুর পেয়ে খোলা।
 আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
 এল তার দৌরাখ্য নিয়ে এই ছুবনের চিরকালের জোলা।

ছিন্ন পত্র

কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাশাপাচীর অপ্রভেদী
চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে;
তারি মধ্যে জীবন যখন শূন্যকিয়ে আসে ধীরে ধীরে,
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা, পায় না কোনো রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় মল,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেছে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলাম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাসে;
বৃহৎ সর্বনাশে
হারিয়েছিলাম বিশ্বজগৎখানি।
নীল আকাশের সোনার বাণী
সকাল-সন্ধ্যার বাণীর তারে
পেঁছত না মোর বাতায়ন-দ্বারে।
ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারই পাতে,
আমার আঙিনাতে
আনত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।
অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কী যে সে ক্রন্দন
জানব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সংগোপনে বহন করে কর্মরথে
সমারোহে চলতেছিলাম নিষ্ফলতার মরুপথে।
তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়তে হত নকল সিংহনাদ;
বীডন কুঞ্জে মীটিং হলে আমি হতেম বক্তা;
রিপোর্ট লিখতে হত তজ্জা তজ্জা;
বৃন্দ হত সেনেট-সিন্ডিকেটে,
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিনরাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বৃন্দরা সব বলত, “করছ কী এ।
মারা যাবে শেষে!”
আমি বলতেম হেসে,
“কী করি ভাই, খাটতে কি হয় সাথে।
একটু যদি টিল দিয়েছি এমনি গলদ সাথে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কী করি তার উপায় বলতে পার?”
বিশ্বকর্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার ‘পরেই’ নামত,
অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সেদিন তখন দৃ-তিন রাতি ধরে
 গত সনের রিপোর্টখানা লিখেছি খুব জোরে।
 বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি
 হস্তা তিনেক মরতে হবে ভোট কুড়োতে তারি।
 শীতের দিনে যেমন পত্রভার
 খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা-সার,
 আমার হল তেমনি দশা;
 সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা;
 কেবল পত্র রওনা করা,
 কেবল শূন্যকিয়ে মরা।
 খবর আসে 'খাবার তৈরি', নিই নে কথা কানে,
 আবার যদি খবর আনে,
 বলি ক্রোধের ভরে
 "মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া তো থাক্ পরে।"

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হল পাড়া.
 আর-সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখি ছাড়া;
 এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
 হাতে গেল দিয়ে।
 জরুরি কোন্ কাজের চিঠি ভেবে
 খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চলছে উঠে নেবে,
 নাইকো দাঁড়ি-কমা,
 শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা।
 আর হল না পড়া,
 মনে হল, কোন্ বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া,
 চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
 এমনি করে কোন্ অতলের মাঝে
 হস্তা তিনেক গেল ডুবে।
 সূর্য ওঠে পশ্চিমে কি পূবে,
 সেই কথাটাই ভুলে গেছি, চলছি এমন চোটে।
 এমন সময় ভোটে
 আমার হল হার,
 শত্রুদলে আসন আমার করলে অধিকার;
 তাহার পরে খালি
 কাগজপত্রে চলল গালাগালি।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়ল হাতে,
 সেটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছি বসে আরামকেদারাতে;
 এমন সময় হঠাৎ দখিন-পবনভরে
 ছেঁড়া চিঠির টুকরো এসে পড়ল আমার কোলের 'পরে'।

অন্যমনে হাতে তুলে
 এই কথাটা পড়ল চোখে 'মনদ্রে কি গেছ এখন তুলে'।
 মনদ্র? আমার মনোরমা? ছেলেবেলার সেই মনদ্র কি এই।
 অমনি হঠাৎ এক নিমেষেই
 সকল শূন্য ভরে,
 হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিরে দিল মোরে।
 সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিনী,
 পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনি ঝিনি।
 সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
 অসীম হতে এসেছে পথহারা;
 সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
 শূন্য শিশির দোলে;
 সেই তো আমার মন্থ চোখের প্রথম আলো,
 এই ডুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
 মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
 অমনি ওদের বাড়ির পানে ছোটা।
 ওরই সঙ্গে শূন্য হত দিনের প্রথম খেলা:
 মনে পড়ে, পিঠের 'পরে চুলটি মেলা
 সেই আনন্দমূর্তিখানি, স্নিগ্ধ ডাগর অঁখি,
 কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি।
 অসীম ধৈর্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার,
 সকল কথায় মানত মনদ্র হার।
 উঠে গাছের আগডালেতে দোলা খেতেম জোরে,
 ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি করে,
 কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে,
 ভুলতে পারি কি সে।
 মনে পড়ে, নীরব ব্যথা তার,
 বাবার কাছে বখন খেতেম মার;
 ফেলেছে সে কত চোখের জল,
 মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজত কত জল।
 আরো কিছু বড়ো হলে
 আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া বঁলে।
 নামতাটা তার কেবল বেত বেধে,
 তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠত লাজে কঁদে।
 আমার হাতে মোটা মোটা ইংরেজি বই দেখে
 ভাবত মনে, গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
 রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা।
 যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন লেহাত সোজা।
 হেনকালে হঠাৎ সেবার,
 দশমীতে শ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার
 রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর-দরওয়ানে
 বার্ষিক লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।

তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মনু'র বাবার বাথল মকন্দমা,
 কেউ কাহারে করলে না আর ক্ষমা।
 দুরায় মোদের বন্ধ হল,
 আকাশ ঘেন কালো মেঘে অন্ধ হল,
 হঠাৎ এল কোন্ দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জন,
 মোর প্রতিমার হল বিসর্জন।

দেখানোনা ঘুচল যখন, এলেম যখন দূরে,
 তখন প্রথম শুনতে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
 প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
 নিবিড় বেদনাতে
 মৃৎখানি তার উঠল ফুটে আঁধার পটে সন্ধ্যাতারার মতো;
 একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
 সে যে আমার কতখানিই নয়!
 প্রেমের শিখা জ্বলল তখন, নিবল যখন চোখের পরিচয়।

কত বছর গেল চলে,
 আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হলে।
 গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ি কিনেছে কোন্ পাটের কুঠিয়াল,
 হল অনেক কাল।
 বিয়ে করে মনু'র স্বামী
 কোন্ দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।
 সেই মনু'র আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে
 কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে।
 কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
 মৃত্যু সে কি। ক্ষতি সে কি। সে কি অত্যাচার।
 কেবল কি তার বালাসখার কাছে
 হৃদয়ব্যথার সান্ধনা তার আছে।
 ছিন্ন চিঠির বাকি
 বিশ্বমাকে কোথায় আছে খুঁজে পাব না কি।
 'মনুরে কি গেছ ভুলে'
 এ প্রশ্ন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে
 মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো।
 কত চিঠির জবাব লিখব কত,
 এই কথাটির জবাব শূন্য নিতা বৃকে জ্বলবে বহির্লিখা
 অক্ষরেতে হবে না আর লিখা।

কালো মেয়ে

মরচে-পড়া গয়াদে ওই, ভাঙা জানলাখানি;
 পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী
 ওইখানেতে বসে থাকে একা,
 শূন্য নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে ক্রমে
 বয়স উঠছে জমে।
 বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ;
 সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
 দীর্ঘস্থাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
 দিবসরাত্রি কালো মেয়েটির।
 সামনে-বাড়ির নীচের তলায় আমি থাকি 'গেস'-এ;
 বহুকষ্টে শেষে
 কলেজেতে পার হইছি একটা পরীক্ষায়।
 আর কি চলা যায়
 এমন করে এগুজামিনের লগি ঠেলে ঠেলে।
 দুই বেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
 একটা বেলা খেয়েছি আধপেটা,
 ভিক্ষা করা সেটা
 সহিত না একবারে,
 তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
 বিনি মাইনের, নেহাত পক্ষে, আধা মাইনের, ভর্তি হবার জন্যে।
 এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যা
 পাবার আমার ছিল দাবি,
 মনে ছিল ধনমানের রত্ন ঘরের সোনার চাঁদ
 জন্মকালে বিধি যেন দির্শেছিলেন রেখে
 আমার গোপন শক্তিমানে ঢেকে।
 আজকে দেখি নব্যবঙ্গে
 শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাঁদটা তার সঙ্গে।
 মনে হচ্ছে ময়নাপাথির খাঁচার
 অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচার;
 পদে পদে পুড়ে বাধে জোহার শলা,
 কোন্ কৃপণের রচনা এই নাটকলা।
 কোথায় মৃত্ত অরণ্যানী, কোথায় মৃত্ত বাদল মেঘের ভেরী।
 এ কী বর্ধন রাখল আমার ঘেঁহু।

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
 শূন্যে ঘুরি রোদ্দরে আর উপবাসে।
 প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
 তক্তপোলে ঘুরে পড়ি ধপাস করে।

হাতপাখাটার বাতাস খেতে খেতে
 হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে—
 মরচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি,
 বসে আছে পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী।
 মনে হয় যে, রোদের পরে বৃষ্টিভরা থমকে-যাওয়া মেঘে
 ক্লান্ত পরান জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।
 আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের 'পরে' স্পষ্ট দেখি আঁকা;
 ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা;
 একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তম্ভ নিশীথ রাতে
 কালো জলের গহন কিনারাতে।
 লাজুক ভীরু ঝরনাখানি ঝিরি ঝিরি
 কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরে ধীরে।
 রাত-জাগা এক পাখি,
 মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
 ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
 ঘন ঘুমের নীলাঙলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে
 ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
 সেই বাঁশিটির টান
 ছুঁটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ।
 আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
 একলা থাকি 'মেস'-এ।
 সকাল-সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
 মেঠো গানের সুর যা ছিল মনে।

ওই যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরানী
 যেমনতরো ওর ভাঙা ওই জানলাখানি,
 যেখানে ওর কালো চোখের তারা
 কালো আকাশতলে দিশাহারা;
 যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
 বাতাস এসে করত খেলা আলসভরে;
 যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
 আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী;
 তেমনি আমার বাঁশের বাঁশি আপন-ভোলা,
 চার দিকে মোর চাপা দেয়াল, ওই বাঁশিটি আমার জানলা খোলা।
 ওইখানেতেই গুটিকয়েক তান
 ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুঁচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
 এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা
 কেবল বাঁশির সুরের দেশে দূই অজানার রইল জানাশোনা।

যে কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বৃকে
উঠল ফুটে বাঁশির মূখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া।

আসল

বয়স ছিল আট,
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেন পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মৃদুজ্জ্বলতার বাড়ির পাশে
একটুখানি পোড়ো জমি, শূন্য শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মতো।
পাড়ার আবর্জনা যত
ওইখানেতেই উঠছে জমে,
একধারেতে ক্রমে
পাহাড়-সমান উঁচু হল প্রতিবেশীর রাস্তার ঘরের ছাই;
গোটাকয়েক আকন্দগাছ, আর কোনো গাছ নাই;
দশ-বারোটা শালিখ পাখি
তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে করত ডাকাডাকি;
দুপুরবেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে
কী যে প্রশ্ন হাঁকিত শূন্যে কিসের কৌতূহলে।
পাড়ার মধ্যে ওই জমিটাই কোনো কাজের নয়;
সবার যাতে নাই প্রয়োজন লক্ষ্মীছাড়ার তাই ছিল সপ্তর;
তেলের ভাঙা ক্যানিস্তারা, টুকরো হাঁড়ির কানা,
অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা,
ফুটো এনামেলের গেলাস, খিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন,
মরচে-পড়া টিনের লন্টন,
সিগারেটের শূন্য বাক্স, খোলা চিঠির খাম,
অ-দরকারের মৃদু হেথায়, অনাদরের অমর স্বর্গধাম।

তখন আমার বয়স ছিল আট,
করতে হত ভূবিস্তান্ত পাঠ।
পড়ার ঘরের দেয়ালে চার পাশে
ম্যাপগুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করত নীরব পরিহাসে;
পাহাড়গুলো মরে-বাওয়া শূন্যোপোকায় মতো,
নদীগুলো যত
অচল রেখার মিথ্যা কথায় অন্ধ হয়ে রইত থতমত,
সাগরগুলো ফাঁকা,
দেশগুলো সব জীবনশূন্য কালো-আখর-অঁকা।

হাঁপিয়ে উঠত পরান আমার ধরণীর এই শিকল-রেখার রূপে—

আমি চুপে চুপে

মেঝের 'পরে বসে যেতেম ওই জানলার পাশে।

ওই যেখানে শূকনো জমি শূকনো শীর্ণ ঘাসে

পড়ে আছে এলোথেলো, তাকিয়ে ওরই পানে

কার সাথে মোর মনের কথা চলত কানে কানে।

ওই যেখানে ছাইয়ের গাদা আছে

বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলোটের কাছে।

মাথার 'পরে উদার নীলাঞ্চল

সোনার আভায় করত ঝলমল।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর সমুদ্র পারের বাণী

আমার কাছে দিতেন আনি।

ম্যাপের সঙ্গে হত না তার মিল,

বইয়ের সঙ্গে ঐক্য তাহার ছিল না এক তিল।

তার চেহারা নয় তো অমন মস্ত ফাঁকা

আঁচড়-কাটা আখর-আঁকা—

নয় সে তো কোন্ মাইল-মাপা বিশ্ব,

অসীম যে তার দৃশ্য; আবার অসীম সে অদৃশ্য।

এখন আমার বয়স হল ষাট—

গুরুতর কাজের ঝঞ্জাট।

পাগল করে দিল পলিটিক্‌সে,

কোনটা সত্য কোনটা স্বপ্ন আজকে-নাগাদ হয় নি জানা ঠিক সে;

ইতিহাসের নজির টেনে সোজা

একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্মফলের বোঝা,

সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব

মাসিক পরে প্রবন্ধ উন্মত্ত।

ষত লিখছি কাব্য

ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অপ্রাব্য।

কথায় কেবল কথারই ফল ফলে,

পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে পৃথিবী কেবলমাত্র পৃথিবী বেড়ে চলে।

আজ আমার এই ষাট বছরের বয়সকালে

পৃথিবীর সৃষ্টি জগৎটার এই বন্দীশালে

হাঁপিয়ে উঠলে প্রাণ

পালিয়ে যাবার একটি আছে স্থান।

সেই মহেশ্বরের পাশে

পাড়ায় যারে পাগল বলে হাসে।

পাছে পাছে

ছেলেগদুলো সঙ্গে যে তার লেগেই আছে।

তাদের কলরবে
নানান উপদ্রবে
একমুহূর্ত পায় না শান্তি,
তবু তাহার নাই কিছুতেই ক্রান্তি।
বেগার-খাটা কাজ
তারি ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কেউ মানে না লাজ।
সকালবেলায় ধরে ভজন গলা ছেড়ে,
যতই সে গায়, বেসদর ততই চলে বেড়ে।
তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে এসে
মহেশ বলে হেসে,
“আমার এ গান শোনাই যারে
বেসদর শব্দে হাসেন তিনি, বুক ভরে সেই হাসির পুরস্কারে।
তিনি জানেন, সদর রয়েছে প্রাণের গভীর তলায়,
বেসদর কেবল পাগলের এই গলায়।”

সকল প্রয়োজনের বাহির সে যে সৃষ্টিছাড়া,
তার ঘরে তাই সকলে পায় সাড়া।
একটা রোগা কুকুর ছিল, নাম ছিল তার ভূতো,
একদা কার ঘরের দাওয়ার ঢুকেছিল অনাহুত,
মারের চোটে জরজর
পথের ধারে পড়ে ছিল মর-মর,
খোঁড়া কুকুরটারে
বাঁচিয়ে তুলে রাখলে মহেশ আপন ঘরের দ্বারে।
আরেকটি তার পোষা ছিল, ডাকনাম তার সূর্মি,
কেউ জানে না জাত যে কী তার, মসলমান কি কাহার কিংবা কুর্মি।
সে বছরে প্রয়াগেতে কুম্ভমেলায় নেয়ে
ফিরে আসতে পথে দেখে চার বছরের মেয়ে
কেঁদে বেড়ায় বেলা দুপুর দুটোয়।
মা নাকি তার ওলাউঠায়
মরেছে সেই সকালবেলায়;
মেয়েটি তাই বিষম ভিড়ের ঠেলায়
পাক খেয়ে সে বেড়াচ্ছিল ভয়েই ভেবাচেকা—
মহেশকে যেই দেখা
কী ভেবে যে হাত বাড়াল জানি না কোন্ ভূলে:
অমনি পাগল নিল তারে কাঁধের 'পরে তুলে,
ভোলানাথের জটায় যেন ধূতরোক্ষনের কুঁড়ি;
সে অবধি তার ঘরের কোণটি জুড়ি
সূর্মি আছে ওই পাগলের পাগলামির এক স্বচ্ছ শীতল ধারা
হিমালয়ে নিষ্করিশীল পায়া।
এখন তাহার বয়স হচ্ছে দশ,
খেতে শব্দে অষ্টপ্রহর মহেশ তারি বশ।

আছে পাগল ওই মেয়েটির খেলার পদতুল হয়ে
 যন্ত্রসেবার অত্যাচারটা সয়ে।
 সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার থেকে ফিরে
 যেমনি মহেশ ঘরের মধ্যে ঢোকে ধীরে ধীরে,
 পথ-হারানো মেয়ের বদকে আজো যেন জাগায় ব্যাকুলতা—
 বদকের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা ধ'রে আবোল-তাবোল কথা।
 এই আদরের প্রথম বানের টান
 হলে অবসান
 ওদের বাসায় আমি যেতেম রাতে।
 সামান্য কোন্ কথা হত এই পাগলের সাথে।
 নাইকো পুঁথি, নাইকো ছবি, নাই কোনো আসবাব,
 চিরকালের মানুস যিনি ওই ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।
 তারার মতো আপন আলো নিয়ে বদকের তলে—
 যে মানুসটি যুগ হতে যুগান্তরে চলে,
 প্রাণখানি যার বাঁশির মতো সীমাহীনের হাতে
 সরল সুরে বাজে দিনে রাতে,
 যার চরণের স্পর্শে
 ধূলায় ধূলায় বসুন্ধরা উঠল কে'পে হর্ষে,
 আমি যেন দেখতে পেতেম তাঁরে
 দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে।
 রাজনীতি আর সমাজনীতি পুঁথির যত বুলি
 যেতেম সবই ভুলি।
 ভুলে যেতেম রাজার কারা মস্ত বড়ো প্রতিনিধি
 বালদর 'পরে রেখার মতো গড়ছে রাজ্য, লিখছে বিধানবিধি।

ঠাকুরদাদার ছদ্মটি

তোমার ছদ্মটি নীল আকাশে,
 তোমার ছদ্মটি মাঠে,
 তোমার ছদ্মটি তেঁতুল-তলায়,
 দিঘির ঘাটে ঘাটে।
 তোমার ছদ্মটি তেঁতুল-তলায়,
 গোলাবাড়ির কোণে,
 তোমার ছদ্মটি ঝোপে-ঝোপে
 পারুলডাঙার বনে।
 তোমার ছদ্মটির আশা কাঁপে
 কাঁচা ধানের খেতে,
 তোমার ছদ্মটির খুঁশি নাচে
 নদীর তরঙ্গোত্তে।

আমি তোমার চশমাপরা
 বড়ো ঠাকুরদাদা,
 বিষয়-কাজের মাকড়সটার
 বিষয় জ্বালে বাঁধা।
 আমার ছুটি সেজে বেড়ায়
 তোমার ছুটির সাজে,
 তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির
 মধুর বাঁশি বাজে।
 আমার ছুটি তোমারি ওই
 চপল চোখের নাচে,
 তোমার ছুটির মাঝখানেতেই
 আমার ছুটি আছে।

তোমার ছুটির খেয়া বেয়ে
 গরং এল মাঝি।
 শিউলি কানন সাজায় তোমার
 শব্দ ছুটির সাজি।
 শিশির-হাওয়া শিরশিরিয়ে
 কখন রাতারাতি
 হিমালয়ের থেকে আসে
 তোমার ছুটির সাথী।
 আশ্বিনের এই আলো এল
 ফুল-ফোটানো ভোরে
 তোমার ছুটির রঙে রঙিন
 চাদরখানি পরে।

আমার ঘরে ছুটির বন্যা
 তোমার লাফে-ঝাঁপে;
 কাজকর্ম হিসাব-কিতাব
 ধরধরিয়ে কাঁপে।
 গলা আমার জড়িয়ে ধর,
 কাঁপিয়ে পড় কোলে,
 সেই তো আমার অসীম ছুটি
 প্রাণের তুফান তোলে।
 তোমার ছুটি কে যে জোগায়
 জানি নে তার রীতি,
 আমার ছুটি জোগাও তুমি,
 ওইখানে মোর জিত।

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
 সঞ্জিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
 সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
 অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
 হাতে ছিল প্রদীপখানি,
 আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানী।

আমি ছিলাম ছাতে
 তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
 হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
 দেখতে গেলেম ছুটে।
 সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
 প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
 শূন্যই তারে, “কী হয়েছে, বাম্বী।”
 সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, “হারিয়ে গেছি আমি।”

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
 ফিরে গিয়ে ছাতে
 মনে হল আকাশপানে চেয়ে
 আমার বাম্বীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
 নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
 দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
 নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
 আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, “হারিয়ে গেছি আমি।”

শেষ গান

যারা আমার সঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
 আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো
 যাদের আলোক-ছায়ার লীলা; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
 তাদের প্রাণের ঝরনা-স্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা
 চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের যোগে আয়ত্ন
 নয় সে কেবল দিন-রজনীর সাতনলী হার, নয় সে নিশাস-বায়দ।
 নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে শ্বজন-বন্ধুজনে
 পরমায়ু পাত্রখানি জীবন-সুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।
 একের বাঁচন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
 বহুদূরে; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।

অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃত্তদোলায় দোলে—
 গর্ভবাধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
 বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
 একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
 আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শব্দে জীবন মম
 শীর্ণ রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নিকরিরণীসম
 শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্রান্ত সলিল প্রস্রব্ত অবহেলায়।
 তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়
 তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
 ব'লে নে ভাই, এই যে দেখা, এই বে ছোঁয়া, এই ভালো এই ভালো।
 এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনার
 ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
 এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষার;
 তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নতুন প্রাণের আশায়।

শেষ প্রতিষ্ঠা

এই কথা সদা শুনিন, 'গেছে চলে', 'গেছে চলে'।
 তবু রাখি ব'লে
 বোলো না, 'সে নাই'।
 সে কথাটা মিথ্যা, তাই
 কিছুতেই সহ্য না যে,
 মর্মে গিয়ে বাজে।

মানুষের কাছে
 যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
 তাই তার ভাষা
 বহে শূন্য, আধখানা আশা।
 আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
 যে সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তান্ডবে তোর ল'ডভ'ড হয়ে যায় সব;
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে;
প্রলয়ের ঘূর্ণচক্ৰ-'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাক্কে মর্ন্তি দিস অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃংখল।

অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুই তো কোনো মূল্য নাই,
রাচিস যা-তোর-ইচ্ছা তাই
যাহা-খুশি তাই দিয়ে,
তার পর ভুলে যাস যাহা-ইচ্ছা তাই নিয়ে।
আবরণ তোরে নাহি পারে সংবরিতে, দিগম্বর,
স্রুত ছিন্ন পড়ে ধূলি-'পর।
লজ্জাহীন সম্ভ্রাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নতোর বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে
নে রে তোর তান্ডবের দলে;
দে রে চিন্তে মোর
সকল-ভোলার ওই ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চাঁল
তবে তোর মন্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

শিশুর জীবন

ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা,
তাই তো এমন বড়ো হয়েই মরি।
ভিলে ভিলে জন্মাই কেবল

জমাই এটা ওটা,
 পলে পলে বাঙ্ক বোঝাই করি।
 কালকে-দিনের ভাবনা এসে
 আজ-দিনেরে মারলে ঠেসে
 কাল তুলি ফের পর-দিনের বোঝা।
 সাধের জিনিস ঘরে এনেই
 দেখি, এনে ফল কিছ্‌ নেই
 খোঁজের পরে আবার চলে খোঁজা।

ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত
 দেখতে না পাই পথ,
 তাকিয়ে থাকি পরশুদিনের পানে,
 ভবিষ্যৎ তো চিরকালই
 থাকবে ভবিষ্যৎ,
 ছুটি তবে মিলবে বা কোন্‌খানে?
 বৃন্দ-দীপের আলো জ্বালি
 হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি,
 হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটি।
 মন্ত্রণা দেয় কতজনা,
 সঙ্কল্প বিচার-বিবেচনা,
 পদে পদে হাজার খুঁটিনাটি।

শিশু হবার ভরসা আবার
 জাগুক আমার প্রাণে,
 লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
 ভবিষ্যতের মূখোশখানা
 খসাব একটানে,
 দেখব তারেই বর্তমানের কালে।
 ছাদের কোণে পুকুরপারে
 জানব নিত্য-অজানারে
 মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা:
 জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
 তৈরি হবে আমার খেলা,
 সুখ রবে মোর বিনামূলোই কেনা।

বড়ো হবার দায় নিয়ে, এই
 বড়োর হাতে এসে
 নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।
 যাবার বেলায় বিশ্ব আমার
 বিকিয়ে দিয়ে শেষে
 শূন্যেই নেব ফাঁকা কথার ডালা!

কোনটা সস্তা, কোনটা দামী
ওজন করতে গিয়ে আমি
বেলা আমার বইয়ে দেব দ্রুত,
সন্ধ্যা যখন অধার হবে
হঠাৎ মনে লাগবে তবে
কোনোটাই না হল মনঃপূত।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক-না তাহা সারা।
জলে স্থলে সঙ্গ আবার
পাক-না বাধনহীন,
ধূলায় ফিরে আসুক-না পথহারা।
সম্ভাবনার ডাঙা হতে
অসম্ভবের উতল স্রোতে
দিই-না পাড়ি স্বপন-তরী নিয়ে।
আবার মনে বৃষ্টি-না এই,
বস্তু বলে কিছই তো নেই
বিশ্ব গড়া যা খুঁশি তাই দিয়ে।

প্রথম যেদিন এসেছিলেম
নবীন পৃথিবীতলে
রবির আলোয় জীবন মেলে দিয়ে,
সে যেন কোন্ জগৎ-জোড়া
ছেলেখেলার ছলে,
কোথাথেকে কেই বা জানে কী এ!
শিশির যেমন রাতে রাতে,
কে যে তারে লুকিয়ে গাঁথে,
ঝিল্লি বাজায় গোপন ঝিনিঝিনি।
ভোরবেলা যেই চেয়ে দেখি,
আলোর সঙ্গে আলোর এ কী
ইশারাতে চলছে চেনাচিনি।

সেদিন মনে জেনেছিলেম
নীল আকাশের পথে
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগালো বৃষ্টি!
যা-কিছু সব চলেছে ওই
ছেলেখেলার রথে
ষে-যার আপন দোসর খুঁজি খুঁজি।
গাছে খেলা ফুল-ভরানো
ফুলে খেলা ফল-ধরানো,
ফলের খেলা অন্ধুরে অন্ধুরে।

স্থলের খেলা জলের কোলে,
জলের খেলা হাওয়ার দোলে,
হাওয়ার খেলা আপন বাঁশির সুরে।

ছেলের সঙ্গে আছ তুমি
নিত্য ছেলেমানুষ,
নিয়ে তোমার মাল-মসলার ঝুলি।
আকাশেতে ওড়াও তোমার
কতরকম ফানুস
নেঘে বোলাও রঙবেরঙের ডুলি।
সেদিন আমি আপন মনে
ফিরেছিলাম তোমার সনে,
খেলছিলাম হাত মিলিয়ে হাতে।
ভাসিয়েছিলাম রাশি রাশি
কথায় গাঁথা কান্নাহাসি
তোমারি সব ভাসান-খেলার সাথে।

ঋতুর তরী বোঝাই কর
রঙিন ফুলে ফুলে,
কালের স্রোতে যায় তারা সব ভেসে।
অবার তারা ঘাটে লাগে
হাওয়ার দলে দলে
এই ধরণীর কূলে কূলে এসে।
মিলিয়েছিলাম বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়,
সাজিয়েছিলাম ঋতুর তরনীতে,
আশা আমার আছে মনে
বকুল কেঁরা শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে।

সেদিন যখন গান গেয়েছি
আপন মনে নিজে,
বিনা কাজে দিন গিয়েছে ঢলে,
তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেছি যে,
চিনেছিলে আমায় সার্থী বলে।
তোমার ধুলো তোমার আলো
আমার মনে লাগত ভালো,
শূনেছিলাম উদাস-করা বাঁশি।
বুঝেছিলাম সে-ফাল্গুনে
আমার সে-গান শূনে শূনে
তোমারো গান আমি ভালোবাসি।

দিন গেল ওই মাঠে বাটে,
 অধার নেমে প'ল;
 এপার থেকে বিদায় মেলে যদি
 তবে তোমার সম্ভবেলার
 খেলাতে পাল তোলো,
 পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।
 আবার ওগো শিশুর সাথী,
 শিশুর ভুবন দাও তো পাতি,
 করব খেলা তোমায় আমার একা।
 চেয়ে তোমার মূখের দিকে
 তোমায়, তোমার জগৎটিকে
 সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।

৪ কার্তিক ১৩২৮

তালগাছ

তালগাছ এক পারে দাঁড়িয়ে
 সব গাছ ছাড়িয়ে
 উঁকি মারে আকাশে।
 মনে সাধ, কালো মেঘ ফুড়ে যায়
 একেবারে উড়ে যায়:
 কোথা পাবে পাখা সে?

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
 গোল গোল পাতাতে
 ইচ্ছাটি মেলে তার,
 মনে মনে ভাবে, বৃষ্টি ডানা এই,
 উড়ে যেতে মানা নেই
 বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝরঝর থণ্ডর
 কাঁপে পাতা-পসুর,
 ওড়ে যেন ভাবে ও.
 মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
 তারাদের এড়িয়ে
 যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
 পাতা-কাঁপা ধোমে যায়,
 ফেরে তার মনটি

যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

২ কার্তিক ১৩২৮

বুড়ি

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ি.
পদরাগে তার বয়স লেখে
সাতশো হাজার কুড়ি।
সাদা স্নাতোয় জাল বোনে সে
হয় না বুনন সারা.
পণ ছিল তার ধরবে জালে
লক্ষ কোটি তারা।

হেনকালে কখন আঁখি
পড়ল ঘুমে ঢুলে.
স্বপনে তার বয়সখানা
বেবাক গেল ভুলে।
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে.
মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি
ছড়িয়ে দিল হেসে।

সন্ধ্যবেলায় আকাশ চেয়ে
কী পড়ে তার মনে।
চাঁদকে করে ডাকাডাকি,
চাঁদ হাসে আর শোনে।
যে পথ দিয়ে এসেছিল
স্বপন-সাগর তীরে
দু হাত তুলে সে পথ দিয়ে
চায় সে যেতে ফিরে।

হেনকালে মায়ের মূখে
যেমনি আঁখি তোলে
চাঁদে ফেরার পথখানি যে
তক্‌খানি সে ভোলে।
কেউ জানে না কোথায় বাসা
এল কী পথ বেয়ে,
কেউ জানে না এই মেয়ে সেই
আদ্যকালের মেয়ে।

বয়সখানার খ্যাতি তবু
 রইল জগৎ জুড়ি—
 পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
 ডাকে 'বুড়ি বুড়ি'।
 সবচেয়ে যে পুরানো সে,
 কোন্ মন্দের বলে
 সবচেয়ে আজ নতুন হয়ে
 নামল ধরাতলে।

১৫ ডান্ড ১৩২৮

রবিবার

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
 আসে তাড়াতাড়ি,
 এদের ঘরে আছে বুঝি
 মস্ত হাওয়া-গাড়ি?
 রবিবার সে কেন মা গো,
 এমন দেরি করে?
 ধীরে ধীরে পেঁছয় সে
 সকল বারের পরে।
 আকাশ-পারে তার বাড়িটি
 দূর কি সবার চেয়ে?
 সে বুঝি মা, তোমার মতো
 গরিব-ঘরের মেয়ে?

সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল
 থাকবারই জনোই,
 বাড়ি-ফেরার দিকে ওদের
 একটুও মন নেই।
 রবিবারকে কে যে এমন
 বিষম তাড়া করে,
 ঘন্টাগুলো বাজায় যেন
 আধ ঘন্টার পরে।
 আকাশ-পারে বাড়িতে তার
 কাজ আছে সবচেয়ে,
 সে বুঝি মা, তোমার মতো
 গরিব-ঘরের মেয়ে?

সোম মঙ্গল বুধের যেন
 মদুখগুলো সব হাঁড়ি,
 ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের
 বিষম আড়াআড়ি।

কিন্তু শনির রাতের শেষে
 যেমনি উঠি জেগে,
 রবিবারের মূখে দেখি
 হাসিই আছে লেগে।
 যাবার বেলায় যায় সে কে'দে
 মোদের মূখে চেয়ে।
 সে বদ্বি মা, তোমার মতো
 গরিব-ঘরের মেয়ে?

৫ আশ্বিন ১৩২৮

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
 শূদ্ধ কখন খেলতে গিয়ে
 হঠাৎ অকারণে
 একটা কী সুর গন্গনিয়ে
 কানে আমার বাজে,
 মায়ের কথা মিলায় যেন
 আমার খেলার মাঝে।
 মা বদ্বি গান গাইত, আমার
 দোলনা ঠেলে ঠেলে:
 মা গিয়েছে, যেতে যেতে
 গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
 শূদ্ধ যখন আশ্বিনেতে
 ভোরে শিউলিবনে
 শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
 ফুলের গন্ধ আসে,
 তখন কেন মায়ের কথা
 আমার মনে ভাসে?
 কবে বদ্বি আনত মা সেই
 ফুলের সাজি বয়ে,
 পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
 মায়ের গন্ধ হয়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
 শূদ্ধ যখন বসি গিয়ে
 শোবার ঘরের কোণে
 জানলা থেকে তাকাই দূরে
 নীল আকাশের দিকে,
 মনে হয় মা আমার পানে
 চাইছে অনিমিখে।

কালের 'পরে ধরে কবে
 দেখত আমায় চেয়ে,
 সেই চাউনি রেখে গেছে
 সারা আকাশ ছেয়ে।

৯ আশ্বিন ১৩২৮

পদতুল ভাঙা

'সাত-আটটে সাতাশ' আমি
 বলেছিলাম বলে
 গুরুমশায় আমার 'পরে
 উঠল রাগে জ্বলে।
 মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায়
 এবার রথের দিনে
 সেই যে রঙিন পদতুলখানি
 আপনি দিলে কিনে
 খাতার নীচে ছিল ঢাকা:
 দেখালে এক ছেলে,
 গুরুমশায় রেগেমেগে
 ভেঙে দিলেন ফেলে।
 বললেন, 'তোমার দিনরাত্তির
 কেবল যত খেলা।
 একটুও তোমার মন বসে না
 পড়াশুনোর বেলা!'
 মা গো, আমি জানাই কাকে?
 ঠুর কি গুরু আছে?
 আমি যদি নালিশ করি
 একখনি তাঁর কাছে?
 কোনোরকম খেলার পদতুল
 নেই কি মা, ঠুর ঘরে?
 সত্যি কি ঠুর একটুও মন
 নেই পদতুলের 'পরে?
 সকাল-সাঁজে তাদের নিয়ে
 করতে গিয়ে খেলা
 কোনো পড়ায় করেন নি কি
 কোনোরকম হেলা?
 ঠুর যদি সেই পদতুল নিয়ে
 ভাঙেন কেহ রাগে,
 বল্ দেখি মা, ঠুর মনে তা
 কেমনতরো লাগে?

৯ আশ্বিন ১৩২৮

মুখু

নেই বা হলেম যেমন তোমার
 অম্বিকে গোসাই।
 আমি তো মা, চাই নে হতে
 পণ্ডিতমশাই।
 নাই যদি হই ভালো ছেলে,
 কেবল যদি বেড়াই খেলে,
 তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
 গদাটিপোকাকার গদাটি,
 মুখু হয়ে রইব তবে?
 আমার তাতে কীই বা হবে,
 মুখু যারা তাদেরি তো
 সমস্তখন ছুটি।

তারাই তো সব রাখাল ছেলে
 গোরু চরায় মাঠে।
 নদীর ধারে বনে বনে
 তাদের বেলা কাটে।
 ডিঙির 'পরে পাল তুলে দেয়,
 ঢেউয়ের মুখে নাও খুলে দেয়,
 ঝাউ কাটতে যায় চলে সব
 নদীপারের চরে।
 তারাই মাঠে মাচা পেতে
 পাখি তাড়ায় ফসল-খেতে,
 বাঁকে করে দই নিয়ে যায়
 পাড়ার ঘরে ঘরে।

কাস্তে হাতে চুবাড়ি মাথায়,
 সম্মে হলে পরে
 ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ ছেলে,
 মন যে কেমন করে।
 যখন গিয়ে পাঠশালাতে
 দাগা বুলোই খাতার পাতে,
 গুরুমশাই দূরদূরবেলায়
 বসে বসে ঢোলে,
 হাঁকিয়ে গাড়ি কোন গাড়োয়ান
 মাঠের পথে যায় গেয়ে গান,
 শব্দে আমি পণ করি যে
 মুখু হব বলে।

দুপুরবেলায় চিল ডেকে যায়;
 হঠাৎ হাওয়া আসি
 বাঁশ-বাগানে বাজায় যেন
 সাপ-খেলাবার বাঁশ।
 পূর্বের দিকে বনের কোলে
 বাদল-বেলায় আঁচল দোলে,
 ডালে ডালে উছলে ওঠে
 শিরীষফুলের ডেউ।
 এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
 পাঠশালা সব ছাড়তে বলে,
 আমি জানি এরা তো মা,
 পণ্ডিত নয় কেউ।

যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
 তাঁদের অনেক মান।
 ঘরে ঘরে সবার কাছে
 তাঁরা আদর পান।
 সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা,
 ধুমধামে যায় সারাবেলা,
 আমি তো মা, চাই নে আদর
 তোমার আদর ছাড়া।
 তুমি যদি মর্খ বনে
 আমাকে মা, না নাও কোলে
 তবে আমি পালিয়ে যাব
 বাদলা মেঘের পাড়া।

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে
 ভিজিয়ে দেব চুল।
 ঘাটে যখন যাবে, আমি
 করব হৃদয়স্থল।
 রাত থাকতে অনেক ভোরে
 আসব নেমে অধার করে,
 ঝড়ের হাওয়ায় ঢুকব ঘরে
 দুয়ার ঠেলে ফেলে,
 তুমি বলবে মেলে আঁধি,
 ‘দুর্ভিক্ষ দেয়া খেপল না কি?’
 আমি বলব, ‘খেপেছে আজ
 তোমার মর্খ ছেলে।’

সাত সমুদ্র পারে

দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ
 আকাশ অন্ধকার।
 সাত সমুদ্র তেরো নদী
 আজকে হব পার।
 নাই গোবিন্দ, নাই মদুকুন্দ,
 নাইকো হরিণ খোড়া,
 তাই ভাবি যে কাকে আমি
 করব আমার ঘোড়া।

কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
 বাবার খাতা থেকে,
 নৌকো দে-না বানিয়ে, অমনি
 দিস মা, ছবি একে।
 রাগ করবেন বাবা বৃদ্ধি
 দিল্লী থেকে ফিরে?
 ততক্ষণ যে চলে যাব
 সাত সমুদ্র তীরে।

এমনি কি তোর কাজ আছে মা,
 কাজ তো রোজই থাকে।
 বাবার চিঠি একখুনি কি
 দিতেই হবে ডাকে?
 নাই বা চিঠি ডাকে দিলে
 আমার কথা রাখো,
 আজকে না-হয় বাবার চিঠি
 মাসি লিখুন-নাকো!

আমার এ যে দরকারি কাজ
 বুঝতে পার না কি।
 দৌর হলেই একেবারে
 সব যে হবে ফাঁকি।
 মেঘ কেটে যেই রোদ উঠবে
 বৃষ্টি বন্ধ হলে,
 সাত সমুদ্র তেরো নদী
 কোথায় যাবে চলে!

জ্যোতিষী

ওই যে রাতের তারা
জানিস কি মা, কারা?
সারাটিখন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমনধারা!
আমার যেমন নেইকো ডানা,
আকাশপানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তের্মনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর 'পরে'।

সকালে যে নদীর বঁকে
জল নিতে হাস কলসি কাঁখে
শজনেতলার ঘাটে
সেখায় ওদের আকাশ থেকে
আপন ছায়া দেখে দেখে
সারা পহর কাটে।
ভাবে ওরা চেয়ে চেয়ে,
হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকাল-সাঁজে
কলসিখানি ধরে বদকে
সাঁতরে নিতেম মনের সূখে
ভরা নদীর মাঝে।

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায়, যেথা গভীর বনে
রাক্ষসদের ঘরে
রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে
জাগাই শব্দা-'পরে'।
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে
হত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলার খেলার
তার পরে সেই রাতের বেলার
সুশ্রোত তোর সাথে।

যেদিন আমি নিশ্চুত রাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে

স্বপন থেকে জেগে
 জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে
 তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
 বাপ্‌সা আছে মেঘে।
 বসে বসে ক্ষণে ক্ষণে
 সেদিন আমার হয় যে মনে
 ওদের স্বপ্ন বলে।
 অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
 ওরা আসে সেই পহরেই,
 ভোর বেলা যায় চলে।
 আঁধার রাত অন্ধ ও যে,
 দেখতে না পার, আলো খোঁজে,
 সবই হারিয়ে ফেলে।
 তাই আকাশে মাদুর পেতে
 সমস্তখন স্বপনেতে
 দেখা-দেখা খেলে।

১০ আশ্বিন ১৩২৮

খেলা-ভোলা

তুই কি ভাবিস, দিনরাত্তির
 খেলতে আমার মন?
 কখখনো তা সত্যি না মা—
 আমার কথা শোন।
 সেদিন ভোরে দেখি উঠে
 বৃষ্টিবাদল গেছে ছুটে,
 রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে
 বাঁশের ডালে ডালে;
 ছুটির দিনে কেমন সুরে
 পুজোর সানাই বাজছে দূরে,
 তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
 রাসাঘরের চালে—
 খেলনাগুলো সামনে মেলি
 কী যে খেলি, কী যে খেলি,
 সেই কথাটাই সমস্তখন
 ভাবনু আপন মনে!
 লাগল না ঠিক কোনো খেলাই,
 কেটে গেল সারা বেলাই,
 রেলিঙ ধরে রইনু বসে
 বারান্দাটার কোণে।

খেলা-ভোলার দিন মা, আমার
 আসে মাঝে মাঝে।
 সেদিন আমার মনের ভিতর
 কেমনতরো বাজে।
 শীতের বেলায় দুই পহরে
 দূরে কাদের ছাতের 'পরে
 ছোট্ট মেয়ে রোদ্‌দূরে দেয়
 বেগুনি রঙের শাড়ি।
 চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই,
 তেপান্তরের পার বদ্বি ওই,
 মনে ভাবি ওইখানেতেই
 আছে রাজার বাড়ি।
 থাকত যদি মেঘে-গুড়া
 পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া
 তক্‌খুনি যে যেতেম তারে
 লাগাম দিয়ে ক'ষে।
 যেতে যেতে নদীর তীরে
 ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
 পথ শূন্যে নিতেম আমি
 গাছের তলায় বসে।

একেক দিন যে দেখেছি, তুই
 বাবার চিঠি হাতে
 চুপ করে কী ভাবিস বসে
 ঠেস দিয়ে জানলাতে।
 মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
 তুই যেন কোন্‌ দেশের মেয়ে,
 যেন আমার অনেক কালের
 অনেক দূরের মা।
 কাছে গিয়ে হাতখানি ছুই
 হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
 মাঠ-পারে কোন্‌ বটের তলার
 বাঁশির সুরের মা।
 খেলার কথা যায় যে ভেসে,
 মনে ভাবি কোন্‌ কালে সে
 কোন্‌ দেশে তোর বাড়ি ছিল
 কোন্‌ সাগরের কূলে।
 ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
 অজানা সেই স্বপ্নের ঘরে
 তোমায় আমার ভোরবেলাতে
 নৌকোতে পাল ভুলে।

পথহারা

আজকে আমি কতদূর যে
 গিয়েছিলেম চলে!
 যত তুমি ভাবতে পার
 তার চেয়ে সে অনেক আরো,
 শেষ করতে পারব না তা
 তোমায় বলে বলে।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
 আরো অনেক দূর।
 মাঝখানেতে কত যে বেত,
 কত যে বাঁশ, কত যে খেত,
 ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি
 ছাড়িয়ে তালিমপূর।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
 সাত-কুশি সব গ্রাম,
 ধানের গোলা গুনব কত
 জোন্দারদের গোলার মতো,
 সেখানে যে মোড়ল কারা
 জানি নে তার নাম।

একে একে মাঠ পেরোলুম
 কত মাঠের পরে।
 তার পরে, উঃ, বলি মা শোন,
 সামনে এল প্রকাণ্ড বন,
 ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
 গা ছম্‌ছম্ করে।

জামতলাতে বড়ি ছিল,
 বললে 'খবরদার'!
 আমি বললেম বারণ শূনে
 'ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে',
 যতক্ষণ সে গুনতে থাকে
 হয়ে গেলেম পার।

কিছুরই শেষ নেই কোথাও
 আকাশ পাতাল জুড়ি।
 যতই চলি যতই চলি
 বেড়েই চলে যনের গলি,

কালো মৃৎখোশপরা অধার
সাজল জুজুবুড়ি।

খেজুরগাছের মাথায় বসে
দেখছে কারা ঝড়িক।
কারা যে সব ঝোপের পাশে
একটুখানি মৃচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মাঝে উর্পিক।

আমায় যেন চোখ টিপছে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কাদের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে,
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সড়সড়ি।

ফিসফিসিয়ে কইছে কথা
দেখতে না পাই কে সে।
অন্ধকারে দন্দাড়িয়ে
কে যে করে ঝার তাড়িয়ে,
কী জানি কী গা চেটে ঝার
হঠাৎ কাছে এসে।

ফুরোয় না পথ, ভাবছি আমি
ফিরব কেমন করে।
সামনে দেখি কিসের ছায়া,
ডেকে বলি, 'শেয়াল ভায়া,
মায়ের গায়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে-না মোরে।'

কয় না কিছুই, চুপটি করে
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঁপিগমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন এসে ডেকে
কে জানে মা, হালদা ক'রে
পড়ল যে কার আড়ে।

বল্ দেখি তুই কেমন করে
 ফিরে পেলেম মাকে?
 কেউ জানে না কেমন করে:
 কানে কানে বলব তোরে?
 যেমনি স্বপন ভেঙে গেল
 সিঁগিমামার ডাকে।

১৫ আশ্বিন ১৩২৮

সংশয়ী

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে
 শ্রদ্ধাস কি মা, তাই?
 যেখান থেকে এসেছিলাম
 সেথায় যেতে চাই।
 কিন্তু সে যে কোন্ জায়গা
 ভাবি অনেকবার।
 মনে আমার পড়ে না তো
 একটুখানি তার।
 ভাবনা আমার দেখে বাবা
 বললে সেদিন হেসে,
 'সে জায়গাটি মেঘের পারে
 সন্ধ্যাতারার দেশে।'
 তুমি বল, 'সে দেশখানি
 মাটির নীচে আছে,
 যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে
 ফুল ফোটে সব গাছে।'
 মাসি বলে, 'সে দেশ আমার
 আছে সাগরতলে,
 যেখানেতে আঁধার ঘরে
 লুকিয়ে মানিক জ্বলে।'
 দাদা আমার চুল টেনে দেয়,
 বলে, 'বোকা ওরে,
 হাওয়ায় সে দেশ মিলিয়ে আছে
 দেখবি কেমন করে?'
 আমি শূনে ভাবি, আছে
 সকল জায়গাতেই।
 সিধু মাস্টার বলে শূধু,
 'কোনোখানেই নেই।'

রাজা ও রানী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পিরডু কেমন নাচে।
ডালে ছিলেম চড়ে,
সেটা ভেঙেই গেল পড়ে।
সেদিন হল মানা
আমার পেরারা পেড়ে আনা,
রথ দেখতে যাওয়া,
আমার চিড়ের পুঁলি খাওয়া।
কে দিল সেই সাজা,
জান কে ছিল সেই রাজা?

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।
সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখল কেবল চেয়ে।
বললে না তো কিছু,
কেবল মৃখটি করে নিচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দি়ে।
হল না তার খাওয়া,
কিংবা রথ দেখতে যাওয়া।
নিজ আমার কোলে
সাজার সময় সারা হলে।
গলা ভাঙা-ভাঙা,
তার চোখ-দুখানি রাঙা।
কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি।

দূর

পূজোর ছুটি আসে যখন
বক্সারেতে যাবার পথে—
দূরের দেশে যাচ্ছি ভেবে
হৃদয় হয় না কোনোমতে।

পথে করতে খেলা
 আমার কখন হল বেলা
 আমার শাস্তি দিল তাই।
 ইচ্ছে হোথায় নাবি
 কিন্তু ঘরে বন্ধ চাবি
 আমার বেরতে পথ নাই।
 বাড়ি ফেরার তরে
 তোমায় কেউ না ভাড়া করে
 তোমায় নাই কোনো পাঠশালা।
 সমস্ত দিন কাটে
 তোমায় পথে ঘাটে ঘাটে
 তোমায় ঘরেতে নেই তাল।
 তাই তো তোমায় নাচে
 আমার প্রাণ বেন ভাই বাঁচে।
 আমার মন বেন পায় ছুটি,
 ওগো তোমায় নাচে
 বেন ঢেউয়ের দোলা আছে,
 ঝড়ে গাছের লুটোপুটি।
 অনেক দূরের দেশ
 আমার চোখে লাগায় রেশ,
 বখন তোমায় দেখি পথে।
 দেখতে যে পায় মন
 বেন নাম-না-জানা বন
 কোন্ পথহারা পর্বতে।
 হঠাৎ মনে লাগে,
 বেন অনেক দিনের আগে,
 আমি অমনি ছিলেম ছাড়া।
 সেদিন গেল ছেড়ে,
 আমার পথ নিল কে কেড়ে,
 আমার হারাল একতারা।
 কে নিল গো টেনে,
 আমায় পাঠশালাতে এনে,
 আমার এল গুরুদশায়।
 মন সदा যার চলে
 যত ঘরছাড়াদের দলে
 তারে ঘরে কেন বসায়।
 কও তো আমার ভাই,
 তোমায় গুরুদশায় নাই?
 আমি বখন দেখি ভেবে
 বুঝতে পারি খাঁটি,
 তোমায় বুকের একতারাটি,
 তোমায় ওই জো পড়া দেবে।

তোমার কানে কানে
 ওরই গদগদনানি গানে
 তোমার কোন্ কথা যে কয়!
 সব কি তুমি বোঝ।
 তারই মানে যেন খোঁজ
 কেবল ফিরে ডুবনময়।
 ওরই কাছে বৃষ্টি
 আছে তোমার নাচের পদ্বিজি.
 তোমার খাপা পায়ের ছদ্টি?
 ওরই সুরের বোলে
 তোমার গলার মাল্য দোলে,
 তোমার দোলে মাথার ঝড়টি।
 মন যে আমার পালায়
 তোমার একতারা-পাঠশালায়,
 আমার ভুলিয়ে দিতে পার।
 নেবে আমার সাথে?
 এ-সব পিঁড়িতেই হাতে
 আমার কেন সবাই মার?
 ভুলিয়ে দিয়ে পড়া
 আমার শেখাও সুরে-গড়া
 তোমার তাল-ভাঙার পাঠ।
 আর-কিছু না চাই,
 যেন আকাশখানা পাই,
 আর পালিয়ে যাবার ঘাট।
 দূরে কেন আছ।
 দ্বারের আগল ধরে নাচো,
 বাউল আমারই এইখানে।
 সমস্ত দিন ধরে
 যেন মাতন ওঠে ভরে
 তোমার ভাঙন-সাগা গানে।

দৃষ্ট

তোমার কাছে আমিই দৃষ্ট,
 ভালো যে আর সবাই।
 মিস্ত্রদের কাজ নীল,
 ভারি ঠান্ডা ক-ভাই!
 যতীশ ভালো, সতীশ ভালো,
 ন্যাড়া নবীন ভালো,

তুমি বল ওরাই কেমন
 ঘর করে রয় আলো।
 মাখনবাবুর দাঁটি ছেলে
 দাঁষ্টে তো নয় কেউ—
 গেটে তাদের কুকুর বাঁধা
 করতেছে ঘেউ ঘেউ।
 পাঁচকড়ি ঘোষ লক্ষ্মী ছেলে,
 দস্তপাড়ার গবাই,
 তোমার কাছে আমিই দাঁষ্টে,
 ভালো যে আর সবাই।
 তোমার কথা আমি বেন
 লুনি নে কক্খনোই,
 জামাকাপড় বেন আমার
 সাফ থাকে না কোনোই!
 খেলা করতে খেলা করি,
 বৃষ্টিতে যাই ভিজে,
 দাঁষ্টপনা আরো আছে
 অমনি কত কী যে!
 বাবা আমার চেয়ে ভালো?
 সত্যি বলো তুমি,
 তোমার কাছে করেন নি কি
 একটুও দাঁষ্টমি?
 যা বল সব শোনেন তিনি,
 কিচ্ছ ভোলেন নাকো?
 খেলা ছেড়ে আসেন চলে
 যেমনি তুমি ডাক?

ইচ্ছামতী

যখন যেমন মনে করি
 তাই হতে পাই যদি
 আমি তবে একখনি হই
 ইচ্ছামতী নদী।
 রইবে আমার দখিন ধারে
 সূর্য ওঠার পার,
 বাঁয়ের ধারে সম্বেবেলার
 নামবে অন্ধকার।
 আমি কইব মনের কথা
 দূই পারেরই সাথে,
 আধেক কথা দিনের বেলায়,
 আধেক কথা রাতে।

যখন ঘরে ঘরে বেড়াই
 আপন গায়ের ঘাটে
 ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই
 দরের মাঠে মাঠে।
 গায়ের মান্দ্র চিনি, যারা
 নাইতে আসে জলে,
 গোরু মহিষ নিয়ে যারা
 সাঁতরে ওপার চলে।
 দরের মান্দ্র যারা তাদের
 নতুনতরো বেশ,
 নাম জানি নে, গ্রাম জানি নে
 অশ্রুতের একশেষ।

জলের উপর ঝলোমলো
 টুকরো আলোর রাশি।
 ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন,
 হাততালি আর হাসি।
 নীচের তলার তলিয়ে যেথায়
 গেছে ঘাটের ধাপ
 সেইখানেতে কারা সবাই
 রয়েছে চুপচাপ।
 কোণে কোণে আপন মনে
 করছে তারা কী কে।
 আমারই ভয় করবে কেমন
 ডাকাতে সেই দিকে।

গায়ের লোকে চিনবে আমার
 কেবল একটুখানি।
 বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে
 আমিই সে কি জানি।
 এক ধারেতে মাঠে ঘাটে
 সবুজ বরন শূন্য,
 আর-এক ধারে বালুর চরে
 রৌদ্র করে ধূ ধূ।
 দিনের বেলায় যাওয়া আসা,
 রাস্তারে থম্ থম্!
 ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে
 করবে গা ছম্ ছম্।

অন্য ঝা

আমার ঝা না হয়ে, তুমি
 আর-কারো ঝা হলে
 ভাবছ তোমার চিন্তেম না,
 যেতেম না ওই কোলে?
 মজা আরো হত ভারি,
 দূই জায়গায় থাকত বাড়ি,
 আমি থাকতেম এই গাঁয়েতে,
 তুমি পারের গাঁয়ে।
 এইখানেতেই দিনের বেলা
 যা-কিছু সব হত খেলা
 দিন ফুরোলেই তোমার কাছে
 পেরিয়ে যেতেম নায়ে।
 হঠাৎ এসে পিছন দিকে
 আমি বলতেম, 'বল্ দেখি কে।'
 তুমি ভাবতে, চেনার মতো,
 চিনি নে তো তব্দ।
 তখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
 আমি বলতেম গলা ধরে—
 'আমার তোমার চিনতে হবেই,
 আমি তোমার অব্দ!'

ওই পারেরে তখন তুমি
 আনতে যেতে জল,
 এই পারেরে তখন ঘাটে
 বল্ দেখি কে বল্।
 কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
 ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
 যদি গিয়ে পৌছত সে
 বুঝতে কি, সে কার।
 সাঁতার আমি দিখি নি যে
 নইলে আমি যেতেম নিজে,
 আমার পারের থেকে আমি
 যেতেম তোমার পার।
 মায়ের পারে অব্দর পারে
 থাকত তফাত, কেউ তো পারে
 ধরতে গিয়ে পেত নাকো,
 রইত না একসাথে।
 দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
 দেখা-দেখি ঘুরে ঘুরে—

সন্ধ্যবেলায় মিলে যেত
অবদতে আর মা-তে ।

কিন্তু হঠাৎ কোনোদিনে
যদি বিপিন মাঝি
পার করতে তোমার পারে
নাই হত মা রাজি ।
ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বললে
ছাতের 'পরে মাদুর মেলে
বসতে তুমি, পারের কাছে
বসত কান্তবুড়ি,
উঠত তারা সাত ভায়েতে,
ডাকত শেরাল ধানের খেতে,
উড়ো ছায়ার মতো বাদুড়
কোথায় যেত উড়ি ।
তখন কি মা, দেরি দেখে
ভয় হত না থেকে থেকে
পার হয়ে মা, আসতে হতই
অব, যেথায় আছে ।
তখন কি আর ছাড়া পেতে?
দিতেন কি আর ফিরে যেতে?
ধরা পড়ত মায়ের ওপার
অব, পারের কাছে ।

দুরোরানী

ইচ্ছে করে মা, যদি তুই
হতিস দুরোরানী!
ছেড়ে দিতে এমন কি ভয়
তোমার এ ঘরখানি ।
ওইখানে ওই পুকুরপারে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
ও যেন ঘোর বনের মধ্যে
কেউ কোথাও নেই ।
ওইখানে কাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব দৃজনেই ।
বাঘ ভাঙ্গুক অনেক আছে
আসবে না কেউ তোমার কাছে,

দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে ।
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে ।

আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
ষেই দাঁড়াবি স্ফারে
অমনি ষত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে ।
শিঙগদাগি সব আঁকাবাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে ।

ওরা সবাই আমার বোঝে,
করবে না ভয় একটুও যে,
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বসবে কাছে ঘেঁষে ।

ফলসা-বনে গাছে গাছে
ফল ধরে মেঘ করে আছে,
ওইখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে ।
শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে ।

দিন ফুরোবে, সাজের আধার
নামবে তালের গাছে ।
তখন এসে ঘরের কোণে
বসব কোলের কাছে ।
থাকবে না তোর কাজ কিছু তো,
রইবে না তোর কোনো ছুতো,
রূপকথা তোর বলতে হবে
রোজই নতুন করে ।

সীতার বনবাসের ছড়া
সবগদাগি তোর আছে পড়া;
সুন্দর করে তাই আগাগোড়া
গাইতে হবে তোরে ।

তার পরে যেই অশ্বখ-বনে
ডাকবে পেঁচা, আমার মনে

একটুখানি ভয় করবে
 স্বামি নিশ্চুত হলে।
 তোমার বদকে ঘুখটি গুজে
 ঘুমেতে চোখ আসবে বদকে,
 তখন আবার বাবার কাছে
 ঘাস নে যেন চলে!

১৪ আশ্বিন ১৩২৮

রাজমিন্দি

বয়স আমার হবে তিরিশ.
 দেখতে আমায় ছোটো.
 আমি নই মা, তোমার শিরিশ.
 আমি হচ্ছি নোটো।
 আমি যে রোজ সকাল হলে
 যাই শহরের দিকে চলে
 তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চড়ে।
 সকাল থেকে সারা দুপুর
 ইস্ট সাজিয়ে ইস্টের উপর
 খেয়ালমতো দেয়াল তুলি গড়ে
 ভাবছ তুমি নিরে ঢেলা
 ঘর-গড়া সে আমার খেলা,
 কক্খনো না সত্যিকার সে কোঠা।
 ছোটো বাড়ি নয় তো মোটে,
 তিনতলা পর্যন্ত ওঠে,
 থামগুলো তার এমনি মোটা মোটা।
 কিন্তু যদি শূধাও আমার
 ওইখানেতেই কেন থামার?
 দোষ কী ছিল ষাট-সত্তর তলা?
 ইস্ট সুরকি জুড়ে জুড়ে
 একেবারে আকাশ ফুড়ে
 হয় না কেন কেবল গেথে চলা?
 গাঁথতে গাঁথতে কোথায় শেষে
 ছাত কেন না তারার মেলে?
 আমিও তাই ভাবি নিজে নিজে।
 কোথাও গিয়ে কেন থামি
 যখন শূধাও, তখন আমি
 জানি নে তো তার উত্তর কী যে।

যখন খুঁশি ছাতের মাথায়
 উঠছি ভারা বেয়ে।
 সত্যি কথা বলি, তাতে
 মজা খেলার চেয়ে।
 সমস্ত দিন ছাত-পিটুনি
 গান গেয়ে ছাত পিটোয় শূনি,
 অনেক নীচে চলছে গাড়িঘোড়া।
 বাসনওয়ালা থালা বাজায়;
 সুর করে ওই হাঁক দিয়ে যায়
 আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া।
 সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
 ছেলেরা সব বাসায় ছোট
 হো হো করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।
 রোদ্দুর যেই আসে পড়ে
 পূবের মূখে কোথায় ওড়ে
 দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
 আমি তখন দিনের শেষে
 ভারার থেকে নেমে এসে
 আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে
 জান তো মা, আমার পাড়া
 যেখানে ওই খুঁটি গাড়া
 পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।
 তোরা যদি শূধাস মোরে
 খড়ের চালায় রই কী করে?
 কোঠা যখন গড়তে পারি নিজে;
 আমার ঘর যে কেন তবে
 সব চেয়ে না বড়ো হবে?
 জানি নে তো তার উত্তর কী যে!

৬ কার্তিক ১৩২৮

ঘুমের তত্ত্ব

জাগার থেকে ঘুমোই, আবার
 ঘুমের থেকে জাগি—
 অনেক সময় ভাবি মনে
 কেন, কিসের লাগি?
 আমাকে মা, যখন তুমি
 ঘুম পাড়িয়ে রাখ
 তখন তুমি হারিয়ে গিয়ে
 তবু হারাও নাকো।

রাতে সূর্য, দিনে তারা
 পাই নে, হাজার খুঁজি।
 তখন তারা ঘুমের সূর্য,
 ঘুমের তারা বৃষ্টি?
 শীতের দিনে কনকচাঁপা
 যায় না দেখা গাছে,
 ঘুমের মধ্যে নুঁকিয়ে থাকে
 নেই তবুও আছে।
 রাজকন্যে থাকে, আমার
 সিঁড়ির নীচের ঘরে।
 দাদা বলে, 'দেখিয়ে দে তো',
 বিশ্বাস না করে।
 কিন্তু মা, তুই জানিস নে কি
 আমার সে রাজকন্যে
 ঘুমের তলায় তলিয়ে থাকে,
 দেখি নে সেইজন্যে।

নেই তবুও আছে এমন
 নেই কি কত জিনিস?
 আমি তাদের অনেক জানি,
 তুই কি তাদের চিনিস?
 যেদিন তাদের রাত পোয়াবে
 উঠবে চক্ৰ মেলি
 সেদিন তোমার ঘরে হবে
 বিষম ঠেলাঠেলি।
 নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া
 ব্যাঙ্গমা বেঙ্গদুমী
 ভিড় করে সব আসবে যখন
 কী যে করবে তুমি!
 তখন তুমি ঘুমিয়ে পোড়ো,
 আমিই জেগে থেকে
 নানারকম খেলার তাদের
 দেব ভুলিয়ে রেখে।
 তার পরে যেই জাগবে তুমি
 জাগবে তাদের ঘুম,
 তখন কোথাও কিছুই নেই
 সমস্ত নিঃস্বপ্ন।

দুই আমি

বৃষ্টি কোথায় নদীকিনে বেড়ায়
 উড়ো মেঘের দল হয়ে,
 সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায়
 প্রাণ-ধারায় জল হয়ে।
 আমি ভাবি চুপটি করে
 মোর দশা হয় ওই যদি!
 কেই বা জানে আমি আবার
 আর-একজনও হই যদি!
 একজনারেই তোমরা চেন
 আর-এক আমি কারোই না।
 কেমনতরো ভাবখানা তার
 মনে আনতে পারোই না।
 হয়তো বা ওই মেঘের মতোই
 নতুন নতুন রূপ ধরে
 কখন সে যে ডাক দিয়ে যায়,
 কখন থাকে চুপ করে।
 কখন বা সে পূর্বের কোণে
 আলো-নদীর বাঁধ বাঁধে,
 কখন বা সে আধেক রাতে
 চাঁদকে ধরার ফাঁদ ফাঁদে।
 শেষে তোমার ঘরের কথা
 মনেতে তার যেই আসে,
 আমার মতন হয়ে আবার
 তোমার কাছে সেই আসে।
 আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
 দুই রকমের দুই খেলা,
 একটা সে ওই আকাশ-ওড়া,
 আরেকটা এই ভূই-খেলা।

২৮ আশ্বিন ১৩২৮

মর্ত্যবাসী

কাকা বলেন, সময় হলে
 সবাই চলে
 যার কোথা সেই স্বর্গ-পারে।
 বল্ তো কাকী
 সত্যি তা কি
 একেবারে?

তিনি বলেন, বাবার আগে
 তন্দ্রা লাগে
 ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,
 স্নায়ের পাশে
 তখন আসে
 ঘাটের মাঝি।

বাবা গেছেন এমনি করে
 কখন ভোরে
 তখন আমি বিছানাতে।
 তেমনি মাখন
 গেল কখন
 অনেক রাতে।

কিন্তু আমি বলছি তোমায়
 সকল সময়
 তোমার কাছেই করব খেলা,
 রইব জোরে
 গলা ধরে
 রাতের বেলা।

সময় হলে মানব না তো,
 জানব না তো
 ঘণ্টা মাঝির বাজল কবে।
 তাই কি রাজা
 দেবেন সাজা
 আমার তবে?

তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
 সেথায় আলো
 রঙে রঙে আকাশ রাঙায়,
 সারা বেলা
 ফুলের খেলা
 পারুলডাঙায়!

হোক-না ভালো যত ইচ্ছে—
 কেড়ে নিচ্ছে
 কেই বা তাকে বলো, কাকী?
 যেমন আছি
 তোমার কাছেই
 তেমনি থাকি!

ওই আমাদের গোলাবাড়ি,
 গোরুর গাড়ি
 পড়ে আছে চাকা-ভাঙা,
 গাবের ডালে
 পাতার লালে
 আকাশ রাঙা।

সেথা বেড়ায় ফকীরবাড়ি
 গাড়িগাড়ি
 আসশেওড়ার ঝোপে ঝোপে।
 ফুলের গাছে
 দোয়েল নাচে,
 ছায়া কাঁপে।

নাকিয়ে আমি সেথা পলাই,
 কানাই বলাই
 দূ-ভাই আসে পাড়ার থেকে।
 ভাঙা গাড়ি
 দোলাই নাড়ি
 ঝেঁকে ঝেঁকে।

সন্ধ্যাবেলায় গল্প বলে
 রাখ কোলে,
 মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
 চালভা-শাখে
 পেঁচা ডাকে,
 বাড়ে রাত।

স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
 বলছি কাকী,
 দেখব আমার কে কী করে।
 চিরকালই
 মইব খালি
 তোমার ধরে।

বাগী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হতিস,
 আমি চাঁপার গাছ,
 তোরে সাথে মোর বিনি-কথায়
 হত কথার নাচ।
 তোরে হাওয়া মোর ডালে ডালে
 কেবল থেকে থেকে
 কত রকম নাচন দিয়ে
 আমার যেত ডেকে।
 মা বলে তার সাড়া দেব
 কথা কোথায় পাই.
 পাতায় পাতায় সাড়া আমার
 নেচে উঠত তাই।
 তোরে আলো মোর শিশির-ফোঁটার
 আমার কানে কানে
 টলমলিয়ে কী বলত যে
 বলমলানির গানে।
 আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
 আমার যত কুঁড়ি.
 কথা কইতে গিয়ে তারা
 নাচন দিত জুঁড়ি।
 উড়ো মেঘের ছায়াটি তোরে
 কোথায় থেকে এসে
 আমার ছায়ার ঘনিরে উঠে
 কোথায় যেত ভেসে।
 সেই হত তোরে বাদলবেলার
 রূপকথাটির মতো ;
 রাজপুত্রের ঘর ছেড়ে যায়
 পেরিয়ে রাজ্য কত ;
 সেই আমারে বলে যেত
 কোথায় আলেখ-সত্য।
 সাগরপারের দৈত্যপুত্রের
 রাজকন্যার কথা ;
 দেখতে পেতেম দরোরানীর
 চক্ষু ভর-ভর,
 লিউরে উঠে পাতা আমার
 কাপিত থরথর।
 হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার
 হাওয়ার পাছে পাছে
 নামত আমার পাতায় পাতায়
 টপদর-টপদর নাচে ;

সেই হত তোর কাদন-সুরে
 রামায়ণের পড়া,
 সেই হত তোর গদন-গদনিয়ে
 শ্রাবণ-দিনের ছড়া।
 মা, তুই হতিস নীলবরনী,
 আমি সবুজ কাঁচা;
 তোর হত মা, আলোর হাসি,
 আমার পাতার নাচা।
 তোর হত মা, উপর থেকে
 নয়ন মেলে চাওয়া,
 আমার হত আঁকুবাঁকু
 হাত ভুলে গান গাওয়া।
 তোর হত মা, চিরকালের
 তারার মণিমালা,
 আমার হত দিনে দিনে
 ফুল-ফোটার পাল্লা।

বৃষ্টি রৌদ্র

ঝুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে
 দল বেঁধে মেঘ চলেছে যে
 আজকে সারাবেলা।
 কালো ঝাঁপির মধ্যে ভরে
 সূর্যকে নেয় চুরি করে,
 ভয়-দেখাবার খেলা।
 বাতাস তাদের ধরতে মিছে
 হাঁপিয়ে ছোট পিছে পিছে,
 যায় না তাদের ধরা।
 আজ যেন ওই জড়োসড়ো
 আকাশ জুড়ে মন্ত বড়ো
 মন-কেমন-করা।
 বটের ডালে ডানা-ভিজে
 কাক বসে ওই ভাবছে কী যে,
 চড়ুইগুলো চুপ।
 বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে,
 শজনেপাতার ঝরে ঝরে
 জল পড়ে টপটপ।
 ল্যাজের মধ্যে মাথা থুয়ে
 খ্যাঁদন কুকুর আছে গুয়ে
 কেমন একরকম।

দালানটাতে ঘরে ঘরে
 পাররাগলো কাঁদন-সদরে
 ডাকছে বক্‌বকম।
 কার্তিকে ওই ধানের খেতে
 ভিজ়ে হাওয়া উঠল মেতে
 সবুজ ঢেউয়ের পরে।
 পরশ লেগে দিশে দিশে
 হিহি ক'রে ধানের শিশে
 শীতের কাঁপন ধরে।
 ঘোষাল-পাড়ার লক্ষ্মী বদড়ি
 ছেঁড়া কাঁথায় মদড়িসদড়ি
 গেছে পুকুরপাড়ে,
 দেখতে ভালো পায় না চোখে
 বিড়বিড়িয়ে বকে বকে
 শাক তোলে, ঘাড় নাড়ে।
 ওই ঝামাঝম বৃষ্টি নামে
 মাঠের পারে দূরের গ্রামে
 আপসা বাঁশের বন।
 গোরুটা কার থেকে থেকে
 খোঁটায়-বাঁধা উঠছে ডেকে
 ভিজ়ছে সারাক্ষণ।
 গদাই কুমোর অনেক ভোরে
 সাজিয়ে নিয়ে উঁচু ক'রে
 হাঁড়ির উপর হাঁড়ি
 চলছে রবিবারের হাটে
 গামছা মাথায় জলের ছাঁটে
 হাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি।
 বন্ধ আমার রইল খেলা,
 ছুটির দিনে সারাবেলা
 কাটবে কেমন করে?
 মনে হচ্ছে এমনিতিরো
 ঝরবে বৃষ্টি ঝরঝর
 দিনরাস্তির ধরে!
 এমন সময় পূর্বের কোণে
 কখন বেন অন্যমনে
 ফাঁক ধরে ওই মেঘে,
 মৃধের চাদর সরিয়ে ফেলে
 হঠাৎ চোখের পাতা মেলে
 আকাশ ওঠে জেগে।
 ছিঁড়ে-হাওয়া মেঘের থেকে
 পুকুরে রোদ পড়ে বেকে,
 লাগায় ঝিলিমিলি।

বাঁশবাগানের মাথায় মাথায়
 তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায়
 হাসায় খিলিখিলি।
 হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
 ভুলিয়ে দিলে একনিমেয়ে
 বাদলবেলার কথা।
 হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
 নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
 বেড়ার ঝুমকোলতা।
 উপর নীচে আকাশ ভরে
 এমন বদল কেমন করে
 হয়, সে কথাই ভাবি।
 উলটপালট খেলাটি এই,
 সাজের তো তার সীমানা নেই,
 কার কাছে তার চাবি?
 এমন যে ঘোর মন-খারাপি
 বৃকের মধ্যে ছিল চাপি
 সমস্তখন আজি
 হঠাৎ দেখি সবই মিছে
 নাই কিছ, তার আগে পিছে
 এ যেন কার বার্তা!

সংযোজন

সময়হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম : কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, “দশটা বাজাই বন্ধ।”
তাঁধিন তাঁধিন তাঁধিন।

শুই নে বলে রাগিস যদি, আমি বলব তোরে,
“রাত না হলে রাত হবে কী করে।
নটা বাজাই থামল যখন, কেমন করে শুই।
দোরি বলে নেই তো মা কিচ্ছুই।”
তাঁধিন তাঁধিন তাঁধিন।

যত জানিস রূপকথা মা, সব যদি ঘাস বলে
রাত হবে না, রাত যাবে না চলে :
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না তো খেলা,
ফুরোয় না তো গল্প বলার বেলা।
তাঁধিন তাঁধিন তাঁধিন।

পূর্ববী

উৎসর্গ

বিজয়ার করকমলে

পূরবী

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা; সেই যে আমার আপন মানুষগুণ
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের করনা নিল তুলি;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ত্ন,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতার, নয় সে নিশাস-বারত্ন।
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে;
নিমেষগুণির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পূরে;
অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বসন্ত-দোলার দোলে—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শূন্য রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নিব্বিরণী-সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্রান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্নবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
বলে নে ভাই, 'এই যা দেখা, এই যা ছোঁয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কাম্বাহাসির গঙ্গা-যমুনা
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পূণ্য ধরার ধূলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।'

বিজয়ী

তখন তারা দম্ভ-বেগের বিজয়-রথে
ছুটছিল বীর মস্ত অধীর, রক্তধূলির পথ-বিপথে।
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো,
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্দির কোন্ ক্রান্ত বায়ে;
বিহঙ্গ-গান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষছায়ে।

মশাল তাদের রক্তজ্বালার উত্তল জ্বলে—
অন্ধকারের উষ্মতলে
বহিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে;

দূর-গগনের স্তম্ভ তারা মৃদু শ্রমর তাহার প'রে।
ভাবল পাখিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দম্ভ-পলের মরীচিকা।

ভাবল তারা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তারা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাহি-রানীর দুর্গ-প্রাচীর দম্ভ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিস্তরাণি;
ধরিয়াঁকে করবে আপন ভোগের দাসী।

ওই বাজে রে ঘণ্টা বাজে।
চমকে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে।
আপ্নাকে হায় দেখাছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুত্রীর সিংহাসনে লক্ষ্মণির রাজার বেশে;
মহেশ্বরের বিশ্ব যেন লুপ্ত করেছে অট্ট হেসে।

শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ওই যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শূদ্ররাগে;
মশাল-ভস্ম লুপ্ত-ধূলার নিত্যদিনের সৃষ্টি মাগে।
আনন্দলোক স্বার খুলেছে, আকাশ পলকময়,
জয় ভুলোকে, জয় দুলোকে, জয় আলোকে জয়।

মাটির ডাক

শালবনের ওই আঁচল বোপে
যেদিন হাওয়া উঠত খেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল বাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগত পলক কী মন্তরে
কিচ পাতার প্রথম কল-কথায়,
সেদিন মনে হত কেন
ওই ভাষারই বাণী যেন
লুকিয়ে আছে স্বপ্নকুলাহারে;

তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-খেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা-রঙিন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠত দূলে
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—
সেদিন আমার হত মনে
ওই সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি:
তাই তো হিরা ছুটে পালায়
যেতে তারি যন্তশালায়,
কোন ভুলে হয় হারিয়েছিল চাবি।

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে—
'যে জননীর কোলের 'পরে
জন্মেছিল মর্ত্য-ঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে:
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে।
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।'
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাকে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
'গেছিস দূরে, অনেক দূরে,'
কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব লাগে প্রাণে
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে,
ফিরেছি তাই নানামতে
নানান ছাটে নানান পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
 মা আমার এই শ্যামল মাটি,
 অম্বে ভরা শোভার নিকেতন;
 অপ্রভেদী মন্দিরে তার
 বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
 ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
 এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
 প্রভাত-রবির শব্দ বাজে,
 আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
 এইখানে সে পূজার কালে
 সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
 শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
 হেথা হতে গেলেম দূরে
 কোথা যে ইঁটকাঠের পুরে
 বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে,
 ভ্রমিত যে নাই, কেবল নেশা,
 ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা,
 আবর্জনা জমে উপার্জনে।
 যন্ত্র-জাঁতার পরান কাঁদায়,
 ফিরি ধনের গোলক-ধাঁধায়,
 শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে;
 পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
 লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
 কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বদকে,
 যাই চলে যাই মর্জিত-সুখে,
 ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে,
 আজ ধরণী আপন হাতে
 অন্ন দিলেন আমার পাতে,
 ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পছন্দে।
 আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
 নিশ্বাসে মোর খবর আসে
 কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
 ছর ঋতু ধার আকাশতলার,
 তার সাথে আর আমার চলার
 আজ হতে না রইল ব্যবধান।

যে দূতগর্দীল গগনপারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যার,
আজ হয়েছে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কী ভুল ভুলেছিলাম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চার দিকে এই যে-ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

২০ ফাল্গুন ১৩২৮

পশ্চিমে বৈশাখ

রাগি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিবানি
হাতে করে আনি'
দ্বারে আসি দিল ডাক
পশ্চিমে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি;
অরণ্যের স্তান ছায়া বাজে যেন বিষম ভৈরবী।
শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
রক্তপথ শূন্য মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সম্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে—
আত্ম আত্মের বনে কণে কণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শূন্যপথে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কালবৈশাখীর স্রস্ট মেঘে
অস্বহীন বেগে।

আর সে একান্তে আসে
 মোর পাশে
 পীত উত্তরীরতলে লয়ে মোর প্রাণ-দেবতার
 স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
 নীলকান্ত আকাশের খালা,
 তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত স্ফূর্তি পিয়লা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
 যে অনন্ত সমুদ্রের শব্দ নিয়ে হাতে,
 তাহার নির্ঘোষ বাজে
 ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে।
 জন্ম-মরণের
 দিবলয়-চক্রেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
 সে আজ মিলাল।
 শূন্য আলো
 কালের বাণীর হতে উচ্ছ্বাস যেন রে
 শূন্য দিল ভরে।
 আলোকের অসীম সংগীতে
 চিত্ত মোর কংকারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয়-দিক্-প্রান্ত-তলে নেমে এসে
 শান্ত হেসে
 এই দিন বলে আজি মোর কানে,
 'অম্লান নূতন হরে অসংখ্যের মাঝখানে
 একদিন তুমি এসেছিলে
 এ নিখিলে
 নবমালিকার গঞ্জে,
 সন্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল-হুল্লোল,
 শ্যামলের বদকে,
 নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে।
 সেই যে নূতন তুমি,
 তোমারে ললাট চুমি
 এসেছি আগাতে
 বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

হে নূতন,
 দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শূভক্ষণ।
 আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
 শীর্ণ নিম্নেষের যত ধূলিকণীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।

মনে রেখো হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন—
যেমন প্রথম জন্ম নিরুপেক্ষের প্রতি পলে পলে;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিঁধে যেমন উছলে
প্রতিফলনে
প্রথম জীবনে।
হে নতুন,
হোক তব আগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হৃদাশন।

হে নতুন,
তোমার প্রকাশ হোক কুস্মাটিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি,
শূন্য পাথে কিশলয় মূহূর্তে অরণ্য দেয় ভারি—
সেইমতো হে নতুন,
রিঙতার বন্ধ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
বাঙ হোক তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।

উদয়দিগন্তে ওই শূন্য শব্দে বাজে।
মোর চিস্তমাঝে
চির-নতনেরে দিল ডাক
পাঁচিলে বৈশাখ।

২৫ বৈশাখ ১৩২৯

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বস্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতার পাতার;
বর্ষে বর্ষে এ দোলার দিত তাল তোমার ক্ষে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি লজাটে কর হানি
বিধবার বেলে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলিপরে।
আম্বিলে উৎসব-সাজে করৎ সন্দর শূন্য করে

শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শূন্যরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পদ্পগদলি
নীরব-সংগীত তব স্মারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীতে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজিয়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য ষত, ষত-কিছ, অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রুর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিষাছ ক্ষিপ্ৰবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ-সম;
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তম্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দুরবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরনে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেখা তুমি একে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিঙ্গন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সংগীত তব; কাননের পল্লবে কদমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রীদল রত্নস্বার-রাগি অবসানে
নিঃশব্দে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের জাগি
অশ্বকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মালা বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথর
বহিতেছে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পুজারী।

আজও যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই বাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দুরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মর্ত্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সম্ভান কোথায়,
কোথায় সাক্ষ্য। বন্ধুত্বমিলনের দিনে বারংবার
উৎসব-রসের পাশ পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, প্রস্থায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে হার,

জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া স্মান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শূন্য—আজি বাধা কি গো ঘৃণিচল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলীর তলে আজি
নবসূর্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে। সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি; আছে তাহে সমাপ্তির বাধা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষন্ন মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে খেলার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারিগানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিকথানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি ওই খেলা-পয়ে করি ভর—
না জানি সে কোন্ দাম্ভ শিউলি-ঝরার শূকুরাতে,
দক্ষিণের দোলা-জাগা পাখি-জাগা বসন্তপ্রভাতে,
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে, প্রাণের
ঝিল্লিমন্ত্র-সঘন সম্ভাষণ, মুখরিত প্লাবনের
অদান্ত নিশীথ রাত্রে, হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলি-গদগদনতলে।

ধরণীতে প্রাণের খেলার
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলিছি আপন মনে; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি ঝরে হাতে,
মুগ্ধ মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরষাঝা মাখে।
আজ তুমি গেলে আগে; ধরিত্রীর রাত্রি আমার দিন

তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
 চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্য করি, মূহূর্তের মাঝে।
 গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা স্ফুটন্তীর বাজে
 অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
 ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
 সেথা তুমি অগ্রজ আমার; যদি কভু দেখা হয়,
 পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
 কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে। যেমনি অপূর্ব হোক নাকো,
 তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
 ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভরে দুঃখে সুখে
 বিজড়িত—আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মূখে
 যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
 সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
 তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
 অমর্ত্যলোকের দ্বারে—বার্থ নাহি হোক এ কামনা।

১৪ আষাঢ় ১৩২১

শিলঙের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী কল্যাণীয়াস,

ছন্দ লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে,
 ভাবছি বসে, এই কল্যায়ের আর কি তেমন জোর আছে।
 তরুণ মেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস,
 মনে ছিল হই বৃষ্টি বা বাজ্যমীকি কি বেদব্যাস,
 কিছ্র না হোক 'লঙ্কেশ্বরের' হন আমি সমান তো,
 এখন মাথা ঠান্ডা হয়ে হয়েছে সেই প্রমত্ত।
 এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিত্ত,
 আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিত্ত।
 যা হোক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে,
 শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈয়ী সে;
 সেই সেকালের নেলা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
 নতুন বৃগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
 তাই বসেছি ডেস্ক আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,
 'কলম লে আও, কাগজ লে আও, কার্লি লে আও, ধাঁ কর্কে।'

ভাবছি যদি তোমরা দুজন বছর তিরিশ পূর্বেতে
 গরজ করে আসতে কাছে, কিছ্র তবু সদর পেতে।
 সেদিন যখন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
 বর্তমানের সদৃশ্যের প্রায় ছিল সব ছায়া লোক,

তখন যদি বলতে আমার লিখতে পয়ার মিল করে,
লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল্ পিল্ করে।
পঞ্জিকাটা মান' না কি, দিন দেখাটায় লক্ষ নেই?
ল'নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছ অক্ষণেই।
যা হোক তবু যা পারি তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে,
কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে।
শিলঙগিরির বর্ণনা চাও? আচ্ছা না-হয় তাই হবে,
উচ্চদের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে—
মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাত্রা দেবার বিধান তো;
তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার নিতান্ত।

গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে,
ঠান্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণো
ক্রান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, 'কোলে আমার শরণ নে।'
অর্ন। করে কল্কলিয়ে আঁকাবাঁকা ভাঁগতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
নিশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে।
দার্জিলিংয়ের তুলনাতে ঠান্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার দৃষ্টিপাত;
মোদের 'পরে বাদল-মেঘের নেই ততদ্র দৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়;
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল ফুলি,
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিস দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠান্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন গিরিদেবের পাণ্ডাটি।
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যা দেখায় শৈলবুকে শস্য-খেতের থাক কাটা।
ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে।
নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচকাওয়াজের কান্ডটা,
তা ছাড়া ওই ব্যাপ্তপাইপ নামক বাদ্যভান্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সরগরম,
গুলিগোলায় খড়্‌খড়ানি, বুকের মধ্যে ধরুধরম।

আর ভালো নর মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া,
 নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাক দেওয়া।
 তা ছাড়া সব পিসু মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি,
 কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় পিত্তাদি;
 এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিংবা অর্ধটা
 যৎসামান্য উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফদটা।
 দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে—
 মোটের উপর শিলঙ ভালোই, ঘাই-না বলুক বিন্দুকে।
 আমার মতে জগৎটাতে ভালোটোরই প্রাধান্য—
 মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।
 বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
 আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।

ছড়া কিংবা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে।
 তথাপি এই ছন্দ রচে করেছি কাল নষ্ট তো;
 এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখি স্পষ্টত—
 তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি,
 আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি।
 তবু আমার পক্ষ কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে
 আমাকে যে ভয় কর নি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে,
 মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
 কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লক্ষিত,
 এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
 মনে হল, বৃন্দ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
 মনে হল আজো আছে কম বয়সের রঞ্জিয়া,
 জরার কোপে দাড়ি গোঁপে হয় নি জবড়-জঞ্জিয়া।
 তাই বৃদ্ধি সব ছোটো ষারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
 এক-বয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিশ্বাসে।
 এই ভাবনার সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
 ডাকছে ভোলা 'খাবার এল' আমার কি আর হুঁশ আছে।
 জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
 ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিষ্পত্ত।
 মনকে ডাকি, 'হে আশ্চার্য্য, ছুটুক তোমার কবিত্ব,
 ছোটো দাঁটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব।'

যাত্রা

আশ্বিনের রাগিণে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্নে আকুল বনতল; তারা মরণকালের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে; শব্দ বলে, 'চলো চলো।'
অশ্রুবাম্প-কুহেলিতে দিগন্তের চক্ষু ছলছল,
ধরিয়াই আশ্রু-বক্ষে তুণে তুণে কম্পন সঞ্চারে,
তবু ওই প্রভাতের যাত্রীদল বিদায়ের স্বারে
হাস্যমুখে উদ্বোধনে চায়, দেখে অরুণ-আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংসশব্দ মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে।

ওরে, এতক্ষণে বৃষ্টি
তারা-ঝরা নিকরের স্রোতঃপথে পথ ধুঁজি ধুঁজি
গেছে সাত ভাই চম্পা; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ; দিব্যধর বেণুতে বেণুতে
বেজেছে ছুটির গান; ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি
মৃষ্টির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে উদ্বোধন বাহু তুলি
উচ্ছলিয়া বলে, 'চলো, চলো।' বাউল উত্তরে-হাওয়া
ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুদ্ধনেশা-পাওয়া;
বাজায় অশান্ত ছন্দে তাল-পল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগমন্ত্র; স্পর্শে তার হয়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তারা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে—বলে, 'বৃন্তবন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘ সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব যেথা শংকরের টলমল চরণ-পাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তান্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাজুট ধনুঁরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খন্ড খন্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।'

ওরা ডেকে বলে, 'কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গো যাবে, যেথা অন্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনা-সভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির স্তিম জ্বালা
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য; যেথায় নিঃশব্দ বেগু-পরে
সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে।'

কবি বলে, 'যাত্রী আমি, চলিব রাগির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালের উৎসব-প্রাঙ্গণে

মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দ দীপগদলি,
 যেথা মোর জীবনের প্রত্যয়ের স্নেহগন্ধি গিউলি
 মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুন্ডলে,
 ইন্দ্রাণীর স্বয়ংবর-বরমাল্য সাথে; দলে দলে
 যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগদলি, অসিদ্ধ সাধনা,
 মন্দির-অঙ্গনম্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
 নন্দন-মন্দারগন্ধ-লব্ধ যেন মধুকর-পাণি,
 গেছে উড়ি মর্ত্যের দূর্ভিক্ষ ছাড়ি।

আমি তব সাথী,

হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
 প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর সূচিরসিঞ্চিত
 অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বন্ধতলে,
 সম্মির্ষ নিব্বাকের নিব্বাণবাণীর হোমানলে।'

৫ আশ্বিন ১৩৩০

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগদলি,
 হে কালের অধীশ্বর, অনামনে গিয়েছ কি ভুলি,
 হে ভোলা সম্যাসী।

চণ্ডল চৈত্রে রাত্রে

কিংকরকমলরী সাথে

শূন্যের অকূলে তারা অথক্কে গেল কি সব ভাসি।
 আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশূদ্র মেঘের ভেলায়
 গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
 নির্মম্ব হেলায়?

একদা সে দিনগদলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
 শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পদ্পে বিচিত্র সাজালে,
 গেছ কি পারি।

দসদ্ তারা হেসে হেসে

হে ভিক্ষুক, নিল শেষে

তোমার ডম্বর শিঙা, হাতে দিল স্বঞ্জিরা, বাঁশরি।
 গন্ধভারে আশ্বিনের বসন্তের উদ্ভাদন-রসে
 ভারি তব কমন্ডল নিম্বঞ্জিল নিবিড় আলসে
 মাধব-রসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
 শূন্যপথে স্বর্ণবেগে গীতরিঙ হিম্বরসে
 উজ্জ্বল রসে।

তব ধ্যানমন্ডলটিরে
 আনিল বাহির তীরে
 পদ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কোতুকে।
 সে মন্ডে উঠিল মাতি সে উতি কাণ্ডন করাবিকা,
 সে মন্ডে নবীনপদ্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
 শ্যাম বহিঃশিখা।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সম্মাসের হল অবসান;
 জটিল জটর বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
 শুনিলে তন্ময়।

সেদিন ঐশ্বর্য তব
 উন্মেষিল নব নব,
 অন্তরে উন্মেষিল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।
 আপনি সম্মান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
 আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
 বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
 সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
 তব সঙ্গ ধরে।

ললাটের চন্দ্রালোকে
 নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
 নিত্য-নৃতনের লীলা দেখেছিনু চিস্ত মোর ভ'রে।
 দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঞ্জিমা,
 দেখেছিনু লজ্জিতের পদলকের কুণ্ঠিত ভঞ্জিমা,
 রূপ-তরঞ্জিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘূঢ়ালে পূর্ণতা :
 মৃদুছিলে, চুম্বনরাগে চিহ্নিত বস্কিম রেখা-লতা
 রক্তিম-অঙ্কনে?

অগীত সংগীতধার,
 অশ্রুর সঞ্চার
 অথলে লুপ্তিত সে কি ভগ্নভান্ডে তোমার অঙ্গনে?
 তোমার তান্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি?
 নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিঃবাসে কি উঠিছে আকূলি
 লুপ্ত দিনগূলি।

নছে নছে, আছে তারা : নিয়েছ তাদের সংহরিতা
 নিগূঢ় ধ্যানের রাগে, নিঃশব্দের মাঝে সংবরিতা
 রাখ সংগোপনে।

তোমার জটায় হারা
 গঙ্গা আজ শান্তধারা,
 তোমার ললাটে চন্দ্র গদ্যস্ত আজি স্দান্তির বন্ধনে।
 আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
 অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
 'নাহি রে, নাহি রে।'

কালের রাখাল তুমি, সম্মুখ তোমার শিঙা বাজে,
 দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তম্ভ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
 উৎকণ্ঠিত বেগে।

নির্জন প্রান্তরতলে
 আলোর আলো জ্বলে,
 বিদ্যুৎ-বাহির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
 চঞ্চল মূহূর্ত যত অন্ধকারে দঃসহ নৈরাশে
 নিবিড় নিবন্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
 শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সম্মান
 চঞ্চলের নৃত্যশ্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
 দূরন্ত উল্লাসে।

বন্দী যৌবনের দিন
 আবার শৃঙ্খলহীন
 বারে বারে বাহিরিবে বাগ্ন বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
 বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থাবিরের শাসন-নাশন,
 বারে বারে দেখা দিবে; আমি রুচি তারি সিংহাসন,
 তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ-দূত আমি গাহেন্দ্রের, হে রুদ্ধ সম্মাসী,
 স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
 তব তপোবনে।

দুর্জয়ের জয়মালা
 পূর্ণ করে মোর ডালা,
 উদ্দামের উত্তরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
 ব্যথার প্রজাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
 কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
 মোর গান হানি।

হে শৃঙ্খল বঙ্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
 সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
 ছন্দরগবেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তারি তুণ সম্মোহনে ভরি দিব বলে
আমি করি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারংবার প্রেমসীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অনামনা,
নতন উৎসাহে।

তাই তুমি ধ্যানছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদঃখদাহে।
ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দোঁখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই করি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অটুহাসি
দেখে মোর সাজ।

হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন করিবে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পদ্প-মালা-মাণ্ডাল্যের সাজ লয়ে, সপ্তর্ষির দলে
করি সঙ্গ চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শত্রুতনু রক্তাংগকে রহিয়াছে ঢাকি,
প্রাতঃসূর্যরুচি।

অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে,
ভালে মাথা পদ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মৃদুহি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া করি-পানে;
সে হাস্যে মন্দির বীণি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পুরানে।

ভাঙা মন্দির

পদ্যলোভীর নাই হল ভিড়
 শূন্য তোমার অঙ্গনে,
 জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
 অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজালো
 পদ্যে প্রদীপে চন্দনে,
 যাত্রীরা তব বিস্মৃত-পরিচয়।
 সম্মুখপানে দেখো দেখি চেয়ে,
 ফাঙ্গনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে
 বনফুলদল ওই এল ধেয়ে
 উল্লাসে চারি ধারে।
 দক্ষিণ বায়ে কোন্ আহবান
 শূন্যে জাগায় বন্দনাগান,
 কী খেয়াতরীর পায় সম্মান
 আসে পৃথবীর পারে।
 গন্ধের খালি বর্ণের ডালি
 আনে নিৰ্জন অঙ্গনে,
 জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
 বকুল শিমূল আকন্দ ফুল
 কাণ্ডন জবা রংগনে
 পূজা-তরঙ্গ দলে অম্বরনয়।

২

প্রতিমা না-হয় হয়েছে চূর্ণ,
 বেদীতে না-হয় শূন্যতা,
 জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
 না-হয় ধূলায় হল লুপ্তি
 আছিল বে চড়া উন্নতা,
 সম্ভ্রা না থাকে কিসের লজ্জা ভয়।
 বাহিরে তোমার ওই দেখো ছবি,
 ভূমিভিত্তিলগ্ন মাধবী,
 নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
 হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।
 বাতাসে পূর্নকি আলোকে আকুসি
 আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুণি,
 নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি
 প্রাচীন তোমার গেহে।
 সন্দের এসে ওই হেসে হেসে
 ভরি দিল তব শূন্যতা,

জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরশ্চে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুদ্রতা
রূপের শব্দে অসংখ্য জয় জয়।

৩

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে
যত সন্ন্যাসী-সম্মানে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
নাই মদুখরিল পার্বণ-ক্ষণ
ঘন জনতার গর্জনে,
অতিথি-ভোগের না রহিল সন্ধ্যা।
পূজার মণ্ডে বিহঙ্গদল
কুলায় বর্ধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন
ভূত পরানে করিছে কুজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎসতীরে।
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী-সম্মানে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে—
প্রসাদ-অমৃত-মন্ডনে
স্থলিত ভিত্তি হল যে পূণ্যময়।

মাস ১০০০

আগমনী

মাঘের বৃকে সকৌতুকে কে আজি এল, আহা
বৃক্ষিতে পায় তুমি?
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে করিল, 'আহা আহা'
সকল বনভূমি?
শুদ্ধ জরা পুষ্প-ঝরা,
হিমের বায়ে কপিন-ধরা
শিথিল মন্ডর;
'কে এল' বলি তরাসি উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়াপথে,
 পায়ের ধ্বনি নাহি।
 ছায়াতে এল, কায়তে এল, এল সে মনোরথে
 দখিন-হাওয়া বাহি।
 অশোকবনে নবীন পাতা
 আকাশ-পানে তুলিল মাথা,
 কহিল, 'এসেছ কি।'
 মর্মরিয়া থরথর কাঁপিল আমলকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে,
 'শোনো গো, শোনো শোনো।'
 শামা না জানে প্রভাতী গানে কী নামে তারে ডাকে
 আছে কি নাম কোনো।
 কোকিল শূদ্ধ শূদ্ধ শূদ্ধ শূদ্ধ
 আপন মনে কুহরে কুহর
 ব্যথায় ভরা বাণী।
 কপোত বৃদ্ধি শূদ্ধ শূদ্ধ, 'জানি কি, তারে জানি।'

আমের বোলে কী কলরোলে সুবাস ওঠে মতি
 অসহ উচ্ছ্বাসে।
 আপন মনে মাধবী ভনে কেবলই দিবারাতি,
 'মোরে সে ভালোবাসে।'
 অধীর হাওয়া নদীর পারে
 খাপার মতো কহিছে কারে,
 'বলো তো কী-যে করি।'
 শিহরি উঠি শিরীষ বলে, 'কে ডাকে, মরি মরি!'

কেন যে আজি উঠিল বাজি আকাশ-কাঁদা বাঁশ
 জানিস তাহা না কি।
 রঙিন যত মেঘের মতো কী যায় মনে ভাসি
 কেন যে থাকি থাকি।
 অবদূর তোরা, তাহারে বৃদ্ধি
 দূরের পানে ফিরিস খুঁজি;
 বাহিরে অধি বাঁধা,
 প্রাণের মাঝে চাহিস না যে তাই তো লাগে ধাঁধা।

পদকে-কাঁপা কনকচাঁপা বৃকের মধু-কোষে
 পেয়েছে ম্বার নাড়া,
 এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে
 দিয়েছে তারি সাড়া।

সহসা বনমালিকা যে
পেয়েছে তারে আপন-মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
'এই যে তুমি, এই যে তুমি' আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব
আপন মাঝখানে,
তাই এ শীতে জাগালো গীতে বিপুল কলরব
স্বিধাবিহীন তানে।
ওদের সাথে জাগ্ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্ সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর।
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক-না ভরে ভোরের নব রবি,
বাজ্ রে বীণা বাজ্।
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে দূলে কবি,
ফুরাল তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি।

মাঘ ১৩৩০

উৎসবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিরস-কাছে,
মিলন-সুখের বন্ধোমাঝে।
আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে ক্ষণে
বেদনার রুদ্ধ দেবতা যে।
তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাষ্পাকুল অরণ্যের করুণ আলোতে
উদ্ভাস-কল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-সুখের বন্ধোমাঝে।

নবীন পল্লবপুষ্পে মর্ম্মির মর্ম্মির উঠে
দ্রব বিরাহের দীর্ঘশ্বাস;
উষার সীমন্তে লেখা উদয়-মিলন-রেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।

আগ্নের মৃকুলগন্ধে ব্যাকুল কী সুর
 অরণ্যছায়ার হিয়া করিছে বিধুর;
 অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
 দূর বিরহের দীর্ঘস্বাস।
 দিগন্তের স্বর্ণস্বারে কতবার বারে বারে
 এসেছিল সৌভাগ্য-সগন।
 আশার লাবণ্যে-ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা,
 হেসেছিল প্রভাত-গগন।
 কত-না উৎসুক বৃকে পথপানে ধাওয়া,
 কত-না চকিত চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
 বারে বারে বসন্তেরে করেছিল চাণ্ডল্যে-মগন,
 এসেছিল সৌভাগ্য-সগন।

আজ উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে,
 বাতাসেরে করে যে উদাস।
 তাদের পরশ পায়, কী মায়াতে ভরে যায়
 প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ।
 তাদের চমক লাগে চম্পক-শাখায়,
 কাঁপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাখায়,
 সেতারের তারে তারে মূর্ছনায় তাদের আভাস
 বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকূলে আলোচ্ছায়া দূলে দূলে
 চলে নিত্য অজানার টানে।
 বর্ষাশ কেন রহি রহি সে আহ্বান আনে বহি
 আজি এই উল্লাসের গানে?
 চণ্ডলেরে শুনাইছে স্তম্ভতার ভাষা,
 যার রাগি-নদীড়ে আসে যত শঙ্কা আশা।
 বর্ষাশ কেন প্রশ্ন করে, 'বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
 চলে নিত্য অজানার টানে?'

যায় যাক, যায় যাক, আসুক দূরের ডাক,
 যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
 চলার সংঘাত-বেগে সংগীত উঠুক জেগে
 আকাশের হৃদয়-নন্দন।
 মৃহর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
 যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায় মাদল;
 অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হারিস ও ক্রন্দন,
 যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

গানের সাজি

গানের সাজি এনেছি আজি,
 ঢাকাটি তার লও গো খুলে
 দেখো তো চেয়ে কী আছে।
 যে থাকে মনে স্বপন-বনে
 ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
 সে বৃষ্টি কিছ্রু দিয়েছে।
 কী যে সে তাহা আমি কী জানি,
 ভাষায় চাপা কোন্‌ সে বাণী
 সুরের ফুলে গন্ধখানি
 ছন্দে বর্ষি গিয়াছে,
 সে ফুল বৃষ্টি হয়েছে পূজি.
 দেখো তো চেয়ে কী আছে।

দেখো তো সখী, দিয়েছে ও কি
 সুখের কাঁদা দুখের হাসি,
 দুঃখাভরা চাহনি।
 দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
 দিয়েছে কি সে রাতের বর্ষা
 গহন-গান-গাহনি।
 বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা,
 সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
 আপন মনে আগুন-খেলা
 পরানমন-দাহনি—
 দেখো তো ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা
 আছে আকুল চাহনি?

ডেকেছ কবে মধুর রবে,
 মিটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা
 তোমার করপরণে,
 সহসা এসে করুণ হেসে
 কখন চোখে ঢালিলে সুখা
 ক্ষণিক তব দরণে—
 বাসনা জাগে নিভুতে চিতে
 সে-সব দান ফিরায়ে দিতে
 আমার দিনশেষের গীতে—
 সফল তারে করো-সে।
 গানের সাজি খোলো গো আজি
 করুণ করপরণে।

রসে বিলীন সে-সব দিন
 ভরেছে আজি বরণডালা
 চরম তব বরণে।
 সুরের ডোরে গাঁথনি করে
 রচিয়া মম বিরহমালা
 রাখিয়া যাব চরণে।
 একদা তব মনে না রবে,
 স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
 তাহারি আগে মরুক তবে
 অমৃতময় মরণে
 ফাগুনে তোরে বরণ করে
 সকল শেষ বরণে।

ফাগুন ১৩৩০

লীলাসংগিনী

দুরার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
 মনে হল যেন চিনি—
 কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
 ছিলে লীলাসংগিনী?
 কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
 মনে পড়ে গেল আজি বৃষ্টি বন্ধুরে?
 ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
 বাজাইলে কিংকণী।
 বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
 আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচূলে বহে এনেছ কী মোহে
 সেদিনের পরিমল?
 বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
 কবেকার সম্বল?
 চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
 চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
 সেদিনের ভূমি এলে এদিনের সাজে
 ওগো চিরচঞ্চল।
 অশ্লল হতে করে বায়ুস্রোতে
 সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ সখী,
 ভুলায়েছ বায়ে বায়ে।
 বন্ধ দুরার খুলেছ আমার
 কঙ্কল-স্বংকারে।

ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘরে ঘরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমার নবমুকুলের বেশে,
কছু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহ্নিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

নদী-কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগন-কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে?
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,
অযাত্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আরোজনে?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুণি?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বদলাব রসের তুলি?
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কলগুণিত মৌমাছিদের সাথে
পাখার পদ্পদুণি।
আবার নিভুতে হবে কি রচিতে
মানসপ্রতিমাগুণি।

দেখ না কি হার, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।

বাজে পুরবীর ছন্দে রবির
 শেষ রাগিণীর বীন।
 এতদিন হেথা ছিন্দু আমি পরবাসী,
 হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
 আজ সম্মুখ প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
 গানহারা উদাসীন।
 কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
 সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
 নিশীথ-অন্ধকারে।
 মনে মনে বৃষ্টি হবে খোঁজাখুঁজি
 অমাবস্যার পারে?
 মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
 তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে?
 সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
 নীরবে লভিব তারে?
 দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
 রচিবে অন্ধকারে?

যদি রাত হয়, না করিব ভয়—
 চিনি যে তোমারে চিনি।
 চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
 হে গোপন-রাগিণী।
 নিমেষে অঁচিল ছুঁয়ে যার যদি চলে
 তবু সব কথা যাবে সে আমার বলে,
 তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
 হে রস-তরাঙ্গিণী!
 হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ে,
 চিনি যে তোমারে চিনি।

ফাল্গুন ১৩৩০

শেষ অর্ঘ্য

যে তারা মহেন্দ্রকণে প্রভুষবেলায়
 প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী
 শান্তমুখে; নিখিলের আনন্দমেলার
 স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল: দিল আনি
 ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
 প্রাণের প্রাপ্তগে; যে সুন্দরী, যে কণিকা

নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুরি-পাতে তন্দ্রাঘর্ষিকা
সহাস্যে সরাস্রে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলারে দিল রূপের মণিকা;
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিন্, ঋজ্বিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

ফাল্গুন ১৩৩০

বেঠিক পথের পথিক

বেঠিক পথের পথিক আমার
অঁচিন সে জন রে।
চকিত চলার কঁচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশথ-পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগার চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

অঁচিন বেদন আমার ভাষায়
মিলায় যখন রে
আপন গানের গভীর নেশায়
মন কেমন করে।
তরঙ্গ চোখের ভিমির ভারায়
যখন আমার পরান হারায়,
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্বপন যে।
কী চাই, কী চাই, সদর যে না পাই
মনের মতন রে।

হেলার খেলার কোন্ অবেলার
হঠাৎ মিলন রে।
সুখের দুখের দুঃখের মেলার
মন কেমন করে।
বধুর বাহুর যথুর পরশ
কারার জাগার মায়ার হরষ,

তাহার মাঝার সেই অচেনার
চপল স্বপন যে,
কী চাই, কী চাই, বাধন না পাই
মনের মতন রে।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে।
ছুই কি না ছুই বৃষ্টি না কিছুই
মন কেমন করে।
চরণে তাহার পরান বদলাই
অরূপ দোলায় রূপে দোলাই;
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্বপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

ফাল্গুন ১৩৩০

বকুল-বনের পাখি

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
দেখো তো, আমার চিনিতে পারিবে না কি।
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি,
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম?

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে কথা কি।
বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলাম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।
সহজ রসের ঝরনা-ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সৃষ্টির ভরে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
কাছে এসেছিন্দ ভুলিতে পারিবে তা কি।
নন্দ পরান লয়ে আমি কোন্ সৃষ্টি
সারা আকাশের ছিন্দ যেন বৃকে বৃকে,

বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি।
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি।
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাই।
কিছু, কি থাকে না বাকি।
বালক গিয়েছে হারিয়ে, সে কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে?

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
আরবার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি।
যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,
ধরার খুঁশিতে আছে সে সকলখানে;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখী।
আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,
বিদায়ের আগে লও গো আপন করে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
সেদিন চিনেছ আজিও চিনিবে না কি।
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
খেয়াল-খেয়াল পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
সুন্দের সুন্দের সাক্ষী।
আর কিছু, নই, তোমারি গানের সাথী,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাত্তি।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
মৃন্মুর টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক-না ফেঁসে,
কীর্তি যাক-না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।

ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি।

বেগুপল্লব-মর্মর-রব সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোখলি-থনে।

ফাল্গুন ১৩৩০

ଅଧିକ

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দূর্যোগে খজা হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি।
বহুবীণা বন্ধে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বেগধনীর বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যাষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে চুম্বনে উচ্ছলিত জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছ্বাস উঠিল মন্দির বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উদ্ভাস সংগীত কোথা ভেসে যার উদ্ভাস আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বন-মন্ত্রে বন্ধে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথার বিস্মিত।

তোমার হোমোনি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।
তমিস্র সূক্তির কলে যে বংশী বাজাও আদিকবি,
ধ্বংস করি তম,
সে বংশী আমারি চিস্ত, রম্ভে তারি উঠিছে গদ্গরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভণ্ডে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সগরি
জীবনহিল্লোল।

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সূরের উরণী;
আশ্রুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসিয়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিজ বদকে।

আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্মদ্রিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরজ্জ্বলিত
উৎসুক আলোক।

তরঙ্গহিম্মোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে প্ৰরিত
করে মৃদু চোখ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে।

কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গদ্য-প্রাণে।

তোমার দ্যুতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা:
মৃদুহৃৎ সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মৃদুছে যায় সরে।

তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা,
না বাধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ-বর্ষণে;

যোগ দিক নিখরুর মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপল-ঘর্ষণে।

ঝঞ্জার মদিরামস্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।

তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বর্ষাশিতে
জাগিল মূর্ছনা।

আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।

জানি না কী মন্ততার, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী,
লয়ে তার ডালি।

সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।

শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।

সীমন্তে, গোখলিলেনে দিলো একে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখে রেখে আলোকবিন্দুর
তার সিন্ধু ভালে।

দিনান্ত-সংগীতধ্বনি সঙ্গমভীর বাজুক সিন্দুর
তরঙ্গের ভালে।

হারুনা-মারু জাহাজ
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

পূর্ণতা

স্তম্ভরাতে একদিন
নিপ্লাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অগ্রনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—
'তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমানা ভাঙে
সমস্ত ভূবন মম
মরুসম
রুদ্ধ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্রান্তি
সব শান্তি
চিস্তা হতে করিবে হরণ—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তম্ভ শোক
মরণের অধিক মরণ।'

২

শূনে, তোর মৃদুধ্বনি
বক্ষে আনি
বলেছিন্দু তোরে কানে কানে—
'তুই যদি হাস দূরে
তোরি সূরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গান
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিস্তা
সচকিবে আলোকে আলোকে।

বিরহ বিচিত্র খেলা
 সারা বেলা
 পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
 তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে
 দূরে গিয়ে
 মর্মের নিকটতম দ্বার—
 আমার ভুবনে তবে
 পূর্ণ হবে
 তোমার চরম অধিকার।

৩

দৃষ্ণের সেই বাণী
 কানাকানি,
 শূন্যেছিল সপ্তর্ষির তারা :
 রজনীগন্ধার বনে
 ক্ষণে ক্ষণে
 বহে গেল সে বাণীর ধারা।
 তার পরে চূপে চূপে
 মৃত্যুরূপে
 মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
 দেখাশূন্য হল সারা,
 স্পর্শহারা
 সে অনন্তে বাক্য নাই আর।
 তবু শূন্য শূন্য নয়,
 ব্যথাময়
 অগ্নিবাস্পে পূর্ণ সে গগন।
 একা-একা সে অগ্নিতে
 দীপ্তগীতে
 সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

হারুনা-মারু জাহাজ
 ১ অক্টোবর ১৯২৪

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারংবার
 ফিরেছি ডাকিয়া।
 সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুঁজিয়াছে দ্বার
 থাকিয়া থাকিয়া।

দীপখানি তুলে ধরে, মৃদু চেয়ে, কলকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আধারে
চলে যাই ভেসে।
নিজেরে হারিয়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তুষ্টিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হতে অকস্মাৎ কর মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বদিক না যে।

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
'আছি, আমি আছি।'
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুস্রাশা ফেলে টুটি,
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে,
অসাড়েঁর সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্য-কলরোলে।

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সূক্ষ্মতর দ্বারারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি করে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য ছড়ারে দেয় মৃদু হস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে।

কোন জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতাসনে
রচিতোছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নরনে
করিতে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে;
রোমাঞ্চিত ভূণে
ধরণী কন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
ষিপিনে ষিপিনে।

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ভূত ভান্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভূলি
পদপদ্পদভারে।
দেবতার প্রার্থনার কার্পণ্যের বন্ধ মৃষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি
রহস্যসমুদ্রতল উল্লম্বিয়া উঠে উপকূলে
রক্ত মৃষ্টি মৃষ্টি।

ভূমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক হে কল্যাণী,
দেবতার দৃতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিরা এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাঙে গদ্যত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সম্মানে ভূমি নারী,
দ্রব বাহু বাড়ালে।

তাই তো কবির চিস্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সদৃশিতর তিমির বন্ধ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মৃদুশ্লিষ্টে বহু করে বল,
অসত্যেরে হানে।

হে অন্তিসারিকা, তব বহুদ্র পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব লিখা, মৌন বীণা ধোয় তোমার
অঙ্গুলিপল্লব।
তারায় তারায় খোঁজে তুমার আতুর অন্ধকার
সঙ্গসংসারস।

নিদ্রাহীন বেদনার ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান।
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ ভানে
মোর শেষ গান।

কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁরাবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে।
মহানিস্তত্বের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছে রমণী
নীরব নিশীথে।

মহেশ্বরের বস্ত্র হতে কালো চক্রে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি,
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহি জ্বালো
হে কালবৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্রান্ত তার স্তম্ভ মৃক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।
বন্যাবেগে মদ্রু করো, রিক্ত করি করো পরিগ্রাণ,
সব লও লুটে।

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি; দিগন্ত-অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শূন্যতার শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সঙ্গমভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্বশেষ ক্ষতি:
দুঃখে সূখে পূর্ণ হবে অরূপসুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি।

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী।
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি--
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিবে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন সিঁধ্যপার।

জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীয়ে
আজিও না চিনি।
সম্ভারতিলাসেন কেন আসিলে না নিভৃত স্বপ্নিরে
শেষ পূজারিনী।
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র-গানে
জাগারে দিলে না
তিমির রাশির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা।

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের খালি
 নিতে হল তুলে।
 রচিয়া রাখে নি মোর প্রেরসী কি বরণের ডালি
 মরণের কূলে।
 সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
 নব জন্ম লভি
 এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
 প্রভাতী ভৈরবী।

হারুনা-মারু জাহাজ
 ১ অক্টোবর ১৯২৪

ছবি

ক্ষুধা চিহ্ন একে দিলে শান্ত সিংহবদকে
 তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
 আলোক-চুম্বনে নীল জল
 করে কলমল।
 দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
 সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ।
 উর্ধ্ব যার দেখা
 তৃতীয়ার শীর্ণ শলিলেখা।
 যেন কে উজলা শিল্প কোথায় এসেছে জানে না সে,
 নিঃসংকোচে হাসে।
 বহে মন্দ মন্দর বাতাস
 সঙ্গশূন্য সান্নাতির বৈরাগ্য-নিবাস।
 স্বর্গসুখে ক্রান্ত কোন্ দেবতার বাণীর পূর্ববী
 শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
 ক্ষণকাল পরে যাবে শুচে,
 উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মূছে।
 এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
 এমনি চঞ্চল মায়া
 জীবন-অম্বরতলে:
 দঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
 চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
 তার পরে দিন যার, অস্তে যার রবি:
 যুগে যুগে মূছে যার লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
 তুই হেথা কবি,
 এ বিশ্বের মৃত্যুর নিবাস
 আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ
 ২ অক্টোবর ১৯২৪

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
ভস্মিতহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে?
প্রত্যয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
আধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বন্ধে টেনে আনি
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবাস্তি কর যে মৃদুধ্বনে

বহুবদন হরে গেল কোন শব্দকণে
বাস্পের গুণ্ঠনখানি প্রথম পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মৃদু তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বন্ধে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখন।
নিঃশব্দ বরণ-মল্লধ্বনি
উজ্জ্বলিত পর্বতের শিখরে শিখরে।
কলোজ্বালিত উল্কাখিল নৃত্যমন্ত সাগরে সাগরে
'জয়, জয়, জয়।'
ঝঞ্জা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়
'জাগো রে, জাগো রে'
বনে বনান্তরে।

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।
তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,
ভূগে ভূগে কণ্ঠ তুলি
উর্ধ্বে চেরে কয়—
'জয়, জয়, জয়।'
সে বিস্ময় পদ্যে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উল্লসিত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সজ্জন প্রলয়;
সে বিস্ময় সূত্রে দৃশ্যে গজির্ উঠি কয়—
'জয়, জয়, জয়।'

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যাধান;
উর্ধ্বে হতে তাই নামে গান।

চিরবিরহের নীল পটখানি-পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অঙ্করে।

বন্ধে তারে রাখ,

শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাক;

বাক্যগুণি

পদ্পদলে রেখে দাও তুলি—

মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে;

পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে

বন্দী কর তারে;

তরুণীর প্রেমাবিষ্ট অখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে

রাখ তারে ভরি;

সিন্দুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল-পল্লবে মর্মরি,

সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে;

মধ্যাহ্নে শোন সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে।

বিরহিণী, সে লিপির যে উত্তর লিখিতে উন্মনা

আজ্ঞো তাহা সাঙ্গ হইল না।

বদগে বদগে বারংবার লিখে লিখে

বারংবার মূছে ফেল; তাই দিকে দিকে

সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে;

অবশেষে একদিন জ্বলজ্বলতা ভীষণ বৈশাখে

উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে

সব দাও ফেলে

অবহেলে,

আত্মবিশ্রোহের অসন্তোষে।

তার পরে আরবার বসে বসে

নতন আগ্রহে লেখ নতন ভাষায়।

বদগবদগান্তর চলে যায়।

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে

বসে গেছে একমনে।

লিখিতে চাহিছে তব ভাষা,

বদ্বিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।

তোমার মনের কথা আমার মনের কথা টানে,

চাও মোর পানে।

চকিত ইঙ্গিত তব, কসনপ্রান্তের ভগ্নখানি

অঙ্কিত করুক মোর বাণী।

ধরতে দিগন্ততলে

ছলছলে

তোমার যে অশ্রুর আভাস,

আমার সংস্রিতে তারি পড়ুক নিব্বাস।

অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
 ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
 কটিতটে যে কলকিঞ্চণী,
 মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিরিনি
 ওগো বিরহিণী।

দূর হতে আলোকের বরমালা এসে
 খসিয়া পড়িল তব কেশে,
 স্পর্শে তারি কছু হাসি কছু অশ্রুজলে
 উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বন্ধতলে
 ওঠে যে ক্রন্দন,
 মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
 স্বর্গ হতে মিলনের সূধা
 মর্ত্যের বিচ্ছেদ-পাশ্রে সংগোপনে রেখেছ বসুধা;
 তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,
 বিরহিণী অরি,
 মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী।

শারদা-মারু জাহাজ
 ৪ অক্টোবর ১৯২৪

কণিকা

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তম্ভ তব নীল স্বর্নিকা—
 খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
 কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
 গোধূলিবেলার পাম্ব জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
 লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
 দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার কণিকা।

ভেবেছিঁন্দু গেছিঁ ভুলে; ভেবেছিঁন্দু পদচিহ্নগুলি
 পদে পদে ঘুছে নিজ সর্বনাশী অবিদ্যাসী ধূলি।
 আজ দেখিঁ সেদিনের সেই কণি পদধূলি তার
 আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;
 দেখিঁ তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
 স্বপ্নে অশ্রুস্রোতেরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ ভুলি।

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
 চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।

সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপঙ্খের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী।

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ব্রহ্মত আঁখি সন্নিবিড় তিমিরের তলে
যে রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুপ্তন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুপ্তন।

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে ধমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুঃখের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরম লক্ষ্যে সখী,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি।

হে পান্থ, সে পথে তব খুলি আজ করি যে সন্ধান--
বর্ণিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বৃদ্ধিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি।
ছিল ফুল, এ কি মিছে ভান।
কথা ছিল শূন্যবার, সময় হল যে অবসান।

গেল না ছায়ার বাধা; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়-মোহের নেশা—সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াজ্জ্বল্য লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার লোকে।

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তম্ভ তব নীল বরনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
প্রাণের সারাহুখুঁতিকা;
আশ্বিনে গোখুলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-পরে
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্ৰণ
ওগো খেলার সাথী।

হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রাঙন শিখার বাতি।

কোন্ সে ভোরের রঙের খেলায় কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বৃকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিরে পশ্মবনের থেকে
রাঙরে দিলে রাতি?

উদয়-ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনার একে
জ্বালিয়ে সাক্ষের বাতি।

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বৃষ্টি
লুকোচুরির ছলে?

বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
শুকনো পাতার তলে।

যে সদর তুমি লিখিয়েছিলে বসে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে,
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বৃকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল চোখের জলে—

কাঁপত যে সদর ক্ষণে ক্ষণে দূরন্ত বাতাসে
শুকনো পাতার তলে।

মোর প্রভাতের খেলার সাথী আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফুলে।

অন্ধকারে গন্ধ তারি ওই যে আসে আজি
এ কি পথের ভুলে।

বকুলবীথির তলে তলে আজ কি নতুন ঘেঁষে
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে।
সেই সাজি তার দক্ষিণ হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার গদ্ধ দলে।

সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে
এ কি পথের ভুলে।

আমার কাছে কী চাও তুমি ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।

চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু,
তেমনি হবে সারা।

সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
 নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
 কাজ-ভোলা সব খ্যাপার দলে তেমনি আবার জুটে
 করবে দিশেহারা।
 স্বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
 তেমনি হব সারা।

বাধা পথের বাধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
 চলতে দেবে নাকো?
 সন্ধ্যাবেলার জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হতে
 তাই কি আমায় ডাক।
 সকল চিন্তা উধাও করে অকারণের টানে
 অব্যব ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
 ধর্তুরিয়া কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
 দাঁড়িয়ে কোথায় থাক।
 না জেনে পথ পড়ব তোমার বৃকেরই মাঝখানে,
 তাই আমারে ডাক।

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পঙ্কজ মালা
 ওগো খেলার সাথী।
 এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
 নয় আঁর্তির বাঁতি।
 তোমার খেলার আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
 নিশীথিনীর স্তম্ভ সভার তারার মহোৎসবে,
 তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
 পূর্ণ হবে রাতি।
 তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
 নয় আঁর্তির বাঁতি।

হারুনা-মারু জাহাজ
 ৭ অক্টোবর ১৯২৪

অপরিচিতা

পথ বারিক আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা,
 তোমার সাথে কই হল গো দেখা।
 কুয়াশাতে ঘন আকাশ, স্তান শীতের ক্ষণে
 ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে।
 সকল লেখের সিঁউলিটি যেই ধূলোয় হবে ধূলি,
 সঙ্গিনীহীন পাখি যখন গান রাবে তার ভুলি,
 হয়তো তুমি আপন মনে আসবে সোনার রথে
 শূন্যে পাতা ঝরা ফুলের পথে।

পুলক লেগেছিল মনে পথের নতুন বাকি
 হঠাৎ সেদিন কোন মধুরের ডাকে।
 দূরের থেকে ক্ষণে ক্ষণে রঙের আভাস এসে
 গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে;
 মনের ভূলে ভেবেছিলাম তুমিই বন্ধি এলে
 গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়ী মেলে।
 হয়তো তুমি এসেছিলে, বায় নি আড়ালখানা,
 চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা।

হয়তো সেদিন তোমার অঁখির ঘন তিমির ব্যোপে
 অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে।
 হয়তো আমার দেখেছিলে বাকিয়ে বাকা ভুরু,
 বন্ধ তোমার করেছিল ক্ষণেক দরদ দরদ;
 সেদিন হতে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে
 রঙিয়েছিল হয়তো ব্যথার রক্তিম কুঙ্কুমে:
 আধেক-চাওয়ায় ভুলে-যাওয়ায় হয়েছে জাল বোনা,
 তোমায় আমার হয় নি জানাশোনা।

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
 রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম ষত।
 মনের মাঝে বাজল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
 সেদিন আমি গেরেছিলাম তোমার আগমনী;
 দাঁখন বাতাস ফেলেছে শ্বাস রাতের আকাশ ঘেরি
 সেদিন আমি গেরেছি গান তোমার বিরহেরই:
 ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান
 ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান।

এ গানগুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি।
 ক্ষতি কী তার, নাই চিনিলে সখী।
 তবু তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়,
 তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয়:
 যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের সুরে
 বরণ করে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।
 রোদন খুঁজে ফিরবে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
 আমার গানে মিলবে তাহার বাণী।

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আঁধার বোলে,
 তখন আমি কোথায় যাব চলে।
 পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মৃদু বসন্তের
 বকুলবাঁধির ছায়াখানি মধুর মৃদুভাষা;

হয়তো সেদিন বন্ধে তোমার মিলন-মালা গাঁথা,
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিন্ধু চোখের পাতা;
সেদিন আমি আসব না তো নিশ্চয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান।

আন্দেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর ১৯২৪

আন্থনা

আন্থনা গো, আন্থনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বদ্ববে কবে।
তোমারো মন জানব না,
আন্থনা গো আন্থনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সঁঝে
নয়ন তোমার মগ্ন যখন স্ফলান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্থনা
আন্থনা গো আন্থনা।

জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ-পানে রইবে পেতে কান,
বৃকের তলে শূন্যবে বলে গ্রহতারার গান;
কুলায়-ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাকি;
বেগুনাখার অন্তরালে অন্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে মৃদুবে আবার শেষ-বিদায়ের ছবি;
স্তম্ভ হবে দিনের কেলার ক্ষুদ্র হাওয়ার দোলা,
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা—
তখন সম্মুখতার
পায় যদি তার সাড়া
তোমার উদার আঁখিতারার পারে;
কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল-বিছানো ছুঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শূন্যে;
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদু তানে,
কিঞ্জি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালার একটানা সুর গাঁথে।

একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাণ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
একে যাব আমার গানের আল্পনা
আনন্মন্য গো আনন্মন্য।

আন্দ্রেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর ১৯২৪

বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল?
সে ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে সাজিয়ে রাখাই ভাল,
মিথো কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে।
খুলায় তারি শান্তি, তারি গতি,
এই সমাদর কোরো তাহার প্রতি
সময় যখন গেছে, তখন তারে
ভুলো একেবারে।

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া;
বনের বন্ধ উঠেছে আজ দুলে,
চামেলি ওই কার যেন পথ-চাওয়া।
ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি,
চোখে চোখে নীরব জানাজানি,
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ।

যদি বা তার ফুরিয়ে থাকে বেলা,
মনে জেনো দুঃখ তাহে নাই;
করেছিল ক্ষণকালের খেলা,
পেরেছিল ক্ষণকালের ঠাই।
অলকে সে কানের কাছে দুর্লি
বলেছিল নীরব কথাগুণি,
গন্ধ তাহার ফিরেছে পথ ভুলে
তোমার এলোচুলে।

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি।
শুকিয়ে সে কি রয় নি কোনোখানে।
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্থানে, কোনো গন্ধে গানে?

আরেক দিনের বনছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা।
অশ্রুতে তার আভাস দিবে না কি
আরেক দিনের অঁখি।

না-হয় তাও লুপ্ত যদিই হয়,
তার লাগি শোক, সেও তো সেই পথে।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে।
শূন্যকিয়ে-পড়া পদ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—
সেই ধুলারই বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে।

আন্দাস ভাষা
১৯ অক্টোবর ১৯২৪

আশা

মস্ত যে-সব কান্ড করি, শব্দ তেমন নয়;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময়।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে: অনেক লেখাপড়া,
অনেক ভাষায় বকার্বিক, অনেক ভাঙগড়া।
ক্রমে ক্রমে জাল গোটবে যার, গিঠের পরে গিঠ,
মহল-পরে মহল ওঠে, ইন্টার 'পরে ইন্টার।
কীর্তিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ,
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মসলা যেমন জোটে,
মোটের 'পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়,
সহজ ঘটে লুপ্তে লাগে, মোটেই সহজ নয়।
একটুকু সুখ গানের সুরে ফুলের গন্ধে মেলা,
গাছের-ছায়ার-স্বপ্ন-দেখা অবকাশের নেলা,
মনে ভাবি চাইলে পাব; যখন তারে চাই,
তখন দেখি চপ্টা সে কোনোখানেই নাহি।
অরুণ অকুল বাঙ্গমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে,
আদ্যবৃক্ষের খাটনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষবৃক্ষের স্বেপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গন্ধ।

বহুদিন মনে ছিল আশা
 ধরণীর এক কোণে
 রহিব আপন মনে;
 ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
 করেছিলাম আশা।
 গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
 ঘরে-আনা গোখলিতে সম্মাটির তারা,
 চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
 ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
 তাহারে জড়িয়ে ঘিরে
 ভরিয়া তুলিব ধীরে
 জীবনের কদিনের কাদা আর হাসা।
 ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
 করেছিলাম আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
 অন্তরের ধ্যানখানি
 লভিবে সম্পূর্ণ বাণী:
 ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
 করেছিলাম আশা।
 মেঘে মেঘে একে যায় অন্তগামী রবি
 কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
 আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
 রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
 তাহারে জড়িয়ে ঘিরে
 ভরিয়া তুলিব ধীরে
 জীবনের কদিনের কাদা আর হাসা:
 ধন নয়, মান নয়, ধ্যানের ভাষা
 করেছিলাম আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
 প্রাণের গভীর কদ্বা
 পাবে তার শেষ সদ্বা;
 ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
 করেছিলাম আশা।
 হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
 অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
 দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাষা,
 কাছে এলে দৃষ্ট চোখে কথা-ভরা আশা।

তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
 ভরিয়া তুলিব ধীরে
 জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
 ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
 করেছিলাম আশা।

আন্ডেস জাহাজ
 ১৯ অক্টোবর ১৯২৪

বাতাস

গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বৃষ্ণতে কে বা পারে,
 কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে।
 বাতাস বলে, ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
 আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ;
 সেই প্রভাতের আলো এল, আমি কেবল ভাঁঙয়ে দিলাম ঘুম
 হে মোর কুসুম।

পাখি বলে, ওগো বাতাস, কী তুমি চাও বৃষ্ণিয়ে বলো মোরে,
 কুলায় আমার দূলাও কেন ভোরে।
 বাতাস বলে, ওগো পাখি, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
 আমি জানি তুমি কারে খোঁজ;
 সেই আকাশে জাগল আলো, আমি কেবল দিনে তোমায় আনি
 সীমাহীনীর বাণী।

নদী বলে, ওগো বাতাস, বৃষ্ণতে নারি কী যে তোমার কথা,
 কিসের লাগি এতই চঞ্চলতা।
 বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
 জানি তোমার বিলয় যেথা খোঁজ;
 সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার বৃষ্ণের কাছে,
 তোমার ঢেউয়ের নাচে।

অরণ্য কর, ওগো বাতাস, নাহি জানি বৃষ্ণি কি নাই বৃষ্ণি,
 তোমার ভাষার কাহার চরণ পূজি।
 বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
 আমি জানি কাহার মিলন খোঁজ;
 সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল সদর জাগাতে পারি
 তাহার পূর্ণভারি।

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে
বলো মোদের, কী চাও তুমি নিজের।
বাতাস বলে, আমি পৃথক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি বৃষ্টি তোমরা করে খেঁজ—
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

লিসবন বন্দর। আন্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর ১৯২৪

স্বপ্ন

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, 'ওগো সত্য সে কি।'
কী জানি গো, হয়তো বৃষ্টি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি।
হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদিযুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু চাঁদের পথ-ভোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি।
এই কলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে,
পরশ তোমার ছাড়িয়ে কাগ্না বাজে মায়ার বীণার তারে।
হয়তো হবে সত্য তাই,
হয়তো তোমার স্বপ্ন, আমার আপন মনের মন্ততাই।

আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে।
যে তুমি মোর দরের মানুষ সেই তুমি মোর কাছেই কাছে।
সেই তুমি আর নও তো বানিন,
স্বপ্নরূপে মৃতিসাধন,
ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেধার মেলা।
নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ, কভু হেলা।
চিন্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাব-সাগরের খেলার চড়ি।
বিধির মনের কল্পনায়ে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ার ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

আপনি তুমি দেখেছ কি আপন-মাঝে সত্য কী যে।
দিতে যদি চাও তা করে, দিতে কি তাই পল্লি নিজের।
হয়তো ভাবে দৃষ্টিদিনে
অগ্নি-আলোয় পাশে চিনে,
তখন তোমার নিষিদ্ধ বেদন নিবেদনের জ্বালাবে শিখা।

অমৃত যে হয় নি মথন,
 তাই তোমাতে এই অযতন;
 তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা।
 নিত্যকালের আপন তোমায় লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে,
 ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শূন্য আমার স্বপন-মাঝে।
 আমি জানি সত্য তাই—
 মরণ-দংশে অমর জাগে, অমৃতেরই তত্ত্ব তাই।

পদুমমালার গ্রন্থিখানা অনাদরে পড়ুক ছিঁড়ে,
 ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার ভিড়ে।
 ছল করে যা পিছন ডাকে
 পিছন ফিরে চাস নে তাকে,
 ডাকে না যে যাবার বেলায় যাস নে তাহার পিছে পিছে।
 যাওয়া-আসা-পথের ধূলোয়
 চপল পায়ের চিহ্নগুলোয়
 গণে গণে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে মিছে।
 কী হবে তোর বোঝাই করে ব্যর্থ দিনের আবর্জনা;
 স্বপ্ন শূন্যই মর্ত্য অমর, আর সকলই বিড়ম্বনা।
 নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
 প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে, অসীম পথের পথ্য তাই।

লিসবন বন্দর। আন্ডেস জাহাজ
 ২০ অক্টোবর ১৯২৪

সমুদ্র

হে সমুদ্র, স্তম্ভচিহ্নে শূন্যেছিন্দু গর্জন তোমার
 রাগিবেলা; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
 স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্দ্রনা;
 যুগ-যুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
 তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
 প্রকাশ সম্বান করে। কত মহামুখী মহাবন
 এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্য গানে
 দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
 নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
 মর্ত্যহীন ব্যর্থতার নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
 হানিছে তরঙ্গ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার
 ফেনিল তোমার নীলে বিলীন দুলিছে একাকার।
 স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জনা,
 জলে তব এক গান, অব্যক্তের অস্থির গর্জন।

২

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোল-মরুর মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তম্ভ উর্ধ্বলোকে
চাহিলাম; শূন্যলিখিত নক্ষত্রের রম্ভে রম্ভে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন; দেখিলাম শূন্যমাঝে
আধারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গঢ় বহিমুর বেদনার ভরে
অক্ষরের আচ্ছাদন দীর্ণ করি তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বন্ধের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ-উৎসব দিনে। যুগসন্ধ্যা কবে এসে তার,
ডুবে গেল অলঙ্ক্যে অতলে। রূপ-নিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বদভুজ ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধূলার ধূলার তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল।

৩

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিস্তাপানে;
কোথায় সপ্তম তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমৃত আধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বৃষ্টি ভাষা;
বিশ্বগীতি-নির্ঝরের তীরে তীরে বৃষ্টি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ জন্মে—দগ্ধে স্নেহে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রঞ্জমণ্ড হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারাল তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
স্মৃতিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শূন্য মর্তি-তরে, আগ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

আন্ডেস জাহাজ

২১ অক্টোবর ১৯২৪

মর্জি

মর্জি নানা মর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পক্ষা নহে।
পরিপূর্ণতার সূচী নানা স্বাদে ভুবে ভুবে
নানা প্রাণে বহে।

সৃষ্টি মোর সৃষ্টি-সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
 মৃষ্টি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
 সেথা আমি খেলা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া
 লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
 সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে হে গুণী,
 তোমাতে চিনায়।
 বেঁধে দিয়ে নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
 আমার বীণায়।
 তা হলে বঁধিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
 বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল,
 নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
 বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
 তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমাতে ভোলায়।

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
 সুরের ভিগড়ে
 মৃষ্টির সংগমতীর্থে পাব আমি আমারি প্রাণের
 আপন সংগীতে।
 সেদিন বঁধিব মনে, নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
 শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন—
 নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
 ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
 বিশ্বগীত-পদ্মদলে স্তম্ভ হবে অশান্ত ভাবনা।

সর্পি দিব সূর্য দঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত-কিছু
 তব বীণাতারে—
 ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচু
 শূন্যে তাহারে।
 দেখিব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে,
 দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে,
 বিবাগী ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে—
 নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়
 সারাহুগগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়।

সেদিন আমার রক্তে শূন্য যাবে দিবসরাত্রির
 নৃত্যের নৃপদর।
 নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
 আলোকবেগদর।

সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাণ্ডিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশঙ্করের রক্তমা-লিঙ্গিত;
সেদিন আমার মৃত্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলার মোর লীলা—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলে।

আন্ডেস জাহাজ
২২ অক্টোবর ১৯২৪

ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোর আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।
মুখ-ধোবার ওই ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা,
ক্রান্ত চোখের বোঝা।
দুলছে কাপড় peg-এ
বিজ্জল-পাথার হাওয়ার ঝাপট লেগে।
গায়ে গায়ে ঘেঁষে
জিনিসপত্র আছে কায়ক্লেশে।
বিছানাটা কপণ-গতিকের,
অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের।
ঘরে আছে যে-কটা আস্‌বাব
নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মূখের ভাব
নারাজ ভূতাসম,
পাশেই থাকে মম,
কোনোমতে করে কেবল কাজ-চলা-গোছ সেবা।
এমন ঘরে আঠারো দিন থাকতে পারে কেবা।
কন্ট ব'লে একটা দানব ছোটো খাঁচার পুরে
নিয়ে চলে আমার কত দূরে।
নীল আকাশে নীল সাগরে অসীম আছে বসে,
কী জানি কোন্‌ দোষে
ঠেলেঠেলে চেপেচুপে মোরে
সেখান হতে করেছে একঘরে।

হেনকালে ক্ষুদ্র মূখের ক্ষুদ্র ফাটল ঘেঁরে
কেমন করে এল হঠাৎ ঘেঁরে
বিশ্বধারার বন্ধ হতে বিপুল মূখের প্রবল বন্যাধারা;
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা,
আনলে আপন বৃহৎ সাম্রাজ্যে,
আনলে আপন গর্জনেতে ইন্দ্রলোকের অভয়-ঘোষণারে।
মহাদেবের তপের জটা হতে
মৃত্তিমুন্দাকিনী এল কুল-ডোবানো স্রোতে;
বললে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে—
ভস্ম আধার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।

বললে, আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান,
 মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ।
 মৃত্যুজয়ের ডমরু-রব শোনাই কলম্বরে,
 মহাকালের তান্ডবতাল সদাই বাজাই উদ্দাম নিব্বরে।

স্বপ্নসম টুটে
 এই কেবিনের দেওয়াল গেল ছুটে।
 রোগশয্যা মম
 হল উদার কৈলাসেরই শৈলশিখর-সম।
 আমার মনপ্রাণ
 উঠল গেয়ে রুদ্রেরই জয়গান :

সুপ্তির জড়িমাঘোরে
 তীরে থেকে তোরা ওরে
 করেছিস ভয়,
 যে ঝড় সহসা কানে
 বজ্রের গর্জন আনে—
 ‘নয়, নয়, নয়।’

তোরা বলেছিলি তাকে,
 ‘বাঁধিয়াছি ঘর।
 মিলেছে পাখির ডাকে
 তরুর মর্মর।
 পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
 ফলেছে ক্ষুধার ফল,
 ভাঙারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।’
 ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে
 ডেকে ওঠে মেঘমন্ড্রে—
 ‘নয়, নয়, নয়।’

সমুদ্রে আমার তরী;
 আসিয়াছি ছিন্ন করি
 তীরের আশ্রয়।
 ঝড় বন্ধু তাই কানে
 মাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
 ‘জয়, জয়, জয়।’

আমি যে সে প্রচণ্ডরে
 করেছি বিশ্বাস—
 তরীর পালে সে যে রে
 রুদ্রেরই নিব্বাস।
 বলে সে বন্ধুর কাছে,
 ‘আছে আছে, পার আছে,

সন্দেহ-বন্ধন ছিঁড়ি লহো পরিচয়।'
বলে ঝড় অবিভ্রান্ত,
'তুমি পাম্ব, আমি পাম্ব—
জয়, জয়, জয়।'

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে,
'এ দেখি প্রলয়।'
ঝড় বলে, 'ভয় নাই,
যাহা দিতে পার, তাই
রয়, রয়, রয়।'
চলেছি সম্মুখ-পানে
চাহিব না পিছন।
ভাসিল বন্যার টানে
ছিল যত-কিছন।
রাখি যাহা, তাই বোঝা,
তারে ধোওয়া, তারে ধোঁজা,
নিতাই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে, 'এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়।'

এ মোর যাত্রীর বাঁশ
ঝঞ্জার উদ্দাম হাসি
নিয়ে গাঁথে সুর—
বলে সে, 'বাসনা অম্ব,
নিশ্চল শৃঙ্খল-বন্ধ
দুর, দুর, দুর।'
গাহে, 'পশ্চাতের কীর্তি',
সম্মুখের আশা,
তার মধ্যে ফেঁদে ভিস্তি
বাঁধিস নে বাসা।
নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গি চঞ্চল সিঁধ্যুর।
যত লোভ, যত শঙ্কা,
দাসত্বের জয়ডঙ্কা
দুর, দুর, দুর।'

এসো গো ধ্বংসের নাড়া,
পঞ্চভোলা, অরছাড়া,
এসো গো দূর্জয়।

আপটি মৃত্যুর ডানা
 শূন্যে দিয়ে যাও হানা—
 ‘নয়, নয়, নয়।’
 আবেশের রসে মত্ত
 আরামশয্যায়
 বিজড়িত যে জড়ত্ব
 মজ্জায় মজ্জায়—
 কার্পণ্যের বন্ধ দ্বারে,
 সংগ্রহের অন্ধকারে
 যে আত্মসংকোচ নিত্য গদ্যন্ত হয়ে রয়,
 হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
 ঘোষক তোমার শঙ্খ—
 ‘নয়, নয়, নয়।’

আন্ডেস জাহাজ
 ২৪ অক্টোবর ১৯২৪

পদধ্বনি

আধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
 আগষ্কার পরশনে
 হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
 সেইমতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
 শয্যা মোর ক্ষণতরে
 সহসা কাঁপিল অকারণ।
 পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
 শুনিনু তখন।
 মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
 মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি।
 অজানার যাত্রী কে গো। ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।
 এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
 পদে পদে চিরদিন
 উদাসীন
 পিছনের পথ মূছে চলে?
 এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছুর নাহি চাহে—
 নিজের খেলেনা-চর্চা
 ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
 খেলার প্রবাহে?
 ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
 ছিঁড়ি মোর

শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায়।

হোক তাই—
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলিছি বারংবার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নতুন করে তোলা;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা;
বাধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুদলি কুড়িয়ে কৌতুকে
বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মৃদুহৃৎের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন শুনোছি এমনি
বারে বারে।
একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে।
একি মোর আপন বক্ষেতে।
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে।
তবে কি হবেই যেতে।
সব বন্ধ করিব ছেদন?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিস্ফেদের তীর হতে।
তরী কি ভাসাব স্নোতে।
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাকে মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে?
বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি—
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুখা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে।
সূর্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কী সংকেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চলে যায়।
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি।
তারে কি বিরহী

বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি।
 পদধ্বনি, কার পদধ্বনি।
 দিনশেষে
 কম্পিত বন্ধের মাঝে এসে
 কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী।

আন্ডেস জাহাজ
 ২৪ অক্টোবর ১৯২৪

প্রকাশ

খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল,
 সে পথ আমায় দাও নি তুমি বলে।
 বাহির-স্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মাঝে হাসির কোলাহল,
 দেখে এলেম চলে।
 এই ছবি মোর ছিল মনে—
 নির্জন মন্দিরের কোণে
 দিনের অবসানে
 সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাতারার পানে।
 নিভৃত ঘর কাহার লাগি
 নিশীথ-রাতে রইল জাগি,
 খুঁজল না তার দ্বার।
 হে চঞ্চলা, তুমি বদ্বি
 আপ্নিও পথ পাও নি খুঁজি,
 তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে,
 আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা।
 কাঙাল সদরে দখিন বাতাস বনে বনে গুস্ত কী ধন মাগে,
 বেড়ায় নিদ্রাহারা।
 হয় গো তুমি জান না যে
 তোমার মনের তীর্থমাঝে
 পূজা হয় নি আজও।
 দেবতা তোমার বদ্বিক্ত, মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজ'।
 হল স্বেদের শয়ন পাতা,
 কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা,
 প্রমোদ-রাতের গান,
 হয় নি কেবল চোখের জলে
 লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে
 আপন-ভোলা সকল-শেষের দান।

ভোলাও যখন, তখন সে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে';
 ফুলবে যখন, তখন প্রকাশ পাবে—

উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার অধির নীলাম্বরে
 গভীর অন্তরে।
 ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
 নয় আপনার উপাসনা,
 নরকো অভিমান;
 সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।
 আপন প্রাণের চরম কথা
 বদাবে যখন, চঞ্চলতা
 তখন হবে চূপ।
 তখন দঃখসাগর-তীরে
 লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
 রূপের কোলে পরম অপরূপ।

আন্ডেস জাহাজ
 ২৬ অক্টোবর ১৯২৪

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
 ধরে কী অপূর্ব বেশ,
 কী মহিমা।
 জ্যোতিহীন সীমা
 মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
 যায় গলি,
 গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
 হয় সে অমৃতপাত্র, সীমার ফুরালে অহংকার।
 শেষের দীপালি রাতে, হে অশেষ,
 অমা-অন্ধকার-রম্ভে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

ভোরের বাতাসে
 শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
 তারাহারা রাতির বীণার
 চরম স্বংকার।
 যামিনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি
 প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী
 শেষ করে যায় তার,
 উদয়সূর্যের পানে জালন্ত নমস্কার।
 যখন কর্মের দিন
 জ্ঞান কীণ,
 গোষ্ঠে-জলা খেন্দুসম সন্ধ্যার সমীরে
 চলে ধীরে আধারের তীরে—
 তখন সোনার পাত্র ছুঁতে
 কী অজস্র স্রোতে

তাহারে করাও স্নান অস্তিমের সৌন্দর্যধারায় ?
 যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়
 বর্ষণের সকল সম্বল,
 শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শূদ্র সমুজ্জ্বল।—

হে অশেষ, তোমার অঙ্গনে
 ভারমুক্ত তার সাথে ক্ষণে ক্ষণে
 খেলায়ে রঙের খেলা,
 ভাসিয়ে আলোর ভেলা,
 বিচিত্র করিয়া তোল তার শেষ বেলা।

ক্রান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
 কত দূরে আছে সেই খেলা-ভরা মৃদুতির অমৃত।
 বধু যথা গোদুলিতে শেষ ঘট ভরে
 বেগুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
 সেইমতো হে সুন্দর, মোর অবসান
 তোমার মাধুরী হতে
 সুধাস্রোতে
 ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।
 হে ভীষণ, তব স্পর্শঘাত
 অকস্মাৎ
 মোর গুঢ় চিন্ত হতে কবে
 চরম বেদনা-উৎস মূক্ত করি অগ্নিমহোৎসবে
 অপূর্ণের যত দুঃখ, যত অসম্মান
 উচ্ছ্বাসিত রুদ্ধ হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান।

আন্ডেস জাহাজ
 ২৯ অক্টোবর ১৯২৪
 Equator পার হয়ে আজ দক্ষিণ মেরুর মুখে

দোসর

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
 কোন শিশুকাল হতে আমার গেলে ডেকে।
 তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
 সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি—
 সেই তো তোমার ডাকের বাঁধন, অলখ ডোরে
 দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
 কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।

চমকে উঠে ছুটি বে তাই বাতাসনে,
সকল কাজে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন মনে—
পারের পাখি আকাশে ধায় উধাও গানে
চেয়ে থাকি তাহার পানে।

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে
বসন্ত তার পলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুল-ফোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে।
গুঞ্জরিয়া মর্মরিয়া কী বলে যায় কানে কানে,
কে যেন তা বোঝে আমার বন্ধতলে,
ভাসে নয়ন অশ্রুজলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন্ সদরে
ঘরছাড়া মোর ভাবনা-বাউল বেড়ায় ঘরে।
তারে যখন শুধাই, সে তো কল্প না কথা,
নিয়ে আসে স্তম্ভ গভীর নীলাম্বরের নীরবতা।
একতারা তার বাজায় কঁভু গদন-গদনিয়ে,
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া—
এবার তবে হোক আমাদের তরী বাওয়া।
দিনে দিনে পূর্ণ হল বাথার বোঝা,
তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা খোঁজা।
একে একে সকল রশি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও-না দেখা—
সময় হল একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমার আমার নতুন পালা হোক-না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

আন্ডেস জাহাজ
২৮ অক্টোবর ১৯২৪

অবসান

পারের ঘাটা পাঠাল তরী ছায়ার পাল তুলে,
আজি আমার প্রাণের উপকলে।
মনের মাঝে কে কর ফিরে ফিরে—
বাঁশির সুরে ভরিয়া দাও গোখলি-আলোটিরে।
সাঁঝের হাওয়া করুন হোক দিনের অবসানে
পাড়ি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
 নিভৃত খনে আপন মনে গাই।
 আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে—
 অশ্রুধন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে—
 আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক পূরবীতে
 একটি সংগীতে।

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথারি প্রাণের কথা তব—
 আমার গানে, বলো, কী আমি কব।
 দিনের শেষে যে ফুল পড়ে ঝরে
 তাহারি শেষ নিশ্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে।
 অথবা বসে বাঁধিব সুর যে তারা ওঠে রাতে
 তাহারি মহিমাতে।

সন্ধ্যা মম, যে পার হতে ভাসিল মোর তরী
 গাও কি আজি বিদায়গান ওরই।
 অথবা সেই অদেখা দূর পারে
 প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে?
 বলিব—যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
 চলিলু খুঁজে নিতে।

আন্ডেস জাহাজ
 ৩০ অক্টোবর ১৯২৪

তারা

আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই।
 ওই হবে কি ওই।
 রাগা আভার আভাস-মাঝে, সন্ধ্যা-রবির রাগে
 সিন্দূপারের ঢেউয়ের ছিটে ওই বাহারে লাগে,
 ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নামহারা,
 ওই কি আমার হবে আপন তারা।

জোয়ার ভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
 কেবল ঘাটে ঘাটে।
 এমনি করে পথে পথে অনেক হল খোঁজা,
 এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা—
 ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
 আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দূরে এসে তার ভাষা কি কুসৌদি কোন্ খনে।
 পড়বে না কি মনে।

ঘরে-ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোথায় জেদলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে?
কোন রাতে যে মোটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা,
খুঁজে খুঁজে পাব না তার দিশা?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি শ্বার নাড়া—
পাই নি কি তার সাড়া।
বাতাসনের মৃদুপথে স্বচ্ছ শব্দ-রাতে
তার আলোটি মেলে নি কি মোর স্বপনের সাথে।
হঠাৎ তারি সুরখানি কি কাগুন-হাওয়া বেয়ে
আসে নি মোর গানের 'পরে' বেয়ে।

কানে কানে কথাটি তার অনেক সূখে দুখে
বেজেছে মোর বৃকে।
মাঝে মাঝে তারি বাতাস আমার পালে এসে
নিরে গেছে হঠাৎ আমার আনন্দের দেশে,
পথ-হারানো বনের ছায়ার কোন মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ড নিরে এলেন ধরাতলে
লক্ষ্যহারার দলে।
বাসার এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের মূখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরই লাগল বাদল মিলন-ঘন রাতে
বাধনহারা প্রাণ-ধারা পাতে।

ফিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই.
আমার তারা কই।
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে.
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে;
সুর শুভ্রাল নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা,
কোন আকাশে আমার আপন তারা।

আন্দেস জাহাজ
১ নভেম্বর ১৯২৪

কৃতজ্ঞ

বলোছিলাম 'ভুলিব না', যবে তব ছলছল আঁখি
নীরবে চাছিল মূখে। কমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে'
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী ধরে ধরে

শূন্যে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোত-কাকলি
 তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
 কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
 মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
 লজ্জাভয়ে; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে
 চঞ্চল আলোক ছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
 বদলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে একে
 তারি 'পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাতি গেছে রেখে
 অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন,
 তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতি মৃদুহৃৎপি প্রতিক্ষণ
 বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
 আপনার স্মৃতিলিপি চিত্রপটে একে একে যায়,
 লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বদনে।
 সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
 ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
 অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা কোরো তবে।
 তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
 গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
 আজও নাই শেষ; রবির আলোক হতে একদিন
 ধনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজিয়েছে বীন
 তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাই আর,
 কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
 বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
 ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সূচাপাত্ত ভরে
 আমারে করায় পান। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
 তবু জানি একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি
 হৃদিমাঝে; আমি তাই আমার ভাগ্যে ক্ষমা করি—
 যত দূঃখে যত লোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
 সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
 মৃদু হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
 ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবিয়েছে ভরা তরী
 তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে— সব তার ক্ষমা করি।
 আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
 বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মৃদু-যাওয়া তোমার সিঁদূরে,
 সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
 সব মানি—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

দুঃখ-সম্পদ

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিস্তা উঠে ভরি,
 দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
 রোধ করে বাহিরের সাম্বনার দ্বার,
 সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
 নিগড় ভাঙার হতে গভীর সাম্বনা
 বাহির করিয়া আনে; অমৃতের কণা
 গলে আসে অশ্রুজলে;
 সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
 যে আপন পরিপূর্ণতার
 আপন করিয়া লয় দুঃখ-বেদনায়।
 তখন সে মহা-অন্ধকারে
 অনিবার্ণ আলোকের পাই দেখা অন্তর-মাঝারে।
 তখন বৃষ্টিতে পারি আপনার মাঝে
 আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।

আন্তস জাহাজ
 ৪ নভেম্বর ১৯২৪

মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে
 আনন্দকল্লোলে।
 নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাখি,
 জননীর অঁখি,
 শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
 প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
 জন্ম সেই
 এক নিমিষেই
 অন্তহীন দান,
 জন্ম সে যে গৃহমাঝে গৃহীতে আহ্বান।

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জনে,
 হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
 গৃহহীন পথিকেরই
 নৃত্যহুন্নে নিত্যকাল বাজিতেছে ডেরী।
 অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস স্মরণ,
 বিদেশের বিবাগী নিবারণ
 বিদায় গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
 যেথায় অপরিচিত নকশের আরাতির থালি
 চলিয়াছে অনন্তের মন্দির-সন্ধ্যানে,
 পিছ ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে।

দুয়ার রহিবে খোলা; ধরিয়াই সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিররে নিশীথরাতি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।

আন্দেস জাহাজ
৩ নভেম্বর ১৯২৪

দান

কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে কণেক-তরে,
পরেছিলে হয়তো গিরে ঘরে,
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে বোঁদন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন দুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভুলে।

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে।
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে।
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে।
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি।
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে বৃকের রক্তহারে
সেই মণিটি ক'জন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে—
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।

কোন্ খনিতে কোন্ ধনভান্ডারে,
সাগরভলে কিংবা সাগরপারে,
যকরাঙ্গের লক্ষ্মণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয় প্রিয়ে।
তাই তো বলি যা-কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে।

আন্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর ১৯২৪

সমাপন

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ্য;
যদি অবসান সুস্বপ্নের
আপন বাণীর তারে সকল বেসুর
সুরে বেঁধে তুলে থাকে;
অন্তরবি যদি ভোরে ডাকে
দিনেরে মাঠেঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানার;
সুন্দরের শেষ অর্চনায়
আপনার রশ্মিছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা;
যদি সম্মুখতার
অসীমের বাতায়নতলে
শান্তির প্রদীপশিখা দেখায় কেমন ক'রে জ্বলে;
যদি রাহি তার
খুলে দেয় নীরবের স্ফার,
নিরে যায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে
সকল বাণীর শেষ সাগরসংগম-তীর্থতীরে;
সেই পতঙ্গ হতে যদি গন্ধ পেয়ে থাক তার
মানস-সরসে বাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার।

আন্ডেস জাহাজ
৫ নভেম্বর ১৯২৪

ভাবী কাল

কমা কোরো যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি—মোর কাব্যখানি কল্পে করে
দূর ভাবী পতঙ্গীর অগ্নি সম্প্রদর্শী,
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাঙ্ক্ষিতে পদী

ছন্দের ভরিয়া রম্ব ডালিছে গভীর নীরবতা
 কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা ;
 হয়তো উঠিছে বন্ধ নেচে,
 হয়তো ভাবিছে, 'যদি থাকিত সে বেঁচে,
 আমারে বাসিত বৃদ্ধি ভালো।'
 হয়তো বলিছে মনে, 'সে নাহি আসিবে আর কভু,
 তারি লাগি তবু
 মোর বাতায়নতলে আজ রাখে জ্বালিলাম আলো।'

আন্ডেস জাহাজ
 ৬ নভেম্বর ১৯২৪

অতীত কাল

সেই ভালো প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
 সম্পূর্ণ করে না তার গান ;
 অতীতের দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
 তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
 বেজে ওঠে গানখানি
 তার মাঝে সুদূরের বাণী
 কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বৃদ্ধিতে কে পারে ;
 যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যাহের ব্যথার মাঝারে
 মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল ;
 অতীতের সূর্যাস্তের কাল
 আপনার সঙ্করূপ বর্ণচ্ছটা মেলে
 মৃত্যুর ঐশ্বর্য দেয় ঢেলে,
 নিমেষের বেদনারে করে সর্বিপুল।
 তাই বসন্তের ফুল
 নাম-ভুলে-যাওয়া
 প্রেমসীর নিশ্বাসের হাওয়া
 যুগান্তর-সাগরের স্বপ্নপান্তর হতে বহি আনে।
 যেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
 পরিচিত ভাষাটির সাথে,
 মিলনের রাতে।

আন্ডেস জাহাজ
 ৭ নভেম্বর ১৯২৪

বেদনার লীলা

গানগদলি বেদনার খেলা যে আমার,
 কিছূতে ফুরায় না সে আর।
 যেখানে স্রোতের জল পড়নের পাকে
 আবর্তে আবর্তে থাকে,

সূর্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে;
 ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
 দিব্যরাতি
 রঙের খেলায় ওঠে মাতি।
 শিশু রুদ্ধ হাসে খলখল,
 দোলে টলমল
 লীলাভরে।
 প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুণি প্রহরে প্রহরে
 ওঠে পড়ে আসে যায় একান্ত হেলায়,
 নিরর্থ খেলায়।
 গানগুণি সেইমতো বেদনার খেলা যে আমার,
 কিছতে ফুরায় না সে আর।

আন্তঃস জাহাজ
 ৭ নভেম্বর ১৯২৪

শীত

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
 গানের বেলা শেষ না হতে হতে?
 মনের কথা ছিড়িয়ে এলোমেলো
 ভাসিয়ে দিল শূকনো পাতার স্রোতে।
 মনের কথা ষত
 উজান তরীর মতো;
 পালে ষখন হাওয়ার বলে
 মরণ-পারে নিয়ে চলে,
 চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
 পিছদ ঘাটের পানে
 যেথায় ভূমি প্রিয়ে,
 একলা বসে আপন মনে
 আঁচল মাথায় দিয়ে।

ঘোরে তারা শূকনো পাতার পাকে,
 কাঁপন-ভরা হিমের বারুডরে?
 ঝরা ফুলের পাপড়ি তাদের ঢাকে,
 লুটায় কেন মরা ঘাসের পরে।
 হজ কি দিন সারা।
 বিদায় নেবে তারা?
 এবার বৃষ্টি কুয়াশাতে
 লুকিয়ে তারা পোউষ-রাতে
 ধূসার ডাকে সাজা দিতে চলে

বেথায় ভূমিতলে
একলা ভূমি প্রিয়ে,
বসে আছ আপন মনে
অঁচল মাথায় দিবে?

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়,
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান:
মন যে বলে, শূন্য আকাশময়
ষাবার মূখে ফিরে আসার গান।
শীর্ণ শীতের লতা
আমার মনের কথা
হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে
নন্দ মাথায় ফাঁকে ফাঁকে,
ফাল্গুনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণমূলে
বেথায় ভূমি প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
অঁচল মাথায় দিবে।

বুরেনোস এরারিস
১০ নভেম্বর ১৯২৪

কিশোর প্রেম

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?
সে যে অনেক দিনের কথা।

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর-পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা।
যেন প্রথম দখিন ঝঞ্ঝে
পিছুর লেগেছিল গারে;
চাঁপা কুঁড়ির বকের মাঝে অক্ষুণ্ণ কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আসা-যাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেরে দেখা,
মনে পড়ে ভীরু হিম্মার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মদকুলগদলি,
শব্দে তারা হাওয়ার দলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

ঝরে-পড়া সেই মদকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনার উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা,
সেই শেষ-না-করা কথা।

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলার ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন-মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর ১৯২৪

প্রভাত

স্বর্ণসুখা-ঢালা এই প্রভাতের বৃকে
বাঁপিলাম সুরে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মৃদিল অলস পাখা মৃদু মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ যৌমাছি
আকাশপঙ্খের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।
যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নিঃস্বরে
মন্ডর মৃদুভঙ্গি ভাসারে দিতেছি লীলাভরে।
ধরণীর বক ভেদি বেথা হতে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের কোয়ারা,
ফুলের লহরী,
সেখানে ফুলের মোর মাঝিরাছি ধরি;

ধীরে চিস্তা উঠিতেছে ভরি
 সৌরভের স্রোতে।
 ধূলি-উৎস হতে
 প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ,
 জন্মমৃত্যু-তরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
 স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষঃস্থল আজি।
 রক্তে মোর উঠে বাজি
 তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর,
 নিখিল মর্মর।
 এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
 আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন।
 এই স্বচ্ছ উদার গগন
 বাজায় অদ্ব্য শব্দ শব্দহীন সুদূর।
 আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুদীর্ঘ সুদূর।

বুয়েনোস এয়ারিস
 ১১ নভেম্বর ১৯২৪

বিদেশী ফুল

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম
 'কী তোমার নাম'
 হাসিয়া দুলালে মাথা, বুকিলাম তবে
 নামেতে কী হবে।
 আর কিছ্ নয়,
 হাসিতে তোমার পরিচয়।

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বৃকের কাছে ধরে
 শূধালেম 'বলো বলো মোরে
 কোথা তুমি থাক',
 হাসিয়া দুলালে মাথা, কহিলে, 'জানি না, জানি নাকো।'
 বুকিলাম তবে
 শূনিয়া কী হবে
 থাক কোন্ দেশে।
 যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে
 তাহার হৃদয়ে তব ঠাই
 আর কোথা নাই।

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শূধান্দু আবার,
 'ভাষা কী তোমার।'
 হাসিয়া দুলালে শূধু মাথা,
 চারি দিকে মর্মরিয়া পাতা।

আমি কহিলাম, 'জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিশ্বাসের ভাষা।'

হে বিদেশী ফুল, আমি যেদিন প্রথম এন্দ ভোরে—
শুধালেম, 'চেন তুমি মোরে?'
হাসিয়া দুলালে মাথা, ভাবিলাম, তাহে এক রতি
নাহি কারো ক্ষতি।
কহিলাম, 'বোধ নি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভরেছে মোর রসে।
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী।'

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই 'বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি'।
হাসিয়া দুলোও মাথা; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা—
মোরে ভুলিবে না।

বুয়েনোস এয়ারিস
১২ নভেম্বর ১৯২৫

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী,
মাধুর্যসুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে; যেমন সহজে সম্মুখাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা; নিজনি এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়িয়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ গগনে
উর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরই বাণী—
শুনিব গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি;
আধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।'

তেমনি তারার মতো মৃদু মৌর চাহিলে কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, 'তোমারে যে জানি আমি জানি।'
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনোছি তব গীতি,
'প্রেমের অতিথি করি, চিরদিন আমারি অতিথি।'

বুয়েনোস এয়ারিস
১৫ নভেম্বর ১৯২৪

অন্তহিতা

প্রদীপ যখন নিবোঁছিল,
অধার যখন রাত্তি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিল,
ছিল না কেউ সাথী।
মনে হল অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির-স্বারে,
মনে হল শূন্য যেন
পায়ের ধ্বনি কার,
রাতের হাওয়ায় বাজল বৃষ্টি
ককণ-স্বংকার।

বারেক শূন্য মনে হল
খুঁজি, দুয়ার খুঁজি।
কণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেন্দু ভুলি।
'কোন অতিথি সবার কাছ
একলা রাতে বসে আছে?'
কণে কণে তপ্পা ভেঙে
মন শূন্য হবে,
বলোঁছিলেম, আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে।

মাঝ-গগনে সন্ত-খাঁষ
স্তম্ভ গভীর রাতে
জানলা হতে আমার যেন
ডাকল ইশারাতে।
মনে হল, শয়ন ফেলে
দিই-না কেন আলো জেবলে,
আলসভরে রইন্দু শূন্যে
হল না দীপ জ্বালা।
প্রহর পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল ডালা।

জাগল কখন দখিন হাওয়া
কাঁপল বনের হিমা,
স্বপ্নে কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া।
যুধীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মুঁচিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল আমার
সকল অঙ্গ চুম্বে।
জ্বলে উঠে আবার কখন
ভরল নয়ন ঘুম্বে।

ভোরের তারা পদ-গগনে
যখন হল গত
বিদায়রাতির একটি ফোঁটা
চোখের জলের মতো,
হঠাৎ মনে হল তবে,
যেন কাহার করুণ রবে
শিরীষ ফুলের গন্ধে আকুল
বনের বীথি ব্যোপে
শিশির-ভেজা তৃণগুলি
উঠল কেঁপে কেঁপে।

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন
খুলে দিলেম দ্বার,
হায় রে, খুলায় বিছিয়ে গেছে
যুধীর মালা কার।
ওই যে দূরে, নয়ন নত
বনের ছায়ায় ছায়ায় মতো
মায়ার মতো মিলিয়ে গেল
অরুণ-আলোর মিশে,
ওই বদ্বী মোর বাহির-দ্বারের
রাতের অতিথি সে।

আজ হতে মোর ঘরের দয়ার
রাখব খুলে রাতে।
প্রদীপখানি রইবে জ্বালা
বাহির-জানালাতে।
আজ হতে কার পরশ লাগি
পথ তাকিয়ে রইব আগি;

আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেয়ে
যুথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে?

বুয়েনোস এয়ারিস
১৬ নভেম্বর ১৯২৪

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দূ হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে,
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি।
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি
যাই-না নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সে-ও,
সুধায় ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব-তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুধা ডাকে
রাতে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে;
ভুলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো, যেয়ো ভুলে।

বিজন পথে চলেছিলাম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলাম বলি তোমায়, সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।
হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হল যে আমার মনে।
দেখেছিলাম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুনি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোক আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।

হবি হবে তোমার প্রেমের হোমান্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে—
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

বুরেনোস এয়ারিস
১৭ নভেম্বর ১৯২৪

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারংবার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিন্দু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গণিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেঁরি করিব না মিছে,
ফিরে চাহিব না পিছে
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে অখিজল পাব আশা করি
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণারসে ভরি।

ফিরিয়া যেনো না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাষনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোচুঁকু এসে
আরো কিছুখন ধরে কলক তোমার কালো কেশে।

হাসিলো মধুর উচ্চহাসে
 অকারণ নির্মম উল্লাসে,
 বন-সরসীর তীরে
 ভীরু কাঠবিড়ালিরে
 সহসা চকিত কোরো হাসে।
 ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায় স্মরণ
 দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

তার পরে ঘেরো তুমি চলে
 বরা পাতা দ্রুতপদে দলে
 নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
 অক্ষুট কাকলিরবে
 দিনান্তেরে ক্ষুধ করি তোলে।
 বেগুনছায়াঘন সম্মুখ তোমার ছবি দূরে
 মিলাইবে গোখলির বাঁশির সর্বশেষ সুরে।

রাগি যবে হবে অন্ধকার
 বাতাসনে বসিলো তোমার।
 সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে,
 সমুখের পথ দিয়ে,
 ফিরে দেখা হবে না তো আর।
 ফেলে দিলো ভোরে-গাঁথা স্কান মল্লিকার মালাখানি।
 সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

বুয়েনোস এয়ারিস
 ২১ নভেম্বর ১৯২৪

বিপাশা

মায়ামগ্নী, নাই বা তুমি
 পড়লে প্রেমের ফাঁদে।
 ফাগুন রাতে চোরা মেঘে
 নাই হরিণ চাঁদে।
 বাঁধন-কাটা ভাবনা তোমার
 হাওয়ায় পাখা মেলে,
 দেহমনে চঞ্চলতার
 নিত্য যে ঢেউ খেলে।
 স্বপ্ননা-ধারার মতো সদাই
 মনস্ত তোমার গতি,
 নাই বা নিলে তটের স্রবণ
 তার বা কিসের ক্ষতি।

শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি
 শূন্য আলোর ধোয়া,
 একটুখানি অরুণ আভার
 সোনার হাসি-ছোঁয়া।
 শূন্য পথে মনোরথে
 ফেরো আকাশ-পার,
 বৃকের মাঝে নাই বহিলে
 অশ্রুজলের ভার।
 এমনি করেই যাও খেলে যাও
 অকারণের খেলা;
 ছুটির স্রোতে থাক-না ভেসে
 হালকা খুঁশির ভেলা।
 পথে চাওয়ার ক্রান্তি কেন
 নামবে আঁখির পাতে,
 কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
 দূরের দূরাশাতে:
 তোমার পায়ের নূপূরখানি
 বাজাক নিত্যকাল
 অশোকবনের চিকন পাতার
 চমক-আলোর তাল।
 রাতের গারে পূলক দিয়ে
 জোনাক যেমন জ্বলে
 তেমনি তোমার খেয়ালগর্ভিণী
 উড়ুক স্বপন-তলে।
 যারা তোমার সঙ্গ-কাঙাল
 বাইরে বেড়ায় ঘুরে,
 ভিড় যেন না করে তোমার
 মনের অন্তঃপূরে।
 সরোবরের পশ্ম তুমি,
 আপন চারি দিকে
 মেলে রেখো তরল জলের
 সরল বিষ্মটিকে।
 গন্ধ তোমার হোক-না সবার,
 মনে রেখো তব্দ
 বৃন্ত যেন চুরির ছুরি
 নাগাল না পার কভু।
 আমার কথা শুধাও যদি—
 চাবার তরেই চাই,
 পাবার তরে চিন্তে আমার
 ভাবনা কিছুই নাই।
 তোমার পানে নিবিড় টানের
 বেদন-ভরা সূত্র

মনকে আমার সাথে যেন
 নিয়ত উৎসুক।
 চাই না তোমায় ধরতে আমি
 মোর বাসনায় ঢেকে,
 আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও,
 নয় খাঁচাটার থেকে।

বুয়েনোস এয়ারিস
 ২২ নভেম্বর ১৯২৪

চারি

বিধাতা যেদিন মোর মন
 করিলা সৃজন
 বহু কক্ষে ভাগ-করা হর্ম্যের মতন,
 শুধু তার বাহিরের ঘরে
 প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে:
 নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
 তালা তার বন্ধ করি চারিখানি ফেলি দিলা দূরে।
 মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
 বলিয়াছে, 'খুলে দাও।' উপায় জানি না খুলিবারে।
 বাহিরে আকাশ তাই ধূলায় আকুল করে হাওয়া:
 সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসা-যাওয়া।

অন্তরের জনহীন পথে
 হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালিকা লুটায় শরতে।
 আষাঢ়ের আদ্র বায়ুভরে
 কদম্বকেশরে
 চিহ্ন তার পড়ে ঢাকা।
 চৈত্র সে বিচিত্র বর্ণে কুসুমের আলিম্পনে আঁকা।
 সেখায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,
 মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেমসীরে ডাকে।
 সম্মুখতার দিগন্তের কোণে
 শিরীষ পাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে
 যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণ বাতাসে।
 ঝরাপাতা-বিছানো সে ঘাসে
 বাঁশরি বাজাই আমি কুসুম-সুগন্ধি অবকাশে।

দূরে চেয়ে থাকি একা
 মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা
 যে পথিক একদিন অজানা সমুদ্র-উপকূলে
 কুড়িয়ে পেয়েছে চারি; বন্ধে নিয়ে তুলে

শূন্যে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী;
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।

অবশেষে

মোঁমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান;

খুলিবে সে গদ্যস্ত দ্বার কেহ যার পায় নি সম্মান।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৬ নভেম্বর ১৯২৪

বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,

তরল খঞ্জের মতো ধারা তব, নাই তার ধ্বনি,

নাই তার তরঙ্গভঙ্গিমা;

নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা;

অমাবস্যা রজনীর

সদৃশ সঙ্গমভীর

মৌনীর প্রহরের মতো

নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে ধায় অবিরত।

প্রাণের অরণ্যতট হতে

দন্ড পল খসে খসে পড়ে তব অন্ধকার স্রোতে।

রূপের না থাকে চিহ্ন, নাই থাকে বর্ণের বর্ণনা,

বাণীর না থাকে এক কণা।

ওগো বৈতরণী,

কতবার খেয়ার তরণী

এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।

নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে

কত মোর উৎসবের বাতি,

আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথী,

দিবসেরে রিক্ত করি, তিক্ত করি আমার রাগিরে।

সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওগো বৈতরণী,

অদৃশ্যের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী

সেথায় নিজর্নে

দেখি আমি আপনার মনে

তোমার অরূপতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,

সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে

প্রবণের পরপারে

তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।

যে সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
 ক্ষণিকের ক্ষণ ছন্দবেশে,
 যে চিরমধুর
 দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজারে নৃপদর,
 প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।
 চোখের জলের মতো
 একটি বর্ষণে যারা হয়ে গেছে গত,
 চিত্তের নিশীথ রাতে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা;
 অনিবার্ণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।

বুয়েনোস এয়ারিস
 ২৭ নভেম্বর ১৯২৪

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
 খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
 হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
 বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
 তোমারে পাঠায় ডাকি,
 হে কালো কাজল আঁখি।

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
 সেথা বাজে তার বেণু;
 বলে, এসো, এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
 মধুসংগর দিলো না ব্যর্থ করে,
 এসো এ বন্ধোমাঝে,
 কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবনবেগে
 সুরের আঘাত লেগে
 মোর সরোবরে জলতল ছলছল
 এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
 তরঙ্গ উঠে জেগে।
 গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাদার রাত্তি,
 নিখিল ভুবন হেরো কী আশার মাতি
 আছে অজলি পাতি।

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
 মেলিল নীরব বাণী।
 অরুণপক্ষ প্রসারি সকোতুকে
 সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
 কোথা হতে নাহি জানি।

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি।
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির-বাঁধ
পাও নি কি সংবাদ।
জ্বগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে বারতা।
শোন নি কী গাহে পাখি,
হে কালো কাজল আঁখি।

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল
বেগুনাখাগুলি খনে খনে টলমল,
অকুপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

বুরেনোস এরারিস
১ ডিসেম্বর ১৯২৪

মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভান্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
সে তো কভু পায় না সম্মান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।
তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে,
হারায় সে নিখিলের গান।

জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন্ করুণ বিষাদ,
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবাদ।
চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাই জানে,
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শূন্য লেখা।

পাখির মতন মন শূন্য উড়িবার সূখ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাই স্বপ্ন তার,

নাহি যার ক্ষয়,
 নাহি যার নিরুদ্ধ্য সঞ্চয়,
 যার বাধা নাই,
 যারে পাই তব্দ নাহি পাই,
 যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রিষ,
 নহে শূল, নহে গদ্যস্ত বিষ।

বুয়েনোস এয়ারিস
 ৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
 তিন বছরের প্রিয়া আমার, দঃখ জানাই কাকে।
 কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন হাওয়ার দান
 তিন বসন্তে দোরেল শ্যামার তিন বছরের গান।
 তব্দ কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
 বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।
 তব্দ ভাবি, যাই কেন হোক অদৃষ্ট মোর ভালো,
 অমন সুরে ডাকে আমার মানিক আমার আলো।
 কপাল মন্দ হলে টানে আরো নীচের তলায়,
 হৃদয়টি ওর হোক-না কঠোর, মিষ্টি তো ওর গলায়।

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আমলকীর ওই গাছে
 তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
 লুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিম্মোল
 অঙ্গে উহার বেগুনাখার তিন ফাগুনের দোল।
 তব্দ ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি লুট
 শেষ না হতেই নাচের পালা কোন্‌খানে দেয় ছুট।
 আমি ভাবি এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে,
 ওর মনেতে যা হয় তা হোক আমার তো মন দোলে।
 হৃদয় না-হয় নাই বা পেলাম মাধুরী পাই নাচে,
 ভাবের অভাব রইল না-হয়, ছন্দটা তো আছে।

বন্দী হতে চাই যে কোমল ওই বাহুবন্ধনে,
 তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেলাল মনে।
 সোনার প্রভাত দিল্লোছে ওর সর্বদেহ ছুঁয়ে
 শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে।
 বদ্বতে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
 ক্ষয় নাহি যার সেই সূখা নল দিত একটুখানি।
 তব্দ ভাবি বিধি আমার নিতান্ত নল বাস,
 মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তারি কি কম দাম।

পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বৃকের পাহাড় বেয়ে।

কবি বলে লোক-সমাজে আছে তো মোর ঠাই,
তিন বছরের প্রিয়র কাছে কবির আদর নাই।
জানে না যে ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ,
দোলার টানে ঝাঁপে মানে দূর আকাশের চাঁদ।
পলাতকার দল যত-সব দখিন হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোটো ওরই হৃদয়খানি দেয় না শূন্য ধরা,
ঝগড় বোকার বরণমালা গাঁথে স্বপ্নংবরা।
যখন দেখি এমন বৃষ্টি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি।

এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গ-ভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
খাপা হাওয়ার বৃকের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্ম্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
সৃষ্টিছাড়া ব্যথা যত, নাই সাহাদের বাসা,
ঘরে ঘরে গানের সুরে ঝুঁজে আপন ভাষা।
দেখবে তখন ঝগড় বোকা কী করতে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির দ্বারে।

বুরেনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

অদেখা

আসিবে সে, আছি সেই আশাতে।
শোন নি কি, দুজনাঙ্কে
নাম ধরে ওই ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে?
সুর বৃকে আসে ভাসি,
পথ চেনাবার ষাঁশি
বাজে কোন্ ওপারের বাসাতে।
ফুল ফোটে বনতলে
ইশারায় মোরে বলে
'আসিবে সে'; আছি সেই আশাতে।

এল না তো এখনো সে এল না।
আলো-অধারের ঘোরে

যে ডাক শুনিন্দু ভোরে,
সে শব্দ স্বপন, সে কি ছলনা।
হায় বেড়ে যায় বেলা,
কবে শব্দ হবে খেলা,
সাজিয়ে বসিয়া আছি খেলনা,
কিছু ভালো, কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা,
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না।

আসে নি তো এখনো সে আসে নি।
ভেবেছিন্দু আসে যদি,
পাড়ি দেব ভরা নদী,
বসে আছি, আজো তরী ভাসে নি।
মিলায় সিঁদুর-আলো,
গোধূলি সে হয় কালো,
কোথা সে স্বপন-বন-বাসিনী।
মালতীর মালাগাছি,
কোলে নিয়ে বসে আছি,
যারে দেব, এখনো সে আসে নি।

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
সুবাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।
বুঝিয়াছি অনুভবে
বনমর্মর-রবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

বুরেনোস এয়ারিস
৭ ডিসেম্বর ১৯২৪

চণ্ডল

হায় রে তোরে রাখব ধরে,
ভালোবাসা,
মনে ছিল সেই দুরাঙ্গ।
পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে
বাসা যে তোর দিলেম বেঁধে
এল তুফান সর্বনাশ।

মনে আমার ছিল যে রে
 ঘিরব তোরে হাসির ঘেরে—
 চোখের জলে হল ভাসা।
 অনেক দূরে গেছে বোঝা
 বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,
 সুখের ভিত্তি নহে তোমার
 অচল বাসা।

এবার আমি সব-ফুরানো
 পথের শেষে
 বাঁধব বাসা মেঘের দেশে।
 ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনব
 বদল কোরো মূর্তি তব
 রঙ-ফেরানো মায়াব বেষে।
 কখনো বা জ্যোৎস্না-ভরা
 কখনো বা বাদল-ঝরা
 খেয়াল তোমার কেন্দ্রে হেসে।
 যেই হাওয়াতে হেলাভরে
 মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে
 সেই হাওয়াতেই ফিরে ফিরে
 আসবে ভেসে।

কঠিন মাটি বানের জলে
 যায় যে বয়ে,
 শৈলপাষণ যায় তো ক্ষয়ে।
 কালের ঘায়ে সেই তো মরে
 অটল বলের গর্বভরে
 থাকতে যে চায় অচল হয়ে।
 জানে যারা চলার ধারা
 নিত্য থাকে নতুন তারা,
 হারায় যারা রয়ে রয়ে।
 ভালোবাসা, তোমারে তাই
 মরণ দিয়ে বরিতে চাই,
 চঞ্চলতার লীলা তোমার
 রইব সয়ে।

প্রবাহিণী

দূর্গম দূর শৈলশিরের
 স্তম্ভ তুষার নই তো আমি;
 আপনা-হারা ঝর্ণা-ধারা
 ধূলির ধরায় ঘাই যে নামি।
 সরোবরের গম্ভীরতায়
 ফেনিল নাচের মাতন ঢালি;
 অচল শিলার ভ্রু-ভঙ্গিমায়
 বাজাই চপল করতালি।
 মন্দ-সুরের মন্ত শুনাই
 গভীর গৃহার অধারতলে,
 গহন বনের ভাঙাই ধোয়ান
 উচ্চহাসির কোলাহলে।
 শূদ্র ফেনের কুন্দমালায়
 বিন্ধ্যগিরির বন্ধ সাজাই,
 যোগীশ্বরের জটোর মধ্যে
 তরঙ্গিণীর নৃপদর বাজাই।
 বৃন্দ বটের লব্ধ শিকড়
 আমার বেণী ধরিতে চায়;
 সূর্যকিরণ শিশুর মতন
 অন্ধ আমার ভরিতে চায়।
 নাই কোনো মোর ভয়-ভাবনা,
 নাই কোনো মোর অচল রীতি।
 গতি আমার সকল দিকেই,
 শূভ আমার সকল তিথি।
 বন্ধ আমার কালোর ধারা,
 আলোর ধারা আমার চোখে,
 স্বর্গে আমার সূর চলে যায়,
 নৃত্য আমার মর্ত্যলোকে।
 অশ্রুহাসির যুগল ধারা
 ছোটে আমার ডাইনে বামে।
 অচল গানের সাগরমাঝে
 চপল গানের যাত্রা থামে।

ব্রুয়েনোস এয়ারিস
 ১১ ডিসেম্বর ১৯২৪

আকন্দ

সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে
 অকূল অন্ধকারে,
 হৃদয়মিমে এল রীতি জ্বলনভাঙার মাঠে
 একলা আমি গোরাপাড়ার বাটে।

নতুন-ফোটা গানের কুঁড়ি দেব বলে দিনের হাতে আনি
 মনে নিয়ে সুরের গদগদনানি
 চলছেলেন, এমন সময় যেন সে কোন পরীর কণ্ঠখানি
 বাতাসেতে ঝঞ্জিয়ে দিল বিনা-ভাষার বাণী;
 বললে আমার, “দাঁড়াও কপেক-তরে,
 ওগো পথিক তোমার লাগি চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
 আমার নেবে চিনে,
 সেই সঙ্গন এল এতদিনে।
 পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
 কবির ছন্দে বাঁধব আমার বাসা।”
 দেখা হল, চেনা হল সাক্ষের আধারেতে,
 বলে এলেন, “তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।”

সেই কথা আজ পড়ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে
 সাগরপারের দেশে,
 মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে
 তারি মধ্যে বাজল করুণ সুরে—
 ‘ভুলো না গো ভুলো না এই পথ-বাসিনীর কথা,
 আজো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা।’
 লপথ আমার, তোমরা বোলো তারে,
 তার কথাটি দাঁড়িয়েছিল মনের পথের ধারে,
 বোলো তারে চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে-
 লিখনখানি রাখিনু এইখানে।

আকন্দবল্লভ রবি

যেদিন প্রথম কবিগান
 বসন্তের জাগাল আহ্বান
 ছন্দের উৎসব-সভাতলে,
 সেদিন মালতী যুগ্মী জাতি
 কোত্‌হলে উঠেছিল মাতি,
 ছুটে এসেছিল দলে দলে।
 আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাণ্ডন করবী
 সুরের বরণমালায় সবারে বরিয়া নিল কবি।
 কী সংকোচে এলে না যে, সভার দয়ার হল বন্ধ।
 সব পিছে রহিলে আকন্দ।

মোরে তুমি লজ্জা কর নাই,
 আমার সম্মান মানি তাই,
 আমারে সহজে নিলে জাকি।
 আপনারে আপনি জানালে,
 উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
 পরিচয় রাখিলে না ঢাকি।

মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিলাম একা,
তুমি বৃষ্টি ভেবেছিলে কী জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ুভরে পাঠালে আকন্দ।

হিয়া মোর উঠিল চমকি
পথমাঝে দাঁড়ানু থমকি,
তোমারে খুঁজিনু চারি ধারে।
পল্লবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের দুর্যোরানী
পথপ্রান্তে গোপন আধারে।
সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে তারা সবে নামগোত্রহীন,
কাড়িতে জানে না তারা পথিকের অর্থি উদাসীন।
ভরিল আমার চিত্ত বিস্ময়ের গভীর আনন্দ,
চিনিলাম তোমারে আকন্দ।

দেখা হয় নাই তোমা-সনে
প্রাসাদের কুসুমকাননে,
জনতার প্রগল্ভ আদরে।
নিদ্রাহীন প্রদীপ-আলোকে
পড় নি অশান্ত মোর চোখে
প্রমোদের মৃথর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি,
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিশ্বাস মৃদু মন্দ,
নম্রহাসি উদাসী আকন্দ।

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরান ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বন্ধে তব শূন্য রেখা একে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সূদূর ভালোবাসা।
দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার,
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ।

কঙ্কাল

পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে
পড়ে আছে ঘাসে,
যে ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল,
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।

পড়ে আছে পান্ডু অস্থিররাশি,
কালের নীরস অটুহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ,
ইঞ্জিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সূরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাশ পড়ে রবে অর্মানি ধূলায় অনাদরে।

আমি বলিলাম, 'মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শূন্যমাত্র প্রাণ
সর্ব বিস্ত রিক্ত করি যার হয় যাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহারনিদ্রার শেষ ঋণ।
ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি শূন্যেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধরে নি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে;
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্যে তার কোথা পরিমাণ।

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লিখিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপদরে।
চিরকাল-তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে।
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়;
পদাঘাতে জর্জর তারে নাহি করে দণ্ডপলগদলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

আমি যে রূপের পশ্বে করেছি অরূপ-অধু পান,
দৃঃখের বন্ধের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,

অনন্ত মৌনের বাণী শুনেনিছি অন্তরে,
দেখেনিছি জ্যোতির পথ শূন্যায় অধারপ্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

চাপাড মালাল
১৭ ডিসেম্বর ১৯২৪

চিঠি

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসার ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বৃকের বোঁদ।
আঁতি-পাঁতি খুঁজে শেষে বৃকি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইন্দ্রানি।
প্রকাশ্যে তার থাক্-না যতই সাদা মৃৎখর টঙ,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বৃকের রঙ।
হেথায় মৃৎখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম।
চারুকণ্ঠে ঠাই নাই তার, ধূলার পরিণাম।

মৃৎখী বলে, 'আঁতিখ্য লও, একটুখানি বোসো।'
আমি বলি চমকে উঠে, আরে রোসো, রোসো;
জিতবে গন্ধ, হারবে কি গান। নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম; জানি নে কার জিৎ।
তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান,
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি গেরো সেদিন, দিনু,
জুইবাগানের আরেক দিনের গান যা রচেনিছিনু।

ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পল্লিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশে গান হাসি সব ঠেলে
কুলদূপ দিয়ে করছে আটক আলিপত্রের জেলে।
হিমালয়ে বোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূমরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের ঘোঁষনে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিং
নকল শিবের তান্ডবে আজ পল্লিস বাজায় শিঙে।

জানি তুমি বলবে আমার, থামো একটুখানি,
বেদ-বীণার সঙ্গ এ নয়, শিকল বন্ধকমানি।

শূনে আমি রাগব মনে, কোরো না সেই ভয়,
 সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়।
 ষাদের নিয়ে কান্ড আমার তারা তো নয় ফাঁকি,
 গিল্টি-করা ডক্‌মা-ঝোলা নয় তাহাদের খাঁকি।
 কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা,
 তাদের ভিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
 যেদিন ভবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
 সেদিনো তো সাজাবে জুই দেবার্চনার খালা।
 সেই খালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোর খারা,
 লড়বে তারাই চিরটা কাল? গড়বে পাখাল-কারা?
 রাজ-প্রতাপের দম্ভ সে তো এক দমকের বায়ু,
 সব্দর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
 ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
 লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ার বেড়ায় ছুটে ছুটে।
 আজ আছে কাল নাই বলে তাই তাড়াতাড়ির তালে
 কড়া মেজাজ দাঁপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
 পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দঃখীর বৃক জুড়ি,
 ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
 তাই তো প্রেমের মালা গাঁথার নাইকো অবকাশ,
 হাতকড়ারই কড়াঙ্কড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
 শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে,
 সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উল্টো দিকের পথে।
 জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তব্দ,
 ধর্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের-জোরের প্রভু।
 রক্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
 বিনাশ তারে আপন গোলায় বোকাই করে নিজে।
 বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
 নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
 নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
 সূর্যদেবের গানে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
 বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
 নতুন রাহু ভাবে তব্দ হবে না মোর বেলা।
 কান্ড দেখে পশুপক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে,
 অনন্তদেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।
 টুটল কত বিজয়-তোরশ, লুটল প্রাসাদ-চুড়ো,
 কত রাজার কত গারদ ধুলোর হল গুড়ো।
 আলিপূরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
 তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সব্দর সবে।
 রঙিন কুর্তি, সঙিন ঘুঁতি, রইবে না কিচ্ছুই,
 তখনো এই বনের কোণে ফুটেবে লাজুক জুই।
 ভাঙবে লিকল টুকরো হয়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
 চূর্ণ-করা দপে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
 পাললা আইন লোক হাসাবে কালের গ্রহসনে,
 মধুর আমার বন্ধু রাখেন কাব্য-সিংহাসনে।

সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
 ক্রন্দ্য প্রভু নয় না সবদর, প্রেমের সবদর নয়।
 প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দ্রুত দেবার বড়াই,
 জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
 দ্রুত সহায় তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,
 ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
 মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
 মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
 পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যোদিন খেপে,
 ফোসে সর্প হিংসা-দর্প সকল পৃথ্বী ব্যোপে,
 বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
 গর্জ বলে আমিই সত্য, দেবতা মিথ্যা মায়া;
 সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
 মৌলিন-গানের সম্মুখে গাই জুই ফুলের এই গান :

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই,
 ও আমার জুই।

অজানা ভাষার দেশে
 সহসা বলিলি এসে,
 'আমারে চেন কি।'
 তোর পানে চেয়ে চেয়ে
 হৃদয় উঠিল গেয়ে,
 চিনি, চিনি, সখী।

কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
 'আমি ভালোবাসি।'

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই,
 ও আমার জুই।

আজ তাই পড়ে মনে
 বাদল-সাঁঝের বনে
 ঝর ঝর ধারা,
 মাঠে মাঠে ভিজ়ে হাওয়া
 যেন কী স্বপনে-পাওয়া,
 ধরে ধরে সারা।

সজল তিমিরতলে তোর গন্ধ বলেছে নিশ্বাসি,
 'আমি ভালোবাসি।'

মিলনসুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই,
 ও আমার জুই।

মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল।
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কী বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
সে রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি,
'আমি ভালোবাসি।'

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিল তুই,
ও আমার জুই।
বক্ষে এনেছিল কার
যুগ-যুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া;
বারে বারে স্মারে এসে
কোন নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া?
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন বঁশি
'আমি ভালোবাসি।'

যুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর ১৯২৪

বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে
কোন অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন করে।
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদোষ-আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
তাই তোমার ওই কাঁদন-হাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন সুদূর অগ্র-ঢেউ।
সেখানে কোন রাজপুত্র চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেখানে সে বাজায় বঁশি রূপকথারই ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তুমি জান না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়।
হয়তো সে কোন সকালবেলা শিশির-ঝন্ডা পথে
জাগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার স্নেহে,
কিংবা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায়—
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক, নয় সে দাদামশায়।

যুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর ১৯২৪

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে
ঘুমে ছুয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে কণে কণে।

সহসা স্বপন টুটে

তাই সে যে গেয়ে উঠে,

কিছু তার বৃদ্ধি নাহি বৃদ্ধি।

তাই সে যে পাখা মেলে

উঠে যায় ঘর ফেলে,

ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে কণে কণে।

হিরা তাই ওঠে কেঁদে,

রাখিতে পারি না বেঁধে,

অকারণে দূরে থাকে চেয়ে—

মলিন আকাশতলে

যেন কোন্ খেয়া চলে,

কে যে যায় সারিগান গেয়ে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্ত-নিশীথ সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।

কে জানালো সে কথা যে

গোপন হৃদয়মাঝে,

আজো তাহা বৃদ্ধিতে পারি নি।

মনে হয় পলে পলে

দূর পথে বেজে চলে

ঝিল্লিরবে তাহার কিম্বদন্তী।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলি-পরশনে।

কার গানে কার সুর

মিলে গেছে সুরমধুর

ভাগ করে কে লইবে চিনে।

ওরা এসে বলে, 'এ কী,

বুঝাইয়া বলো দেখি।'

আমি বলি, বুঝাতে পারি নে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, প্রাণের অশান্ত পবনে
কদম্ববনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষনে

আমার পাওয়ার কানে

জানি নে তো মোর গানে

কার কথা বলি আমি করে।
‘কী কহ’ সে যবে পদছে
তখন সন্দেহ ঘুচে,
আমার বন্দনা না-পাওয়ায়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

সৃষ্টিকর্তা

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি ম্বিগদগ আপন-দেওয়া নিধি।
তার বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারংবার নিরেছেন জানি।
আমি শুনিয়েছি তাঁরে, শ্রাবণ রাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমা রাতে পূর্ণিপাত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি গির নত,
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিয়ে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর-মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি
স্মিতমিত প্রদীপালোকে মৃখে তার স্তম্ভ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে সুরে আপনি তিনি উল্মাদিনী অভিসারিণী
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়-তিমিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৫ ডিসেম্বর ১৯২৪

বীণা-হারা

যবে এসে নাড়া দিলে ম্যার
চমকি উঠিন্দু লাজে,
খুঁজে দেখি গৃহমাঝে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।

সেদিন মেঘের ভারে
 নদীর পশ্চিম পারে
 ঘন হল দিগন্তের ভুরূ,
 বৃষ্টির নাচনে মাতা,
 বনে মর্ম্মরিল পাতা,
 দেয়া গরজিল গদরু গদরু।
 ভরা হল আয়োজন,
 ভাবিন্দু ভরিবে মন
 বক্ষে জেগে উঠিবে মল্লার,
 হায়, লাগিল না সুর
 কোথায় সে বহুদর
 বীণা ফেলে এসেছি আমার।

কণ্ঠে নিয়ে এলে পদ্পহার।
 পদ্রস্কার পাব আশে
 খুঁজে দেখি চারি পাশে
 বীণা ফেলে এসেছি আমার,
 ওগো বীনকার।
 প্রবাসে বনের ছায়ে
 সহসা আমার গায়ে
 ফাল্গুনের ছোঁয়া লাগে একি।
 এ পারের যত পাখি
 সবাই কহিল ডাকি,
 'ও পারের গান গাও দেখি।'
 ভাবিলাম মোর ছন্দে
 মিলাব ফুলের গন্ধে
 আনন্দের বসন্তবাহার।
 খুঁজিয়া দেখিন্দু বৃকে,
 কহিলাম নতমুখে,
 'বীণা ফেলে এসেছি আমার।'

এল বৃষ্টি মিলনের বার।
 আকাশ ভরিল ওই;
 শূন্য হইল, 'সুর কই?'
 বীণা ফেলে এসেছি আমার,
 ওগো বীনকার।
 অন্তরবি গোখলিতে
 বলে গেল পদ্রবীতে
 আর তো অধিক নাই দেরি।
 রাঙা আলোকের জ্বা
 সাজিয়ে তুলেছে সভা,
 সিংহাসনে বাজিয়াছে ভেরী।

সুদূর আকাশতলে
 ধ্রুবতারা ডেকে বলে,
 'তারে তারে লাগাও ঝংকার।'
 কানাড়াতে সাহানাতে
 জাগিতে হবে যে রাতে—
 বীণা ফেলে এসেছি আমার।

এলে নিয়ে শিখা বেদনার।
 গানে যে বরিব তারে,
 চাহিলাম চারি ধারে—
 বীণা ফেলে এসেছি আমার,
 ওগো বীনকার।
 কাজ হয়ে গেছে সারা,
 নিশীথে উঠেছে তারা,
 মিলে গেছে বাটে আর মাটে।
 দীপহীন বাঁধা তরী
 সারা দীর্ঘ রাত ধরি
 দুলিয়া দুলিয়া ওঠে ঘাটে।
 যে শিখা গিয়েছে নিবে
 অগ্নি দিয়ে জ্বলে দিবে
 সে আলোতে হতে হবে পার।
 শুনো গানের তালে
 সুবাস লাগে পালে—
 বীণা ফেলে এসেছি আমার।

সান ইসিড্রো
 ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৪

বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে উদ্বাপনে:
 পূজ পূজ পল্লবে পল্লবে
 নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাতের নিঃশব্দ আহবানে,
 মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।
 ধ্রুবতীর মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রজাখায়
 বিপুল প্রাণের বহে ভার।
 তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
 আন্দোলিয়া উঠে বারংবার।

দয়া কোরো, দয়া কোরো, আরণ্যক এই তপস্বীরে,
 ধৈর্য ধরো ওগো দিগঙ্গনা,
 ব্যর্থ করিবারে তবু অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
 বনের অঙ্গনে মাতিরো না।

এ কী তীর প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম দঃসহ—
 দূরন্ত চুম্বন-বেগে তব
 ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সূত্রে, কহো মোরে কহো,
 কিশোর কোরক নব নব?

অকস্মাৎ দসদুতার তারে রিক্ত করি নিতে চাও
 সর্বস্ব তাহার তব সাথে?
 ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
 হবে তারে মূহুর্ভে হারাতে।
 যে লব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
 সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
 লুপ্তনের ধন লুপ্তি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব
 উঠিবে কঠিন হাসি হেসে।

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বরতলে,
 শান্তিরূপে এসো দিগঙ্গনা।
 উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বঙ্কলে
 সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।
 দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্ব যাহার সমাধান,
 সার্থক হোক সে বনস্পতি।
 বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
 তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্বমাবে
 নিত্য নব পদ্রে ফলে ফুলে।
 গোপনে অধারে তার যে অনন্ত নিয়ত বিরাজে
 আবরণ দাও তার খুলে।
 তাহার গৌরবে লহো তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
 আপনার চরম ষারতা।
 তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
 তারি ফলে তব সফলতা।

সান ইসিড্রো
 ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৪

পথ

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
 দূরার-বাহিরে থামি এসে।
 ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা,
 আমি পাই ক্রমে ক্রমে তারি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
 সেথা হতে লেখে মোর ধূলিপটে দীপরশ্মিরেখা
 অসম্পূর্ণ লেখা।

জীবনের সোধমাঝে কত কক্ষ কত-না মহলা,
 তলার উপরে কত তলা।
 আজন্মবিধবা তারি এক প্রান্তে রয়েছি একাকী,
 সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম-দূরে থাকি,
 লক্ষ্য নহি, উপলক্ষ, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ,
 মোর নহি শেষ।

উৎসবসভায় যেতে যে পায় আহ্বান-পদধানি
 তাহারে বহন করে আনি।
 সে লিপির খন্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
 ধূলার করিয়া লুপ্ত তাদের উড়ানে দিই ঝড়ে,
 আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
 বহু বিস্মৃতির।

কেহ যারে নাই শোনে, সবাই যাহারে বলে, 'জানি,'
 আমি সেই পুরাতন বাণী।
 বণিকের পণ্যযান, হে তুমি রাজার জয়রথ,
 আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভুলিবার পথ,
 তীব্র-দুঃখ মহা-দম্ভ, চিহ্ন মূছে গিয়েছে সবাই—
 কিছুর নাই, নাই।

কভু সূখে, কভু দুঃখে নিয়ে চলি; সূদিন দুর্দিন
 নাই বদ্বি আমি উদাসীন।
 বার বার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে,
 চলে যায়—সেও যায় যে যায় তাহারে দলে দলে,
 বিচিহ্নের প্রয়োজনে অবিচিহ্ন আমি শূন্যময়,
 কিছুর নাই রয়।

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছুর না সহ্যে দেরি,
 কারো নই, তাই সকলেরই।
 বামে মোর শস্যক্ষেত্র দক্ষিণে আমার লোকালয়,
 প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্তমান অকিড়িয়া রয়।
 আমি সর্ববংশহীন নিভ্র চলি তারি মধ্যখানে,
 ভবিষ্যের পানে।

তাই আমি চিররিম্ভ, কিছুর নাই থাকে মোর পুঞ্জি,
 কিছুর নাই পাই, নাই খুঞ্জি।
 আমারে ভুলিবে বলে যাত্রীদল গান গাহে সূরে,
 পারি নে রাখিতে তাহা, সে গান চলিরা যার দূরে।
 বসন্ত আমার বৃকে আসে যবে ধূলার আকুল,
 নাই দেয় ফুল।

পেঁপীছিয়া ক্ষতির প্রান্তে বিস্তৃহীন একদিন শেষে
 শয্যা পাতে মোর পাশে এসে।
 পান্থের পাথের হতে খসে পড়ে যাহা ভাঙাচোরা,
 ধূলিরে বণ্টনা করি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা;
 আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর 'পরে নাই প্রীতিলেশ,
 মোরে করে শ্বেষ।

শিশু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি বলে,
 ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
 নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
 আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্ত্রময় কারা,
 বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে—
 শিশু বোঝে মোরে।

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুঁশি সৃষ্টি করে তাই,
 এই আছে এই তাহা নাই।
 ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা,
 মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
 ভাঙা-গড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে,
 মোরে ভালোবাসে।

সান ইসিড্রো
 ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৫

মিলন

জীবন-মরণের স্রোতের ধারা
 যেখানে এসে গেছে থামি
 সেখানে মিলেছিঁন্দ সময়হারা
 একদা তুমি আর আমি।
 চলেছি আজ একা ভেসে
 কোথা যে কত দূর দেশে,
 তরণী দলিতেছে ঝড়ে—
 এখন কেন মনে পড়ে
 যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
 স্বর্গ আসিয়াছে নামি
 সেখানে একদিন মিলেছিঁ এসে
 কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিঁন্দ আপনা-ভোলা
 আমরা দৌঁছে পাশে পাশে।
 সেদিন বদেঁছিঁন্দ কিসের দোলা
 দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
 কিসের খুঁশি উঠে কেঁপে
 নিখিল চরাচর ব্যোপে,
 কেমনে আলোকের জয়
 অধারে হল তারাময়;
 প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
 ছুটেছে দশদিক্-গামী—
 সেদিন বদেঁছিঁন্দ যেদিন জেগে
 চাহিন্দ তুমি আর আমি।

বিজনে বসেছিঁন্দ আকাশে চাহি
 তোমার হাত নিম্নে হাতে।
 দৌঁহার কারো মূখে কথাটি নাহি,
 নিমেষ নাহি অঁখিপাতে।
 সেদিন বদেঁছিঁন্দ প্রাণে
 ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
 বিশ্ব-হৃদয়ের মাঝে
 বাণীর বীণা কোথা বাজে,
 কিসের বেদনা সে বনের বৃকে
 কুসুমে ফোটে দিনসামী,
 বদেঁছিঁন্দ যবে দৌঁছে ব্যাকুল সূখে
 কাঁদিন্দ তুমি আর আমি।

বদেঁছিঁন্দ কী আগনে ফাগুন হাওয়া
 গোপনে আপনারে দাহে—
 কেন যে অরুণের করুণ চাওয়া
 নিজেরে মিলাইতে চাহে;
 অকূলে হারাইতে নদী
 কেন যে ধায় নিরবধি;
 বিজুলি আপনার বাণে
 কেন যে আপনারে হানে;
 রজনী কী খেলা যে প্রভাত-সনে
 খেলিছে পরাজয়কামী,
 বদেঁছিঁন্দ যবে দৌঁছে পরান-পণে
 খেলিন্দ তুমি আর আমি।

অন্ধকার

উদয়ান্ত দূই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।

প্রভাত-আলোকচ্ছটা শূন্য তব আদিশঙ্খধ্বনি
চিস্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নতুন চেয়েছি আঁখি তুলি;
সে তব সংকেতমন্ত্র ধ্বনিয়েছে, হে মৌনী মহান,
কর্মের তরঙ্গে মোর; স্বপ্ন-উৎস হতে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি।

নিম্নতম্বের সে আহবানে, বাহিয়া জীবনযাত্রা মম,
—সিদ্ধগামী তরঙ্গিণীসম—
এতকাল চলেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে
বিক্ষিপ্ত জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে
অনির্দেশ অলঙ্কার পানে।
কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অনামনা
অশেষের টানে।

আজি মোর ক্রান্তি ঘোর দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহাসনে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিঃশ্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নতুন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে 'স্বার খোলো'।

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আজ সে সম্বান হোক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বাহিত হোক
অধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গদহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন অর্থ নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে, ভাবি তাই।
কত-না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্তির পদস্কার,
সবরে এসেছি বহে সেই-সব রক্ত-অলংকার,

ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা,
দিনের আলোর সাথে স্নান হয়ে এসেছে তাহারা
তব স্মারে এসে।

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হস্তে যায় মিছে,
সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকি আছে তব, প্রাতে মোর যাত্রাসহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবীমঞ্জরী,
আজো তাহা অস্মান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হতে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
স্মৃতি হতে জেগে দেখি, বসন্তে একদা রাত্রিশেষে
অরুণকিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পদলিনে।
দিবসের ধূলা এরে কিছতে পারে নি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিব, তব স্মারে,
ভূমি লও চিনে।

হে চরম, এরি গম্বে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝি নি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সম্মুখ যবে সব লক্ষ হল অবসান
আমার ধ্যান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে।

জন্মিয়া চেজারে জাহাজ
১০ জানুয়ারি ১৯২৫

প্রাণ-গঙ্গা

প্রতিদিন নদীপ্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্য দান
পূজারীর পূজা-অবসান।
আমিও তেমনি যবে মোর ডালি ভরি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহবী-জলধারে,
পূজি আমি তারে।

বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে,
 এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।
 মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটাজালে
 ঘুরে ঘুরে কালে কালে
 তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার।
 কত-না যুগের পাপভার
 নিঃশেষে ভাসিয়ে দিল অতলের মাঝে।
 তরঙ্গে তরঙ্গে তার বাজে
 ভবিষ্যের মঙ্গলসংগীত।
 তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের চলেছে ইঞ্জিত।

দৈবস্পর্শে তার
 আমারে সে ধূলি হতে করিল উদ্ধার;
 অঙ্গে অঙ্গে দিল তার তরঙ্গের দোল;
 কণ্ঠে দিল আপন কল্লোল।
 আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষু দিল ভরি
 বর্ণের লহরী।
 খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরীয়,
 কত রূপে দেখা দিল প্রিয়,
 অনির্বচনীয়।

তাই মোর গান
 কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান
 প্রাণ-জাহ্নবীরে।
 তাহারি আবর্তে ফিরে ফিরে
 এ পৃথ্বীর কোনো ফুল নাও যদি ভাসে চিরদিন,
 বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
 তবে তার লাগি, কহো,
 কার সাথে আমার কলহ।
 এই নীলাম্বরতলে তুণরোমাঞ্চিত ধরণীতে,
 বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
 প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি অবসান
 ধন্য হয়ে ভেসে থাক গান।

জুলিয়ে চোজারে জাহাজ
 ১৬ জানুয়ারি ১৯২৫

বদল

হাসির কুসুম আনিম সে, ডালি ভরি'
 আমি আনিলাম দুখ-বাদলের ফল।
 শূন্যালেম তারে, 'যদি এ বদল করি
 হার হবে কার বস'।'

হাসি কোঁতুকে কহিল সে সুন্দরী,
 'এসো-না, বদল করি।
 দিয়ে মোর হার লব ফলভার
 অশ্রুর রসে ভরা।'
 চাহিয়া দেখিন্দু মদুখপানে তার
 নিদ্রা সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
 করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
 আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
 তুলিয়া ধরিন্দু বদকে।
 'মোর হল জয়' হেসে হেসে কয়,
 দূরে চলে গেল ভরা।
 উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
 আসিল দারুণ খরা,
 সন্ধ্যায় দেখি তন্ত দিনের শেষে
 ফুলগুলি সব ঝরা।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
 ১৭ জানুয়ারি ১৯২৫

ইটালিয়া

কহিলাম, 'ওগো রানী,
 কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
 এসেছি শূন্যিয়া তাই,
 উষার দ্বারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।'
 শূন্যিয়া দাঁড়ালে তব বাতায়ন-পরে,
 ঘোমটা আড়ালে কহিলে করুণ স্বরে,
 'এখন শীতের দিন
 কুয়াশার ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।'

কহিলাম, 'ওগো রানী,
 সাগরপারের নিকুঞ্জ হতে এনেছি বর্শাশিখানি।
 উতারো ঘোমটা তব,
 বারেক তোমার কালো নরনের আলোখানি দেখে লব।'
 কহিলে, 'আমার হয় নি রঙিন সাজ,
 হে অধীর কবি, ফিরে যাও তুমি আজ;
 মধুর ফাগুন মাসে
 কুসুম-আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে।'

কহিলাম, 'ওগো রানী,
 সফল হয়েছে যাত্রা আমার শূন্যে আশার বাণী।
 বসন্তসমীরণে
 তব আহ্বানমস্ত ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।
 মধুপমধুর গন্ধমাতাল দিনে
 ওই জানালার পথখানি লব চিনে,
 আসিবে সে সুসময়।
 আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়।'

মিলান
 ২৪ জানুয়ারি ১৯২৫

সংযোজন

স গি ডা

অবসান

বিরহ-বৎসর পরে, মিলনের বীণা
তেমন উদ্গাদ-মন্ড্রে কেন বাজিল না।
কেন তোর সন্তস্বর সন্তস্বর্গ-পানে
ছুটিয়া গেল না উর্ধ্বে উদ্গাম পরানে
বসন্তে মানসযাত্রী বলাকার মতো?
কেন তোর সর্ব তন্ত্র সবলে প্রহত
মিলিত ঝংকারভরে কর্ণিয়া কর্ণিয়া
আনন্দের আতঁরবে চিত্ত উদ্গাদিয়া
উঠিল না বাজি? হতাশ্বাস মৃদুস্বরে
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
কেন মৌন হল। তবে কি আমারি প্রিয়া
সে পরশ-নিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া?
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছন্ন-তার,
সেদিনের মতো করে বাজে নাকো আর?

শিলাইদহ

২১ আষাঢ় ১৩০৩

অন্তিম প্রেম

ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেমসী,
শুদ্ধ বাহু বাড়াইয়া উচ্ছ্বাস উল্লসি
আমারে কি পেতে চাস চির আলিঙ্গনে।
শুদ্ধ এক মৃহুর্ভের উদ্গাস মিলনে
তোর বন্ধোমাঝে চাস করিতে বিলস
আমার বন্ধের যত শুধ দৃষ্ট ডয়?
আমিও তো কতদিন ভাবিয়াছি মনে
বসি তোর তটোপান্তে প্রশান্ত নির্জনে,
বাহিরে চঞ্চলা তুই প্রমত্ত মৃখরা,
শাণিত অসির মতো ভীষণ প্রথরা,
অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর,
দীপহীন রুদ্ধস্বার অধঃস্রবীর
বাসরথরের মতো নিষ্পত্ত নির্জন—
সেখা কার ভয়ে পাতা সূচির শয়ন!

পত্র

সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব,
 লয়ে সदा আছ মন্ত,
 দৃষ্টি শব্দ আকাশে ফিরিছে,
 গ্রহতারকার পথে
 যাইতেছ মনোরথে,
 ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে;
 হাঁকায়ে দৃ-চারিজোড়া
 তাজা পক্ষিরাজ-ঘোড়া
 কল্পনা গগনভেদিনী
 তোমারে করিয়া সঙ্গী
 দেশকাল যায় লঙ্ঘি,
 কোথা পড়ে থাকে এ মেদিনী।
 সেই তুমি ব্যোমচারী
 আকাশ-রবিরে ছাড়ি
 ধরার রবিরে কর মনে—
 ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
 একি আজ অনুগ্রহ
 জ্যোতির্হীন মর্ত্যবাসী জনে।
 ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ
 দূরবীন দ্রষ্টলক্ষ্য,
 কোথা হতে কোথায় পতন।
 তাজি দীপ্ত ছায়াপথে
 পড়িয়াছ কায়াপথে—
 মেদ-মাংস-মজ্জা-নিকেতন।

বিধি বড়ো অনুকূল,
 মাঝে মাঝে হয় ভুল,
 ভুল থাক্ জন্ম জন্ম বেঁচে—
 তবু তো ক্ষণেকতরে
 ধূলিময় খেলাঘরে
 মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে।
 তুমি অদ্য কাশীবাসী,
 সম্প্রতি লয়েছ আসি
 বাবা ভোলানাথের শরণ;
 দিব্য নেলা জন্মে ওঠে,
 দূবেলা প্রসাদ জোটে,
 বিধিমতে ধুমোপকরণ।
 জেগে উঠে মহানন্দ
 খুলে যায় হৃদোবন্ধ,
 ছুটে যায় পেল্লিসল উদ্দাম,

পরিপূর্ণ ভাবভরে
 লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
 বেড়ে যায় ইন্সটাম্পের দাম।
 আমার সে কর্ম নাস্তি,
 দারুণ দৈবের শাস্তি,
 জেলা-দেবী চেপেছেন বন্ধে,
 সহজেই দম কম,
 তাহে লাগাইলে দম,
 কিছুতে রয়ে না আর রক্ষে।
 নাহি গান, নাহি বাঁশি,
 দিনরাতি শুধু কাশি,
 ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে;
 নবরস কবিত্বের
 চিস্তে ছিল জন্ম দেয়,
 বহে গেল সর্দির প্রবাহে।
 অতএব নমোনম,
 অধম অক্ষমে ক্ষমো,
 ভগ্ন আমি দিনু ছন্দরগে,
 মগধে কলিঙ্গে গোড়ে
 কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
 কে বলো পারিবে তোমা-সনে।

বনক্কেত্র। শিমলাশৈল
 শনিবার। ১৮২৮

বসন্তের দান

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে—
 এবার কিছু কি, কবি করেছে সপ্তয়।
 ভয়েছ কি কল্পনার কনক-অঙ্কলে
 চণ্ডলপবনক্রিষ্ট শ্যাম কিশোর,
 ক্লান্ত করবার গুচ্ছ? তপ্ত রৌদ্র হতে
 নিয়েছ কি গলাইয়া ঘোবনের সূরা,
 ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দঃস্রোতে,
 রেখেছ কি কবি তারে অনন্তমধুরা।
 এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমানিশীথে
 নবমল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
 তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
 যে দৃষ্টি হানিরাছিল একটি নিমেষে,
 সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষর সংগীতে!
 সে কি গেছে পদ্যপুষ্প সৌরভের দেশে!

প্রশ্ন

দিয়েছ প্রশ্ন মোরে করুণানিলয়,
 হে প্রভু, প্রত্যহ মোরে দিয়েছ প্রশ্ন।
 ফিরেছি আপন মনে আলসে জালসে
 বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে
 নানা পথে, নানা ব্যর্থ কাজে, তুমি তব
 তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর প্রভু,
 আজ তাহা জানি। যে অলস চিন্তালতা
 প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জটিলতা
 হৃদয়ে বেষ্টিয়া ছিল, তারি শাখাজালে
 তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে
 নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সদা
 গোপনে সিগুন করি। দিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
 দিয়ে দন্দ-পদরস্কার, সুখ-দুঃখ ভয়,
 নিয়ত টানিয়া কাছে দিয়েছ প্রশ্ন।

২৩ ফাল্গুন ১৩০৭

সাগর সংগম

হে পথিক কোন্ খানে
 চলেছ কাহার পানে?
 পোহাল রজনী উঠে দিনমণি
 চলেছি সাগর স্নানে।
 উষার আভাসে ভূষার বাতাসে
 পাখির উদার গানে
 শয়ন তেরাগি উঠিয়াছি জাগি,
 চলেছি সাগর স্নানে।

শূন্যই তোমার কাছে
 সে সাগর কোথা আছে।
 যেথা এই নদী বহি নিরবধি
 নীল জলে মিশিয়াছে।
 যেথা হতে রবি উঠে নব ছবি
 যিলার বাহার পাছে;
 তন্ত প্রাণের তীর্থ স্নানের
 সাগর সেথায় আছে।

পথিক তোমার দলে
 যাত্রী ক'জন চলে।
 গণি তাহা ভাই শেষ নাই পাই
 চলেছে জলে স্থলে।
 তাহাদের বাতি জ্বলে সারারাত্তি
 তিমির আকাশতলে
 তাহাদের গান সারা দিনমান
 ধ্বনিছে জলে স্থলে।

সে সাগর কহো তবে
 আর কতদূরে হবে।
 আর কতদূরে আর কতদূরে
 সেই তো শূন্য সবে।
 ধ্বনি তার আসে দখিন বাতাসে
 ঘন ভৈরব রবে।
 কভু ভাবি কাছে, কভু দূরে আছে
 আর কতদূরে হবে।

পথিক গগনে চাহো
 বাড়িছে দিনের দাহ।
 বাড়ে যদি দূখ হব না বিমূখ
 নিবাব না উৎসাহ।
 ওরে ওরে ভীত, তৃষিত তাপিত
 জয়-সংগীত গাহো।
 মাথার উপরে খর রবি-করে
 বাড়ুক দিনের দাহ।

কি করিবে চলে চলে
 পথেই সন্ধ্যা হলে?
 প্রভাতের আশে স্নিগ্ধ বাতাসে
 ঘুমাব পথের কোলে।
 উদিবে অরুণ নবীন করুণ
 বিহঙ্গ কলরোলে।
 সাগরের স্নান হবে সমাধান
 নতুন প্রভাত হলে।

সাগর-মন্থন

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে
 কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাট মন্থনে
 অনন্ত বরষ ধরি। দেবদৈত্যদলে
 কী রত্ন সন্ধান লাগি তোমার অতলে
 অশান্ত আবর্ত নিত্য রেখেছে জাগারে
 পাপে পুণ্যে সন্ধে দৃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
 ফেনিল কল্লোল-ভণ্ডে? ওগো, দাও দাও
 কী আছে তোমার গর্ভে—এ ক্লেভ থামাও!
 তোমার অন্তর-লক্ষ্মী যে শূভ প্রভাতে
 উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি হাতে
 বিস্মিত ভুবন মাঝে, লয়ে বর-মালা
 ত্রিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা,
 সেদিন হইবে কান্ত এ মহামন্থন,
 ধেমো যাবে সমুদ্রের রুদ্ধ এ ক্রন্দন।

আলমোড়া

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

শিবাজী-উৎসব

কোন দূর শতাব্দের কোন এক অখ্যাত দিবসে
 নাহি জানি আজি,
 মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে—
 হে রাজা শিবাজী,
 তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
 এসেছিল নামি—
 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খন্ড ছিন্ন বিক্লান্ত ভারত
 বেঁধে দিব আমি।'

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
 পায় নি সংবাদ,
 বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
 শূভ শঙ্খনাদ!
 শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্মল
 শ্যামল উত্তরী
 তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
 ছিল বন্ধে করি।

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
 তব বহুশিখা
 আঁকি দিল দিগ্দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যাদ্বেহিতে
 মহামন্ত্র-লিখা।

মোগল-উকীষশীর্ষ প্রক্ষুরিত প্রলয়প্রদোষে
পকুপগ্ন যথা—
সেদিনও শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বহুনির্বোধে
কী ছিল বারতা।

তার পরে শূন্য হল ঝঞ্জাক্কে নিবিড় নিশীথে
দিল্লীরাজশালা—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিণিতে
দীপালোকমালা।
শবলন্ধ গল্পদের উর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা—মুন্টিমের ডগ্মরেখাকারে
হল তার সীমা।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পল্লবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চূপে চূপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

সেদিন কোথায় তুমি হে ভাবুক, হে বীর মারাঠী,
কোথা তব নাম।
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম।
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দসাদ্ধ বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তুস্করের নিষ্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে।

অগ্নি ইতিবৃত্তকথা, ক্রান্ত করো মধুর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে নৱ দ্বিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।

হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
 বিধির ভাঙারে
 সৃষ্টিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
 পারে হরিবারে?
 তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
 সে সত্যসাধন,
 কে জানিত হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর-তরে
 ভারতের ধন।

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী,
 গিরিদরীতলে,
 বর্ষার নিষ্কর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি
 পরিপূর্ণ বলে—
 সেইমতো বাহিরিলে—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
 যাহার পতাকা
 অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
 কোথা ছিল ঢাকা।

সেইমতো ভাবিতোঁছি আমি কবি এ পূর্ব-ভারতে—
 কী অপূর্ব হেরি,
 বঙ্গের অঙ্গানম্বারে কেমনে ধ্বনিলা কোথা হতে
 তব জয়ভেরী।
 তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্রা বিদারি
 প্রতাপ তোমার
 এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি
 উদিল আবার।

মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
 বিস্মৃতির তলে,
 নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
 আঘাতে না টলে।
 যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
 কর্মপরপারে,
 এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
 ভারতের দ্বারে।

আজও তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
 ভবিষ্যের পানে
 একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান
 হেরিছে কে জানে।

অশরীর হে তাপস, শব্দ তব তপোমূর্তি লগ্নে
আসিয়াছ আজ,
তব তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ বগ্নে,
সেই তব কাজ।

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
'হর হর হর'।
শব্দ তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি,
করিল আহ্বান—
মহাতে হৃদয়ামনে তোমারেই বরিল হে স্বামী,
বাঙালির প্রাণ।

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দ-কাল ধরি—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি
দিবে বিনা রণে।
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন বাণী-রূপে আনি দিবে নতুন পরান
নতুন প্রভাত।

মারাঠার প্রাপ্ত হতে একদিন তুমি ধর্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে
রাজ্য বলে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব যবে।
তোমার কৃপাণদীপ্ত একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগদিনে না বদ্বিন্দু রুদ্ধ সেই লীলা,
লুকান্দু তরাসে।

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমূর্তি—
সমুদ্রত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকায়ে না তার দিব্যজ্যোতি
কছু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি হে রাজন,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর লগ্নে আট কোটি বঙ্গের মঙ্গল
দাঁড়াইবে আজ।

সদিন শূন্য নি কথা— আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বন্ধে বন্ধে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমগ্নে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূর্ব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পূণ্য নামে।

[গিরিধি
১১ ভাদ্র ১০১১]

দুর্দিন

ওই আকাশ-পরে আঁধার মেলে কী খেলা আজ খেলতে এলে
তোমার মনে কী আছে তা জানব না।
আমি তবুও হার মানব না, হার মানব না।
তোমার সিংহ-ভীষণ রবে,
তোমার সংহার-উৎসবে,
তোমার দুর্যোগ-দুর্দিনে—
তোমার তিড়িৎশিখায় বহুলিখার তোমার লব চিনে—
কোনো লক্ষ্য মনে আনব না গো আনব না।
যদি সঙ্গে চলি রঙ্গভরে কিংবা পড়ি মাটির 'পরে
তবুও হার মানব না হার মানব না।

কভু যদি আমার চিত্তমাঝে ছিন্ন-তারে বেসুর বাজে
জাগে যদি জাগরু প্রাণে যন্ত্রণা—
ওগো না পাই যদি নাই বা পেলেম সান্ধনা।
যদি তোমার তরে আজি
ফুলে সাজিয়ে থাকি সাজি,
প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকি ঘরে,
তবে ছিঁড়ে গেলে পদ্প, প্রদীপ নিবে গেলে ঝড়ে
তবু ছিন্ন ফুলে করব তোমার বন্দনা।

তব্দ নেবা-দীপের অন্ধকারে করব আঘাত তোমার দ্বারে,
জাগে যদি জাগুক প্রাণে যন্ত্রণা।

আমি ভেবেছিলাম তোমায় লয়ে যাবে আমার জীবন বয়ে
দুঃখ তাপের পরশটুকু জানব না—

তাই সুখের কোণে ছিলাম পড়ে আনমনা।

আজ হঠাৎ ভীষণ বেগে

তুমি দাঁড়াও যদি এসে,

তোমার মস্ত চরণ-ভরে

আমার যত্নে-গড়া শয়নখানি ধূলায় ভেঙে পড়ে

আমি তাই বলে তো কপালে কর হানব না।

তুমি যেমন করে চেনাতে চাও তেমনি করে চিনিরে যাও

যে দুঃখ দাও দুঃখ তারে জানব না।

তবে এসো হে মোর সদুঃসহ ছিন্ন করে জীবন লহো

বাজিয়ে তোলো ঝঞ্জা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা,

আমায় দুঃখ হতে কোরো না আর বণ্ডনা।

আমার বৃকের পাজির টুটে

উঠুক পঙ্কার পদ্ম ফুটে;

যেন প্রলয়-বায়ু-বেগে

আমার মর্মকোষের গন্ধ ছুটে বিশ্ব উঠে জেগে।

ওরে আয় রে ব্যথা সকল-বাধা-ভঞ্জন।

আজ আধারে ওই শূন্য বোপে কণ্ঠ আমার ফিরুক কেঁপে,

জাগিয়ে তোলো ঝঞ্জা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা।

নমস্কার

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার

বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে ঘান,

নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান

চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি

বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আহ জাগি

পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—

যার লাগি নরদেব চিররাত্রিদিন

তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বহুবর্ষে

গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে

গিয়েছেন সংকটযাত্রায়, যার কাছে

আরাম লঙ্ঘিত শির নত করিয়াছে,

মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়—সেই বিখ্যাত

শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার

চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
 সত্যের গৌরবদ্যুত প্রদীপ্ত ভাষায়
 অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
 বিধাতা কি শুনেন? তাই উঠে বাজি
 জয়গীত তাঁর? তোমার দক্ষিণকরে
 তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
 দঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
 জ্বলিয়াছে বিশ্ব করি দেশের আঁধার
 ধুবতারকার মতো? জয় তব জয়!
 কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়—
 সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
 নিজেরে করিতে রক্ষা! কোন্ অমানুষ
 তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল!
 মোছ রে দুর্বল চক্ষু, মোছ অশ্রুজল।

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
 সেই রুদ্ধদ্যুতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
 পারে শাস্তি দিতে? বন্ধনশৃঙ্খল তার
 চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
 কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুদ্ধ রাহু
 বিধাতার সূর্য-পানে বাড়াইয়া বাহু
 আপনি বিলুপ্ত হয় মূহূর্তেক-পরে
 ছায়ার মতন। শাস্তি? শাস্তি তাঁর তরে
 যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
 লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
 কপট বেষ্টন, যে নপুংস কোনোদিন
 চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
 অন্যায়েরে বলে নি অন্যায়, আপনার
 মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য-অধিকার
 যে নির্লজ্জ ভয়ে জোভে করে অস্বীকার
 সভামাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,
 দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
 অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত-প্রায়—
 সেই ভীরু নর্তকির চিরশাস্তিভারে
 রাজকারা-বাহিরেতে নিত্যকারাগারে।

বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান-মাঝে
 হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
 আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—
 মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
 আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভর বাণী
 উদার মৃদুত্ব। ভারতের বীণাপাণি,

হে কবি, তোমার মূখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঙ্কার—
নাহি তাহে দঃখতান, নাহি কদু লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি হাস। তাই শূনি আজ
কোথা হতে ঙ্কার-সাথে সিঁদুর গর্জন,
অন্ধবেগে নিখরির উন্মত্ত নর্তন
পাষণপিঞ্জর টুটি, বহুগর্জর
ভেরীমন্ড্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাস্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

তার পরে তাঁরে নমি, যিনি কীড়াঙ্কলে
গড়েন নতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বৃকে
সম্পদে করে লালন, হাসিমুখে
ভক্তের পাঠায়ে দেন কষ্টককান্তারে
রিত্তহস্তে শত্রুমাঝে রাতি-অন্ধকারে;
যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, 'দঃখ' কিছু নয়—
কৃত মিথ্যা, কৃত মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদন্ড তার!
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩১৪

সুপ্রভাত

মুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দূরার ভেদিয়া;
বন্ধে বেজেছে বিদ্রোহাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধ ভ্রমস গোছে কি না ছুটি,
মুগ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
ভুল্লা-জড়িয়া যাজিয়া।
এমন সময় ঈশান, তোমার
বিজ্ঞান উঠেছে বাজিয়া।
বাজে রে পরাজি বাজে রে
দম্ব মেঘের মন্ডে-মন্ডে
দীপ্ত গগন-মাঝে রে।

চমকি জাগিয়া পূর্ব ভুবন
 রক্ত বদন লাজে রে।
 ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ,
 ললাটে ফুসিছে নাগিনী;
 রত্ন-বীণায় এই কি বাজিল
 সুপ্রভাতের রাগিনী।
 মৃগ কৌকিল কই ডাকে ডালে,
 কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে।
 বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
 অমানিশা গেল ফাটিয়া;
 তোমার খজা আধার-মহিষে
 দখানা করিল কাটিয়া।
 ব্যথায় ভুবন ভরিছে;
 ঝরঝর করি রক্ত-আলোক
 গগনে গগনে ঝরিছে;
 কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
 কেহ বা স্বপনে ডরিছে।

তোমার শ্মশান-কিষ্কর-দল
 দীর্ঘ নিশায় ভুখারি,
 শব্দ অধর লেহিয়া লেহিয়া
 উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
 অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে,
 করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-পরে,
 খোলো খোলো দ্বার, ওগো গৃহস্থ,
 থেকে না থেকে না লুকায়ে,
 যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
 সব দিতে হবে চুকায়ে।
 ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
 হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
 ভাঙ ভরিয়া দেহো রে।
 ওরে দীন প্রাণ, কী মোহের লাগি
 রেখেছিস যিছে স্নেহ রে।

উদয়ের পথে শূনি কার বাণী,
 “ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
 নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
 ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।”
 হে রত্ন, তব সংগীত আমি
 কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী,
 মরণ-নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
 হৃদয়-ভয় বাজাষ।

ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লগ্নে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিব-শংকর
কী অটুহাস হেসেছে।
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে।

জীবন সর্পিণী জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচর
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
ভালোই হয়েছে ঋণার বারে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়িয়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে,
মিলন-যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার দাহনে।
তিমির রাতি পোহারে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ান্নে,
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ান্নে।

लेखक

श्रीरविशरणदास

बुधालय

२३ कांठ

२०००

লেখন

মুখ আমার বেলাসি
দীপ্ত আলোর ঘনিকা,
তুচ্ছ আঁটার নিম্নীখে
উড়িছে আলোর ঘনিকা ॥

My fancies are fireflies
specks of living light—
twinkling in the dark.

আমার চিন্তন মূঢ় নবনীত
অনিচ্ছাকৃত মূলে,
চলিত চলিত দেখে যার তার
চলিত চলিত ভুলে ॥

The same voice murmurs
in these desultory lines
which is born in wayside fancies
letting hasty glances pass by.

প্রজাপতি মাত্র রক্ত না গলে,
বিষে গনিয়া গৈছে,
সময় গ্রহণ করছে অই আরু ॥

The butterfly does not count years
but moments
and therefore has enough time.

ହୁଏବ ଓଂକର କୋରବର ଓଏ ସବୁ ମାଧୀର ବାମା,
ବୁଝାଏ ଏକାହିଁ ହୁଏବ ଦିବର ବାମ-ମତା ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି।

In the drowsy dark caves of the mind
dreams build their nest
with bits of things
dropped from day's caravan.

ଓଂକର କୋରବ ଓଂକର କୋରବ ମାଧୀର ବାମା,
ମାଡ଼ି ଦିଡ଼ି ମିଳି ବସିବ ଓଏ ସବୁ ମାଧୀର ବାମା।
ଓଏ ଓଏ ଓଏ ଓଏ କ'ଣ ହାତ କ'ଣ ହାତ ମାଧୀର ବାମା
ହାତ ଓଏ ଓଏ ଓଏ ଓଏ କ'ଣ ହାତ କ'ଣ ହାତ ॥

My words that are slight
may lightly dance upon time's waves
while my words heavy with import sink.

ବସନ୍ତ ମେ ଓଂକର କୋରବ ଦିବ
ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି।
ନାହିଁ ଓଏ ଓଏ କୋରବ ଦିବ,
ଓଏ କୋରବ ଓଏ କୋରବ ଦିବ ॥

Spring scatters the petals of flowers
that are not for the fruits of the future
but for the moment's whim.

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তম্ভ আঁধার নিশীথে
উড়ছে আলোর কণিকা।

My fancies are fireflies
specks of living light—
twinkling in the dark.

আমার লিখন ফুটে পথধারে
কণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

The same voice murmurs
in these desultory lines
which is born in wayside pansies
letting hasty glances pass by.

প্রজাপতি সে তো বরষ না গণে,
নিমেষ গণিরা বাঁচে,
সময় তাহার যথেষ্ট তাই আছে।

The butterfly does not count years
but moments
and therefore has enough time.

ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাখির বাসা,
কুড়ারে এনেছে মৃদু দিনের খসে-পড়া জাঙা ভাষা।

In the idrowsy dark caves of the mind
dreams build their nest
with bits of things
dropped from day's caravan.

ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে
 পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে।
 তার চেয়ে মোর এই ক'খানা হালকা কথার গান
 হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান।

My words that are slight
 may lightly dance upon time's waves
 while my works heavy with import sink.

বসন্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল
 হাওয়ার কত ওড়ায় অবহেলায়।
 নাহি ভাবে ভাবী কালের ফল,
 ক্ষণকালের খামখেয়ালি খেলায়।

Spring scatters the petals of flowers
 that are not for the fruits of the future
 but for the moment's whim.

স্বর্লিঙ্গ তার পাখায় পেল
 ক্ষণকালের ছন্দ।
 উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
 সেই তারি আনন্দ।

My thoughts, like sparks,
 ride on winged surprises
 carrying a single laughter.

সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে,
 সে তার আপন, ভবু পায় না তাহাকে।

The tree gazes in love at the beautiful shadow
 who is his own and yet whom he never can grasp.

আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন
 জ্যোতির্ময় স্নানি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।

Let my love, like sunlight, surround you
 and give you a freedom illumined.

মাটির সৃষ্টিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া,
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় ছুটে এসে দেয় নাড়া।

Joy freed from the bond of earth's slumber
rushes into the leaves numberless
and dances in the air for a day.

অতল আধার নিশা-পারাবার, তাহারি উপরিতলে
দিন সে রঙিন বৃন্দবৃন্দসম অসীমে ভাসিয়া চলে।

Days are coloured bubbles
that float upon the surface
of fathomless night.

ভীরু মোর দান ভরসা না পায়
মনে সে যে রবে কারো,
হয়তো বা তাই তব করুণায়
মনে রাখিতেও পারো।

My offerings are too timid
to claim your remembrance—
and therefore you may remember them.

ফাগুন, শিশুর মতো, ধূলিতে রঙিন ছবি আঁকে,
ক্ষণে ক্ষণে মূছে ফেলে, চলে যায়, মনেও না থাকে।

April, like a child, writes hieroglyphics
on dust with flowers,
wipes them and forgets.

দেবমন্দির-আগুনাতলে শিশুরা করেছে মেলা,
দেবতা ভোলেন পুজারীদলে, দেখেন শিশুর খেলা।

From the solemn gloom of the temple
children run out to sit in the dust.
God watches them play and forgets the priest.

তোমার বনে ফুটেছে শ্বেতকরবী,
 আমার বনে রাঙা,
 দৌহার অঁখি চিনিম দৌহে নীরবে
 ফাগুনে ঘুম ভাঙা।

White and pink oleanders meet
 and make merry in different dialects.

আকাশ ধরায়ে বাহুতে বোঁড়িয়া রাখে,
 তবুও আপনি অসীম সূদূরে থাকে।

The sky, though holding in his arms
 his bride, the earth,
 is ever immensely away.

দূর এসেছিল কাছে,
 ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।

One who was distant came near to me
 in the morning,
 and came still nearer
 when taken away by night.

ওগো অনন্ত কালো,
 ভীরু এ দীপের আলো,
 তারি ছোটো ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো।

Wishing to hearten a timid lamp
 great night lightens all her stars.

আমার বাণীর পতঙ্গ গৃহাচর
 আর গহ্বর ছেড়ে
 গোধূলিতে এল শেষবাণীর অবসর,
 হারিয়ে যা পাখা নেড়ে।

Mind's underground moths
 grow filmy wings
 and take a farewell flight
 in the sunset sky till their hum is hushed.

দাঁড়িয়ে গিরি, শির
মেঘে তুলে,
দেখে না সরসীর
বিনতি।
অচল উদাসীর
পদমূলে
ব্যাকুল রূপসীর
মিনতি।

The lake lies low by the hill,
a tearful entreaty of love
at the foot of the inflexible.

ভাসিয়ে দিলে মেঘের ভেলা
খেলেন আলো-ছায়ার খেলা,
শিশুর মতো শিশুর সাথে
কাটান হেসে প্রভাত বেলা।

There smiles the Divine Child
among his playthings of unmeaning clouds
and ephemeral lights and shadows.

মেঘ সে বাষ্পগিরি,
গিরি সে বাষ্পমেঘ,
কালের স্বপ্নে যুগে যুগে ফিরি ফিরি
এ কিসের ভাবাবেগ।

Clouds are hills in vapour,
hills are clouds in stone—
a phantasy in time's dream.

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তারি
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইষ্ট পাথরের জয়।

While God waits for his temple
to be built of love
men bring stones.

শিখারে কহিল
 হাওয়া,
 “তোমারে তো চাই
 পাওয়া।”
 যেমনি জ্বিনিতে চাহিল ছিনিতে
 নিবে গেল দাবি-দাওয়া।

Wind tries to take flame by storm
 only to blow her out.

দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে
 সমুদ্র করে দান
 অতল প্রেমের অশ্রুজলের গান।

The two separated shores mingle their voices
 in a song of unfathomed tears.

তারার দীপ জ্বালেন যিনি
 গগনতলে
 থাকেন চেয়ে ধরার দীপ
 কখন জ্বলে।

God among stars waits for man to light
 his lamps.

মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার,
 নিরর্থকধারায় শৈল যেমন পরশে পারাবার।

I touch God in my song
 as the far away hill touches the sea
 with its waterfall.

নানা রঙের ফুলের মতো উষা মিলায় যবে
 শূন্য ফলের মতন সূর্য জাগেন সগৌরবে।

Dawn—the many-coloured flower—fades,
 and the sun comes out,
 the fruit of the simple white light.

আঁধার সে যেন বিরহিণী বধু
অগ্নলে ঢাকা মৃদু,
পাখি আলোর ফিরিবার আশে
বসে আছে উৎসুক।

Darkness is the veiled bride
silently waiting for the errant light
to return to her bosom.

হে আমার ফুল, ভোগী মর্ষের মালে
না হোক তোমার গতি,
এই জেনো তব নবীন প্রভাতকালে
আশিস তোমার প্রতি।

My flower, seek not thy paradise in a fool's button-hole.

চলিতে চলিতে খেলার পদতুল খেলার বেগের সাথে
একে একে কত ভেঙে পড়ে যায়, পড়ে থাকে পশ্চাতে।

Life's play runs fast,
life's playthings fall behind one by one
and are forgotten.

বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী,
রজনীগন্ধা যে তবু চেয়ে আছে বসি।

Thou hast risen late, my crescent moon,
but my night bird is still awake to greet you.

আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোঙর রহিল পাঁকে,
অধীর তরণী খুঁজিয়া না পার কোথায় সে মৃদু ঢাকে।

Breezes come from the sky,
the anchor desparately clutches the mud,
and my boat is beating its breast against the chain.

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায়।

The blue of the sky longs for the earth's green.
The wind between them sighs, "Alas."

কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল,
সে নহে মধুকর।
প্রেম যে তার বিষম ভুল
করিল জর্জর।

Flower, have pity for the worm,
it is not a bee,
its love is a blunder and burden.

মাটির প্রদীপ সারাদিবসের অবহেলা লয় মেনে,
রাত্রের শিখার চুম্বন পাবে জেনে।

The lamp waits through the long day of neglect
for the flame's kiss in the night.

দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা বচনহারা,
অধারে যে তাহা জ্বলে রজনীর দীপ্ত তারা।

Day's pain muffled by its own glare
burns among stars in the night.

গানের কাঙাল এ বীণার তার বেসুরে মরিছে কেঁদে।
দাও তার সুর বেঁধে।

My untuned strings beg for music
in their anguished cry of shame.

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে।

In the shady depth of life are the lonely nests
of unutterable pains.

আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আধারের গলে,
সৃষ্টি তারে বলে।

Light accepts Darkness for his spouse
for the sake of creation.

আলোকের স্মৃতি ছায়া বদকে ক'রে রাখে,
ছবি বলি তাকে।

The picture—a memory of light
treasured by the shadow.

ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আশ্বহারা
প্রেম যে তখন মোহন মদের ধারা।
কুসুম-ফোটার দিন হলে অবসান
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান।

In the bounteous time of roses
love is wine.
It is food in the famished hour
when the petals are shed.

দিন হয়ে গেল গত।
শূন্যে বসে নীরব আধারে
আঘাত করিছে হৃদয় দুরারে
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে আসা
পথিক দুরাশা যত।

Through the silent night
I hear the knockings at my heart
of the morning's vagrant hopes
sadly coming back.

জীর্ণ জয়-ভোরণ-ধূলি-পর
ছেলেরা রচে ধূলির খেলাঘর।

By the ruins of terror's triumph
children build their dust castle.

রঙের খেলালে আপনা খোয়ালে
হে মেঘ, করিলে খেলা।
চাঁদের আসরে যবে ডাকে তোরে
ফুরাল যে তোর বেলা।

The cloud gives all its gold
to the departed sun
and greets the rising moon
with only a pale smile.

স্থলিত পালখ ধূলায় জীর্ণ
পড়িয়া থাকে।
আকাশে ওড়ার স্মরণচিহ্ন
কিছু না রাখে।

Feathers lying in the dust
have forgotten their sky.

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরী,
দিন বৃথা গেল, প্রিয়া।
তবুও তোমার ক্ষমা-হাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।

I lingered on my way
till thy cherry tree lost its blossoms,
but the azalea brings to me, my love,
thy forgiveness.

যখন পথিক এলেম কুসুমবনে
 শব্দ আছে কুঁড়ি দড়ি।
 চলে যাব যবে, বসন্ত সমীরণে
 কুসুম উঠিবে ফড়ি।

The shy little pomegranate bud,
 blushing today behind her veil
 will burst into a passionate flower
 tomorrow when I am away.

হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া
 ভুলায়ে বাহির করেছ মানবহিয়া।
 নিত্য তোমার ভয়ের ভীষণ বাণী
 দঃসাহসের পথে তারে আনে টানি।

The sea of danger, doubt and denial
 around men's little island of certainty
 challenges him across into the unknown.

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
 নব প্রাতে জাগে নতন জনম লভি।

The same sun is newly born in newlands
 in a ring of endless dawns.

জোনাকি সে খুলি খুঁজে সারা,
 জানে না আকাশে আছে তারা।

The glow worm while exploring the dust
 never knows that the stars are in the sky.

যবে কাজ করি
 প্রভু দেয় মোরে মান।
 যবে গান করি
 ভালোবাসে ভগবান।

God honours me when I work,
 He loves me when I sing.

একটি পুষ্প কলি
 এনেছিলাম দিব বলি,
 হায় তুমি চাও সমস্ত বনভূমি,
 লও, তাই লও তুমি।

I came to offer thee a flower,
 but thou must have all my garden.
 It is thine.

বসন্ত, তুমি এসেছ হেথায়
 বদ্বি হল পথ ডুল।
 এলে যদি তবে জীর্ণ শাখায়
 একটি ফুটাও ফুল।

Spring in pity for the desolate branch
 left one fluttering kiss in a solitary leaf.

চাহিয়া প্রভাত-রবির নয়নে
 গোলাপ উঠিল ফুটে।
 “রাখিব তোমায় চিরকাল মনে”
 বলিয়া পড়িল টুটে।

While the Rose said to the Sun
 “I shall ever remember thee”
 her petals fell to the dust.

আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর
 উড়বার ইতিহাস।
 তবু, উড়েছিলাম এই মোর উল্লাস।

I leave no trace of wings in the air,
 but I am glad I had my flight.

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শনে হাসে।

The shy shadow in the garden
loves the Sun in silence.
Flowers guess the secret and smile,
while the leaves whisper.

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জ্বলে
কণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ ধরণীতলে।

God watches with the same smile
the single night of a firefly
as the age-long nights of a star.

কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি
তবু নিজ মহিমায় অবিচল গিরি।

The mountain remains unmoved
at its seeming defeat by the mist.

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা।

Hills are the silent cry of the earth
for the unreachable.

একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়,
কাঁটা বিধে গেছে তার।
তবু, সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
করিন্দু নমস্কার।

Though the thorn pricked me in thy flower
O Beauty,
I am grateful.

হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা,
কোনো দায় নাহি তার।
আপনি সে পায় আপন পুরস্কার।

Let not my love be a burden on you, my friend,
know that it pays itself.

স্বল্প সেও স্বল্প নয়, বড়োকে ফেলে ছেয়ে।
দু-চারিজন অনেক বেশি বহুজনের চেয়ে।

The world ever knows
that the few are more than the many.

সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজ বাণী
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাসিখানি।

Truth smiles in beauty when she beholds her face
in a perfect mirror.

আমি জানি মোর ফুলগুঁড়ি ফুটে হরষে
না-জানা সে কোন্ শব্দ চুম্বন পরশে।

I see an unseen kiss from the sky
in its response in my rose.

বদ্বদ্বদ সে তো বন্ধ আপন ঘেরে,
শুন্যে মিলায়, জানে না সমুদ্রে।

In the swelling pride of itself
the bubble doubts the truth of the sea
and laughs and bursts into emptiness.

বিরহ প্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি
মিলনস্মৃতির নির্বাণহীন বাতি।

Thou hast left thy memory as a flame
to my lonely lamp of separation.

মেঘের দল বিলাপ করে
 অধার হল দেখে।
 ভুলেছে বৃষ্টি নিজেই তার
 সূর্য দিল ঢেকে।

My clouds sorrowing in the dark
 forget that they themselves
 have hidden the sun.

ভিক্ষুবশে দ্বারে তার “দাও” বলি দাঁড়ালে দেবতা
 মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্যবারতা।

Man discovers his own wealth
 when God comes to ask gifts of him.

গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে,
 বাঁশির লাগিয়া গুণী ফিরিছে সম্মানে।

The reed waits for his master's breath,
 master goes seeking for his reed.

ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল
 কুসুমবন
 সেদিন এসেছে আমার গানের
 নিমন্ত্রণ।

The first flower that blossomed on this earth
 was an invitation to me to sing.

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
 ধরণীরে সবচেয়ে করেছে বিক্ষত।

The world suffers most from the disinterested
 tyranny of its well-wisher.

স্তম্ভ অতল শব্দবিহীন মহাসমুদ্রতলে
বিশ্ব ফেনার পুঞ্জ সদাই ভাঙিয়া জুড়িয়া চলে।

The world is the ever changing foam
that floats on the surface of a sea of silence.

নর-জনমের পুরা দাম দিব যেই
তখনি মুক্তি পাওয়া যাবে সহজেই।

We gain freedom when we have paid
the full price for our right to live.

গোয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাঁবি,
শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি।

The clumsiness of power spoils the key
and uses the pickaxe.

জন্ম মোদের রাতের আঁধার
রহস্য হতে
দিনের আলোর সমুহন্তর
রহস্য স্নোতে।

Birth is from the mystery of night
into the greater mystery of day.

আমার প্রাণের গানের পাখির দল
তোমার কণ্ঠে বাসা খুঁজিবারে
হল আজি চণ্ডল।

Migratory songs from my heart are on wings
seeking their nests in love's voice in thee.

নিমেষকালের খেলালের লীলাভরে
অনাদরে যাহা দান কর অকাতরে
শরৎ-রাতের খসে-পড়া তারা-সম
উজ্জ্বল উঠে প্রাণের আধারে মম।

Your moments' careless gifts,
like the meteors of an autumn night
catch fire in the depth of my being.

মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা
বাহিয়া আমার অকাজ দিনের অলস বেলার বোঝা।

My paper boats sail away in play
with the burden of my idle hours.

অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা-পরে
ফিরে যায় শ্বিধাভরে।
আমের মৃকুল ছুটে বাহিরায়, কিছু না বিচার করে
ফেরে না সে, শুধু মরে।

Spring hesitates at winter's door,
but the flower rashly runs out to him
and meets her doom.

হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর তুমি সব অভিমান তোজে,
কঠিন শাস্তি সে যে।
হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহ
সেই বড়ো দুঃসহ।

Love punishes when it forgives
and the injured beauty by its awful silence.

দেবতার সৃষ্টি বিশ্বমরণে নতুন হয়ে উঠে
অসুদের অনাসৃষ্টি আপন অস্তিত্বভারে টুটে।

God's world is ever renewed by death
a Titan's ever crushed by its own existence.

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন,
আদিম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন।

The tree is of today, the flower is old.
She brings with her the message
of the immemorial seed.

নতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শূন্য আকাশ-মাঝে
পুরানো প্রেমের রিক্ত বাসায় বাসা তার মেলে না যে।

My love of today finds herself homeless
in the deserted nest of the yesterday's love.

সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি
চিরপুরাতন একটি চাঁপার বাণী।

Each rose that comes brings me greetings
from the Rose of an Eternal spring.

দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে
বেদনার পরপার-পানে।

The fire of pain traces for my soul
a luminous path across her sorrow.

ফেলে যবে যাও একা থুয়ে
আকাশের নীলিমায় কার ছোঁয়া যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বনে বনে বাতাসে বাতাসে
চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।

Since thou hast vanished from my reach
I feel that the sky carries an impalpable touch
in its blueness,
and the wind the invisible image of a movement
among the restless grass.

উষা একা একা অধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি
যেমন সুৰ্শ বাহিরিয়া আসে মিলার ঘোমটা টানি।

Dawn plays her lute before the gate of darkness
till the sun comes out and sees her vanish.

শিশির রবিরে শুধু জানে
বিন্দুরূপে আপন বৃক্ষের মাঝখানে।

The dewdrop knows the sun only within its own tiny orb.

আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে
মরু চিরদিন বন্দী হইয়া থাকে।

The desert is imprisoned in the wall
of its unbounded barrenness.

ধরণীর যজ্ঞ অগ্নি বৃক্ষরূপে শিখা তার তুলে:
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় ফুলে ফুলে।

The earth's sacrificial fire flames up in her trees
scattering sparks in flowers.

ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সর্ব্বেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা।

The sky tells its beads all night
on the countless stars
in memory of the sun.

দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পায়,
প্রেম সে আমার চিরদিবসের চরম মূল্য চায়।

My work is rewarded in daily wages,
I wait for my own final value in love.

কর্ম আপন দিনের মজুরি রাখিতে চাহে না বাকি।
যে প্রেমে আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি।

আলোকের সাথে মেলে আধারের ভাষা,
মেলে না কুয়াশা।

The darkness of night is in harmony with day—
the morning of mist discordant.

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কহে—
“যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নহে?”

An unknown flower in a strange land
speaks to the poet:
“Are we not of the same soil, my lover?”

পৃথি-কাটা ওই পোকা
মানুষকে জানে বোকা।
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা।

The worm thinks it strange and foolish
that man does not eat his books.

আকাশে মন কেন তাকায় ফলের আশা পূর্ষি?
কুসুম যদি ফোটে শাখায় তা নিয়ে থাক্ পূর্ষি!

The greed for fruit misses the flower.

অনন্তকালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া,
মেঘাশ্রয় অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী মায়ী।

The clouded sky today bears the vision
of a divine shadow of sadness
on the forehead of brooding eternity.

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পরিণত ফল,
অধার রজনী তারে ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল।

Flushed with the glow of sunset
earth seems like a ripe fruit
ready to be harvested by night.

প্রজাপতি পায় অবকাশ
ভালোবাসিবারে কমলারে।
মধুকর সদা বারোমাস
মধু খুঁজে খুঁজে শুধু ফেরে।

The butterfly has the leisure
to love the lotus,
not the bee busily storing honey.

মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়
প্রভাতে চারি ধারে,
অন্ধ করিয়া বন্দী করে যে তারে।

The mist weaves her net round the morning
captivates him and makes him blind.

শুকতার মনে করে শুধু একা মোর তরে
অরুণের আলো।
উষা বলে, “ভালো, সেই ভালো।”

The morning star whispers to Dawn:
“Tell me that you are only for me.”
“Yes”, she answers, “and also
only for that nameless flower.”

অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে,
হোথায় পৃথিবী মনে মনে তার
অমরার ছবি আঁকে।

The sky remains infinitely vacant
for earth to build there its heaven
with dreams.

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দঃখ, নাই তার লাজ,
 পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
 বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা,
 সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

Beauty smiles in the confinement of the bud,
 in the heart of a sweet incompleteness.

ফুলগুদলি যেন কথা,
 পাতাগুদলি যেন চারি দিকে তার
 পূঞ্জিত নীরবতা।

Leaves are masses of silence
 round flowers which are their words.

দিবসের অপরাধ সম্বা যদি ক্ষমা করে তবে
 তাহে তার শান্তিলাভ হবে।

Let the evening forgive the mistakes of the day
 and thus win peace for herself.

আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে।
 শক্তি শৃঙ্খল বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে।

Love attracts and unites,
 Power binds with chains.

মহাতরু বহে
 বহুবরষের ভার।
 যেন সে বিরাট
 একমহত তার।

The tree bears its thousand years
 as one large majestic moment.

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নর,
পথের দ্বাংসে আছে মোর দেবালয়।

My offerings are not for the temple
at the end of the road,
but for the wayside shrines
that surprise me at every bend.

অজানা ফুলের গন্ধের মতো
তোমার হাসিটি, প্রিয়,
সরল, মধুর, কী অনির্বচনীয়।

Your smile, love,
like the smell of a strange flower,
seems simple
and yet inexplicable.

মৃতের মতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য,
মরণেরই শব্দ ঘটে ততই বাহুল্য।

Death laughs when we exaggerate
the merit of the dead,
for it swells his store
with more than he can claim.

পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে
তীরের হৃদয় কামা পাঠায় মিছে।

The sigh of the shore follows in vain
the breeze that hastens the ship
across the sea.

সত্য তার সীমা ভালোবাসে
সেখায় সে মেলে আসি সন্দরের পাশে।

Truth loves its limits,
for there she meets the beautiful.

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সৃষ্টির নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঞ্জে শস্যের তরঞ্জে মাঠে মাঠে।
তাহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঞ্জে মনে,
চিন্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে।

The Eternal Dancer dances
in the flower in spring,
in the harvest in autumn,
in thy limits, my child,
in thy thoughts and dreams.

দিন দেয় তার সোনার বীণা
নীরব তারার করে—
চিরদিবসের সুর বাঁধিবার তরে।

Day offers to the silence of stars
his golden lute to be tuned
for the endless light.

ভক্তি ভোরের পাখি
রাতের আঁধার শেষ না হতেই “আলো” বলে ওঠে ডাকি।

Faith is the bird that feels the light
and sings when the dawn is still dark.

সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে ফেলে দেয় তারে
নক্ষত্রের প্রাঙ্গণ মাঝারে।
রাত্রি তারে অন্ধকারে ধৌত করে পুন ভরি দিতে
প্রভাতের নবীন অমৃতে।

The day's cup that I have emptied
I bring to thee, Night,
to be cleaned with thy cool darkness
for a new morning's festival.

দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন
 শক্তি লাভে,
 রাতের মিলনে পরম শান্তি
 মিলিবে তবে।

Let my love feel its strength
 in the service of day,
 its peace in the union of night.

ভোরের ফুল গিয়েছে যারা
 দিনের আলো ভোজে
 অধারে তারা ফিরিয়া আসে
 সন্ধ্যার তারা সেজে।

Stars of night are the memorials for me
 of my day's faded flowers.

যাবার যা সে যাবেই, তারে
 না দিলে খুলে দ্বার
 ক্ষতির সাথে মিলায়ে বাধা
 করিবে একাকার।

Open thy door to that which must go,
 for the loss becomes unseemly when
 obstructed.

সাগরের কানে জোয়ার বেলায়
 ধীরে কয় তটভূমি :
 "তরঙ্গ তব যা বলিতে চায়
 তাই লিখে দাও ভূমি।"
 সাগর ব্যাকুল ফেন-অঙ্করে
 যতবার লেখে লেখা
 চির-চঞ্চল অতৃপ্তিভরে
 উতবার মোছে রেখা।

The shore whispers to the sea:
 "Write to me what thy waves struggles
 to say."
 The sea writes in foam again and again
 and wipes off the lines
 in a boisterous despair.

পুরানো মাঝে যা-কিছু ছিল
চিরকালের ধন
নতুন, তুমি এনেছ তাই
করিয়া আহরণ।

My new love comes bringing to me
the eternal wealth of the old.

মিলন নিশীথে ধরণী ভাবিছে
চাঁদের কেমন ভাষা,
কোনো কথা নাই, শুধু মৃদু চেয়ে হাসা।

The earth gazes at the moon and wonders
that he should have all his music
in his smile.

স্তম্ভ হয়ে কেন্দ্র আছে না দেখা যায় তারে
চক্ৰ যত নৃত্য করি ফিরিছে চারি ধারে।

The centre is still and silent
in the heart of an eternal dance
of circles.

দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল
রাতে দীপ আলো দেয়।
দৌহার তুলনা করা শুধু অন্যায়।

The judge thinks that he is just
when he compares the oil of another's lamp
with the light of his own.

গিরি যে ভূষার নিজের সাথে, তার
ভার তারে চেপে রাখে।
গলারে যা দেয় ঝরনা ধারায়
চরাচর তারে বহে।

Its store of snow is the hill's own burden,
its outpouring of streams
is borne by all the world.

কাছে-থাকার আড়ালখানা
ভেদ করে
তোমার প্রেম দেখিতে যেন
পায় মোরে।

Let your love see me
even through the barrier of nearness.

ওই শব্দ বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি—
“খুলে দাও অঁখি।”

I hear the prayer to the sun
from the myriad buds in the forest :
“Open our eyes.”

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে
কচিপাতা হয়ে এল দলে দলে অশথের গাছে।
বাতাসে মৃদতির দোলে ছুটি পেল ক্ষণিক বাঁচিতে,
নিস্তব্ধ অশ্বের স্বপ্ন দেহ নিল আলোয় নাচিতে।

খেলার খেলালবশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলেনা দিয়ে দিয়েছিন্দু ভরি—
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায়।

দিনের আলোক যবে রাহির অতলে
হয়ে যায় হারা
অধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হয়ে জ্বলে
জ্বল জ্বল তারা।

আলোহীন বাহিরের আলোহীন দরহীন কতি
পূর্ণ করে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি।

অন্তরবির আলো-জ্বলদল
মৃদিল অন্ধকারে।
কুঁড়িয়া উঠুক নবীন ভাষায়
জ্বলন্তবিরহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

জীবন-খাতার অনেক পাতাই এমনিতরো শূন্য থাকে ;
আপন মনের ধ্যান দিয়ে পূর্ণ করে লও না তাকে ।

সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন স্বর্গছবি,
পরশ করুক দৈববাণী সেথায় তোমার কল্পনাকে ।

দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা ।

সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল—
কখন ফুটিবে মোর অত বড়ো ফুল ।

সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও
সন্ধ্যামেঘের তরীতে ।
যাও চলে রবি বেশভূষা খুলে
মরণমহেশ্বরের দেউলে
নীরবে প্রণাম করিতে ।

সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাত্রির তারারে
বন্দে নমস্কারে ।

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাশ্র-সুচিতে
নিমিষে মিলায়, তবু নিখিলের মাধুর্যসুচিতে
স্থান তার চিরস্থির ; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে—নিত্য নষ্ট প্রতি পলে পলে ।

দিবসে বাহারে করিয়াছিলাম হেলা
সেই তো আমার প্রদীপ রাতের বেলা ।

ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে—
বসন্ত আর নাই এ ধরণীতলে ।

বসন্তবায়ু, কুসুমকেলর গেছ কি ছুলি?
নগরের পথে ছুরিয়া বেড়াও উড়িয়ে ধুলি ।

হে অচেনা, তব অঁখিতে আমার
অঁখি করে পায় খুঁজি—
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
অঁধারে লুকানো বদ্বি।

দখিন হতে আনিলে, বায়ু, ফুলের জাগরণ!
দখিন-মুখে ফিরিবে যবে উজ্জাড় হবে বন।

ওগো হংসের পাঁতি,
শীত-পবনের সাথী,
ওড়ার মদিরা পাখার করিছ পান।
দূরের স্বপনে মেশা
নভোনীলিমার নেশা,
বলো, সেই রসে কেমনে ভরিব গান।

শিশির-সিক্ত বন-মর্মর
ব্যাকুল করিল কেন।
ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার
কানে কানে কথা যেন।

দিনান্তের ললাট লেপি'
রক্ত-আলো-চন্দনে
দিবধূরা ঢাকিল অঁখি
শব্দহীন ক্রন্দনে।

নীরব যিনি তাঁহার বাণী নাগিলে মোর বাণীতে
তখন আমি তাঁরেও জানি মোরেও পাই জানিতে।

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক্ মোর কাছে,
ফুল ভূমি নিরো তুলে।

চেয়ে দেখি হোথা তব জানালার
জ্বলন্ত প্রদীপখানি
নিবিড় রাতের নিভৃত বীণায়
কী বাজার কী বা জানি।

পৌরপথের বিরহী তরুণ কানে
বাতাস কেন বা বনের বারতা আনে।

ও যে চেরীফুল তব বন-বিহারিণী,
আমার বকুল বলিছে 'তোমাতে চিনি'।

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু
বস্তুপিণ্ড-বোঝায় বন্ধ বাহু।
মনে পড়ে সেই দীনের রিক্ত ঘরে
বাহু বিমুক্ত আলিঙ্গনের তরে।

গিরির দুরাশা উড়িবারে
ঘরে মরে মেঘের আকারে।

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে
কাছের চেয়ে সে কাছেতে আসে।

উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

চাঁদ কহে, 'শোন'
শুকতারা,
রজনী বখন
হল সারা
যাবার বেলায়
কেন শেষে
দেখা দিতে হয়
এলি হেসে,
আজো অধারের
মাঝে এসে
করিলি আমার
দিশেহারা।'

হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা—
সন্ধ্যা না হতে কদরারে ফেলিয়া
ভেসে যায় আনমনা।

ভেবেছিঁদু গণি গণি জব সব তারা—
 গণিতে গণিতে রাত হয়ে যায় সারা,
 বাঁছিতে বাঁছিতে কিছু না পাইঁদু বেছে।
 আজ বদ্বিলায় যদি না চাহিয়া চাই
 তবেই তো একসাথে সব-কিছু পাই—
 সিন্ধুরে তাকায় দেখো, মরিয়ো না সৈঁচে।

তোমারে, প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে
 জানি তবুও জানি নি।
 সকল কথা বল নি অভিমানিনী।

লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি,
 তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী।

ফুলের লাগি তাকায়ে ছিল শীতে
 ফলের আশা ওরে!
 ফুটিল ফুল ফাগুন-রজনীতে,
 বিফলে গেল ঝরে।

Leave out my name from the gift
 if it be a burden
 but keep my song.

Memory, the priestess,
 kills the present
 and offers its heart to the shrine
 of the dead past.

My mind starts up at some flash on the flow
 of its thoughts
 like a brook at a sudden liquid notes
 of its own
 that is never repeated.

In the mountain, stillness surges up
to explore its own height ;
in the lake movement stands still
to contemplate its own depth.

The departing night's one Kiss
on the closed eyes of morning
glows in the star of dawn.

The lonely light of the sky comes through
the window
and borrows the music of joy and sadness
from my life.

Sorrow that has lost its memory
is like the dumb dark hours
that have no bird songs
but only the cricket's chirp.

**Bigotry tries to keep truth safe in its hand
with a grip that kills it.**

God seeks comrades and claims love,
the Devil seeks slaves and claims obedience.

The soil in return for her service
keeps the tree tied to her
the sky leaves it free.

The immortal, like a jewel,
does not boast of a large surface in years
but of a shining point in a moment.

The child ever dwells in the mystery
of an ageless time
unobscured by the dust of history.

There is a light laughter in the steps of creation
that carries it swiftly across time.

When peace is active sweeping its dirt
it is storm.

The breeze whispers to the lotus:
"What is thy secret?"
"It is myself" says the lotus,
"steal it and I disappear."

The freedom of the wind and the bondage
of the stem
join hands in the dance
of swaying branches.

The jasmine's lisp of love to the sun
is her flowers.

Gods, tired of paradise, envy man.

The tyrant claims freedom to kill freedom
and yet to keep it for himself.

Unimpassioned benevolence
insults the taste of the tongue,
only pitying the stomach's need.

The night's loneliness is maintained
by the silent multitude of stars.

My heart today smiles at its past night of tears
like a wet tree glistening in the sun
after rain is over.

Life's errors cry for the merciful beauty
that can modulate their isolation
into a harmony with the whole.

They expect thanks for the banished nest
because their cage is shapely and secure.

In my love I pay my endless debt to thee
for what thou art.

The bottom of the pond, from its dark,
sends up its lyrics in lilies,
and the sun says, they are good.

Your calumny against the great is impious,
it hurts yourself;
against the small it is mean,
for it hurts the victim.

The muscle that has a doubt of its wisdom
throtles the voice that would cry.

Mother with her ancient trees
points to the sky in endless wonder.

My self's burden is lightened
when I laugh at myself.

The weak can be terrible
because he furiously tries to appear strong.

Realism boasts of its burden of sands
and forgets its loss in the current.

I decorate with futile fancies my idle moments
and see them float away in the air
like derelict clouds with their cargo of colours
drifting from somewhere to no destination.

The Devil's wares are expensive,
God's gifts are without price.

He owns the world who knows its law,
he who feels its truth loves it.

Forests, the clouds of earth,
hold up to the sky their silence,
and clouds from above come down
in resonant showers.

The darkness of night, like pain,
is dumb,
and darkness of dawn, like peace,
is silent.

Pride engraves his frowns in stones,
love hides them in flowers.

The obsequious brush curtails truth
in deference to the canvas which is narrow.

The hill in its longing for the far away sky
wishes to be like the cloud
with its endless urge of seeking.

To justify their own spilling of ink
they spell the day as night.

Profit laughs at goodness
when the good is profitable.

It is easy to make faces at the sun ;
he is exposed by his own light.

History slowly smothers its truth
but hastily struggles to revive it
in the terrible penance of pain.

Beauty knows to say, "Enough",
barbarism clamours for still more.

God loves to see in me not his servant
but himself who serves all.

The morning lamp on the lamp post
mockingly challenges the sun
with the light it has borrowed from him.

I am able to love my God
because he gives me freedom to deny him.

Wealth is the burden of bigness,
welfare the fullness of being.

Between the shores of Me and Thee
there is the loud ocean, my own surging self,
which I long to cross.

The right to possess foolishly boasts
of its right to enjoy.

The rose is a great deal more
than a blushing apology for its thorn.

To carry the burden of the instrument,
count the cost of its material,
and never to know that it is for music,
is the tragedy of life's deafness.

The mountain fir keeps hidden
the memory of its struggle with the storm
murmuring in its rustling boughs
a hymn of peace.

God honoured me with his fight
when I was rebellious ;
he ignored me when I was languid.

The man proud of his sect
thinks that he has the sea
ladled into his private pond.

Life sends up in blades of grass
its silent hymn of praise to the unnamed
Light.

True end is not in the reaching of the limit
but in a completion which is limitless.

Let thy touch thrill my life's strings
and make the music thine and mine.

The fire restrained in the tree fashions flowers.
Released from bonds, the shameless flame
dies in barren ashes.

কানন কুসুম-উপহার দেয় চাঁদে
সাগর আপন শূন্যতা নিয়ে কাঁদে।

The sea smites his own barren breast
because he has no flowers to offer to the moon.

লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে
লেখে যাহা তাও তার কাছে সবি মিছে।

To the blind pen the hand that writes is unreal,
its writing unmeaning.

মন্দ যাহা নিন্দা তার রাখ না বটে বাকি।
ভালো যেটুকু মন্দা তার কেন বা দাও ফাঁকি।

Too ready to blame the bad,
too reluctant to praise the good.

আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ
কাড়িয়া নিতে চাঁদে.
বিনা বাধনে তাই তো চাঁদ
নিজেরে নিজে বাধে।

The sky sets no snare to capture the moon,
it is his own freedom which binds him.

সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা
ভূগের শিশির মাঝে খোঁজে নিজ সীমা।

The light that fills the sky
seeks its limit in a dewdrop on the grass.

প্রভাত আলোরে বিদ্রুপ করে ও কি
 ক্ষুরের ফলার নিষ্ঠুর ঝকঝকি ?

The razor blade is proud of its keenness
 when it sneers at the sun.

All the delights that I have felt
 in life's fruits and flowers
 let me offer to thee
 at the end of the feast
 in a perfect unity of love.

Some have thought deep
 and explored the meaning of thy truth,
 and they are great;
 I have listened to catch the music of thy play
 and I am glad.

The lotus offers its beauty to the heaven,
 the grass its service to the earth.

The sun's kiss mellows the miserliness
 of the green fruit clinging to its stem
 into an utter surrender.

Mistakes live in the neighbourhood of truth
 and therefore delude us.

Day with its glare of curiosity
 makes the stars disappear.
 The cloud laughed at the rainbow
 saying that it was an upstart
 garudy in its emptiness.
 The rainbow calmly answered,
 "I am as inevitable as the sun himself."

Let me not grope in vain in the dark
 but keep my mind still in the faith
 that the day will break
 and truth will appear in the majesty
 of its simplicity.

My mind has its true union with thee,
 O Sky,
 at the window which is mine own,
 and not in the open
 where thou hast thy sole kingdom.

Vacancy in my life's flute
 waits for its music
 like the primal darkness
 before the stars come out.

Emancipation from the bondage of the soil
 is no freedom for the tree.

The tapestry of life's story is woven
 by the joining and breaking of the threads
 of life's ties.

Those thoughts of mine that soar
 free in the air
 come to perch upon my songs.

My soul tonight loses itself
 in the silent heart of a tree
 standing alone among the whispers
 of immensity.

Pearl shells cast up by the sea
on death's barren beach—
a magnificent wastefulness
of creative life.

My life has its play of colours through
thwarted hopes
and gains incomplete
like the reed that has its music through its gaps.

Let not my thanks to thee rob my silence
of its fuller homage.

Life's aspiration comes in the guise of a child.

The fruit that I have gained for ever
is that which has been accepted by love.

In my life's garden my wealth has been
of shadows and lights
that are never gathered and stored.

Light is young, the ancient light,
shadows are of the moment,
they are born old.

My songs are to sing that I have loved thy singing.

Men form constellations with stars that are their
own stories
grown from the fiery mist of their passions,
power and dreams,
eddy into living spheres.

একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব,
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ।

The one without second is emptiness,
the other one makes it true.

প্রভেদে মনো যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

Try to break the difference and it is multiplied.
By acknowledging it unity is gained.

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা,
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা।

The spirit of death is one, the spirit of life
is many.
When God is dead religion becomes one.

অধার একেই দেখে একাকার করে,
আলোক একেই দেখে নানাদিক ধরে।

Darkness smothers the one into uniformity.
Light reveals the one in its multifariousness.

ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ৰ যার রহে
সেই যেন কাটা দেখে, অন্য নহে নহে।

Let him take note of the thorn
who can see the flower as a whole.

ধূলার মারিলে লাগি ঢোকে ঢোকে মূখে।
জল ঢালো, বালাই নিমেষে মাঝে চুকে।

If you kick the dust it troubles the air,
sprinkling of water helps you best.

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।

ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে,
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।

আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে,
তারে যদি দয়া বলো, শোনায় না মিঠে।

হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই,
কিন্তু 'কাজ করা যাক' বলিয়ো না ভাই।

কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক।
কাজের মানুষ কিন্তু ধিক্ তারে ধিক্।

অবকাশ কর্মে খেলে আপনারি সঙ্গ,
সিদ্ধুর স্তম্ভতা খেলে সিদ্ধুর তরঙ্গ।

প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান,
প্রাণ দিয়া লভি তাই যাহা মূল্যবান।

রস যেথা নাই সেথা যত-কিছু খোঁচা,
মরুভূমে জন্মে শূন্য কাটাগাছ বোঁচা।

দর্পণে যাহারে দেখি সেই আমি ছায়া,
তারে লয়ে গর্ব করি অপূর্ব এ মায়ী।

আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যদি হবে
নিজেকে নিজের কাছে নত করো তবে।

প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ
প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ।

দুঃখেই যে বখন প্রেম করে শিরোমণি
তাহারে আনন্দ বলে চিনি তো তখনি।

অমৃত যে সত্য, তার নাহি পরিমাণ,
মৃত্যু তারে নিত্য নিত্য করিছে প্রমাণ।

মহুয়া

শুধায়ো না, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিন্ দান।
পথের ধুলার 'পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি ?
জানি না তোমার নাম,
তোমাতেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি।

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পদ্পধন,
রুদ্ধবাহি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।

যাহা মরণীয় থাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রুঢ়, যাহা মৃঢ় তব
যাহা শ্বল, দম্ব হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পদ্পধন,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সে দিবা দেদীপ্যমান দাহ
উষ্মক্ক করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রথর
বিচ্ছেদেরে করে দিক দঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে জাগো পদ্পধন,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

দঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে-দঃগমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমির তোরণে রজনীর
মন্দিবে সে রথচক্ৰ-নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লসিয়া তুচ্ছ লজ্জা হাস
উচ্ছলবে আশ্বহারা উন্মেষল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো পদ্পধন,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

[শান্তিনিকেতন]
ভাদ্র : ১৩৩৬

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে
পার হয়ে এস চাঁল,
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায়
করণ কুন্দকলি।
উত্তর বায় একতারা তার
তীর নিখাদে দিল ঝংকার,
শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল
গেল তারে দলি দলি।

শীতের রথের ঘর্নি ধূলিতে
গোধূলিরে করে স্জান।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জান।
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি 'কে আসে কী জানি',
বলে মর্মরে 'অতিথির তরে
অর্থ্য সাজায়ে আনো'।

নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জিয়া দিল প্রান্তি ক্রান্তি,
মার্জনা নাহি করে।
স্জান চেতনার আবর্জনায়
পাশ্বে পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তারে।

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নতন করি।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি।
অলস ভোগের স্জানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্জানে কালিমা মূছায়,
চিরপূরাতনে কক্কে উজ্জ্বল
নতন চেতনা ভরি।

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
 নব পরিচয় দিতে।
 নবীন রূপের অপরূপ জাদু
 আনিবে সে ধরণীতে।
 লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
 নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
 নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
 ফিরে জয় করে নিতে।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
 সৃষ্টি তাহার খেলা।
 দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
 চিরাত্যাসের মেলা।
 মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
 পরশপাথর হাতে আছে তার,
 তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
 উদ্ধত অবহেলা।

বলো 'ভয় জয়', বলো 'নাহি ভয়'—
 কালের প্রয়াণপথে
 আসে নির্দয় নবযৌবন
 ভাঙনের মহারথে।
 চিরন্তনের চঞ্চলতায়
 কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
 থর থর করি উঠুক পুরান
 প্রান্তরে পর্বতে।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়,
 'করো স্বরা, করো স্বরা।'
 সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
 রক্তপ্রদীপে ভরা।
 দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
 হোক প্রগল্ভ রক্তিমরাগে,
 মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে
 স্বধূপের মনোহরা।'

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
 কঠোর ষড়নভরে,
 ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
 অঙ্গসংগীতস্বরে।

নগ্ন শিমুলে কার ভান্ডার
রক্ত দুকুল দিল উপহার,
শ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

দোঁখতে দোঁখতে কী হতে কী হল
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনারে
মাধুরীর মঞ্জরী।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথার
জাগে শ্যামাসুন্দরী।

[শান্তিনিকেতন]
দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪

বসন্ত

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব মাঠে: মাঠে:
বন্দীরা পেল ছাড়া।
দিগন্ত হতে শূন্য তব সুর
মাটি ভেদ করি উঠে অশ্রুর,
কারাগারে দিল নাড়া।
জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে যে নবীনেরা জানে,
দলে দলে আসে আমার মদকুল
বনে বনে দেয় সাড়া।

কিশলয়দল হল চঞ্চল,
উতল প্রাণের কলকোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে।
মুক্তির গানে কাঁপে চারি ধার,
কানা দানবের মানা-দেওয়া শ্বার
আজ গেল সব টুটে।
মরুযাত্রার পাথের-অমৃতে
পাঠ ভরিয়া আসে চারি ভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জনগীতে
জাগে মোঁমাছিপাড়।

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
 দূর্গ কোথায়, অস্ত বা কই,
 কেন সুকুমার বেশ।
 মৃত্যুদমন শৌর্য আপন
 কী মায়ামন্তে করিলে গোপন,
 তুণ তব নিঃশেষ।
 বর্ম তোমার পল্লবদলে,
 আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে
 জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
 সকল তেজের বাড়।

জড় দৈত্যের সাথে অনিবার
 চির সংগ্রাম-ঘোষণা তোমার
 লিখিছ ধূলির পটে,
 মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে
 যুদ্ধের বাণী বিস্তারি চলে
 সিংহুর তটে তটে।
 হে অজেয়, তব রণভূমি-পরে
 সুন্দর তার উৎসব করে,
 দক্ষিণ বায়ু মর্মর স্বরে
 বাজায় কাড়া-নাকাড়া।

[শান্তিনিকেতন]
 দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪

বরষা

পবন দিগন্তের দূয়ার নাড়ে,
 চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
 যেন কোন্ দূর্দম
 বিপুল বিহঙ্গম
 গগনে মূহুর্মূহু পক্ষ ঝাড়ে।

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়াল আসি,
 বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।
 ধরার স্বরংবরে
 উদার আড়ম্বরে
 আসে বর, অম্বরে ছড়ারে হাসি।

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরীয়া
 দিল তার সগুণ অঞ্জলিয়া।
 মধুকর-গুঞ্জিত
 কিশলয়-পুঞ্জিত
 উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

কিংশুককুঙ্কুমে বসিল সেজে,
 ধরণীর কিঞ্চিকণী উঠিল বেজে।
 ইঞ্জিতে সংগীতে
 নৃত্যের ভঞ্জিতে
 নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

[শান্তিনিকেতন]
 দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪

মাধবী

বসন্তের জয়রবে
 দিগন্ত কাঁপিল যবে
 মাধবী করিল তার সজ্জা।
 মৃকুলের বন্ধ টুটে
 বাহিরে আসিল ছুটে.
 ছুটিল সকল তার লজ্জা।
 অজানা পান্থের লাগি
 নিশি নিশি ছিল জাগি
 দিনে দিনে ভরেছিল অর্ঘ্য।
 কাননের এক ভিতে
 নিভৃত পরানটিতে
 রেখেছিল মাধুরীর স্বর্গ।
 ফাল্গুন পবনরথে
 যখন বনের পথে
 জাগালো মর্মর কলছন্দ,
 মাধবী সহসা তার
 সর্পি দিল উপহার.
 রূপ তার, মধু তার, গন্ধ।

দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪

বিজয়ী

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
 কে কোথা ছিন্দু দৌছে,
 সহসা প্রেম আসিলে আজ
 কী মহা সমারোহে।

নীরবে রয় অলস মন,
 আঁধারময় ভবনকোণ,
 ভাঙিলে দ্বার কোন্‌ সে ক্ষণ
 অপরাঙ্কিত ওহে।
 সহসা প্রেম আসিলে আজ
 বিপদল বিদ্রোহে।

কানন-পর ছায়া বদলায়
 ঘনায় ঘনঘটা।
 গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
 ধূজটির জটা।
 যে যেথা রয় ছাড়িল পথ,
 ছুটালে ওই বিজয়রথ,
 আঁখি তোমার তিড়িংবং
 ঘন ঘূমের মোহে।
 সহসা প্রেম আসিলে আজ
 বেদনা-দান ব'হে।

বৈশাখ ১৩৩৩

প্রত্যাশা

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ-শাখায় ফাগুন মাসে
 কী উজ্জ্বাসে
 ক্রান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
 ক্রান্তকাজন শান্ত বিজন সম্মুখাবেলা
 প্রতাহ সেই ফুল শিরীষ প্রশ্ন শূন্য আমায় দেখি,
 'এসেছে কি।'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
 কী উজ্জ্বাসে
 নাচের মাতন লাগল শিরীষ-ডালে,
 স্বর্গপদের কোন্‌ নৃপদের তালে।
 প্রতাহ সেই চঞ্চল প্রাণ শূন্যিয়েছিল, 'শূনাও দেখি,
 আসে নি কি।'

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
 কী বিশ্বাসে
 ডালগদলি তার রইবে প্রবণ পেতে
 অলখ জনের চরণশব্দে মেতে।
 প্রতাহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় দীর্ঘশ্বাসে,
 'সে কি আসে।'

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
 কী আশ্বাসে,
 হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
 নিমেষ গণন হয় না কি মোর সারা।
 প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
 'সে কি এস।'

[চৌরঙ্গি। কলিকাতা]
 ২০ শ্রাবণ ১৩৩৫

অর্ঘ্য

সূর্যমুখীর বর্ণে বসন
 লই রাঙারে,
 অরুণ আলোর ঝংকার মোর
 লাগল গারে।
 অণ্ডলে মোর কদমফুলের ভাষা
 বন্ধে জড়ায় আসন্ন কোন্ আশা,
 কৃষ্ণকলির হেমাজলির
 চঞ্চলতা
 কণ্ঠলিকার স্বর্ণলিখায়
 মিলায় কথা।

আজ যেন পায় নয়ন আপন
 নতুন জাগা।
 আজ আসে দিন প্রথম দেখার
 দোলন-জাগা।
 এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
 যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন,
 সেখান আমার ডাক দিলে যার
 নাই জানা কে,
 সাগরপারের পান্থপাথির
 ডানার ডাকে।

চলব ডালার আলোক-মালায়
 প্রদীপ জেদলে,
 ঝিল্লি-ঝনন অশোকতলায়
 চমক মেলে।

আমার প্রকাশ নতুন বচন ধরে,
 আপনাকে আজ নতুন রচন করে,
 ফাগুন-বনের গদ্যস্ত ধনের
 আভাস-ভরা,
 রক্তদীপন প্রাণের আভায়
 রঙিন-করা।

চক্ষে আমার জ্বলবে আদিম
 অগ্নিশিখা,
 প্রথম ধরায় সেই যে পরায়
 আলোর টিকা।
 নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
 করবে ঘোষণা প্রেমের উন্মোচননী,
 প্রাণ-দেবতার মন্দির স্মার
 যাক রে খুলে,
 অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
 অরূপ ফুলে।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫

মৈত

আমি যেন গোখলিগগন
 ধোয়ানে মগন,
 স্তম্ভ হয়ে ধরা-পানে চাই:
 কোথা কিছুর নাই,
 শূন্য শূন্য বিরাত প্রান্তরভূমি।
 তারি প্রান্তে নিরালা পিয়ালতরু তুমি
 যশে মোর বাহুর প্রসারিয়া।
 স্তম্ভ হিয়া
 শ্যামল স্পর্শনে আশ্রহারা,
 বিস্মরিত আপনার সূর্যচন্দ্রতারা।

তোমার মঞ্জরী
 কড় ফোটে, কড় পড়ে ঝরি;
 তোমার পল্লবদল
 কড় স্তম্ভ, কড় বা চঞ্চল।
 একেলার খেলা তব
 আমার একেলা যশে নিত্যনব।

কিশলয়গঙ্গা
 —কম্পমান করুণ অঙ্গুলি—
 চায় সন্ধ্যারস্তুরাগ,
 আলোর সোহাগ;
 চায় নক্ষত্রের কথা—
 চায় বৃষ্টি মোর নিঃসীমতা।

২০ শ্রাবণ ১৩৩৫

সন্ধান

আমার নয়ন তব নয়নের নির্বিড় ছায়ায়
 মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
 সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ার
 পথ হারাইল ও-যে।
 আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবে—
 নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে;
 অজানার মাঝে অবদ্বৈত মতো ফেরে
 অশ্রুধারায় ম'জে।

আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো, তার আভাষণ
 ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে?
 দুয়ারে একেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
 সে তোমারে কিছুর বলে?
 তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
 বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
 বাঁশি কী আশার ভাষা দেয় আকাশেতে
 সে কি কেহ নাহি বোঝে।

শ্রাবণ ১৩৩৫

উপহার

মণিমালা হাতে নিয়ে
 স্মারে গিয়ে
 এসেছিঁন্দু ফিরে
 নতশিরে।
 ক্ষণতরে বৃষ্টি
 বাহিরে ফিরেছিঁ খুঁজি
 —হায় রে বৃথাই—
 বাহিরে যা নাই।
 ভীর্ণ মন চেয়েছিল ভুলারে জ্বিনিতে,
 হীরা দিয়ে হৃদয় কিনিতে।

এই পল মোর,
 সমস্ত জীবন-ভোর
 দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
 স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি;
 কণ্ঠহারে
 গেঁথে দিব তারে
 যে দল্লভ রাগি মম
 বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাতসম।
 পায় দিব তার
 যে এক-মুহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার।

[কলিকাতা]
 ২৩ গ্রাবণ ১৩৩৫

শুভযোগ

যে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
 পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
 উৎসুক ধরণী,
 সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধনা ধনা ধনি
 মন্দিরা উঠিল কূলে কূলে:
 নদীর গদগদ বাণী অশ্রুবেগে উঠে ফুলে ফুলে
 কোটালের বানে,
 কী চেয়েছে কী বলেছে আপনি না জানে,
 সে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
 তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে।

যে বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
 সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে;
 পলাণের কুঁড়ি
 একরায়ে বর্ণবাহি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি;
 শিমূল পাগল হয়ে মাতে,
 অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,
 পাশ করি পুরা
 আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা।
 উজ্জ্বলিত সে-এক নিমেষে
 যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে।

চৌরঙ্গি। কলিকাতা
 ২৪ গ্রাবণ ১৩৩৫

মায়ী

চিন্তাকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সংগোপনে আসন লব
চূপে চূপে।
সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের
ছায়াতলে,
যেথায় শূন্য কীণ জোনাকির
আলো জ্বলে।

সেথায় নিরেে যাব আমার
দীপশিখা,
গাধব আলো-আঁধার দিগে
মরীচিকা।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে
পরিরে দেব চূলে;
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন্ বিদেশের
কী বিস্মৃতির।

পরশ মম লাগবে তোমার
কেশে বেণে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিরেে গান
উঠবে ভেসে।
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার,
বসন্তবাহার,
পূরবী কি ভীষ্মপলাশি
রক্তে দোলে—
রাগরাগিণী দংশে সূত্রে
যার-যে গলে।

হাওয়ার ছায়ার আলোর গানে
আমরা দৌছে
আপন মনে রচয় ছুঁবন
ভাবের মোহে।

রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
 মায়ার চিত্রলেখ—
 বস্তু হতে সেই মায়ী তো
 সত্যতর,
 তুমি আমার আপনি র'চে
 আপন কর।

[কলিকাতা]
 ২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ঝরিনী

ঝর্ণা, তোমার স্ফটিকজলের
 স্বচ্ছ ধারা,
 তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
 সূর্যতারা।
 তারি একধারে আমার ছায়ারে
 আনি মাঝে মাঝে, দুলারো তাহারে,
 তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলারো
 কলধনি—
 দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার
 চিরন্তনী।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
 মিলিত ছবি,
 তাই নিরে আজি পরানে আমার
 মেতেছে কবি।
 পদে পদে তব আলোর ঝলকে
 ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
 মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
 নির্ঝরিনী।
 তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
 নিজেই চিনি।

[বাঙ্গালোর]
 আষাঢ় ১৩৩৫

শুকতারা

সুন্দরী তুমি শুকতারা
 সুন্দর শৈলশিখরান্তে,
 শরীরী যবে হবে সারা
 দর্শন দিয়ো দিক্‌প্রান্তে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
অধারের বন্ধের 'পরে
আধেক আলোকরেখা রম্ব।

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশয়,
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

মন্দ চরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সদর থেমে আসে বারে বারে,
ক্রান্তিতে আমি অবশাগ।

সুন্দরী ওগো শূকতারা,
রাগি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

নিশীথের তল হতে ভুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
অধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো খন্য।

যেখানে সন্নিহিত হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র,
অর্পিন্দু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

Ballabrooie
বাংলার
২৩ জুন ১৯২৮

প্রকাশ

আজ্ঞাদন হতে
ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে।
অজ্ঞাত ছিলাম এতদিন
পরিচয়হীন—
সেই অগোচরদুঃখভর
বহিরা চলিছি পথে; শব্দ আমি অংশ জনতার।

উদ্ধার করিয়া আনো,
 আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।
 যেথা আমি একা
 সেথায় নামুক তব দেখা।
 সে মহানির্জন,
 যে গহনে অন্তর্মামী পাতেন আসন,
 সেইখানে আনো আলো
 দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
 যাক লজ্জা ভয়,
 আমার সমস্ত হোক তব দৃষ্টিময়।

ছায়া আমি সব-কাছে, অক্ষুণ্ণ আমি-বে,
 তাই আমি নিজে
 তাহাদের মাঝে
 নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে।
 তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
 তারা মোর কর্ম জানে, নাহি জানে মর্মগত প্রাণ।
 সত্য যদি হই তোমা-কাছে
 তবে মোর মূল্য বাচে—
 তোমার মাঝারে
 বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
 প্রেম তব ঘোষিবে তখন
 অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
 তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
 পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীকার।
 বহিতেছি অজ্ঞাতের বন্ধন সদাই,
 মুক্তি চাই
 তোমার জানার মাঝে
 সত্য তব যেথায় বিরাজে।

[কলিকাতা]
 ২৪ গ্রাবণ ১৩৩৫

বরণডালা

আজি এ নিরালা কুণ্ডে, আমার
 অঙ্গমাঞ্চে
 বরণের ডালা সেজেছে আলোক-
 আলার সাজে।

নব বসন্তে লতার লতার
 পাতার ঝুলে
 বাণীহিম্মোল উঠে প্রভাতের
 স্বর্ণকালে,
 আমার দেহের বাণীতে সে দোল
 উঠিছে দলে,
 এ বরণ-গান নাহি পেলে মান
 মরিব লাজে,
 ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
 ছন্দ বাজে।

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া
 বাহির হতে,
 ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
 আপন স্রোতে।
 মোর তনুময় উছলে হৃদয়
 বাধনহারা,
 অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
 হোক-না সারা।
 ঘন যামিনীর আধারে যেমন
 ঝলিছে তারা,
 দেহ ঘোরি মম প্রাণের চমক
 তেমনি রাজে।
 সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
 সকল কাজে।

২৫ প্রবন্ধ ১০০৫

মৃষ্টি

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
 পুরানো মোর স্বপনডোর
 ছিঁড়িল কুটিকুটি।
 রুদ্ধ মন গগনে গেল খুলি,
 বিজুলি হানি দৈববাণী
 বকে উঠে দুলি।
 ঘাসের ছোঁয়া তৃণশয়নছায়ে
 মাটির ঘন মর্মকথা বদলায়ে দিল গারে;
 আমের বোল, কাউরের দোল,
 ঢেউয়ের লুটোপুটি
 ঝিলি সবলে কী কোলাহলে
 বকে এল জুটি।

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
 গৃহবিহারী ভাবনা যত
 নিমেষে নিল লুটি।
 কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
 ডাকিল লীলাভরে
 দুরার-খোলা পুরানো খেলাঘরে,
 যেখানে বসে সবার কাছাকাছি
 অজানা ভাবে অব্ধ গান
 একদা গাহিয়াছি।
 প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার
 খ্যাপামি এল ছুটি,
 লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ
 সকলি গেল টুটি।

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
 শূকতারাকে যেমনি ডাকে
 প্রাণে সে উঠে ফুটি।
 অরুণরাঙা চেতনা জাগে চিতে—
 ঝুমকো-লতা জানায় কথা
 রঙিন রাগিণীতে।
 মনের 'পরে খেলায় বায়ুবেগে
 কত-যে মায়া রঙের ছায়া
 খেলালে-পাওয়া মেঘে;
 বদলায় বদকে ম্যাগনোলিয়া
 কোতুহলী মৃতি,
 অতি বিপুল ব্যাকুলতায়
 নিখিলে জেগে উঠি।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

উদ্ঘাত

অজানা জীবন বাহিন্দ,
 রহিন্দ আপন মনে,
 গোপন করিতে চাহিন্দ—
 ধরা দিন্দ দুনয়নে।
 কী বলিতে পাছে কী বলি
 তাই দূরে ছিন্দ কেবলি,
 তুমি কেন এসে সহসা
 দেখে গেলে আঁখিকোণে
 কী আছে আমার মনে।

গভীর তিমিরগহনে
 আছিন্দু নীরব বিরহে,
 হাসির তড়িৎ দহনে
 লুকানো সে আর কি রহে।
 দিন কেটেছিল বিজনে
 ধ্যানের ছবি সৃজনে,
 আনমনে যেই গেরোছি
 শব্দে গেছ সেইধনে
 কী আছে আমার মনে।

প্রবেশিলে মোর নিভুতে,
 দেখে নিলে মোরে কী ভাবে,
 যে দীপ জেদলোছি নিশীথে
 সে দীপ কি তুমি নিভাবে।
 ছিল ভরি মোর থালিকা,
 ছিঁড়িব কি সেই মালিকা।
 শরম দিবে কি তাহারে
 অকথিত নিবেদনে
 যা আছে আমার মনে?

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
 এতদিনে তারে দেখা হল।
 তখন বর্ষগণেশে
 ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
 উন্মীলিত গদলমোরের থোলো।
 বনের মন্দিরমাঝে
 তরঙ্গ তম্বুরা বাজে,
 অনন্তের উঠে স্তবগান,
 চক্ষে জল বহে যায়,
 নয় হল বন্দনায়
 আমার বিস্মিত মনপ্রাণ।

দেবতার বর
 কত কল্প কত জন্মান্তর
 অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
 লিখেছে আকাশ-পাতে
 এ দেখার আশ্বাস-অঙ্কর।

অস্তিত্বের পারে পারে
এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি
আমার উন্মত্তা অঁখি
এ দেখার গঢ় গান গাহে।

বোলো আজি তারে,
'চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে
বারংবার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর শ্বারে।
কত রাতে চৈত্রমাসে,
প্রচ্ছন্ন পদুমের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জ্বালি
আমার গদগদনখানি,
কাদিয়েছে সেতারের তার।'

বোলো তারে আজ,
'অন্তরে পেরেছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বন্ধের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ লুপ্ত অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।'

২৭ প্রাবল ১৩৩৫

নিবেদন

অজানা খনির নতুন মণির
গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীন নবীনা বীণার
বেঁথেছি তার।

যেমন নতুন বনের দৃকুল,
যেমন নতুন আমের মৃকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের

নতুন স্মার—

তেমনি আমার নবীন রাগের
নব যৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া
বীণার তার।

যে বাণী আমার কখনো কায়েও
হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নতুন
নৃত্যকলা।

আজি অকারণ মৃথর বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের মৃচিল
মনের ভার—

যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বাস উঠে নতুন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অচেনা

রে অচেনা, মোর মৃষ্টি ছাড়ারি কী করে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে।

কোন অন্ধকণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাগি যবে সবে হয় ভোর,
মৃথ দেখিলাম তোর।
চক্ৰ-পরে চক্ৰ রাগি শূন্যালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আশ্চর্যমূর্তির কোণে।

তোর সাথে চেনা

সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।

করে নেব জয়
সংসারকুণ্ডিত তোর বাণী;
দৃষ্ট বলে সব টানি
জন্মা হতে, জন্মা হতে, বিধাতৃ হতে
নির্দয় আলোতে।

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
 মৃদুহৃদে চিনিবি আপনারে;
 ছিন্ন হবে ডোর,
 তোমার মৃদুহৃদে তবে মৃদু হবে মোর।

হে অচেনা,
 দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না;
 মহা আকস্মিক
 বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক,
 তোমার চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
 দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।

[বাঙ্গালোর]
 আষাঢ় ১৩৩৫

অপরাজিত

ফিরাবে তুমি মৃদুখ,
 ভেবেছ মনে আমারে দিবে দৃখ?
 আমি কি করি ভয়।
 জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করিব আমি ভয়।
 বিষ্ম-ভাঙা ঘোবনের ভাষা,
 অসীম তার আশা,
 বিপুল তার বল,
 তোমার অর্ধি-বিজুলিঘাতে হবে না নিষ্ফল।

বিমৃদু মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে,
 অরণ্যেরে ঘেন সে নাহি চিনে,
 ধরে না কুণ্ডি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল,
 মাটির তলে ভূষিত তরুন্মূল;
 ঝরিয়া পড়ে পাতা,
 বনস্পতি তবুও ভুলি মাথা
 নিঠরু তপে মন্দ্র জপে নীরব অনিমেঘে
 দহনজরী সন্ন্যাসীর বেশে।
 দিনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে রাত,
 শ্রবণ রহে পাতি।
 কঠিনতর হবে সে পল দারুণ উপবাসে
 এমনকালে হঠাৎ কবে আসে
 উদার অক্লপণ
 আষাঢ় মাসে সজল শ্রুতখন;
 পূর্ণিগরি-আড়াল হতে বাড়ায় তার পাণি,
 করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গদমরি উঠে বাণী,
 নমিয়া পড়ে নিষিড় মেঘরাশি,
 অশ্রুবারিধন্য নামে ধরণী যায় ভাসি।

ফিরালে মোরে মৃদু !
 এ শব্দ মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক ।
 তোমার প্রেমে আমার অধিকার
 অতীত যুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার ।
 অচল গিরিশিখর-পরে সাগর করে দাবি,
 ঝর্ণনা পড়ে নাবি;
 সদৃশ দিকরেখার পানে চায়,
 অকূল অজানায়
 শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে,
 নহে গো, নহে নহে;
 এড়ানে যাবে বলি
 কত-না আঁকাবাঁকার পথে চলে সে ছলছলি:
 বিপুলতর হয় সে ধারা, গভীরতর সূরে,
 যতই আসে দূরে;
 উদারহাসি সাগর সহে অবস্থা অবহেলা—
 একদা শেষে পলাতকার খেলা
 বক্ষে তার মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা
 পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা ।

২৮ প্রাবণ ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
 গড়িব না ধরণীতে,
 মৃদু ললিত অশ্রুগলিত গীতে ।
 পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
 বাসররাতি রচিব না মোরা প্রিয়ে:
 ভাগ্যের পারে দুর্বলপ্রাণে
 ভিক্ষা না বেন যাচি ।
 কিছ্র নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
 তুমি আছ, আমি আছি ।

উড়াব উর্ধ্ব প্রেমের নিশান
 দুর্গম পথমাঝে
 দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে ।
 যুদ্ধ দিনের দুঃখ পাই তো পাখ,
 চাই না শান্তি, সাম্রাজ্য নাহি চাই ।
 পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
 ছিন্ন পালের কাছি,
 মৃত্যুর মৃদু দাঁড়ানে জানিব
 তুমি আছ, আমি আছি ।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
 দৌহারে দেখেছি দৌহে—
 মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
 ছুটি নি মোহন-মরীচিকা পিছে পিছে,
 ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
 এই গোরবে চলিব এ ভবে
 যতদিন দৌহে বাঁচি।
 এ বাণী প্রেমসী, হোক মহীশসী
 তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
 আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পম্পী।
 রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
 পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
 ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
 দিগঙ্গনার নৃত্য,
 হঠাৎ-আলোর বলকানি লেগে
 বলমল করে চিস্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
 বনবাঁধিকার কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
 হঠাৎ কখন সম্মুখবেলার
 নামহারা ফুল গন্ধ এলার,
 প্রভাতবেলার হেলাভরে করে
 অরুণকিরণে তুচ্ছ
 উদ্ভত স্বত শাখার শিখরে
 রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
 নাই রে ঘরের লালনললিত স্বপ্ন।
 পথপালে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
 বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
 ডানা-মেলে-দেওয়া মর্দুপ্রিয়ের
 কুঞ্জে দুজনে তৃপ্ত।
 আমরা চকিত অভাবনীর
 কচিৎ কিরণে দীপ্ত।

দুত

ছিন্দু আমি বিষাদে মগনা
 অন্যমনা
 তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে।
 হেনকালে নিজের কুটিরদ্বারে
 অকস্মাৎ
 কে করিল করাঘাত,
 কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি দ্বার খোলো।

মনে হল
 ওই যেন তোমার স্বর শুনি,
 ওই যেন দক্ষিণ বায়ু দূরে ফেলি মদির ফাল্গুনী
 দিগন্তে আসিল পূর্বদ্বারে,
 পাঠাল নিখোঁষ তার বজ্রধ্বনিমন্দিত মল্লারে।
 কেঁপেছিল বক্ষতল
 বিলম্ব করি নি তবু অর্ধপল।

মৃদুভাষে নুহিন্দু অশ্রুবারি,
 বিরহিণী নারী,
 ছাড়িন্দু ধৈর্য তব তোমারি সম্মানে,
 ছুটে গেল দ্বার পানে।
 শূন্যালেম, তুমি দুত কার।
 সে কহিল, আমি তো সবার।
 যে ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
 ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
 আনিলাম অর্ঘ্যখালি,
 দীপ দিনু জ্বালি।
 দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
 যে মালা পরায়েছিন্দু তোমারেই বিদায়ের কালে।

। কবিতা ।
 ৮ ভাদ্র ১৩৩৫

পরিচয়

তখন বর্ষাঘন অপরাহ্নমেঘে
 শব্দা ছিল জেগে;
 ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভৎসনায়
 বায়ু হেঁকে যায়;
 শুন্যে যেন মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
 দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচকু কটাক্ষজটায়।

সে দুর্যোগে এনেছিল তোমার বৈকালী,
 কদম্বের ডালি।
 বাদলের বিষম ছায়াতে
 গীতহারা প্রাতে
 নৈরাশাজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
 রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে।

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
 পদবন হাওয়ায়,
 কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
 প্লাবনের ঘাতে,
 তখনো নিভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে,
 বন্ত ছিল ক্রান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধূলায়।
 সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
 দিনে উপহার।

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখী,
 একটি কেতকী।
 তখনো হয় নি দীপ জ্বালা,
 ছিলাম নিরालা।
 সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
 জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত করে ঝুঞ্জে ঝুঞ্জে।

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া,
 গোপনে হাসিয়া।
 শূধালেম আমি কৌতুহলী
 'কী এনেছ' বলি।
 পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিম্বপাত,
 গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত।

ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
 কাঁটার সংগীতে।
 চমকিনু কী তীব্র হরষে
 পরুষ পরশে।
 সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মৃগের নিবেদন,
 অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
 নিষেধে নিরুদ্ধ যে সম্মান
 তাই তব দান।

দায়মোচন

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল—
 এ কথা বলিতে চাও বোলো।
 এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল;
 তার পরে যদি তুমি ভোলো
 মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
 আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
 যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
 আবার আসিতে হয় এসো।
 সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
 তবু ভালোবাসো যদি বেসো।

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
 পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।
 অশ্রুদ্রবনে বৃথা শিরে কর হানি
 যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
 আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নাহি,
 ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী;
 তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
 আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
 আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
 রবে তব বিস্মৃতিতলে।

দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
 যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে
 হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
 নয়ন সিন্ধু আঁখিনীরে।
 উপেক্ষা করো যদি পাব তবে বল,
 করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,
 সত্য যা দিয়েছিলে থাক মোর তাই,
 দিবে লাজ তার বেশি দিলে।
 দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
 দুঃখের মূল্য না মিলে।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
 বরমাল্যের অপমানে।
 যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
 চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।

প্রেমেরে বাড়িতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।

৭ ভাদ্র ১৩৩৫

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।
নত করি' মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজের নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজের সন্ধানের রথ
দুর্ধর্য অশ্বেরে বাঁধি দড় বঙ্গাপাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।

যাব না বাসরকক্ষে বধুবেশে বাজায় কিংকণী—
আমারে প্রেমের বীর্ষ্য করো অশঙ্কনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভূলিতে
মোর দস্ত কঠিনতা।
বিনয় দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুদ্র সিদ্ধতীরে;
তরঙ্গ গর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপবে।
মাথার গদগদ খুলি কব তারে, মর্ত্য বা ত্রিদিবে
একমাত্র ভূমিই আমার।

সমুদ্র-পাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠবে হুংকার
পশ্চিম পবনে হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পম্পা অনুমানি।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রক্ত বীণা।
উত্তরীয়া জীবনের সর্বোত্তম মহুতের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্ব্যাহিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিস্তামাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দের নিস্তব্ধ সাগরে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৫

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিস্তা মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
সেবাক্ষে করি না আহ্বান—
শূনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্ষ বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অব্যাহিত,
চাটুল্য জনতার যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

দীর্ঘ এ দূর্গম পথ মধ্যাহ্নতাপিত,
অনিদ্রায় রজনী ব্যাপিত।
শূঙ্করাকা বালুকার ঘর্নিপাক ঝড়ে
পথিক ধূলায় শূন্যে পড়ে।
নাহি চাহি মধুর শূন্যতা,
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিঃশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে উদ্বোধিতা বিপুল বিশ্বাস।

ধূসর প্রদোষে আজি অস্তপথ জুড়ে
নিশাচরী মিথ্যা চলে উড়ে।
আলো-অধারের পাকে রচে এ কী জায়া,
হুম্ব যারা ধরে দীর্ঘ জায়া।

যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক বিধির ধিকারে,
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ,
ধূলিতে খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছ্বস প্রসাদ।

কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্কে-ক্লিষ্ট জ্ঞানি,
কলহেরে শোষণ ব'লে জানি,
ভাবি, দুর্যোগের সিদ্ধ তরিব হেলায়
বণ্ণনার ভঙ্গুর ভেলায়।
বাহিরে মূর্খিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি,
অশান্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি জানি ছলনাকে,
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে।

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুণ্ডলিকা চিরসত্য নয়।
চিন্তের তুলক উধেঁর মহত্ত্বের পানে
উদাস্ত তোমার আশ্রদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিতা যতই করুক সিংহনাদ,
হে সত্যী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

১ ভাদ্র ১৩৩৫

লগ্ন

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আঘাড়ে,
যেদিন গৈরিক বস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা?
প্রাঙ্গণের চারি ধার ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যেদিন সে বসে প্রসাধনে
ছায়ার আসন মেলি;
পরি লয় নতন সবুজ-রঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন।
দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি নিমন্ত্রণ যায় হেঁকে হেঁকে।
যেদিন প্রণয়ী বক্ষতলে
মিলনের পায়খানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে—
নহে নহে, সেদিন জো নহে।

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে,
শুধায় সে মল্লিকারে কাণ্ডন-রঞ্গনে
তুমি কবে এলে।
নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধূলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্যগৌরবে।

কলরবে

অজস্র মিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের রঙ্গে ধ্বনির সংগম;
অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতি-সংঘ আনে পাখায় পাখায়
বসন্তের বর্ণমালা চিত্রল অঙ্করে;
ধরণী ঘোবনগর্ভভরে
আকাশেরে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে;
কবির বীণার তন্ত্র যে বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে।
আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধের উচ্চহাসে
ধৈর্য নাই রহে—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হল ধনে।
সঘন শীর্ণত তট লভিল সঞ্জিনী
তরঙ্গিনী—
তপস্বিনী সে যে, তার গম্ভীর প্রবাহে—
সমুদ্রবন্দনাগান গাহে।
মুছিয়াছে নীলাম্বর বাষ্পসিক্ত চোখ,
বন্ধমুগ্ধ নির্মল আলোক।
বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধোয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অপ্রগল্ভা ধরিণী-সে প্রণামে লুপ্তিষ্ঠত,
পূজারিণী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।
দিগন্তের পথ বাহি
শুন্যে চাহি
রিঙবিস্তৃত শুভ্র মেঘ সম্যাসী উদাসী

গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিল প্রবাসী।
 সেই স্নিগ্ধস্বপ্নে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
 পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
 মৃদুস্তর শান্তির মাঝখানে
 তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।

৩ ভাদ্র ১৩৩৫

সাগরিকা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচূলে
 বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
 শিথিল পীতবাস
 মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
 নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
 চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
 মকরচূড় মৃকুটখানি পরি ললাট-'পরে
 ধনুকবাণ ধরি দাখন করে,
 দাঁড়ানু রাজবেশী—
 কহিনু, “আনি এসেছি পরদেশী।”

চমকি গ্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে,
 শূন্যালে, “কেন এলে।”
 কহিনু আমি, “রেখো না ভয় মনে,
 পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।”
 চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
 তুলিনু যুগ্মী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপাফুল।
 দূজনে মিলি সাজারে ডালি বসিনু একাসনে,
 নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
 কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি
 ধূজুটি মৃথের পানে পার্বতীর হাসি।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে,
 একেলা ছিলে ঘরে।
 কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
 কাকন-দুটি ছিল দুখানি হাতে।
 চলিতে পথে বাজারে দিনু বাঁশি,
 “অতিথি আমি”, কহিনু স্বেরে আসি।
 তরাস-ভরে চকিত-করে প্রদীপখানি জেদলে,
 চাহিলে মৃখে, কহিলে, “কেন এলে।”
 কহিনু আমি, “রেখো না ভয় মনে,
 তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।”

চাহিলে হাসিমুখে,
 আধোচাঁদের কনকমালা দোলান, তব বদকে।
 মকরচূড় মৃকুটখানি কবরী তব ঘিরে
 পরায়ে দিন, শিরে।
 জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
 তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।
 মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
 আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
 পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
 আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে।

ফুরাল দিন কখন নাহি জানি,
 সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
 সহসা বায়, বাহিল প্রতিকূলে,
 প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।
 লবণজলে ভরি
 আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতনভরা তরী।
 আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ান, স্বেপ্নে এসে
 ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
 দেখিনু আমি নটরাজের দেউলস্বার খুলি
 তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।
 হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
 তরল কলরবে
 আলোর নাচ নাচার চাঁদ সাগরজলে ববে,
 নীরব তব নম্র নত মুখে
 আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বদকে।
 দেখিনু চুপে চুপে
 আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
 অঙ্গে তব হিম্মোলিয়া দোলে
 ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে।

মিনতি মম শূন হে সুন্দরী,
 আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
 এবার মোর মকরচূড় মৃকুট নাহি মাখে,
 ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে;
 এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
 সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
 এনেছি শূন্য বীণা,
 দেখো তো চেরে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

বরণ

পদরাগে বলেছে
 একদিন নিরেছিলা বেছে
 স্বয়ংবর সভাগনে দময়ন্তী সতী
 নল-নরপতি,
 ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
 অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
 দেবমূর্তি চিনেছে সেদিন,
 তারা যে ফেলে না ছায়া, তারা অমলিন।
 সেদিন স্বর্গের ঐশ্বর্য গেল টুটি,
 ইন্দ্রলোক করিল প্রকুটি।

তাই শূনে কত দিন একা বসে বসে
 ভেবেছিন্দু বালিকাবয়সে,
 আমি হব স্বয়ংবরা বিশ্বসভাতলে—
 দেবতারই গলে
 দিব মালা তপস্বিনী,
 মানবের মাঝখানে একদিন লব তারে চিনি।
 তারি লাগি সর্ব দেহে মনে
 দিনে দিনে বরমালা গাঁথিব যতনে।

কঠিন সে পণ,
 ভাবি নি কেমনে তারে করিব সাধন।
 মানুস-ষে দেশে দেশে
 কত ফেরে দেবতার ছদ্মবেশে;
 ললাটে তিলক কারো লেখা,
 দেখিতে দেখিতে ওঠে কালো হস্তে তার স্বর্ণরেখা।
 কারো বা কটিতে বাঁধা শরশূন্য তুণ,
 কেহ করে বস্ত্রধারি, নাহি তাহে বস্ত্রের আগুন।
 বাতায়নে বসে থাকি,
 কতদিন কী দেখিয়া আশ্বাসে চমকি উঠে আঁখি;
 চোরে চোরে স্বেধা লাগে শেষে
 বৃষ্টি হতে হতে দেখি লিঙ্গা পড়ে এসে।

একদিন রৌদ্রের খেলায়
 মধ্যাহ্নের জনতার মধুর খেলায়
 রাজপথ-পাশে
 দাঁড়াইন্দু—দেখিলাম যারা যার আসে
 তাহাদের কারা
 সম্মুখে ফেলিয়া চলে দীর্ঘতর ছায়া।

শূন্যলয় স্পর্ধাতীক্ষণ কণ্ঠস্বর
 ছিন্ন করে দিতে চাহে দেবতার অখণ্ড অম্বর।
 উজ্জ্বল সজ্জায়
 দীন অঙ্গ সমাচ্ছন্ন ধনের লজ্জায়।
 ছুটে চলে অম্বরখ,
 তার চেয়ে আড়ম্বরে সঙ্গো ওড়ে ধূলির পর্বত।

যখন সেদিন সেই উদ্বাসন লব্ধ ঠেলাঠেলি
 নানাশব্দে উঠিছে উদ্বেলি
 তুমি দেখি পথপ্রান্তে একা হাসমুখে
 নিঃশব্দ কৌতুকে
 চেয়ে আছ—হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
 মন ছিল দূরে সবা হতে।
 তুমি যেন মহাকাল-সমুদ্রের তটে
 নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
 দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
 শূন্যেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী।
 বহে গেল জনতার ঢেউ—
 কে-যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ।
 একা আমি দেখেছি তোমারে—
 তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
 মালা হাতে গেন্দু ধয়ে,
 হাসিলে আমার পানে চেয়ে।
 মোর স্বয়ংবরে
 সেদিন মর্ত্যের মৃৎ প্রকৃতি অবজ্ঞার ভরে।

১০ ডায় ১০০৫

পথবর্তী

দূর মন্দিরে সিংহদ্বিকিনারে
 পথে চলিয়াছ তুমি।
 আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
 মৃদুকা তার চুমি।
 হে তীর্থগামী, তব সাধনার
 অংশ কিছু বা রহিল আমার,
 পথপাশে আমি তব যাত্রার
 রহিব সাক্ষীরূপে।
 তোমার পূজার মোর কিছু যার
 ফুলের গন্ধধূপে।

তব আহ্বানে বরণ করিয়া
 নিয়েছি দূর্গমেরে।
 ক্লান্তি কিছু বা নিলাম হরিয়া
 মোর অঞ্চল-ঘেরে।
 যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর
 তার সাথে কিছু মিলাই মধুর,
 যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর
 আমি তারি মাঝে থেকে
 দিন পথ-পরে শ্যাম অন্ধরে
 জানার চিহ্ন একে।

মোর পরিচয়ে তোমার পথের
 কিছু রহে পরিচয়।
 তব রচনায় তব ভক্তের
 কিছু বাণী মিশে রয়।
 তোমার মধ্যদিবসের তাপে
 আমার স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে,
 মোর পল্লব সে মন্ত্র জাপে
 গভীর যা তব মনে,
 মোর ফলভার মিলান, তোমার
 সাধনফলের সনে।

বেলা চলে যাবে, একদা যখন
 ফুরাবে যাত্রা তব,
 শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
 হেথাই দাঁড়ায়ে রব।
 এই পথখানি রবে মোর প্রিয়,
 এই হবে মোর চিরবরণীয়,
 তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়,
 না মানিব পরাভব।
 তব উদ্দেশে অর্পিবে হেসে
 যা-কিছু আমার সব।

১১ ভাদ্র ১৩৩৫

মুদ্ররূপ

তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
 পূর্ণরূপে দেখি না তোমার,
 মোর রক্তরঙ্গের মন্ত কলরবে
 বাণী তব মিশে ভেসে যায়।

তোমার পাখারে আমি বন্ধ করি বন্ধি,
সে বন্ধনে তোমারেই পাই না তো খুঁজি,
তুমি তো ছায়ায় নহ, প্রভাতবিলাসী,
আলোতেই তোমার প্রকাশ,
তোমার ডানায় ছন্দে তব উচ্চ হাসি
যাক চলে ভেদিয়া আকাশ।

জানি, যদি লুপ্ত মনে কৃপণতা করি,
ঐশ্বর্যেও দৈন্য না ঘুচায়,
ব্যর্থ ভাণ্ডারের তবে রহিব প্রহরী,
বণ্টনা করিব আপনায়।
আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপছায়া
মুগ্ধ চেতনার 'পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ডুলাব কি আমার জীবন।
গাঁথিব কি বদ্বদদের হার।
তোমারে আড়াল করে তোমার স্বপন
মিটাবে কি আকাঙ্ক্ষা আমার।

বিরাজে মানবশৌর্ষে সূর্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমিরজয়ী প্রভু,
অজ্ঞেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শত্ৰু তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্রধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম-অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা,
জানি যেন সে তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারো জীবনজয়লিখা।

আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো;
মোর দুঃখযজ্ঞের শিখায়
জ্বালিবে মশাল তব, আতঙ্কদুঃসহ
রাত্রিরে দহি সে যেন যায়।
তোমারে করিন্দু দান প্রাণের পাথের,
যাত্রা তব ধন্য হোক, যাহা-কিছু হৈয়
ধূলিতলে হোক ধূলি, শ্বিধা যাক মরি,
চরিতার্থ হোক ব্যর্থতাও,
তোমার বিজয়মালা হতে ছিন্ন করি
আমারে একটি পদ্প দাও।

স্পর্ধা

জলধপ্রাণ দূর্বলের স্পর্ধা আমি কড়ু সহিব না।
 লোলদপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
 ক্রেদঘন চাটুবাঁকো, বাপ্পে বিজ্জড়িত দৃষ্টি তার,
 কলুষকুণ্ঠিত অঙ্গো লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
 আবেশে মন্ধর কণ্ঠে গদগদ সে প্রার্থনা জানায়,
 আলোকবর্ণিত তার অন্তরের কানায় কানায়
 দৃষ্ট ফেন উঠে বদ্বদীয়া—ফেটে যায়, দেয় খুলি
 রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্লিমিগদলি
 কল্পনারিকার তার, শিথিল চিন্তার তলে তলে
 আকুলিতে থাকে কিলিবিলা।—যেন প্রাণপণ বলে
 মন তারে করে কষাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
 নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে
 অসহ্য সে অপমানে। নারী সে যে মহেন্দ্রের দান,
 এসেছে ধরিহীতলে পুরুষেরে সর্পিপতে সম্মান।

জোড়াসাঁকো

১৪ ভাদ্র ১৩৩৫

রাখীপূর্ণিমা

কাহারে পরাব রাখী ঘোবনের রাখীপূর্ণিমায়,
 হে মোর ভাগ্যের দেব। লগ্ন যেন বহে নাহি যায়।
 মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর, ঘন বৃষ্টি-আচ্ছাদনে
 অস্পষ্ট আলোর মন্ড আকাশ নিবিষ্ট হুয়ে শোনে,
 বৃষ্টিতে পারে না ভালো। আমি ভাবিতেছি একা বসে
 আমার বাঞ্ছিত কবে বাহিরিল প্রচ্ছন্ন প্রদোষে
 চিহ্নহীন পথে। এসেছিল ম্বারের সম্মুখে মোর
 ক্ষণতরে। তখনো রজনী ময় হয় নাই ভোর,
 হৃদয় অক্ষুণ্ট ছিল অর্ধ জাগরণে। ডাকে নি সে
 নাম ধরে, দুরারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে
 সমুদ্রতরঙ্গরবে তাহার অম্বের হ্রোষধ্বনি।
 হে বীর অপরিচিত, শেষ হল আমার রজনী,
 জানা তো হল না কোন্ দঃসাধের সাধন লাগিয়া
 অন্ধ তব উঠিল ঝঞ্ঝনি। আমি রহিন্দু জাগিয়া।

১৫ ভাদ্র ১৩৩৫

আহ্বান

কোথা আছ? ডাকি আমি। শোনো শোনো, আছে প্রয়োজন
 একান্ত আমারে তব। আমি নহি তোমার বন্ধন;
 পথের সম্বল মোর প্রাণে। দূর্গমে চলেছ তুমি
 নীরস নিষ্ঠুর পথে—উপবাস-হিংস্র সেই তুমি

আতিথ্যবিহীন; উন্মত্ত নিষেধদণ্ড রাগিণিন
উদ্যত করিয়া আছে উর্ধ্বপানে। আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শূন্যতার পূর্ণশক্তি। আপনার নিঃশব্দ অস্তরে,
যথা স্নান রক্তবৃক্ষ শৈলবৃক্ষ ভেদি অহরহ
দুর্দাম নির্ঝরে ঢালে দুর্নিবার সেবার আগ্রহ,
শূন্য না রসবিন্দু প্রথর নির্দয় সূর্যতেজে,
নীরস প্রস্তরতলে দৃঢ়বলে রেখে দেয় সে যে
অক্ষয় সম্পদরাশি। সহাস্য উজ্জ্বল গতি তার
দুর্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্ষের আধার।

১৬ ভাদ্র ১৩৩৫

বাপী

একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে
তৃষ্ণার জল তুমি দিয়েছিলে তুলে।
আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি,
শূন্যালেম, কাছে বসিতে দিবে কি।
সেদিন তোমার ঘরে-ফিরিবার বেলা
বহে গেল বৃষ্টি, কাজে হয়ে গেল হেলা।

অদূরে হোথায় ভাঙা দেউলের ধারে
পূর্ব যুগের পূজাহীন দেবতারে
প্রভাত অরুণ প্রতিদিন খোঁজে,
শূন্য বেদীর অর্থ না বোঝে,
দিন শেষ হলে সন্ধ্যাতারার আলো
যে পূজারী নাই তারে বলে 'দীপ জ্বালো'।

একদিন বৃষ্টি দূরে কোন্ রাজধানী
রচনা করেছে দীর্ঘ এ পথখানি।
আজি তার নাম নাই ইতিহাসে,
জীর্ণ হয়েছে বাগদকার গ্রামে,
প্রান্তরশেষে শীর্ণ বনের কোলে
জনপদবধু জল নিয়ে যার চলে।

লুপ্তকালের শূন্য সাগরধারে
বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তূপাকারে,
অতি পুরাতন কাহিনী যেথায়
রুদ্ধ কণ্ঠে শূন্যে তাকায়,
ছায়ানো ডাঘার নিশার স্বপ্নছায়ে
হেরিন্দু তোমার, আসিন্দু ক্লান্ত পারে।

দুটি তরু তারা মরুর প্রাণের কথা,
 লুকানো কী রসে বাঁচে তার শ্যামলতা।
 সেদিন তাহারি মর্ম-সনে
 কী ব্যথা মিশান, জানে দুইজনে;
 মাথার উপরে উড়ে গেল কোন্ পাখি
 হতাশ পাখার হাহাকার রেখা আঁকি।

তপ্ত বাজারে ভৎসিয়া মৃদুহৃদ
 তাপিত বাতাস চিংকারি উঠে হৃদ:
 ধূলির ঘর্নি, যেন বোঁকে বোঁকে
 শাপ-লাগা প্রেত নাচে থেকে থেকে:
 রুঢ় রুঢ় রক্তের মাঝখানে
 দুইটি প্রহর ভরেছিল প্রাণে গানে।

দিন শেষ হল, চলে যেতে হল একা.
 বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা।
 শূনে হেসেছিলে হাসিখানি স্মান,
 তরুণ হৃদয়ে যেন তুমি জান
 অসীমের বৃকে অনাদি বিষাদখানি
 আছে সারাখন মৃখে আবরণ টানি।

তার পরে কত দিন চলে গেল মিছে
 একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নীচে।
 বহু পরে যবে ফিরিলাম প্রিয়ে,
 এ পথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
 আছে সেই কূপ, আছে সে যুগলতরু!
 তুমি নাই, আছে ভূষিত স্মৃতির মরু।

এ কূপের তলে মোর যন্ধের ধন
 একটি দিনের দুলভ সেইধন
 চিরকাল ভরি' রহিল লুকানো.
 ওগো অগোচরা জান নাহি জান;
 আর কোনো দিনে অন্য যুগের প্রিয়া
 তারে আর কারে দিবে কি উন্মারিয়া।

১৬ ভাদ্র ১৩৩৫

মহুয়া

বিরক্ত আমার মন কিংবদন্তের এত গর্ব দেখি।
 নাহি খুঁচিবে কি
 অশোকের অতিথ্যতি, বকুলের মৃদু সন্মান।
 ক্লান্ত কি হবে না কবি-গান

মালতীর মালিকার
 অভিধানা রুচি' বারংবার?
 রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোরা, লক্ষ্য ধরনি তার,
 উচ্চগিরে তব্দ রাজকুলধনিতার
 গৌরব রাখিস উর্ধ্ব ধরে।
 আমি তো দেখেছি তোরে
 বনস্পতিগোষ্ঠী-মাঝে অরণ্যসভার
 অকুণ্ঠিত মৰ্যাদায়
 আছিস দাঁড়িয়ে;
 শাখা যত আকাশে বাড়িয়ে

শাল তাল সন্তপর্ণ অশ্বখের সাথে
 প্রথম প্রভাতে
 সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিস গম্ভীর বন্দন।
 অপ্রসন্ন আকাশের স্রুভঙ্গে বধন
 অরণ্য উদ্ভিদ করি তোলে,
 সেই কালবৈশাখীর রুদ্ধ কলরোল
 শাখাব্যাহ্নে ঘিরে
 আশ্বাস করিস দান শঙ্কিত বিহঙ্গ অতিথিরে।

অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট দিনে,
 বিশীর্ণ বিপিনে,
 বন্যভূক্ষুর দল ফেরে রিক্ত পথে,
 দর্ভিক্ষের ভিক্ষাজলি ভরে তারা তোরা সদাশ্রিতে।

বহুদীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত
 তপস্বীর মতো
 বিলাসের চাঞ্চল্যবিহীন,
 সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্যদিন
 অন্তরে অধীরা
 ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে জোগাস মদিরা
 পদ্পপদটে;
 বনে বনে মোঁঝাছিন্ন চঞ্চলিয়া উঠে।
 তোরা সুরাপাত হতে বনানারী
 সম্বল সংগ্রহ করে পূর্ণিমার নৃত্যমন্তভারই।
 রে অটল, রে কঠিন,
 কেমনে গোপনে রাতিদিন
 তরল যৌবনবাহি মজ্জায় রাখিয়াছিলি জ্বরে।
 কানে কানে কহি তোরে
 বধুরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

দীনা

তোমাতে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি,
 প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
 পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।
 মোর স্পর্শে বাজে
 যে তন্ত্রটি তোমার বীণায়,
 তাহারি পঞ্চম স্বরে তোমাতে কি নিঃশেষে চিনায়
 তোমার বসন্ত রাগে,
 নিদ্রাহীন রজনীর পরজে বেহাগে।
 সে তন্ত্র সোনার বটে, বিভাসে ললিতে
 যে কথা সে চেয়েছে বলিতে
 তাইতে হয়েছে পূর্ণ এ আমার জীবন-অঞ্জলি।
 তবু সত্য করে বলি,
 ব্যথা লাগে বুকে
 যখন সহসা আসি তোমার সম্মুখে
 নিভৃত তোমার ঘরে
 স্বপ্নভাঙা প্রথম প্রহরে,
 —যখন জাগে নি পাখি, রক্তিম আকাশে
 আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্যোদয়-আশে
 রয়েছে স্তম্ভিত,
 পিঙ্গল আভার দীপ্ত জটা বিলম্বিত
 অরুণ সম্যাসী
 করজোড়ে আছে স্থির আলোকপ্রত্যাশী—
 তখন তোমার মুখ চেয়ে দেখিয়াছি ভয়ে ভয়ে,
 জেনেছি হৃদয়ে
 তুমিই অচেনা।
 কোনো দিন ফুরাবে না
 পরিচয়, তোমাতে বুঝিব আমি করি না সে আশা,
 কথায় যা বল নাই, আমি যে জানি না তার ভাষা।
 ভয় হয় পাছে
 যে সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
 সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা,
 দেখ দূর হতে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা।

তখন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর,
 হোয়ো না কঠোর,
 তুমি যদি মৃদু মনে ভুলে থাক, তবু
 গভীর দীনতা মোর গোপন করি নি আমি কভু।
 মোর স্বারে যবে এসে অন্যমনা
 সে কি মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা।

নহে নহে, হে রাজন, তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি;
যদি তাই পূর্ণ হয়, তবে আমি নহি তো অভাগী।

১৯ ভাদ্র ১৩৩৫

সৃষ্টিরহস্য

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব,
নিখিলের অস্তিত্বগৌরব।
তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পশ্চের মতন।
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলাল।
যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মূখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।
সেই সৃষ্টিতপস্যার সার্থক আনন্দ মোর চিতে
স্পর্শ করে, যবে তব মূখে মেলি' অঁখি
সম্মুখে তোমার বসে থাকি।

১, ৩৫ ১৩৩৫

নাম্নী

শামলী

সে ঘেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে;
তরঙ্গের ভাঙ্গি নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে;
নুয়েপড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেঁরে
ছোটো করে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি-পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।

গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবার,
 দিন কাটে সহজ সেবার।
 স্নান সাঙ্গ করি এলোচুলে
 অপরাধিতার ফুলে
 প্রভাতে নীরব নিবেদনে
 স্তব করে একমনে।
 মধ্যদিনে বাতায়নতলে
 চেয়ে দেখে নিম্নে দিঘিজলে
 শৈবালের ঘনস্তর,
 পতঙ্গের খেলা তারি 'পর।
 আবছায়া কল্পনায়
 ভাষাহীন ভাবনায়
 মন তার ভরে
 মধ্যাহ্নের অব্যক্ত মর্মরে।
 সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
 নদীপথে যায়
 ঘট-কাঁখে
 বেণুবীথিকার বাকি বাকি
 ধীর পায়ে চলি—
 —নাম কী শামলী।

কাজলী

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
 স্তম্ভিত মেঘের মতো,
 তৃষ্ণাহরা
 আশাঢ়ের আশ্বাদান-প্রত্যাশায় ভরা।
 সে যেন গো তমালের ছায়াখানি,
 অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী।
 যে পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে
 ক্রিষ্ট ক্রান্তিভারে,
 সেই অজানার লাগি গৃহকোণে আনত-নয়ন
 বদনিছে শয়ন।
 সে যেন গো কাকচক্র স্বচ্ছ দিঘিজল
 অচঞ্চল,
 কানায় কানায় ভরা,
 শীতল অতল মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা।
 কালো চক্ৰপঙ্কজের কাছে
 ধর্মকিয়া আছে
 স্তম্ভ ছায়া পাতি'
 হাসির খেলার সাথী

সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অঙ্গুবায়ি;
যেন তাহা দেবতারই
করুণা-অঞ্জলি—
—নাম কি কাজলী।

হে'য়ালি

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
নতুন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে,
কেবলই আলো-অঁধারে
সংশয় বাধায়;
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।
সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া।
অনুকূল চাহনির তলে
কী বিদ্যুৎ ঝলে।
কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে।
তার পরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরিয়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ;
আপনার অভিমানে করে খানখান।
কেন তার চিত্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা।
আপনি সে পারে না বৃষ্টিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে।
গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে
আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ,
অন্যরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্লেদ;
মুহূর্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি—
—নাম কি হে'য়ালি।

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজ্ঞান বাতাসনে
সুদূর গগনে
কী দেখে সে ধানের খেতের পরপারে—
নিরাজা নদীর পথে দিগন্তে সবুজ আঁধারে

যেখানে কাঁঠাল জাম নারিকেল বেত
 প্রসারিয়া চলেছে সংকেত
 অজানা গ্রামের,
 সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু অখ্যাত নামের।
 অপরাধে ছাদে বসি,
 এলোচুল বদকে পড়ে বসি,
 গ্রন্থ নিয়ে হাতে
 উদাস হয়েছে মন সে-যে কোন্ কবিকল্পনাতে।
 সুদূরের বেদনায়
 অতীতের অশ্রুবাত্প হৃদয়ে ঘনায়।
 বীরের কাহিনী
 না-দেখা জনের লাগি তারে যেন করে বিরহিণী।
 পূর্ণিমানিশীথে
 স্রোতে-ভাসা একা তরী যাবে সফরগুণ সারিগাঁতে
 ছায়াঘন তীরে তীরে সন্নিপতিতে সুদূরের ছবি আঁকে,
 উৎসুক আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে
 নিষ্পত্ত প্রহরে,
 অহৈতুক বারিবিন্দু ঝরে
 আঁখিকোণে:
 যুগান্তরপার হতে কোন্ পুরাণের কথা শোনে।
 ইচ্ছা করে সেই রাতে
 লিপিকথানি লেখে ভূজপাতে
 লেখনীতে ভরি লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালি—
 —নাম কি খেয়ালী।

কাকলি

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ—
 নিত্য বহমান
 ভাষার কল্পোলে
 জাগাইয়া তোলে
 চারি ধারে
 প্রত্যাহের জড়তারে:
 সংগীতে তরঙ্গ তুলি,
 হাসিতে ফেনিল তার ছোটো দিনগুলি।
 আঁখি তার কথা কয়, বাহুভাঙ্গা কত কথা বলে,
 চরণ যখন চলে
 কথা করে যায়—
 যে কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায়,
 যে কথাটি ঢেউ তোলে
 আশ্বিনে ধানের খেতে—প্রাপ্ত হতে প্রাপ্তে যায় চলে,

যে কথাটি নিশীথতিমিরে
 তারায় তারায় কাঁপে অধীর মিমিরে,
 যে কথাটি মহদুয়ার বনে
 মধুপগন্ধজনে
 সারাবেলা উঠিছে চঞ্চলি—
 —নাম কি কাকলি।

পিয়ালী

চাহনি তাহার, সব কোলাহল হলে সারা
 সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।
 মৌনখানি সদৃশধর মিনতিরে
 লতায় লতায় যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিরে,
 নির্বাক চাহিয়া থাকে নাহি পায় ভেবে
 কেমন করিয়া কী-ষে দেবে।
 দুয়ার-বাহিরে
 আসে ধীরে,
 কণেক নীরব থেকে চলে যায় ফিরে।
 নাও যদি কয় কথা
 মনে যেন ভরি দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা।
 পায়ের চলায়
 কিছ্র যেন দান করে ধূলির তলায়।
 তারে কিছ্র করিলে জিজ্ঞাসা,
 কিছ্র বলে, কিছ্র তবু বাকি থাকে ভাষা।
 নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
 অণ্ডলে আড়াল করি সে যেন কাহার
 আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি—
 —নাম কি পিয়ালী।

দিয়ালী

জনতার মাঝে
 দেখিতে পাই নে তারে, থাকে তুচ্ছ সাজে।
 ললাটে ঘোমটা টানি
 দিবসে লুকায় রাখে নব্বনের বাণী।
 রজনীর অন্ধকার
 ভুলে দেয় আবরণ তার।
 রাজ-রানী-বেশে
 অনায়াস-গৌরবের সিংহাসনে বসে ক্ষুদ্র হেসে।

বন্ধে হার ঝলমলে,
 সীমন্তে অলকে জ্বলে
 মাণিক্যের সীমি।
 কী যেন বিস্মৃতি
 সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছন্দসীমা,
 মনে পড়ে আপন মহিমা।
 ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
 বরমালা তার
 আপন সহস্র দীপ জ্বালি—
 —নাম কি দিয়ালী।

নাগরী

ব্যঙ্গ-সুনিপুণা,
 শ্লেষবাণ-সম্ভান-দারুণা।
 অনুগ্রহ-বর্ষণের মাঝে
 বিদূষ-বিদ্যুৎঘাত অকস্মাত মর্মে এসে বাজে।
 সে যেন তুফান
 যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে থানথান
 অটুহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে;
 প্রশ্নের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
 রেখেছে সে কণ্টক-অশ্রুর বদনে বদনে;
 অদৃশ্য আগুনে
 কুঞ্জ তার বোড়িয়াছে;
 যারা আসে কাছে
 সব থেকে তারা দূরে রয়;
 মোহমন্ত্রে যে হৃদয়
 করে জয়
 তারি 'পরে অবজ্ঞায় দারুণ নিদর্শন।
 আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই,
 যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
 জানি সেই উদাসীন
 একদিন
 জিনিয়াছে ওরে,
 জ্বালাময়ী তারি পারে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।

বিদূষী নিরেছে বিদ্যা শব্দ চিন্তে নয়,
 আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অঙ্গময়;
 বদ্বি তার ললাটিকা,
 চকুর তারার বদ্বি জ্বলে দীপলিখা;

বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহংকার,
 বিদ্যারে করেছে অলংকার।
 প্রসাধন-সাধনে চতুরা,
 জানে সে ঢালিতে সূরা
 ভূষণভিঙ্গিতে,
 অলঙ্কার আরক্ত ইঙ্গিতে।
 জাদুকরী বচনে চলনে;
 গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে;
 অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
 নিন্দা তার করি দেয় দূর;
 জ্যোৎস্নার মতন
 গোপনেও নহে সে গোপন।
 আঁধার-আলোরই কোলে রয়েছে জাগরি—
 —নাম কি নাগরী।

সাগরী

বাহিরে সে দূরন্ত আবেগে
 উচ্ছ্বলিয়া উঠে জেগে—
 উচ্ছ্বাসাতরঙ্গ সে হানে
 সূর্যচন্দ্র-পানে।
 পাঠায় অস্থির চোখ—
 আলোকের উত্তরে আলোক।
 কভু অন্ধকারপুঞ্জ দেখা দেয় ঝঞ্জার প্রকুটি,
 ক্ষণে ক্ষণে
 আন্দোলনে
 প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি।
 গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর,
 কোথা তল, কোথা তীর;
 অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি—
 —নাম কি সাগরী।

জয়ন্তী

যেন তার চক্ষুমাঝে
 উদ্যত বিরাজে
 মহেশ্বরের তপোবনে নন্দীর তর্জনী।
 ইন্দ্রের অশনি
 ঘোনে তার ঢাকা;
 প্রাণ তার অরুণের পাখা

মেলিল দিনের বক্ষে তীর অতৃপ্তিতে
 দঃসহ দীপ্তিতে।
 সাধক দাঁড়ায় তার কাছে—
 সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে;
 দঃসাধাসাধন-তরে
 পথ খুঁজে মরে।
 তুচ্ছতারে দাহে তার অবজ্ঞাদহন;
 এনেছে সে করিয়া বহন
 ইন্দ্রাণীর গাথা মালা; দিবে কঠে তার
 কামরূকে যে দিলেছে টংকার,
 কাপটোরে হানিয়াছে, সত্যে যার ঋণী বসুমতী—
 —নাম কি জয়তী।

ঝামরী

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
 মর্ত্যের প্রদীপে নিল মস্তিকার কারা।
 নগরে জনতামর,
 সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গীহীন তরু,
 তারে ঢেকে আছে নিতি
 অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি।
 সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
 শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়।
 মন পাখা মেলিবারে চায়
 চারি দিকে ঠেকে যায়,
 জানে না কিসের বাধা তার;
 অদৃষ্টের মায়াদর্গম্বার
 কোন্ রাজপুত্র এসে
 মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে।
 আকাশে আলোতে
 নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হতে,
 পথ রুদ্ধ চারি ধারে,
 মৃধ ফুটে বলিতে না পারে
 অলঙ্কা কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃত।
 সে যেন অশোকবনে সীতা,
 চারি দিকে যারা আছে কেহ তার নহেকো স্বকীয়;
 কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়
 বিচ্ছেদের অতল সমুদ্রপারে।
 আঁখি তুলে তাই বারে বারে
 চোরে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে।

কোন্ দেব নিত্যনির্বাসনে
 পাঠাল তাহারে।
 স্বর্গের বীণার তারে
 সংগীতে কি করেছিল ভুল।
 মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
 নৃত্যকালে খসে গেলে অন্যমনে দর্শেছিল কভু?
 আজো তবু
 মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
 অধরে রয়েছে তার স্মান
 —সন্ধ্যার গোলাপসম—
 মাঝখানে ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনূপম।
 অদৃশ্য যে অশ্রুধারা
 আবিষ্ট করেছে তার চক্ষুতারা
 তাহা দিবা বেদনার করুণানির্ঝরী—
 —নাম কি কামরী।

মুরতি

যে শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে অঁকা,
 যে গুণী প্রজাপতির পাখা
 যুগ যুগ ধ্যান করি একদা কী খনে
 রচিতল অপূর্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে—
 এই নারী
 রচনা তাহারি।
 এ শুদ্ধ কালের খেলা,
 এর দেহ কী আলসো বিধাতা একেলা
 রচিলেন সন্ধ্যাকালে
 আপনার অর্থহীন ক্ষণিক খেলালে—
 যে লগনে
 কর্মহীন ক্লান্তঅঙ্গে
 মেঘের মহিমা-মায়ী মূহুর্তেই মূগ্ধ করি আঁখি
 অন্ধরাগ্নে বিনা স্ফোভে যায় মুখ ঢাকি।
 শরতে নদীর জলে যে ভিগ্নমা,
 বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে রাগরঙিমা
 বৌবনের দাপে
 অবজ্ঞা-কটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,
 শ্রাবণের বন্যাতলে হারা
 ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে নৃত্যের ধারা,
 মাঘশেষে অশ্বখের কচি পাতাগুলি
 যে চাপল্যে উঠে দুলি,

হেমন্তের প্রভাতবাতাসে
 শিশিরে যে ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে,
 প্রথম আষাঢ়দিনে গুরু গুরু হবে
 ময়ূরের পদ্পদপদ উল্লসিয়া উঠে যে গৌরবে
 তাই দিয়ে রচিত সুন্দরী;
 লতা যেন নারী হয়ে দিল চন্দ্র ভরি।

রঙিন বদ্বদ সে কি, ইন্দ্রধনু বদ্বি,
 অন্তর না পাই খুঁজি—
 সকলি বাহির,
 চিত্ত অগভীর।
 কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
 কারো না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে।
 মৃগ্য প্রাণ-উপহার
 অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার।
 ভুবনে যেখানে যত নয়নের আনন্দলহরী
 তাই দেখা দিতে এল নারীমূর্তি ধরি।
 সরস্বতী রচিলেন মন তার কোন্ অবসরে
 রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে:
 অমৃতে মাটিতে মেশা সৃজনের এ কোন্ সুরতি—
 —নাম কি মুরতি।

মালিনী

হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
 সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে।
 প্রসন্নতা তার অন্তহীন
 রাত্রিদিন
 গভীর কী উৎস হতে
 উজ্জলিছে আলো-ঝলি কণা-ঝলি স্রোতে।
 মর্ত্যের স্ফূর্তি তারে
 পারে নি তো স্পর্শ করিবারে।
 প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সূর্যমুখী
 রক্তারুণ উল্লাসে কৌতুকী।
 মধ্যাহ্নের স্থলপদ্ম অমলিন রাগে
 প্রফুল্ল সে সূর্যের সোহাগে,
 সায়াহ্নের জুই সে-বে,
 গন্ধে যার প্রদোষের শূন্যতার বাঁশি ওঠে বেজে।

মৈত্রী-সুধাময় চোখে
মাধুরী মিথ্যায় দেয় সম্বাদীপালোকে।
রজনীগন্ধা সে রাতে, দেয় পরকাশি
আনন্দহিল্লোল রাশি রাশি;
সঙ্গহীন আধারের নৈরাশ্যকালিনী—
—নাম কি মালিনী।

করুণী

তরুলতা
যে ভাষায় কয় কথা
সে ভাষা সে জানে—
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়া বলি মানে।
পুষ্পপল্লবের 'পরে তার আঁখি
অদৃশ্য প্রাণের হৃৎ দিয়ে যায় রাখি।
স্নেহ তার আকাশের আলোর মতন
কাননের অন্তর-বেদন
দূর করিবার লাগি
নিভা আছে জাগি।
শিশু হতে শিশুতর
গাছগর্লি বোবা প্রাণে ভর-ভর;
বাতাসে বৃষ্টিতে
চঞ্চলিয়া জাগে তারা অর্থহীন গীতে,
ধরণীর যে গভীরে চিররসধারা
সেইখানে তারা
কাঙাল প্রসারি ধরে তৃষিত অঞ্জলি,
বিশ্বের করুণারশি শাখায় শাখায় উঠে ফলি—
সে তরুলতারই মতো স্নিগ্ধ প্রাণ তার;
শ্যামল উদার
সেবা যন্ন সরল শান্তিতে
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারি ভিতে;
তাহার মমতা
সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা;
পশু পাখি তার আপনার;
জীববৎসলার
স্নেহ ঝরে শিশু-'পরে, বনে ঘন নত মেঘভার
ঢালে ঝরিধার।
তরুণ প্রাণের 'পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী—
—নাম কি করুণী।

প্রতিমা

চতুর্দশী এল নেমে
 পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল ধেমে।
 অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
 আপন বলিতে তারে মর্ত্যভূমি শঙ্কা নাহি বাসে।
 এ ধরার নির্বাসনে
 কুণ্ঠার গদগ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইকো তার মনে,
 সংসার-জনতামাঝে
 আপনাতে আপনি বিরাজে।
 দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা-ভরা,
 সকল উদ্বেগভরহরা।
 রোগ যদি আসে রুখে
 সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।
 দুর্যোগ মেঘের মতো
 নাচে দিয়ে বহে যায় কত
 বারে বারে,
 প্রভা তার মূছিতে না পারে।
 তবু তার মহিমায় কিছ্র আছে বাকি,
 সেইখানে রাখে ঢাকি
 অশ্রুজল
 বিবাদ-হীপাতে ছোঁয়া ঈষৎ বিহবল।
 কণামাত্র সে ক্ষীণতা
 নাহি কহে কথা,
 কেহ না দেখিতে পায়
 নিত্য যারা ঘিরে আছে তায়।
 অমরার অসীমতা মাটিতে নিম্নেছে সীমা ...
 - নাম কি প্রতিমা।

নন্দিনী

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি
 অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি।
 বর্ষা-অন্তে ইন্দ্রধনু
 মর্ত্যে নিল তনু।
 দিবধরু মায়াবী অঙ্গাদলি
 চঞ্চল চিন্তায় তার বদলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুলি।
 সরল তাহার হাসি, সুকুমার মৃতি
 যেন শূদ্র কমলকলিকা;
 অর্ধি দৃষ্টি
 যেন কালো আলোকের সচকিত লিখা।

অবসাদবন্ধভাঙা মৃদুতির সে ছবি,
 সে আনিয়া দেয় চিত্তে
 কলনৃত্যে
 দস্তুর-প্রসূতর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দ-জাহ্নবী।
 বীণার তন্তের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী—
 —নাম কি নন্দিনী।

উষসী

ভোরের আগের যে প্রহরে
 স্তম্ভ অন্ধকার-পরে
 সূদান্ত-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয়
 বনময়
 পাঠায় নূতন জাগরণী,
 অতি মৃদু শিহরণী
 বাতাসের গায়ে :
 পাখির কুলায়ে
 অস্পষ্ট কার্কিল ওঠে আধো-জাগা স্বরে :
 স্তম্ভিত আগ্রহভরে
 অবাক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে—
 ও কোন্ তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর,
 অন্তর্গত সে প্রহর
 আশ্ব-অগোচর।
 চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
 নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
 পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
 সূদান্ত মাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি
 নির্মল নির্ভয়
 কোন্ দিব্য অভ্যুদয়।
 কোন্ সে পরমা মৃদুতি, কোন্ সেই আপনার
 দীপ্যমান মহা আবিষ্কার।
 প্রভাত-মহিমা ওর সংবৃত রয়েছে নিশ্চেতনে,
 তাহারি আভাস পাই মনে।
 আমি ওই রথশব্দ শুনি,
 সোনার বীণার তারে সংগীত আনিছে কোন্ গুণী।
 জাগিবে হৃদয়,
 ভুবন তাহার হবে বাণীময়;
 মানসকমল একমনা
 নবোদিত তপনের করিবে প্রথম অভ্যর্থনা।
 জাগিবে নূতন দিবা উজ্জ্বল উজ্জ্বলে
 বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তার চারি পাশে।

নিরুদ্ভূত চেতনা হতে হবে চ্যুত
 জালসা-আবেশে জড়ীভূত
 স্বপ্নের শঙ্খলপাশ।
 বিলুপ্ত করিবে দূরে উদ্ভূত বাতাস
 দুর্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলধ্বনিবাস।
 আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি—
 —নাম কি উষসী।

[প্রাথমিক—আশ্বিন ১৩৩৫]

ছায়ালোক

যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
 যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
 আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি,
 সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।
 সেথায় তোমার বৃষ্টি সদাই জাগে,
 চক্ষে তোমার আবেশ নাই লাগে,
 আমার ভীরু হৃদয় ছায়া মাগে,
 তোমার সেথায় আলোক ধরতর,
 যখন সেথা চাহ আমার বাগে
 সংকোচে প্রাণ কাঁপে ধর ধর।

মোহভাঙা দৃষ্টি তোমার যখন আঘাত হানে,
 যায় নিখিলের রহস্যস্বার টুটে,
 এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে
 অন্তর যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে উঠে।
 বসুন্ধরার শ্যামল প্রাণের ঢাকা
 রূঢ় পাথর গোপন করে রাখা,
 ভিতরে তার কতই আকাংক্ষা
 কতকালের দাহন-ইতিহাসে,
 ফাটল-ধরা কত-যে দাগ অঁকা
 তোমার চোখে বাহির হয়ে আসে।

তেমনি করে যখন কভু আমার পানে চাবে
 মর্মভেদী কোতূহলের আঁধি,
 বিধাতা বা লুকান লাজে দেখতে-যে তাই পাবে
 মোর রচনার বা আছে তাঁর ষাণ্ডিক।

আমার মাঝে তোমার অগোচরে
আদিম যুগের গোপন গভীর স্তরে
অপূর্ণতা রয়েছে অন্তরে,
সৃষ্টি আমার অসমাপ্ত আছে,
সামনে এলে মরি-ষে সেই ডরে
ভাঙাচোরা চক্রে পড়ে পাছে।

তোমার প্রাণে কোনোখানে নাই কি মায়ার ঠাই
মস্ততাহীন তত্ত্বপরপারে,
যেথায় তীক্ষ্ণ চোখের কোনো প্রশ্ন জেগে নাই
অসতর্ক মৃত্ত হৃদয়স্বারে?
যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ,
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করে রহ,
যেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ,
যেথা নানা মূর্তিতে মন মাতে,
যেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ
আপন-ভোলা রসের রচনাতে।

সেথায় আমি যাব যখন চৈত্র রজনীতে
বনের বাগী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা,
চাঁদের আলোয় ঘুম-হারানো পাখির কলগীতে
পথ-হারানো ফুলের রেণু মেশা।
দেখবে আমায় স্বপন-দেখা চোখে,
চমকে উঠে বলবে তুমি, 'ও কে,
কোন দেবতার ছিল মানসলোকে,
এল আমার গানের ডাকে ডাকা।'
সে রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে
যে রূপ তোমার পরান দিয়ে অঁকা।

৯ আশ্বিন ১৩৩৫

প্রজ্জ্বা

বিদেশে ওই সৌখিনধর-'পরে
কলকালের তরে
পথ হতে যে দেখেছিলেন, ওগো আবেক-দেখা,
মনে হল তুমি অসীম একা।
দাঁড়িয়েছিলে যেন আমার একটি বিজন খনে
আল-কিছদ নাই সেথায় দ্বিভুবনে।
সামনে তোমার মৃত্ত আকাশ, অস্পষ্ট নীচে,
কণে কণে ঝাড়রের শাখা প্রলাপ মর্ম্মিরছে।

মৃদু দেখা না যায়,
 পিঠের 'পরে বেণীটি জুটায়।
 ধামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দেখি আশখানি ওই দেহ,
 অসম্পূর্ণ কর্ণটি রেখার কী যেন সন্দেহ।
 বসিনী কি ভোগের কারাগারে,
 ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর দিগন্তপারে?
 সোনার বরন শসাথেতে, কোন্ সে নদীতীরে
 পুজারীদের চলার পথে, উচ্চচুড়া দেবতামন্দিরে
 তোমার চিরপরিচিত প্রভাত-আলোখানি,
 তারি স্মৃতি চক্ষে তোমার জল কি দিল আনি।
 কিংবা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগী,
 সেই বহুবল্লভের প্রেমে শ্বিধার মৃদু হৃদয়ে রয় জাগি,
 প্রশ্ন কি তাই শূন্য ও নক্ষত্রে
 সন্তর্কষের কাছে তোমার প্রণামখানি সেরে।
 হয়তো বৃথাই সাজ',
 তৃপ্তিবিহীন চিন্ততলে তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজো;
 তাই কি শূন্য আকাশ-পানে চাও,
 উপেক্ষিত যৌবনেরই খিঙ্কার জানাও?

কিংবা আছ চেয়ে
 আসবে সে কোন্ দূঃসাহসী গোপন পন্থা বেয়ে,
 বন্ধ তোমার দোলে,
 রক্ত নাচে গ্রাসের উতরোলে।
 স্তম্ভ আছে তরঙ্গশ্রেণী মরণছায়া-ঢাকা,
 শূন্যে ওড়ে অদৃশ্য কোন্ পাখা।
 আমি পথিক যাব যে কোন্ দূরে;
 তুমি রাজার পুরে
 মাঝে মাঝে কাজের অবসরে
 বাহির হয়ে আসবে হোথায় ওই অলিন্দ-'পরে,
 দেখবে চেয়ে অকারণে স্তম্ভ নেত্রপাতে
 গোখলিবেলাতে
 বনের সবুজ তরঙ্গ পারায়ে
 নদীর প্রান্তরেখায় যে পথ গিয়েছে হারিয়ে।
 তোমার ইচ্ছা চলবে কম্পনাতে
 সুদূর পথে আভাসরূপী সেই অজানার সাথে
 পান্থ যে জন নিত্য চলে যায়।
 আমি পথিক হার,
 পিছন-পানে এই বিদেশের সুদূর সৌধশিরে
 ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে ফিরে
 ছায়ার ঢাকা আশেক-দেখা তোমার বাতায়নে,
 যে মৃদু তোমার লুকিয়ে ছিল সে মৃদু অধিক মনে।

দর্পণ

দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শূন্যে একমনে
 হে সুন্দরী, কী সংশয় জাগে তব উদ্ভাসন নয়নে।
 নিজেরে দেখিতে চাও বাহিরে রাখিয়া আপনারে
 যেন আর কারো চোখে; আর কারো জীবনের স্ফারে
 খুঁজিছ আপন স্থান। প্রেমের অর্ঘ্যের কোনো চূড়ি
 দেখ কি মূখের কোনোখানে। তাই তব আঁখিদুটি
 নিজেরে কি করিছে ভৎসনা। সাজারে লইয়া সর্বদেহে
 স্বর্গের গর্ভের ধন, তবে যেতে চাও তার গেহে?
 জান না কি হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া,
 পার না রচিতে কভু তাই দিবে চিরস্থায়ী মায়ী।
 তিলোত্তমা অনুপমা সুরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্গণে
 কঙ্কণবাংকারে আর নৃত্যলোল নুপূরনিরঞ্জে
 নাচিয়া বাহিরে চলে যায়। লগ্নে আত্মনিবেদন
 গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন-আসন।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

ভাবিনী

ভাবিছ যে ভাবনা একা একা
 দুরারে বসি চুপে চুপে
 সে যদি সম্মুখে দিত দেখা
 মূর্তি ধরি কোনো রূপে—
 হয়তো দেখিতাম শূন্যতার
 দিবস পার হয়ে দিশাহারা
 এসেছে সম্মুখ কিনারাতে
 সঁজের তারাদের দলে,
 উদাস মূর্তিভরা আঁখিপাতে
 উষার হিমকণ জ্বলে।

হয়তো দেখিতাম বাদলে যে
 প্রাণে এনেছিল বাণী
 শরতে জলভার এল ভোজে
 শূন্য সেই মেঘখানি।
 চলে সে সময়সী দিশে দিশে
 রবির আলোকের পিরাসী সে,

আকাশ আপনারই লিপি লিখে
পড়িতে দিল যেন তারে,
সে তাই চেরে চেরে অনিমিখে
বদ্বিধিতে বদ্বিধি নাহি পারে।

হয়তো দেখিতাম রজনীতে
সে যেন সদরহারা বাঁণা
বিজ্ঞান দীপহীন দেহলিতে
মৌন-মাঝে আছে লীনা।
একদা বেজেছিল যে রাগিণী
তারে সে ফিরে যেন নিল চিনি
তারার কিরণের কম্পনে
নীরব আকাশের মাঝে,
সদর সদরসভা-অঙ্গনে
সদরের স্মৃতি যেথা বাজে।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

একাকী

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী—
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারই শূন্য দিল ঢাকি।
অগ্নি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথরাতে শূন্য সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেরে শূন্যপানে,
যে রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহরস, তাই দিলে ভরিয়া আধার
কোন বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার।
তারি সাথে মিলিয়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনিবচনীয় বাণী,
মিলিয়েছ যেন তব জন্মান্তর হতে নিয়ে-আসা
দীর্ঘনিশ্বাসের ভাষা।
মিলিয়েছ, সদৃশভীর দঃখের মাঝারে
যে মৃক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে।
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে,
জনশূন্য ভুবান্ধলিখরে
কোন মহাশেষতা, কোন তপস্বিনী বিছাল অণ্ডল,
স্তম্ভ অচঞ্চল,
অনন্তরে সম্বোধিয়া কহিল সে উদ্বেগ তুলি আঁখি,
‘তুমিও একাকী।’

১৮ আশ্বিন ১৩৩৫

আশীর্বাদ

জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি এই তরুণ-প্রভাতে
 হে নবীনা, নবরাগরশ্মি শোভাতে
 সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু তব
 জ্যোতি আজি পেল অভিনব,
 চোলাঙলে উন্ডাসিল অন্তরের দীপ্যমান প্রভা,
 শরমের বস্ন্তে তুমি আনন্দের বিকশিত জবা।

সাহানা রাগিণীরসে জড়িত আজি এ পদ্যতিথি,
 তোমার ভুবনে আসে পরম অতিথি।
 আনো আনো মাঙ্গল্যের ভার,
 দাও বধু, খুঁলে দাও শ্বার,
 তোমার অঙ্গনে হেরো সর্গোরবে ওই রথ আসে,
 সেই বার্তা আজি বদ্বি উন্মোচিল আকাশে বাতাসে।

নবীন জীবনে তব নববিশ্ব রচনার ভাষা
 আজি বদ্বি পূর্ণ হল লয়ে নব আশা।
 সৃষ্টির সে আনন্দ উৎসবে
 তব শ্রেষ্ঠধন দিতে হবে,
 সেই সৃষ্টিসাধনার আপনি করিবে আবিষ্কার
 তোমার আপনা-মাঝে লুকানো যে ঐশ্বর্যভান্ডার।

পথ কে দেখালো এই পথিকেরে তাহা আমি জানি,
 ওই চন্দ্রতারা তারে শ্বারে দিল আনি।
 যে সদর নিভুতে ছিল প্রাণে
 কেমনে তা শূন্যেছিল কানে,
 তোমার হৃদয়কুঞ্জে যে ফুল ছারার ছিল ফুটে
 তাহার অমৃতগন্ধ গিরেছিল বন্ধ তার টুটে।

যদি পারিতাম, আজি অলংকার শ্বারীরে জুলায়ে
 হরিয়া অমূল্য মণি অলংকেতে দিতাম দুলারে।
 তবু মোর মন মোরে কহে
 সে দান তোমার যোগ্য নহে,
 তোমার কমলধনে দিব আনি রবির প্রসাদ,
 তোমার মিলনকালে সর্পিষ কবির আশীর্বাদ।

নববধূ

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
 দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।
 কোন্‌ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্‌ ঘাটে হে বধূবেশিনী,
 ওগো বিদেশিনী।
 উৎসবের বাঁশখানি কেন-ষে কে জানে
 ভরেছে দিনান্তবেলা স্নান মূলতানে,
 তোমারে পরালো সাজ মিলি সখীদল
 গোপনে মৃছিয়া চক্ষুজল।

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
 স্তিমিত বাতাসে ঘেন বলে—
 'কত বধূ গিরেছিল কতকাল এই স্রোত বাহি
 তীরপানে চাহি।
 ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা,
 নিস্তম্ব ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা
 তরণী কন্যার পানে, তরী-পরে ছিলেন গোপনে
 তরণীর কাণ্ডারীর সনে।'

কোন্‌ টানে জানা হতে অজানায় চলে
 আধো হাসি আধো অশ্রুজলে!
 ঘর ছেড়ে দিলে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে
 অচেনার ধারে।
 ওপারের গ্রাম দেখো আছে ওই চেয়ে,
 বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
 ওই ঘাটে কত বধূ কত লত বর্ষ বর্ষ ধরি
 ভিড়িয়েছে ভাগ্যভীরু তরী।

জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
 অনিত্যের নিত্যপ্রবাহিনী।
 জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম-উপহার
 রেখে গেল তার।
 আপনার প্রাণসূত্রে যুগ-যুগান্তর
 গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর,
 ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত,
 লভিল মৃত্যুর সদারত।

তাই আজি গোধূলির নিস্তম্ব আকাশ
 পথে তব বিজ্ঞান আশ্বাস।
 করিল সে কানে কানে, প্রাণ দিয়ে যে ভরেছে বুক
 সেই তার সূখ।

রয়েছে কঠোর দৃষ্টি, রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,
যদি বল এই কথা, 'আলো দিয়ে জেদেছিলাম আলো,
এব দিয়ে বেসেছিলাম ভালো।'

১৯ আশ্বিন ১৩৩৫

পরিণয়

শুভখন আসে সহসা আলোক জেদে,
মিলনের সুখা পরম ভাগ্যে মেলে।
একর ভিতরে একের দেখা না পাই,
দুজনার যোগে পরম একের ঠাই,
সে-একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলে।

আপনারে দান সেই তো চরম দান,
আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান।
ফুলবনে তাই রূপের তুফান লাগে,
নিশীথে তারার আলোর খেয়ান জাগে,
উদয়সূর্য গাহে জাগরণী গান।

নীরবে গোপনে মর্ত্যভুবন-পরে
অমরাবতীর সুরসুরধুনী ঝরে
যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
নিজেরে জানিলে সীমার বাধন হারা,
স্বর্গের দীপ জ্বলিল মাটির ঘরে।

আজি বসন্ত চিরবসন্ত হোক
চিরসুন্দরে মজুক তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চিরশান্তির বাণী
জীবনের স্বতে দিনে রাতে দিক আনি,
সংসারে তব নামুক অমৃতলোক।

আষাঢ় ১৩৩৫

মিলন

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
দৃষ্টিরে মিলানো নিরন্তর খেলা।
রেণুদীপি বহি বারু প্রদ্বন করে মৃদুতে মৃদুতে
কবে হবে ফুটিবার খেলা।

তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়,
পাখির সংগীত সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা।

সৃষ্টির সে রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
দুজনায় গ্রন্থির বাঁধন।
অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন।
ছেড়েছে সকল কাজ, রঙিন বসনে ওরা সেজে
চলেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশি চলে বেজে,
পুরানো সংসার হতে জীর্ণতার সব চিহ্ন মেজে
রচিল নবীন আচ্ছাদন।

যাহা সব-চেয়ে সত্য সব-চেয়ে খেলা যেন তাই,
যেন সে ফাল্গুন-কলোদ্ভাস।
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্ত্যের ম্লানতা যেন নাই,
দেবতার যেন সে উচ্ছ্বাস।
সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে
আকাশের আলো আজি গোমুখির রক্তিম লগনে,
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসবপ্রাঙ্গণে
লভিয়াছে আপন প্রকাশ।

বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঙ্গ উঠুক ডালে মেতে
দুরন্ত নাচের নেশা-পাওয়া।
নদীপ্রান্তে তরুগুড়ি ওই দেখ্ আছে কান পেতে,
ওই সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।
নিবি তোরা তীর্থবারি সে অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বন্ধ নিমগ্ন করিতে বাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে, তরঙ্গিত সংগীত-উৎসাহে
জাগায় প্রাণের মস্ত হাওয়া।

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হুল্লোছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
ভুজুতার বেড়া হতে মৃদু তারে কে দিয়েছে আনি
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণদেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ডালে,
সূর্যতারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে প্রত্যঙ্গা আকাশে আগালে
তাই এল করিয়া বহন।

বন্দিনী

ভূমি বনের পদ পবনের সাথী,
বাদল মেঘের পথে তোমার ডানার মাতামাতি।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
খাঁচার কোণে এই বিজনে আপন মনে থাকি।
হায় অজানা, জানি না সে
উধাও ভূমি কোন্ আকাশে,
কোন্ তমালের কুঞ্জতলে মধ্যদিনের তাপে
বনচ্ছায়ার শিরায় শিরায় তোমারি সুর কাঁপে।

কোন্ রঙনে রঙিন তোমার পাখা।
তোমার সোনার বরনখানি চিন্তায় মোর অঁকা।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মন্দিরপের ধানের ছায়ার মগ্ন আমার আঁখি।
বন্দী মনের বন্ধ ডানা,
চতুর্দিকে কঠোর মানা,
তোমার সাথে উড়ে চলার মিলন মাগি মনে—
শূন্যে সদাই গান ফেরে তাই অসীম অন্বেষণে।

গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা,
তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন পাখা মেলা।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মনে মনে তোমায় পরাই গানের গাঁথন রাখী।
আজি তোমার সুরের মাঝে
দুরের ডানার শব্দ বাজে,
মেঘের পখিক গানে আমার এল প্রাণের কূলে,
বিরহেরই আকাশতলে নিল আমার তুলে।

গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে—
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপূরে।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
তোমার গানের মরীচিকায় শূন্য যে দাঁড়াকি।
বাঁধনে তাই জাদু লাগে,
বীণায় তারে মর্তি জাগে,
রাগিণীতে মদ্রি সে পায়, ওগো আমার দূর,
তোমার দেওয়া না-লোনা গান বাঁধে যে স্তর সুর।

গদ্যস্তম্ভ

আরো কিছুখন না-হয় বসিয়ে পাশে,
 আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
 শরৎ-আকাশ হেরো স্ফান হয়ে আসে,
 বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
 জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
 তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
 দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
 হে পথিক, বলো বলো—
 সে মোর অগম অন্তর-পারাবারে
 রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

স্বিধাভরে আজো প্রবেশ কর নি ঘরে,
 বাহির-আঙনে করিলে সুরের খেলা,
 জানি না কী নিয়ে যাবে-যে দেশান্তরে,
 হে অতিথি, আজি শেষ-বিদায়ের বেলা।
 প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
 যে গভীর বাণী শুনাবারে কাছে এলে,
 কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
 হে পথিক, বলো বলো—
 সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জেদলে
 রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো।

১৪ কার্তিক ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি; বসন্তের আনন্দজন্ডার
 তখনো হয় নি নিঃস্ব; আমার বরণপদ্পহার
 তখনো অস্ফান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
 কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্ভাস্ত সমীর
 এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাণি লয়ে হাতে,
 ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
 বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপঞ্চমে;
 আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সংগমে
 কম্পমান আশ্রিতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
 সৌরভবিহীন শূন্যরাতে। সেই কুঞ্জগৃহম্বার
 এতকাল মৃদু ছিল। প্রতিদিন মোর দেহলিতে
 আঁকিয়াছি আলিপনা। প্রতिसন্ধ্যা বরণডালিতে
 গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
 ব্যাঘ্র তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে

হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন—
আমারে আড়াল করে আমারে করিবে অন্বেষণ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেই লাভ করিবারে
আহ্বান লিখিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণম্বারে
যে পথ করিলে শূন্য সে পথের এখানেই শেষ।

হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্লেভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভৎসনা তোমার;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধু; আজি শূভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সম্মান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শূভ্রতার লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশ, জ্বলিবে না প্রদীপের মাল্য,
পরিব না রক্তাম্বর; আজিকার উৎসব নিরাজ্য
সর্ব আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লিখিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

২৭ পৌষ ১৩৩৫

পুরাতন

যে গান গাহিয়াছিলু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে। সেদিনের সাহানার সুদূর
আজি অসময়ে এসে অকারণে করিছে বিধুর
মধ্যাহ্নের আকাশে; দিগন্তের অরণ্যরেখার
দূর অতীতের বাণী লিপ্ত আছে অস্পষ্ট লেখায়,
তাহারে ফুটাতে চাহে। পথভ্রান্ত করুণ গুঞ্জে
মধু আহ্বিতে ফিরে, সেদিনের অকৃপণ বনে
যে চামেলিবগ্নী ছিল তারি শূন্য দানস্র হতে।
ছায়াতে বা লীন হল তারে খোঁজে নিষ্ঠুর আলোতে।
শীতরিক্ত শাখা ছেড়ে পাখি গেছে সিঁধুপারে চলি,
তারি কুলায়ের কাছে সে কালের বিস্মৃত কাকলি
বুধাই জাগাতে আসে। যে তারকা অস্তে গেল দূরে
তাহারি স্পন্দন ও-বে ধরিয়া এনেছে নিজ সুদে।

পৌষ ১৩৩৫

ছায়া

অঁখি চাহে তব মৃদুপানে,
তোমারে জেনেও নাহি জানে।
কিসের নিবিড় ছায়া
নিরেছে স্বপনকারা
তোমার মর্মের মাঝখানে।

হাসি কাঁপে অধরের শেষে
দূরতর অশ্রুর আবেশে।
বসন্তকুঁজিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে।

মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অবাস্ত ভাবনা এসে ভিড়ে।
বসন্তপঞ্চম রাগে
বিচ্ছেদের কথা লাগে
সুগভীর ভৈরবীর মীড়ে।

তোমার প্রাণ পূর্ণিমাতে
বাদল রয়েছে সাথে সাথে।
হে করুণ ইন্দ্রধনু,
তোমার মানসী তনু
জন্ম নিল আলোতে ছায়াতে।

অদৃশ্যের বরণের ডালা,
প্রচ্ছন্ন প্রদীপ তাহে জ্বালা।
মিলন নিকুঞ্জতলে
দিগ্বেছ আমার গলে
বিরহের সূত্রে গাঁথা মালা।

তব দানে ওগো আনমনা,
দিয়ো মোরে তোমার বেদনা।
যে বন কুরাণা-ছাওয়া
করা ফুল সেথা পাওয়া,
থাক্ তাহে শিশিরের কণা।

বাসরঘর

তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে
 রাতি হবে
 উঠবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের স্মরণরবে।
 হায় রে বাসরঘর,
 বিরাত বাহির সে যে বিচ্ছেদের দসদ্ ভয়ংকর।
 তব্দ সে যতই ভাঙেচোরে
 মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
 তুমি আছ ক্ষয়হীন
 অনদিন;
 তোমার উৎসব
 বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
 কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
 শূন্য করি তব শয্যাভল।
 যায় নাই, যায় নাই,
 নব নব যাত্রীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
 তোমার আহ্বানে
 উদার তোমার স্বেপানে।
 হে বাসরঘর,
 বিশ্ব প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

[বাঙ্গালোর]
 আষাঢ় ১৩৩৫

বিচ্ছেদ

রাতি হবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে
 দাঁড়াইলে স্মারে।
 আমার কণ্ঠের যত গান
 করিলাম দান।
 তুমি হাসি
 মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
 তার পরদিন হতে
 বসন্তে শরতে
 আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
 কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্ব বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ।

[বাঙ্গালোর]
 ৯ আষাঢ় ১৩৩৫

বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
 তারি রথ নিতাই উখাও
 জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
 চক্রে-পিণ্ডে অধিরের বন্ধ-ফাটা তারার ক্রন্দন।

ওগো বন্ধু,
 সেই ধাবমান কাল
 জড়িয়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
 ভুলে নিল দ্রুতরথে
 দঃসাহসী ভ্রমণের পথে
 তোমা হতে বহুদূরে।
 মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
 পার হয়ে আসিলাম
 আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
 রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
 আমার পুরানো নাম।
 ফিরিবার পথ নাহি;
 দূর হতে যদি দেখ চাই
 পারিবে না চিনিতে আমায়।
 হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
 বসন্তবাতাসে
 অতীতের তীর হতে যে রাতে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
 করা বকুলের কান্না ব্যাধিবে আকাশ,
 সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছুর মোর পিছে রহিল সে
 তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে
 হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
 হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূর্তি।
 তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
 সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
 সে আমার প্রেম।
 তারে আমি রাখিয়া এলেম
 অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
 পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
 কালের যাত্রায়।
 হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি—
 মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিবে অমৃত-মূর্তি
 যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরাতি

হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
 পূজার সে খেলা
 ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহর স্পানস্পর্শ লেগে;
 তুষার্ত আবেগবেগে
 ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
 যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তুষার,
 তার সাথে দিব না মিশিয়ে
 যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
 আজো তুমি নিজে
 হয়তো বা করিবে রচন
 মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বর্ণাবিষ্ট তোমার বচন।
 ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
 হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিলো না শোক,
 আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
 মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
 শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
 উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
 সেই ধন্য করিবে আমাকে।
 শূরুপক্ষ হতে আনি
 রজনীগন্ধার বস্তথানি
 যে পারে সাজাতে
 অর্ঘ্যধালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
 যে আমারে দেখিবারে পায়
 অসীম ক্ষমায়
 ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
 এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
 তোমারে যা দিগ্বেছিন্দু, তার
 পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
 হেথা মোর তিলে তিলে দান,
 করুণ মদহৃতগদা গন্ডুষ ভরিয়া করে পান
 হৃদয়-অঞ্জলি হতে স্নান।
 ওগো তুমি নিরুপম,
 হে ঐশ্বর্যবান,
 তোমারে যা দিগ্বেছিন্দু সে তোমারি দান;
 গ্রহণ করেছ যত কণী তত করেছ আমার।
 হে বন্ধু, বিদায়।

প্রগতি

কত বৈষ্য ধরি
 ছিলে কাছে দিবসশরীরী।
 তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
 কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে।
 আজ যবে
 দূরে যেতে হবে
 তোমারে করিয়া যাব দান
 তব জয়গান।
 কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
 এ জীবনে
 হোমোনি উঠে নি জ্বলি,
 শূন্যে গেছে চলি
 হতাশ্বাস ধূমের কুন্ডলী।
 কতবার ক্ষণিকের শিখা
 আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
 নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
 লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।
 এবার তোমার আগমন
 হোমহুতাশন
 জেদলেছে গৌরবে।
 যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
 আমার আহুতি দিনশেষে
 করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।
 লহো এ প্রণাম
 জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
 এ প্রগতি-পরে
 স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।
 তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
 সিংহাসন বেধার বিরাজে,
 করিয়ো আহবান,
 সেথা এ প্রগতি মোর পায় যেন স্থান।

[বাঙ্গালোর। আষাঢ় ১৩৩৫]

নৈবেদ্য

তোমারে দিই নি সূখ, মদতির নৈবেদ্য গেন্দু রাখি
 রজনীর শূদ্র অবসানে; কিছ্র আর নাহি বাকি,
 নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মদহর্ষের দৈন্যরাশি,
 নাই অভিমান, নাই দীনকান্না, নাই গর্বহাসি,
 নাই পিছে ফিরে দেখা। শূদ্র সে মদতির জলিখানি
 ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।

[বাঙ্গালোর। আষাঢ় ১৩৩৫]

অশ্রু

সুন্দর, তুমি চক্ৰ ভরিয়া
 এনেছ অশ্রুজল।
 এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
 দঃসহ হোমানল।
 দঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
 মঃখ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
 এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
 বিচ্ছেদ শতদল।

[বাংগালোর
 আষাঢ় ১৩৩৫]

অন্তর্ধান

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
 অন্তরে অলঙ্কারকে তোমার পরম আগমন।
 লভিলাম চিরস্পর্শমণি;
 তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।
 জীবন আধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
 সন্ধ্যার দেউল দীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান।
 বিচ্ছেদেরই হোমবাহি হতে
 পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দঃখের আলোতে।

[শান্তিনিকেতন]
 ২৬ আষাঢ় ১৩৩৫

বিরহ

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদ্ভিল শীর্ণ শশী,
 অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উজ্জ্বল
 বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,
 ব্যথায় নিবিড় হল শেষ বাক্য বলিবার কাল।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
 শান্ত হল শেষ দেখা, নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
 ধীরে ধীরে বনান্তে মিলাল
 প্রান্তরের প্রান্তভটে অস্তশেষ কীল নাশে আলো।

যে দ্বার খুলিয়া গেলে মঃখ সে হবে না কোনোমতে।
 কান পাতি হবে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে,
 তোমার অমৃত আসাম্বাওয়া
 যে পথে চঞ্চল করে দিগ্বালায় অশ্রুজল হাওয়া।

বসন্তে ঘাঘের অন্তে আশ্রবনে মৃকুলমত্ততা
 মধুপ গদ্যজনে মিশি আনে কোন্ কানে কানে কথা
 মোর নাম তব কণ্ঠে ঢাকা
 শান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা।

সঙ্গহীন স্তম্ভতার সুগম্ভীর নিবিড় নিভূতে
 বাক্যহারা চিন্তে মোর এতদিনে পাইনু শূন্যে
 ভূমি কবে মর্মমাঝে পশি
 আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী।

[আত্মনির্দেশন]
 ২৬ আশ্বিন ১৩৩৫

বিদায়সম্বল

ষাবার দিকের পথিকের 'পরে
 ক্ষণিকার স্নেহখানি
 শেষ উপহার করুণ অধরে
 দিল কানে কানে আনি।
 'ভুলিব না কভু, রবে মনে মনে'
 এই মিছে আশা দেয় খনে খনে,
 ছলছল ছায়া নবীন নয়নে
 বাধো বাধো মৃদু বাণী।

ষাবার দিকের পথিক সে কথা
 ভরি লয় তার প্রাণে।
 পিছনের এই শেষ আকুলতা
 পাথের বলি সে জানে।
 যখন আধারে ভরিবে সরণী,
 ভুলে-ভরা ঘূমে নীরব ধরণী,
 'ভুলিব না কভু', এই ক্ষণধ্বনি
 তখনো বাজবে কানে।

ষাবার দিকের পথিক সে বোঝে—
 যে যায় সে যায় চলে,
 যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে,
 যে যায় তাহারে ভোলে।
 উদ্‌ও নিজেরে ছলিতে ছলিতে
 বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে,
 'ভুলিব না কভু' বিভাসে ললিতে
 এই কথা বৃকে দোলে।

দিনান্তে

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে,
 তাহাতে মোর যা হয় হোক ক্ষতি,
 অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে,
 চরণে তব গোপনে তার গতি।
 লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি,
 গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি,
 প্রদীপ ছিল মলিনশিখা, ধোঁয়াতে ছিল কালি,
 দীপ্ত হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি।
 বাহির হতে না যদি লও পূজার এই ডালি
 চরণে তব গোপনে তার গতি।

না-হয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আমি থাকি,
 নীরব এই নীরস মরুতীরে।
 অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় আঁকি
 সুদূর তব উদার আঁখিটিরে।
 ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
 বিরহ হানি তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
 অলখ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
 এপার হতে বহিয়া মোর নতি।
 যে বীণা তব মন্দিরেতে বাজে নি তানে তানে
 চরণে তব নীরবে তার গতি।

আম্বেয়াজ্জ জাহাজ
 ১ শ্রাবণ ১৩৩৪

অবশেষ

বাহির পথে বিবাগী হিয়া
 কিসের ধোঁজে গেলি,
 আয় রে ফিরে আয়।
 পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া,
 ছেঁড়া আসন মেলি
 বসিবি নিরালস্য।
 সারাটা বেলা সাগর-ধারে
 কুড়ালি যত নুড়ি,
 নানারঙের শামুক-ভারে
 বোঝাই হল ঝড়ি,
 লবণ পান্নাঝরের পারে
 প্রখর তাপে পুড়ি
 ঘরিলি পিপাসায়;

চেউয়ের দোল তুলিল রোল
অক্লান্ত জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়।
আয় রে ফিরে আয়।

বিরাম হল আরামহীন
যদি রে তোর ঘরে,
না যদি রয় সাথী,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন
মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বালে বাতি;
তবু তো আছে আঁধার কোণে
ধ্যানের ধনগুলি,
একেলা বসি আপন মনে
মুছিবি তার ধূলি,
গাঁথিবি তারে রতনহারে
বুকেতে নিবি তুলি
মধুর বেদনায়।
কাননবীধি ফুলের স্বীতি
না-হয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগন-কিনারায়।
আয় রে ফিরে আয়।

[শান্তিনিকেতন]
২৯ চৈত্র ১৩৩৪

শেষ মধু

বসন্তবার সম্যাসী হায়
চৈত্র-ফসলের শূন্য খেতে,
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিরে যেতে যেতে—
আয় রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পথঝরা,
গাছের তলার অঁচল বিছায়
ক্লান্তি-জলস বসুন্ধরা।

শঙ্কনে ঝড়ায় ফুলের বেণী,
আমের মৃকুল সব ঝরে নি,
কুঞ্জবনের প্রান্ত-ধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।

আয় রে তোরা মোমাছি, আয়,
 আসবে কখন শুকনো খরা,
 প্রেতের নাচন নাচবে তখন
 রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা।

শূনি যেন কাননশাখায়
 বেলাশেষের বাজায় বেগদ।
 মাথিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
 স্মরণভরা গন্ধরেণু।
 কাল যে কুসুম পড়বে ঝরে
 তাদের কাছে নিস গো ভরে
 ওই বছরের শেষের মধু
 এই বছরের মোচাকেতে।

নতন দিনের মোমাছি, আয়,
 নাই রে দেরি, করিস স্বরা,
 শেষের দানে ওই রে সাজায়
 বিদায়দিনের দানের ভরা।
 চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
 দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি
 প্রলয়দাহের রৌদ্রতাপে
 বৈশাখে আজ ফুটেবে জানি।

যা-কিহু তার আছে দেবার
 শেষ করে সব নিবি এবার,
 যাবার বেলায় যাক চলে যাক
 বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।
 আয় রে ওরে মোমাছি, আয়,
 আয় রে গোপন-মধুহরা,
 চরম দেওয়া সঁপিতে চায়
 ওই মরণের স্বয়ংবরা।

ବନବାଣୀ

ভূমিকা

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাদা ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গদগদনিরে ওঠে।

ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মঞ্জায় মঞ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতারা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মৃদুতির বাণী এসে লাগে। মৃদুতি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কলে, যে সমুদ্রের উপরের তলার সুরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অম্বৈতম্'। সেই সুরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতসৌবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্পবে; তাতেই মৃদুতির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তা হলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ-সুর লাগে না। বৃন্দদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মৃদুতিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন—দুইয়ে মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তম্ভো দিবি তিস্ত্যোকঃ'। শুনিয়েছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজ্জতি নিঃসৃতম্'। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিষে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝর্ণা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভাঁজ, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামৃদুতি আর কোথায় আছে।

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানলার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি শান্তি-নিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-প্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মৃদুতির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছে সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্তের ধনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোর তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গত বেদনার দিনে শান্তি-নিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে—জাদের কাছে চূপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝর্ণা আমার অন্তরাত্মকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে

পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের
অধিকার আমরা পাই। পরমসুন্দরের মূর্ত্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিচাণ—আনন্দময়
সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

[হোটেল ইম্পেরিয়াল]

ভিয়েনা

২০ অক্টোবর ১৯২৬

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শূন্যেছিলে সূর্যের আহবান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বৃক্ষ-পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

সেদিন অম্বর-মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্ত্যের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে জীবন
মরণতোরণস্বার বারংবার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালাে বিচিত্র নতুন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ালে। তোমার নিঃশঙ্ক রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিদ্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে—দেবকন্যা দঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুস্মান গৈরিকবসন-পর্য, খন্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খন্ড খন্ড ভোগ করিবারে,
দঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মৃত্তিকাদান
মরুর দারুণ দূর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-উর্মি দূর্গম স্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া যুদ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পঙ্খা।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন—
শাখায় রিচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে গানে চঞ্চল যারু নিজের লিভিল পরিচয়,
সূর্যের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিজ, অশ্লিষ্ট গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সূর্যের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,

আলোকের গদ্যস্তম্ভ বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে ।
 ইন্দ্রের অঙ্গুরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
 বাষ্পপাত চূর্ণ করি লীলানতো করেছে বর্ষণ
 যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
 আপনার পত্রপদ্পদটে, অনন্তযৌবনা করি
 সাজাইলে বসুন্ধরা ।

হে নিস্তম্ভ, হে মহাগম্ভীর,
 বীর্ষেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির;
 তাই আসি তোমার আগ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে,
 শূন্যে মৌনের মহাবাগী; দৃষ্টিচ্যুত গদ্যভারে
 নতশীর্ষ বিলুপ্তিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব—
 প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
 বিশ্বজয়ী বীররূপ ধরণীর, বাণীরূপ তার
 লভিতে আপন প্রাণে । ধ্যানবলে তোমার মাঝার
 গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহিরূপে
 সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সস্তায় চূপে চূপে
 ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
 শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দহিয়া সদাই
 যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
 করেছে জগৎজয়ী; দিলে তারে পরম সম্মান;
 হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্শী—সে অগ্নিচ্ছটায়
 প্রদীপ্ত তাহার শক্তি, বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
 ভেদিয়া দঃসাধ্য বিষয়াবাধা । তব প্রাণে প্রাণবান,
 তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীমান,
 সঞ্জিত তোমার মাঝে যে মানব, তারি দত্ত হয়ে
 ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
 শ্যামের বাঁশির তানে মদ্য কবি আমি
 অর্পিতাম তোমায় প্রণামী ।

৯ মে ১৩৩০

জগদীশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয়করকমলে

বন্ধু,

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন ঘর,
 প্রাণের আনন্দ নিরে, শব্দ নিরে, দঃশ নিরে, তরু
 দেখা দিল দারুণ নিঃস্বপ্নে । কত বৃগ-বৃগান্তরে
 কান পেতে ছিল স্তম্ভ মানুষের পদশব্দ ভয়ে
 নিবিড় গহনতলে । স্বপ্নে এল মানব অতিথি,
 দিল তারে ফুল ফল, কিস্তারিয়া দিল ছায়াবাণী ।

প্রাণের আদিমভাষা গদ্য ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইপিগাতে মর্ম্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলোছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্যকোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অগ্নিতে অগ্নিতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝংকারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাতপবনে।
প্রাণের প্রথমবাণী এইমতো জাগে চারি ভিতে
ভূণে ভূণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিহুতে—
কাছে থেকে শব্দ নিই; হে তপস্বী, তুমি একমুখ
নিঃশব্দে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শব্দে একান্তে বসি; মৃক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অন্ধুরে অন্ধুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পথে পথে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের স্বেদে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবর্তী নির্বাকের অন্তঃপদর হতে
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিস্তামাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্ম্মর সাথে মানব-মর্ম্মের আত্মীয়তা:
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দৃঃসাধ্য সাধন লভে জয়—
সতর্ক দেবতা যেথা গদ্যস্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অশ্রুভেদী
মর্ত্যের চুড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অগ্রস্থার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকটকিত পথে চলোছিলে ব্যক্তিচরণে,
কদম্ব শব্দতার সাথে প্রতিক্রমে অক্ষরগণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দৃঃখই তোমার পাশের,
সে অগ্নি জেদলোছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে প্রের,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির লব্ধ আজি কাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে ও কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্দ, তুমি দীপ্যমান; উজ্জ্বলি উঠিছে বাজি

বিপুল কীর্তির মন্ড তোমার আপন কর্মমাঝে।
 জ্যোতিষকসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
 সেথায় সহস্রদীপ জ্বলে আজি দীপালি-উৎসবে।
 আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইন, যবে
 চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
 তোমার তপস্যাক্ষেপ ছিল যবে নিভৃত নিরালা
 বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
 কবি-হাতে বরমাল্য সে-বন্ধু পরায়োছিল ভালে;
 অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
 দুর্দিনে জ্বলোছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যখালি-পরে।
 আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
 ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শান্তিনিকেতন

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

দেবদারু

আমি তখন ছিলাম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্শিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোটো একটি পত্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হল, ঐ একটি দেবদারুর মধ্যে যে শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, ঐ দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিন্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলাম।

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরশ্ম ভেদ করি চুপে
 বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
 সূর্যের যে জ্যোতির্মন্ড তপস্বীর নিত্য-উচ্চারণ
 অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
 সেই দীপ্ত রুদ্ধবাণী—তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
 সে বাণী ধরিল শ্যামকায়ী; সন্ধ্যার সভাতলে
 করিল সাবিত্রীগান; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
 ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।
 ঋজু দীর্ঘ দেবদারু—গিরি এরে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান
 আপন মহিমা চেয়ে; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
 বাহিরে তা সত্য হল; উর্ধ্ব হতে পেরেছিল ঋণ,
 উর্ধ্বপানে অর্ধরূপে শোধ করি দিল একদিন।
 আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
 সূর্যের সংগীতে মেশে মস্তিকার মরুলীর সুর।

শিলঙ

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আম্ববন

সে বৎসর শান্তিনিকেতন আম্ববীথিকায় বসন্ত-উৎসব হয়েছিল। কেউ বা চিত্রে কেউ বা কার্ণিশমেন্টে কেউ বা কাব্যে আপন অর্ঘ্য এনেছিলেন। আমি ঋতুরাজকে নিবেদন করেছিলাম কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে নিম্নলিখিত একটি। সে দিন উৎসবে যারা উপস্থিত ছিলেন, এই আম্ববনের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন—সেই আমার বালককালের আত্মীয়তা এই কবিতার মধ্যে আমার জীবনের পরাঙ্কে প্রকাশ করে গেলেন। এই আম্ববনের যে নিমন্ত্রণ বালকের চিরবিস্মিত হৃদয়ে এসে পৌঁচেছিল আজ মনে হয় সেই নিমন্ত্রণ যেন আবার আসছে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্রতন্ত ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তেজিত শালিখগুলির কাকলি-বিস্কৃদ্ধ অপরাহ্নের অবকাশ নিয়ে।

তব পথছায়া বাহি বাঁধারিতে যে বাজালো আজ
মর্মে তব অশ্রুত রাগিণী
ওগো আম্ববন,
তারি স্পর্শে রাহি রাহি আমারো হৃদয় উঠে বাজি—
চিনি তারে কিংবা নাহি চিনি
কে জানে কেমন!
অন্তরে অন্তরে তব যে চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বদ্বি
ওগো আম্ববন।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা—
মঞ্জরিতে মৃৎখরিয়্যা আনন্দের ঘনগুড় ব্যাধা;
অজানারে খুঁজি'
আমারি মতন আন্দোলন।

সচাঁকিয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি
সর্ব অঙ্গে নিমেঘে নিমেঘে
ওগো আম্ববন।
আমিও তো আপনার বিকশিত কম্পনায় সাজি
অন্তর্লীন আনন্দ-আবেশে
অমনি নৃতন।
প্রাণে ঘোর অমনি তো দোলা দেয় সম্মুখ উষায়
অদৃশ্যের নিঃবিস্তৃত ধ্বনি
ওগো আম্ববন।
আমার যে পদ্পলোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়,
নৃতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায়
সুদূরের গাধিনি—
গীতকংকারের আবরণ।

যে অজস্র ভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসুমি
ভূতলের চিরন্তন কথ্য
ওগো আম্ববন,

তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি,
 ধরণীর বিরহবারতা
 গভীর গোপন।
 সে ভাষা সহজে মিশে বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
 মৌমাছির গদজনে গদজনে
 ওগো আশ্রয়ন।
 আমার নিভৃত চিন্তে সে ভাষা সহজে চলে আসে,
 মিশে যায় সংগোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে
 স্বপনে বেদনে,
 ধ্যানে মোর করে সঞ্চার।

সুন্দর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
 গন্ধে তব রয়েছে সঞ্চিত
 ওগো আশ্রয়ন।
 যেন নাম ধরে কোন্ কানে কানে গোপন মর্মর
 তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
 আজি ক্ষণে ক্ষণ।
 আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ-সনে
 জনম-মরণ-পরপার
 ওগো আশ্রয়ন,
 যেথায় অমরাপদ্রে সুন্দরের দেউল-প্রাঙ্গণে
 জীবনের নিত্য-আশা সম্যাসিনী, সম্ভারতিক্ষণে
 দীপ জ্বালি তার
 পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

বহুকাল চলিয়াছে বসন্তের রসের সঞ্চার
 ওই তব মন্ডায় মন্ডায়
 ওগো আশ্রয়ন।
 বহুকাল যৌবনের মদোৎফুল্ল পল্লীললনার
 আকুলিত অঙ্গক-সম্ভার
 জোগালে ভ্রমণ।
 শিকড়ের মর্দুটি দিয়া অঁকিড়িয়া যে বন্ধ পৃথিবীর
 প্রাণরস কর তুমি পান
 ওগো আশ্রয়ন,
 সেথা আমি গেঁথে আছি দৃদিনের কুটির মৃতির—
 তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনীর
 পথ-চলা গান,
 কালি তার হবে সমাপন।

নীলমণিলতা

শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের একটি কোণের ঝাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজ্ঞপ্ত পরিচয় অব্যাহত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তম্ভ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয় নি, কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম, সে দিন রূপের স্মৃতি নামের দাবি করলে। ভক্ত ১০১ নামে দেবতাকে ডাকে সে শব্দ বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণিমঞ্জরীর গুঞ্জন বাজারে দিল কি রে।
আকাশ যে মৌনভার
বহিতে পারে না আর,
নীলমাবন্যায় শুনো উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পদ্পপাত্রে ভরি নিল নীলমণি লতা।

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্ন-মরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নকায়া।
যে মৌন নিজেই চার
সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগদ্য ফুলে,
দুর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে।

আসন্ন মিলনাম্বাসে বধুর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর-অঙ্গলের গদ্যে সঞ্চিত করে বাণী।
মর্মের নির্বাক কথা
পায় তার নিঃসীমতা
নিবিড় নির্মল নীলে; আনন্দের সেই নীল দ্রুতি
নীলমণিমঞ্জরীর পদ্যে পদ্যে প্রকাশে আকৃতি।

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে,
অপরূপ পদ্পোচ্ছবাসে হে লতা, চিরকালে আপনাকে।
বেল জুই শেকালিরে
জানি আমি ফিরে ফিরে,
কত ফাল্গুনের, কত প্রাণের, আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিহ্নে, রঙিন করেছ জলোবাসা।

চাঁপার কাণ্ডন-আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন্ বেণীবন্ধে বাধা।
বাদলের চামেলি-যে
কালো অঁখিজলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণঝংকারসূরে মাধা,
কদম্বকেশরগুঁলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা।

তুমি সুদূরের দূতী, নতুন এসেছ নীলমণি,
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে
বাধা নহে দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে,
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে।

‘কেন এ কে জানে’ এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে;
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে
গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরগগানে;
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি, কেন এ কে জানে।

কেন এ কে জানে এত বর্ণগন্ধরসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যেদিন বিতানছায়ে
মধ্যাহ্নের মন্দবারে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেরে চেরে, কহিলাম, ‘কেন এ কে জানে।’

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধূলা ওড়ে, অঁখির বিস্ময়রস ঝোচে।
মন জড়তার ঠেকে
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে;
বিশ্বপানে চাহিলাম, কহিলাম, ‘কেন এ কে জানে।’

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিলাভা-মাঝে।
তব নীল-সাবণের বংশধ্বনি দূর অন্তরে বাজে।

আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে সন্ধান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল ফোটাবার অবসানে,
তবু, হে অপূর্ণ রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে।

ভরতপুর
১৭ চৈত্র ১৩৩৩

কুর্চি

অনেককাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলাম। কুর্চিয়া স্টেশনঘরের পিছনের দেয়াল-ঘেঁষা এক কুর্চিগাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমাম্বিত। চারি দিকে হাটবাজার; একদিকে রেলের লাইন, অন্য দিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি. ডব্লু. ডি.-র স্মরণিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুর্চিগাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয়ঘোষণা করছে—উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলকে উপরে ষাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। কুর্চির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়
ছিল প্রীতি কুমুদিনী পানে।
সহসা বিদেশে আসি হার, আজ কি ও
কুটিলেও বহু বলি মানে!

—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ

কুর্চি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে ভ্রমর, শূনি নাকি তারে কবি করেছে ভৎসনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি অভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা; শ্বেতভূজা ভারতীর বীণা
তোমারে করে নি অভ্যর্থনা অলংকার-সংকারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা তব স্থান অব্যাহত,
কিম্বলক্ষ্যী করেছেন আমন্ত্রণ যে প্রাঙ্গণতলে
প্রসাদচিহ্নিত তাঁর নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অবিচারে
হে সুন্দরী। শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তারা দেখেছে তোমারে,
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে; শূভদৃষ্টি কোনো সুলগনে
ঘটিতে পারে নি তাই, ঔদাস্যের মোহ-আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হরে।

তোমারে দেখেছি সেই কবে
নগরে হাটের ধারে, জনতার নিত্যকল্লবে,
ইন্টাকাঠপাথরের শাসনের সংকীর্ণ আড়ালে,
প্রাচীরের বহিঃপ্রান্তে।—সূর্যপানে জাহিরা দাঁড়ালে
সকলদল অভিযানে; সহসা পড়েছে যেন মনে
একদিন ছিলে যবে মহেন্দ্রের নন্দনকাননে

পারিজাতমঞ্জরীর লীলার সঞ্জিনীরূপ ধরি
 চিরবসন্তের স্বর্গে, ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী;
 অঙ্গুরীর নৃত্যলোল ঘণিবন্ধে কঙ্কণবন্ধনে
 পেতে দোল তালে তালে; পূর্ণিমার অমল চন্দনে
 মাখা হয়ে নিঃস্বাসিতে চন্দ্রমার বক্কোহার-পরে।
 অদূরে কঙ্কর-রুদ্ধ লৌহপথে কঠোর ঘর্ঘরে
 চলেছে আশ্রয়রথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায়
 ঐশ্বর্য্য বিস্তারি বেগে; কটাক্ষে কেহ না ফিরে চায়
 অধর্ম্মলাহীন তোমাপানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া,
 স্বর্গের দুলালী। যবে নাট্যমন্দিরের পথ দিয়া
 বেসদর অসদর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী
 দক্ষিণ বায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ-কিঙ্কণী
 বসন্তবন্দনানৃত্যে—অবজিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে,
 ঐশ্বর্য্যের ছন্দবেশী ধূলির দঃসহ অহংকারে
 হানিয়া মধুর হাস্য; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত
 ক্রান্তিহীন সৌন্দর্য্যের আশ্রয়হারা অজস্র অমৃত
 করেছে নিঃশব্দ নিবেদন।

মোর মৃদু চিস্তায়

সেইদিন অকস্মাৎ আমার প্রথম পরিচয়
 তোমা-সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহন গীতে
 প্রণমিয়া, উপেক্ষিতা, শূন্যক্ষেপে কৃতজ্ঞ এ চিতে
 পদার্পিলে অক্ষয় গৌরবে। সেইক্ষণে জানিলাম,
 হে আশ্রয়বিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
 সকলেই ভুলে গেছে, সে নাম প্রকাশ নাহি পায়
 চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে পণ্ডিতের পুণ্ডির পাতায়;
 গ্রামের গাথার ছন্দে সে নাম হয় নি আজো লেখা,
 গানে পায় নাই সদর।—সে নাম কেবল জানে একা
 আকাশের সর্ব্বদেব, তিনি তাঁর আলোকবীণায়
 সে নামে ঝংকার দেন, সেই সদর ধূলিরে চিনায়
 অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য তার; সে সদরে গোপন বার্তা জানি
 সম্বধানী বসন্ত হাসে। স্বর্গ হতে চুরি করে আনি
 এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কুটির-কানাচে
 কটুনায়ে লুকাইয়া, হঠাৎ পড়িস ধরা পাছে।
 পণ্ডের কৰ্কশধ্বনি এ নামে কদর্য আশ্রয়
 রচিয়াছে; তাই তোরে দেবী ভয়তীর পশ্চবন
 মানে নি স্বজাতি বলে, ছন্দ তোরে করে পরিহার—
 তা বলে হবে কি ক্ষুদ্র কিছ্রমাত্র তোর শূচিভার।
 সূর্য্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছ্র কিছ্র চিনি,
 কুর্চি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

শান্তিনিকেতন

১০ বৈশাখ ১৩৩৪

শাল

প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবাগিকায় আমার সেদিনকার এক কিশোর কবি-বন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সন্ধ্যায়ে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাতি, আশ্রম-বাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুণির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে। সে কবি আজ ইহলোকে নেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রিয়সঙ্গের কত ধারা কত নিভৃত পথ দিয়ে চলেছে। এই স্তম্ভ তরুশ্রেণীর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন করে আরো অনেক বয়ে গেছে, আরো অনেক বইবে। আমরা চলে যাব কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি— তেমনি ঐ শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।

বাহিরে যখন ক্ষুদ্র দক্ষিণের মদির পবন
অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা; যবে কিংবদন্তের বন
উচ্ছ্বল রক্তরাগে স্পর্ধায় উদ্যত; দিশিদিশি
শিমূল ছড়ায় ফাগ; কোকিলের গান অহর্নিশ
জানে না সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্বনাশে
স্থলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে
আসি আমি হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারশি
পুঞ্জিত করেছ অপ্রভেদী, যেথা রয়েছ বিকালি
দিগন্তে গম্ভীর শান্তি। অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ উদ্বীর্ণরে:
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। অম্বকারে
নিঃশব্দ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ী বেয়ে পাখার সঞ্চারে;
সে অমৃত মন্ত্রতেজ নিজে ধরি সর্বলোক হতে
নিভৃত মর্মের মাঝে; জ্ঞান করি আলোকের স্রোতে
শুনি নিজে নীল আকাশের শান্তিবাণী; তার পরে
আত্মসমাহিত ভূমি, স্তম্ভ ভূমি—বৎসরে বৎসরে
বিশ্বের প্রকাশযজ্ঞে বারংবার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমন্ডলু হতে অফুরান
পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা; সে ধারা চলেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল উষ্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দূর শতাব্দীরে
শূনাতে মর্মের আশীর্বাণী। রাজার সাম্রাজ্য কতশত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বৃদ্ধবৃদ্ধের মতো,
মানুষের ইতিবৃত্ত সদৃশ্য গৌরবের পথে
কিহুদর যায়, আর বারংবার ভ্রূনচূর্ণ যথে
কীর্ণ করে ধূলি। তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি,
ওগো মহা শাল, তুমি সর্বাঙ্গাল কর্তার অতিথি;
আকাশেরে দাও সজ্জ কর্তার শাসন ভাগিতে,
বাতাসেরে দাও সৈন্যী পক্ষের মর্মসংশ্লীষে,
মজারীর পশুর পদে। যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,

শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখি; যায় তারা পথ বাহি
 আসন্ন বিস্মৃতি পানে, উদাসীন ভূমি আছ চাহি।
 নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অঙ্কগুটি
 অস্তিত্বের আবর্তনে দ্রুতবেগে চলে তারা ছুটি;
 মর্ত্যপ্রাণ তাহাদের কণেক পরণ করে যেই
 পায় তারা জপনাম, তার পরে আর তারা নেই,
 নেমে যায় অসংখ্যের তলে। সেই চলে-যাওয়া দল
 রেখে দিয়ে গেছে যেন কণিকের কলকোলাহল
 দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপা ওই তব পত্রের কল্লোলে,
 শাখায় দোলায়। ওই ধ্বনি স্মরণে জাগারে তোলে
 কিশোর বন্ধুরে মোর। কতদিন এই পাতাঝরা
 বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
 সারাহে দৃষ্ণনে মোরা ছায়াতে অন্ধিত চন্দ্রালোকে
 ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মৃদু চোখে
 বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্ডার রঙে রাঙা;
 যৌবন-ভূষান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
 জ্যোৎস্নামৃদু রজনীর সৌহারদের সুধারসধারা
 তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হলে গেল সারা।
 গভীর আনন্দকণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
 একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
 আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
 বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।

প্রীতিমিলনের কণে
 সেদিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ষে বর্ষে দোলা দিত
 যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত।
 তোমার বীথিকাতলে তার মৃদু জীবনপ্রবাহ
 আনন্দচঞ্চল গতি মিলিয়েছে আপন উৎসাহে
 পুষ্পিত উৎসাহে তব। হার, আজি তব পদমোলে
 সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্তকল্লোলে,
 পূর্ণিমার পূর্ণতার, দেবতার অমৃতের দানে
 মর্ত্যের বেদনা মেশে।

চাহি' আজ দূর পানে
 স্বপ্নছবি চোখে ভাসে—ভাবী কোন্ ফাল্গুনের রাতে
 দোলপূর্ণিমার, সাজাতে আসিছে কারা পদ্মপাতে
 পলাশ বকুল চাঁপা, আলিঙ্গনলেখা একে দিতে
 তব ছায়াবোধিকার, বসন্তের আবাহন গীতে
 প্রসন্ন করিতে তব পদপরিধন। সে উৎসবে
 আজিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুপ্তিষ্ঠ নীরবে।
 কোলে তার পড়ে আছে এ রাত্রির উৎসবের ডালা।
 আজিকার অর্ঘ্য আছে স্বপ্নগুলি সূরে-গাথা মালা,
 কিছ্র তার লুকায়েছে, কিছ্র তার আছে অজলিন;
 দূরেকটি ফুলে নিল যাত্রীদল; সে-দিন এ-দিন

দৌছে দৌহা মৃদু চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা—
নতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হল বসন্তের পালা।

[শান্তিনিকেতন]
৮ ফাল্গুন ১৩৩৪

মধুমঞ্জরী

এ লতার কোনো-একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে—জানি নে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরের যে দেবতা মূর্ত্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিদেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি। তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই। এদেশের হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশি নামে একে আপন করে নিলেম।

প্রত্যাশী হয়ে ছিন্দু এতকাল ধরি,
বসন্তে আজ দুরারে, আ মরি মরি,
ফুল-মাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি
মধু-মঞ্জরীলতা।
কতদিন আমি দেখিছে এসেছি প্রাতে
কিচি ডালগুদালি ভরি নিম্নে কিচি পাতে
আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে
কহিতে চেয়েছে কথা।

কতদিন আমি দেখেছি গোমুণিকালে
সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে,
সন্ধ্যাবাসর মৃদু-কাঁপনের তালে
কী যেন ছন্দ শোনে।
গহন নিশীথে ঝিল্লি যখন ডাকে,
দেখেছি চাহিয়া জড়িত ডালের ফাঁকে
কালপদুমের ইঞ্জিত যেন কাকে
দূর দিগন্তকোণে।

প্রাষণে সঘন ধারা ঝরে ঝরঝর
পাতার পাতার কেঁপে ওঠে ধরধর,
মনে হয় ওর হিয়া যেন ভরভর
বিশ্বের বেদনাতে।
কত বার ওর মর্ম গিয়েছি চাপি,
যদিও পেয়েছি কেন উঠে চঞ্চলি,
শরৎশিশিরে যখন সে কলমলি
শিহরায় পাতে পাতে।

ভুবনে ভুবনে যে প্রাণ সীমানাহারা
 গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
 পল্লবপদে ধরি লয় তারি ধারা,
 মঞ্জায় লহে ভরি।
 কী নিবিড় যোগ এই বাতাসের সনে,
 যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে,
 সে পলকখানি কত-যে সে মোর মনে
 বৃকিব কেমন করি।

বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে—
 ঋতুর হাতের মায়ামণ্ডের টানে
 কী-যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ওই জানে,
 মন তা জানিবে কিসে।
 যে ইন্দ্রজাল দালোকে ভুলোকে ছাওয়া,
 বৃকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া—
 বৃকিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
 চেরে থাকি অনিমিষে।

ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
 নিখিলবাণীর রসের পরশামৃত
 গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত
 ধরিতে না পারে তারে।
 ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা,
 ধরণীর ধন গগনের মন-হরা,
 শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
 ঝংকারে ঝংকারে।

আমার দুরারে এসেছিল নাম ভুলি
 পাতা-কলমল অঙ্কুরখানি ভুলি
 মোর আঁখিপানে চেরেছিল দুলি দুলি
 করুণ প্রসন্নরতা।
 তারপরে কবে দাঁড়াল যেদিন ভোরে
 ফুলে ফুলে তার পরিচয়লিপি ধরে
 নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন করে
 মধুমঞ্জরীলতা।

তারপরে যবে চলে যাব অকণ্ঠে
 সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
 তখনো আগায়ে বলন্ত কিরে এসে
 ফুল-কোঁটার ব্যথা।

বরষে বরষে সেদিনও তো বায়ে বায়ে
এমনি করিয়া শূন্য ঘরের দ্বারে
এই লতা মোর আনিবে কুসুমভারে
ফাগুনের আকুলতা।

তব পানে মোর ছিল যে প্রাণের প্রীতি
ওর কিশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি,
মধুর গন্ধে আভাসিবে নিতি নিতি
সে মোর গোপন কথা।
অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্মূলে;
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক্ ওর ফুলে
মধুমঞ্জরীলতা।

[শান্তিনিকেতন]
চৈত্র ১০০০

নারিকেল

সমুদ্রের ধারের জমিতেই নারিকেলের সহজ আবাস। আমাদের আগ্রহের মাঠ সেই সমুদ্রকূল থেকে বহুদূরে। এখানে অনেক ঘন্টে একটি নারিকেলকে পালন করে তোলা হয়েছে—সে নিঃসঙ্গ নিষ্ফল নিস্তেজ। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন প্রাণপণে ঝুজু হয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত অতিক্রম করে কোনো-এক আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবার চেষ্টা করছে। নির্বাসিত তরুর মঞ্জার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা। এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই, গাছের শিকড় তার বাহ্যিক রস এখানে সন্ধান করছে, পাচ্ছে না; সে উপবাসী, ধরণীর কাছে তার কাম্যার সাড়া মিলছে না। আকাশে উদ্যত হয়ে ওঠে তার যে-সন্ধানদৃষ্টিতে সে দিগন্তপারে পাঠাচ্ছে, দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় সেই তার সন্ধানেরই সজীব মূর্তির মতো পাখি তার দোদুল্যমান শাখায় প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে। আজ বসন্তে প্রথম কোকিল ডেকে উঠল। দক্ষিণ হাওয়ার আজ কি সমুদ্রের বাণী এসে পৌঁছল, যে বাণী সমুদ্রের কূলে কূলে বধির মাটির সূপ্তিকে নিরন্তর অশান্ত তরঙ্গমন্দ্রে আন্দোলিত করে তুলছে। তাই কি আজ সেই দক্ষিণ সমুদ্র থেকে তার তান্ডবনৃত্যের স্পর্শ এই গাছের শাখায় শাখায় চঞ্চল। সমুদ্রের রুদ্ধ ডমরুর জাগরণী কি এরই পল্লব মর্মরে তার কণিণ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে। বিরহী তরু কি আজ আপন অন্তরে সেই সদূর বন্ধুর বার্তা পেল, যে বন্ধুর মহাগানে অভিনন্দিত হয়ে কোন্ অতীত যুগে একদিন কোনো প্রথম নারিকেল প্রাণবাণীরূপে জীবলোকে যাত্রা শুরুর করেছিল? সেই যুগারম্ভ প্রভাতের আদিম উৎসবে মহাপ্রাণের যে স্পর্শপূজক জেগেছিল তাই আজ ফিরে পেয়ে কি ঐ গাছটির সংবৎসরের অবসাদ আজ বসন্তে ঘুচল। তার জীবনের জয়পতাকা আবার আজ কি ঐ নব-উৎসাহে নীলস্বরে আন্দোলিত। যেন একটা আচ্ছাদন উঠে গেল, জ্বর মঞ্জার মধ্যে প্রাণশক্তির যে আশ্বাসবাণী প্রজ্বর হয়েছিল তাকেই আজ কি ফিরে পেলে, যে বাণী বলছে—‘চলো প্রাণতীর্থে, জয় করো মৃত্যুকে।’

সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
 নিঃসঙ্গ প্রবাস তব নারিকেল—দিনরাতি কাটে
 যে প্রচ্ছন্ন আকাশায় বৃষ্টিতে পার না তাহা নিজে।
 দিগন্তেরে অতিক্রম দেখিতে চাহিছ তুমি কী-ষে
 দীর্ঘ করি দেহ তব, মজ্জায় রয়েছে তার স্মৃতি
 গঢ় হয়ে। মাটির গভীরে যে রস খুঁজিছ নিতি
 কী স্বাদ পাও না তাহে, অশ্রু তার কী অভাব আছে,
 তাই তো শিকড় উপবাসী কাদে ধরণীর কাছে।
 আকাশে রয়েছে চেয়ে রাত্রিদিন কিসের প্রত্যাশে
 বাক্যহারা! বারবার শূন্য হতে ফিরে ফিরে আসে
 তোমারি সম্ভানরূপী সম্ভ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাখি
 লম্বিত শাখায় তব।

ওই শূন্য উঠিয়াছে ডাকি
 বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এল প্রাণে
 দক্ষিণ পবন হতে, যে বাণী সমুদ্র শূন্য জানে;
 পৃথিবীর কূলে কূলে যে বাণী গম্ভীর আন্দোলনে
 বধির মাটির সন্নিহিত কাঁপায়ে তুলিছে প্রতিধ্বনে
 অশান্ততরঙ্গমন্দে, দক্ষিণ সাগর হতে একি
 তান্ডবনৃত্যের স্পর্শ শাখার হিম্মলে তব দেখি
 মৃদুমৃদু চঞ্চলিত।

রুদ্ধমরুর জাগরণী
 পল্লবমর্মরে তব পেয়েছে কি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
 কান পেতে ছিলে তুমি—হে বিরহী, বসন্তে কি আজি
 সুদূর বন্ধুর বার্তা অন্তরে উঠিল তব ব্যক্তি—
 যে বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্যের আলোতে
 রোমাঞ্চিত বাহিরিলে প্রাণযাত্রী, অন্ধকার হতে?
 আজি কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের পরলহর্ষ সেই
 যুগারম্ভ প্রভাতের আদি-উৎসবের। নিমেষেই
 অবসাদ দূরে গেল, জীবনের বিজয়পতাকা
 আবার চঞ্চল হল নীলাম্বরে, খুলে গেল ঢাকা,
 খুঁজে পেলে যে আশ্বাস অন্তরে কহিছে রাত্রিদিন—
 'প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, প্রান্তিকান্তিহীন।'

[শান্তিনিকেতন]
 ১৬ ফাল্গুন ১৩০৪

চামেলি-বিতান

চামেলিবিতানের নীচের ছায়ায় আমি বসতুম—মরুর এসে বসত উপরে, লতার আশ্রয়-
 বেষ্টনী থেকে পড়ছ কদলি। জানি সে আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করত না, কিন্তু
 সৌন্দর্যের যে অধ্যাত্ম সে বহন করে বেড়াত, তার অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি
 প্রতিদিন গ্রহণ করোঁছি। এমন অসংকোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এতে আমি কৃতজ্ঞ

ছিলুম, সে যে আমাকে ভয় করে নি এ আমার সৌভাগ্য। আরও তার কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গিনী ছিল কিন্তু দূরের দূরায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে এসেছি সেই চার্মেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায়। বাইরে থেকে এই পরিবর্তনগুলি বেশি কিছু নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। শুনোছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো-এক নদীগর্ভজাত শ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই শ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারে নি, অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে, পার্শ্ববর্তী শ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারত। বাস্মীকির শাপকে এ যুগের কবি পুনরায় প্রচার না করে থাকতে পারল না।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং স্বং
অগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ।

ময়ূর, কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকঝক,
বটের উঠেছে কচি পাতা,
হোথায় দূয়ার থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে,
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।
লিখিতেছি নিজ মনে—
হেরি' তাই অধিকোণে
অবজায় ফিরে যাও চল,
বোঝ না, লেখনী ধরি
কী যে এত খুটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি।

সেই ভালো জান যদি তাই,
তাহে মোর কোন খেদ নাই।
তবু আমি খুশি আছি,
আস তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি কর হাস।
যদিও মানব, তবু
আমারে কর না কড়ু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস।

সুন্দরের দূত তুমি,
এ ধূলির মর্ত্যভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আন—

তবুও বধি না তোরে,
 বর্ষি না পিজরে ধরে,
 এও কি আশ্চর্য নাহি মান।

কাননের এই এক কোণা,
 হেথায় তোমার আনাগোনা।
 চামেলি-বিতানতল
 মোর বসিবার স্থল,
 দিন যবে অবসান হয়।
 হেথা আস কী যে ভাবি,
 মোর চেয়ে তোর দাবি
 বেশি বই কম কিছুর নয়।
 জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
 হেথা আল্পনা আঁকে,
 এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।
 কচি পাতা যে বিশ্বাসে
 শ্বিধাহীন হেথা আসে,
 তোমার তেমনি অধিকার।

বর্ণহীন রিঙ মোর সাজ,
 তারি লাগি পাছে পাই সাজ,
 বর্ণে বর্ণে আমি তাই
 ছন্দ রচিবারে চাই,
 সুরে সুরে গীতচিহ্ন করি।
 আকাশেরে বাসি ভালো,
 সকাল-সন্ধ্যার আলো
 আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।
 ধরায় যেখানে, তাই,
 তোমার গৌরব-ঠাই
 সেথায় আমারো ঠাই হয়।
 সুন্দরের অনুরাগে
 তাই মোর গর্ব লাগে,
 মোরে ভুজি কর নাই ভয়।

তোমার আমার তরে জানি
 মধুরের এই রাজধানী।
 তোর নাচ, মোর গীতি,
 রূপ তোর, মোর প্রীতি,
 তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা—
 শোভনের নিমন্ত্রণে
 চলি যোরা দ্বাইজনে,
 তাই দুই আমার আপনা।

সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভাঙ্গা,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি-যে লক্ষ্য না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার।

নাশ করে যে আগ্নেয় বাণ
মুহুর্তে অমল্য তোর প্রাণ—
তার লাগি বসুন্ধরা
হয় নি সবুজে ভরা,
তার লাগি ফুল নাহি ধরে।
যে বসন্তে প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
সে বসন্ত নহে তার তরে।
ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠে বেজে
অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ধূমাক্কর অবিশ্বাস
বিশ্ববন্ধে হানে চাস,
কুটিল সংশয় কদাকার।

সৃষ্টিছাড়া এই-যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
পুণ্য পৃথিবীর শিরে—
তার লজ্জা তুই কি রে
আনিতে পারিবি তোর মনে।
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা
সৌন্দর্যেরে দেয় বাধা
কেন যে তা বদ্বিষি কেমনে।
কেন যে কদম্ব জ্বালা
বিধাতার ভালোবাসা
বিদূষে করিছে ছারখার,
যে হস্ত দানেরই তরে
তারি রক্তপাত করে,
সেই লজ্জা নিখিলজ্ঞতার।

পরদেশী

পিয়র্সন কয়েক জোড়া সবুজ রঙের বিদেশী পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি, কিংবা এখানকার অন্য আশ্রমিক পশুপাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙা হাঙামা ঘটে নি।

এনেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখি আমার বনে,
সকাল-সাঁঝে কুজমাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।
অজানা এই সাগরপারে
হল না তার গানের কতি।
সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেলে
বিদেশী পাখি গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে।

বটের ফলে আরতি তার,
রয়েছে লোভ নিমের তরে,
বন-জামেরে চণ্ড তার
অচেনা বলে দোষী না করে।
শরতে হবে শিল্পির বায়ে
উজ্জ্বলিত শিল্পিবীধি,
বাণীরে তার করে না স্মান
কুহেলিঘন পুরানো স্মৃতি।
শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধুকাঙালি লোভীর মেলা,
চিরমধুর বঁধুর মতো
সে ফুল তার হৃদয় হরে।

বেগুনবনের আগের ডালে
চটুল ফিঙা যখন নাচে
পরদেশী এ পাখির সাথে
পরানে তার ভেদ কি আছে।
উষার ছোঁয়া জাগায় ওরে
ছাতিমশাখে পাতার কোলে,
চোখের আগে যে ছবি জাগে
মানে না তারে প্রবাস বলে।

আলোতে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চির-জানারই লীলা,
মান্নের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে।

[শান্তিনিকেতন]
৮ বৈশাখ ১৩৩৪

কুটিরবাসী

তরুণবাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টিত করে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

তোমার কুটিরের
সমুখবাটে
পল্লীরমণীরা
চলেছে হাতে।
উড়েছে রাঙা ধূলি, উঠেছে হাসি—
উদাসী বিবাগীর চলার বাঁশ
আঁধারে আলোকেতে
সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের
বুকেতে বাজে।

যা-কিছু আসে যায়
মাটির 'পরে
পরশ লাগে তারি
তোমার ঘরে।
ঘাসের কাঁপা লাগে, পাতার দোলা,
শরতে কাশবনে তুফান-তোলা,
প্রভাতে মধুপের
গদ্‌গদনানি,
নিশীথে ঝিঁঝিঁরবে
জাল-বুনানি।

দেখোঁছ ভোরবেলা
কিরিছ একা,
পথের ধারে পাও
কিসের দেখা।

সহজে সুখী তুমি জানে তা কেবা,
ফুলের গাছে তব স্নেহের সেবা;
এ কথা কারো মনে
রবে কি কালি,
মাটির 'পরে গেলে
হৃদয় ঢালি।

দিনের পরে দিন
যে দান আনে
তোমার মন ভারে
দেখিতে জানে।
নম্র তুমি, তাই সরলচিত্তে
সবার কাছে কিছ্ পেয়েছ নিতে,
উচ্চ-পানে সদা
মেলিয়া আঁধি
নিজেরে পলে পলে
দাও নি ফাঁকি।

চাও নি জিনে নিতে
হৃদয় কারো,
নিজের মন তাই
দিতে যে পার।
তোমার ঘরে আসে পশ্চিকজন,
চাহে না জ্ঞান তারা, চাহে না ধন,
এটুকু বন্ধে যায়
কেমনধারা
তোমারি আসনের
খরিক তারা।

তোমার কুটিরের
পদকুর পাড়ে
ফুলের চরাগর্দলি
ষতনে বাড়ে।
তোমারো কথা নাই, তারাও বোঝা,
কোমল কিশলয়ে সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও, তবু
মুখ না খোলে,
সহজে বোঝা যায়
নীলব বলে।

তোমারি ঘড়ো তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিররেতে তালের গাছে
বিরল পাতাকটি আলোয় নাচে,
সমুখে খোলা মাঠ
করিয়ে ধু ধু,
দাঁড়িয়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।

তোমার বাসাখানি
অঁটিয়া মৃতি
চাহে না অঁকিড়িতে
কালের ঝড়ি।
দেখি যে পথিকের মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার সীমার থাকে।
ফুলের মতো ও যে,
পাতার মতো,
যখন যাবে, রেখে
যাবে না কত।

নাইকো রেবারেবি
পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
সহজে করে।
কীর্তিভালে ঘেরা আমি তো ভাবি,
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি:
হারারে ফেলোছি সে
অর্পিবারে,
অনেক কাজে আর
অনেক দারে।

হাসির পাথের

তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয়ে চলেছেন ডালহৌসি
পাহাড়ে। সকালবেলার ডান্ডি চড়ে বেরতুম, অপরাহ্নে কাকবাংলার বিশ্রাম হত। আশু-ও
মনে আছে এক জারগার পথের ধারে ডান্ডিওরালার ডান্ডি নামিয়েছিল। সেখানে
শ্যাওলার খ্যামল পাথরগুলো উপর দিগে গুহার ভিতর থেকে বর্ণনা নেমে উপত্যকার
কলগন্ধে করে পড়ছে। সেই প্রথম দেখা বর্ণনার রহস্য আমার মনকে প্রবল করে

টেনেছিল। এদিকে ডানপাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্যখেত হালদে ফুলে ছাওয়া, দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না—কেবলি ডাবি এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ কেন হয়। সেই ঝর্ণা কোন্ নদীর সঙ্গে মিলে কোথায় গেছে জানি নে কিন্তু সেই মূহূর্তকালের প্রথম পরিচয়টুকু কখনো ভুলব না।

হিমালয় গিরিপথে চলেছিলাম কবে বালাকালে
মনে পড়ে। ধূজটিঁর তান্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি-পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঞ্জিত যেথা স্তম্ভ রহে শূন্যে অবলীন,
ভূষারনিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন বর্ণনাবিহীন।

সেদিন বৈশাখমাস, খন্ড খন্ড শস্যক্ষেত্রে
রৌদ্রবর্ণ ফুল: মেঘের কোমল ছায়া তারি 'পরে
যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রলংসার স্বাক্ষর ভালোবেসে।
সেইদিন দেখেছিলাম নিবিড় বিষ্ণুরম্বন্ধ চোখে
চঞ্চল নিরঞ্জনধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাণ্মীকির
উচ্ছ্বাসিত অনন্দভেদ। স্বর্গে যেন সদরসুন্দরীর
প্রথম যৌবনোন্মাস, নৃপনুরের প্রথম স্বংকার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিষ্ণুর আপনার,
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অপ্রান্ত সম্মান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

সেদিনের যাত্রাপথ হতে

আসিয়াছি বহুদূরে; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে হাসি
শৈলশিখরের দূর নির্মল শূভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিজ্বলে বাজে
কঠিন বাধায় কীর্ণ লক্ষ্যের সংকুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি অবহেলা। সে হাসি দেখেছি যিস
শস্যভরা তটছায়ে কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বাসি
পূর্ণবেগে। দেখেছি অজ্ঞান তারে ভীর রৌদ্রদাহে
শূঙ্ক শীর্ণ দৈন্য-দিনে বহি দ্বার অক্লান্ত প্রবাহে
সৈকতিনী, রক্তচক্ৰ বৈশাখে নিঃশব্দ কৌতুকে
কটাক্ষরা—অফুরান হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে।



ଦକ୍ଷିଣାପଣ ଉତ୍ସବ
ନନ୍ଦଲାଲ ବସୁ - କୃତ

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি
ধরিষ্ঠীরে করে দান যে অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত, গতিপথে নিঃশেষ পাথের,
নিঃসীম সাহসবেগ, উল্লসিত অপ্রান্ত অঙ্গের।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৩৪

বৃক্ষরোপণ উৎসব

গান

১

মরুবিজ্ঞরের কেতন উড়াও পুন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুন্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনীর মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধরনিয়া মর্মের তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্পবে,
হে মোহন প্রাণ।

পাখিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি'
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষার জাগাও শাখার গানের আশা,
সন্ধ্যার আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুস্তগীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ।

২

আর আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুণ,
মানবের স্নেহসঙ্গ নে,
চল, আমাদের ঘরে চল।
শ্যামবিক্রম ভগ্নিতে
চঞ্চল কলসংগীতে
স্বারে নিরে আর শাখার শাখার
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।

তোদের নবীন পল্লবে
 নাচুক আলোক সবিভার,
 দে পবনে বনবল্লভে
 মর্মর গীত উপহার।
 আজ প্রাণের বর্ষণে
 আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
 পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
 অমরাবতীর ধারাজল।

ক্ষতি

বন্ধের ধন হে ধরণী, ধরো
 ফিরে নিয়ে তব বন্ধে।
 শূভদিনে এরে দীক্ষিত করো
 আমাদের চিরসখো।
 অন্তরে পাক কঠিন শক্তি,
 কোমলতা ফুলে পড়ে,
 পক্ষীসমাজে পাঠাক পটী
 তোমার অমসত্রে।

অপ

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
 মেঘের অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
 জাগরুক এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এরে ডেকে
 বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা-অভিষেকে।

ভেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি হে আলোক—
 এ নব তরুতে তব শূভসংস্পর্শ হোক।
 একদা প্রচুর পদ্যে হবে সার্থকতা
 উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
 সিন্ধু পল্লবের তলে তব ভেজ ভরি
 হোক তব জলধানি অন্তর্য্যামি।

ময়দুঃ

হে পবন কর নাই গোণ,
আঘাতে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সংগীত দিয়ে এরে ভিক্ষা।
দিয়ে তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লবহিল্লোল শিক্ষা।

যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামলমূর্তি
আলোক-অমৃতে ধুঁজিছে প্রাণের পূর্তি।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরু-তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য।

মাসালিক

প্রাণের পাথের তব পূর্ণ হোক হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক সূর্যাসিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাঙারেতে করুক সপ্তয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা
প্রাণ বর্ষণযজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ে; বর্ষে বর্ষে পুষ্কিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইরো বর্ষাগীতিকায়,
সন্ধ্যাবন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জবীথিকায়
মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপদ হতে
প্রাণমাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাগণে তব। সে বৃক্ষের নতুন অতিথি

বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণমহোৎসবে
 আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
 দিকে দিকে বিস্তরনে। আজি এই আনন্দের দিন
 তোমার পঙ্কজপদে পদে তব হোক মৃত্যুহীন।
 রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগীত তোমার মঙ্গলে
 মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্বপরিমলে।

শান্তিনিকেতন
 ১০ জুলাই ১৯২৮

সংযোজন

বসন্ত-উৎসব

এ বৎসর দোলপূর্ণিমা ফাল্গুনে পার হয়ে চৈত্রে পৌঁছল। আমার মদকুল নিঃশেষিত, আমবাগানে মোঁমাছির ভিড় নেই, পলাশ-ফোটার পালা ফুরল, গাছের তলায় শুকনো শিমূল তার শেষ মধু পিপড়েদের বিলিয়ে দিলে বিদায় নিয়েছে। কাণ্ডনশাখা প্রায় দেউলে, ঐশ্বৰ্যের অল্প কিছু থাকি। কেবল শালের বীথিকা ভরে উঠেছে মঞ্জরীতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা ঋতুরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলে এই পদ্পিত শালের বনে, তার বন্ধলে আঁবির মাথিয়ে দিলে, তার ছায়ার রাখলে মাল্যপ্রদীপের অর্ঘ্য। চতুর্দশীর চাঁদ যখন অস্তদিগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন অরুণ-আঁবিরের তিলকরেখা ফুটে উঠল, তখন আমি এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত-উৎসবের বেদীর জন্য রচনা করেছি।

আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি,
লহো আমাদের নতি।
তুমি এসেছিলে মোদের সবার আগে
প্রাণের পতাকা রাঙিয়ে হরিৎরাগে,
সংগ্রাম তব কত ঝড়ার সাথে,
কত দুর্দিনে কত দুর্ভোগরাতে
জয়গৌরবে উর্ধ্ব ভুলিলে শির
হে বীর, হে গম্ভীর।

তোমার প্রথম অতিথি বনের পাখি,
শাখায় শাখায় নিলে তাহাদের ডাকি,
স্নিগ্ধ আদরে গানেরে দিলেই বাসা,
মৌন তোমার পেয়েছে আপন ভাষা,
সুখে কিশলয়ে ঘিলন ঘটলে তুমি—
মুখরিত হল তোমার জন্মভূমি।

আমরা যেদিন আসন নিলেম আসি
কহিল স্বাগত তব পল্লবরাশি,
তার পর হতে পরিচর নব নব
দিবসরাশি ছায়াবীথিতলে তব
মিলিল আসিরা নানা দিগ্দেশ হতে
ভরুণ জীবনস্রোতে।

বৈশাখতাপ শান্ত শীতল করো,
নববর্ষারে করি দাও ধনতরু,
শুভ্র শরতে জেয়ন্তনার রেখাগুলি
ছায়ার মিলারে সাজাও বনের ধূলি,

মধুলক্ষ্মীরে আনিয়াছে আহ্বানি
মঞ্জরীভরা সুন্দর তব বাণী।

নীরব বন্ধু, লহো আমাদের প্রীতি,
আজি বসন্তে লহো এ কবির গীতি,
কোকিলকাকলি শিশুদের কলরবে
মিলেছে আজি এ তব জয়-উৎসবে,
তোমার গঞ্ধ মোর আনন্দে আজি
এ পদ্যাদিনে অর্ঘ্য উঠিল সাজি।

গম্ভীর তুমি, সুন্দর তুমি, উদার তোমার দান,
লহো আমাদের গান।

শান্তিনিকেতন
দোলপূর্ণিমা ১৩৩৮

পরিশেষ

আশীর্বাদ

শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন

করকমলে

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতশ্রোতে রসবন্যাবেগে;
কভু বহুবাহি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল; কত রশ্মিজ্বটা
প্রভুষে দিনের অন্তে রাখে তারি 'পরে
আলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্ব্ববারে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষগধারা গিয়েছে ছড়ারে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে;
দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিভা আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণাম

অর্থ কিছু বর্ষি নাই, কুড়ারে পেরেছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশখানি
যাত্রাপথে। সে প্রভু্যে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষেত্রে লভিল পূজক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনছায়ার। মহামৌন পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
ভুলিল হিম্মোলদোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অজ্ঞেয় দূর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিল। শূন্য মোর রাতিদিন,
শূন্য মোর আনমনে পথ-চলা হল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয় নি সপ্তম করা, অধরার গেছি পিছ পিছ।
আমি শূন্য বাঁশিতে ভরিয়ছি প্রানের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুণি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল কোটাবার আগে
ফাগুনে তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিল তারে মোর মৃদু রাগিণীতে
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূর্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপদে
রবিরশ্মি নামে যবে, তুণে তুণে অন্ধুরে অন্ধুরে
যে নিঃশব্দ হৃদয়ধনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনে উৎসারিয়া
এ বাঁশির রঞ্জে রঞ্জে; যে খিরাট গুঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনামন্ত্র জপে—আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেরেছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোরকোরক মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশ্লিষ্ট তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশির কলস্বনা।
চেতনাসিঁদুর ক্ষুদ্র তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উল্লসের অট্টহাস্যলনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিরে কলরলরোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছারারৌদ্র সে দেলার দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্ধতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা। নিখিলের অন্তর্ভূতি
, সংগীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।

এই গীতিপথপ্রাপ্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সাম্ব্যাক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
৬ এপ্রিল ১৯৩১

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মারের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলারে কেশ
বাজালে বাঁশি চূপে,
সে মায়াসূরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে:
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায় গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে।

নারিকেলের ডালের আগে
দুপদুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইশারা তারি লাগিত মোর প্রাণে,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কী বলে তারা কে বলো তাহা জানে।
অর্থহারা সূরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
কলিত মনে অধাক বাণী,
শিশির যেন তুণে।
প্রভাত-আলো উঠিত কেঁপে
পুলকে কাঁপা বৃকে,
বারংহীন নাচিত হিরা
কারণহীন সূখে।

জীবনধারা অক্লে ছোটে,
দুঃখে সূখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেরা,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কালো গগনে ভেকেছে ঘন দেয়া।

প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে
 বাজালে তুমি বীন,
 ব্যথার মোর জাগারে দিবে
 তারের ঝিনঝিন।
 পালের 'পরে' দিবেছ বেগে
 সুরের হাওয়া তুলে,
 সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
 অপূর্বেরই কূলে।

চৈত্রমাসে শুক্ল নিশা
 জুঁহি-বেলির গন্ধে মিশা;
 জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে
 বিচিহ্না, হে বিচিহ্না,
 অনিদ্রারে আকুল করি তোলে।
 ঘোবনে সে উতল রাতে
 করুণ কার চোখে
 সোহিনী রাগে মিলাতে মীড়
 চাঁদের ক্ষীণালোকে।
 কাহার ভীরু হাসির 'পরে'
 মধুর ম্বিধা ভরি
 শরমে-ছোয়া নয়নজল
 কাঁপাতে থরথরি।

হঠাৎ কভু জাগিয়া উঠি
 ছিন্ন করি ফেলেছ টুটি
 নিশীথিনীর মৌন স্ববনিকা,
 বিচিহ্না হে, বিচিহ্না,
 হেনেছ তারে বহ্নানলগিহা।
 গভীর রবে হাঁকিয়া গেছ
 'অলস থেকে না গো'।
 নিবিড় রাতে দিবেছ নাড়া,
 বলেছ 'জাগো জাগো'।
 বাসরঘরে নিবালে দীপ,
 ঘুচালে ফুলহার,
 ধূলি-আঁচল দুলায়ে ধরা
 করিল হাহাকার।

বুকের গিরা ছিন্ন করে
 ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
 কখনো পূজা শোভন শতদলে,
 বিচিহ্না, হে বিচিহ্না,
 হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।

ফসল যত উঠেছে ফলি
 বন্ধ বিভেদিয়া
 কলা-কলার তোয়ারি পায়
 দিগেছি নিবেদিয়া।
 তবুও কেন এনেছ ডালি
 দিনের অবসানে।
 নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
 নিঃস্ব-করা দানে।

শান্তিনিকেতন
 ৭ বৈশাখ ১৩৩৪

জন্মদিন

রবিপ্রদীক্ষণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
 হলে আসে সমাপন।

আমার মৃত্যুর
 মালা মৃত্যুকের
 অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
 রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
 হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
 লহো মালাখানি।

উগ্র তব তপের আসন,
 সেখায় তোমারে সম্ভাষণ
 করেছি নু দিনে দিনে কঠিন স্তবনে
 কখনো মধ্যাহ্নরৌদ্রে কখনো বা স্বপ্নের পবনে।
 এবার তপসয় হতে নেমে এসো ভূমি
 দেখা দাও যেথা তব ঘনভূমি
 ছায়াঘন, যেথা তব আকাশ অরুণ
 আষাঢ়ের আভাসে কমল।
 অপরাহ্ন যেথা তার ক্রান্ত অবকাশে
 মেলে শূন্য আকাশে আকাশে
 বিচিত্র বর্ণের যারা; যেথা সম্মুখতারা
 বাক্যহারা
 বাণীবাহি জ্বালি
 নিভুতে সাজায় বসে অনন্তের আরাতির ডালি।
 প্যামল দাক্ষিণ্যে গুরা
 সহজ আতিথেয় বসুন্ধরা
 যেথা স্নিগ্ধ শান্তিময়;
 যেথা তার অকুরান আধুর্ষসগুর
 প্রাপে প্রাপে
 বিচিত্র বিলাস আনে মৃদে মৃদে গানে।

বিশ্বের প্রাণে আজি ছুটি হোক মোর,
 ছিন্ন করে দাও কর্মজোর।
 আমি আজ কিরিব কুড়ারে
 উচ্ছ্বল সমীরণ যে কুসুম এনেছে উড়ারে
 সহজে ধূলার,
 পাখির কুলায়
 দিনে দিনে ভরি উঠে যে সহজ গানে,
 আলোকের ছোঁয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
 এই বিশ্বসস্তার পরশ,
 স্থলে জলে তলে তলে এই গুঢ় প্রাণের হরষ
 তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
 সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
 জাগরণে, ধৈর্যানে, তন্দ্রায়,
 বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
 এ জন্মের গোখলির ধূসর প্রহরে
 বিশ্বরস-সরোবরে
 শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
 দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
 সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
 বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'

শান্তিনিকেতন
 ২০ বৈশাখ ১৩৩৮

পান্থ

শূন্যায়ো না মোরে তুমি মৃদু কোথা, মৃদু করে কই,
 আমি তো সাধক নই,
 আমি কবি, আমি
 ধরণীর অতি কাছাকাছি,
 এ পারের খেলার খাটার।
 সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাটার
 নিত্য বহে নিরে ছায়া আলো,
 মন্দ ভালো,
 ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি
 লাভকতি কামাহাসি—
 এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর জাতিয়া ভাতিয়া;
 সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাতিয়া রাতিয়া,
 পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো;
 কুকুরাভে তারা বড
 জপ করে ধ্যানমগ্ন; অন্তসূর্য রাতিয়া উত্তরী
 • বলাইয়া চলে যায়; সে তরঙ্গের মাঝবীজরী

ভাসায় মাধুরীডালি,
 পাখি তার গান দেয় ঢালি।
 সে তরঙ্গনৃত্যহুন্দে বিচিত্র ভঙ্গিতে
 চিত্র বসে নৃত্য করে আপন সংগীতে
 এ বিশ্বপ্রবাহে,
 সে হুন্দে বন্ধন মোর, মর্দুতি মোর তাহে।
 রাখিতে চাহি না কিছ, অঁকিড়িয়া চাহি না রহিতে,
 ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
 বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
 তরঙ্গীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

হে মহাপাখিক,
 অব্যাহত তব দশ দিক।
 তোমার মন্দির নাই, নাই ম্বর্গধাম,
 নাইকো চরম পরিণাম;
 তীর্থ তব পদে পদে;
 চলিয়া তোমার সাথে মর্দুতি পাই চলার সম্পদে,
 চণ্ডলের নৃত্যে আর চণ্ডলের গানে,
 চণ্ডলের সর্বভোলা দানে—
 আধারে আলোকে,
 সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

২৪ কৈশাখ ১৩০৮

অপূর্ণ

যে ক্ষুধা চক্ষের ঘাঝে, যেই ক্ষুধা কানে,
 স্পর্শের যে ক্ষুধা ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহবানে,
 উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের,
 রক্ত তার কল্লুসম্বানের,
 মনের যে ক্ষুধা চাহে জায়া,
 সঙ্গের যে ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা,
 যে ক্ষুধা উদ্দেশ্যহীন অজানার জাগি
 অন্তরে গোপনে রয় জাগি—
 সবে তারা মিলি নিতি নিতি
 নানা আকর্ষণবেগে গড়ি তোলে মানস-আকৃতি।
 কত সত্য, কত মিথ্য, কত আশা, কত অভিজ্ঞাষ,
 কত-না সংসার তর্ক, কত-না বিশ্বাস,
 আপন রচিত জগে আপনারে পীড়ন কত-না,
 কত রূপে কল্পিত সাক্ষ্যনা—
 মনস্কায় যেকজরে নিজে কটে বেলা,
 পরদিনে ভেঙে করে বেলা,

অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
 জটিল অভ্যাসে পরিণত,
 বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত-না আদেশ
 দেহহীন তর্জনীনীর্দেশ,
 হৃদয়ের গঢ় অভিরুচি
 কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মূর্ছি,
 কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব-তরে
 কত-না আকাশযাত্রা কল্পপঙ্কভরে,
 কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
 সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,
 কত জয় কত পরাভব—
 ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
 ভালো মন্দ সাদার কালোর
 বস্তু ও ছায়ার গড়া মূর্তি ভূমি দাঁড়ালে আলোয়।

জন্মদিনে জন্মদিনে গাথিনির কর্ম হবে শেষ,
 সূখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্রোধ,
 আরম্ভ ও অনারম্ভ, সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
 তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ
 ভূমি-রূপে পূজা হয়ে শেষে
 কয়দিন পূর্ণ করি কোথা গিয়ে মেশে।
 যে চৈতন্যধারা
 সহসা উন্মূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহার্য,
 সে কিসের জাগি—
 নিদ্রায় আঁকল কড়ু, কখনো বা জাগি
 বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি দিল সীমা,
 গড়িল প্রতিমা।
 অসংখ্য এ রচনার উল্ঘাটিছে মহা ইতিহাস,
 যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি প্রাণভূমি
 কে গো ভূমি।
 কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
 কার কাছে ভূমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।
 আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সস্তাধানি
 আপন গদগদ বাণী
 পারে না করিতে ব্যস্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
 বাধা পায় প্রকাশ-আগ্নাহে,
 মাঝখানে থেমে যার মৃত্যুর শাসন।
 তোমার যে সম্ভাষণে
 জানাইতে চেরেছিলে নিখিলের নিজ পরিচয়
 হঠাৎ কি অজ্ঞান বিলয়,

কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা ।
 তবে কেন পলাই সন্দি, খন্ডিড এ অস্তিত্বের ব্যথা ।
 অপূর্ণতা আপনার বেদনার
 পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
 তবে রাতিদিন হেন
 আপনার সাথে তার এত মিলন কেন ।
 ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে মৃদু
 অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মৃদু মৃদু ।
 সে মৃদু না যদি সত্য হয়
 অথ মৃক দৃষ্টি তার হবে কি অনন্ত পরাজয় ।

দার্জিলিং
 ২৪ কার্তিক ১৩৩৮

আমি

আজ ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
 বাহার কলার মোর বাণী,
 বাহার চলার মোর চলা,
 আমার ছবিতে যার কলা,
 যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
 সুরে দঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরানে ।
 ভেবেছিলাম আমাতে সে বাঁধা,
 এ প্রাপের যত হাসা কাদা
 গন্ডি দিয়ে মোর মাঝে
 ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে ।
 ভেবেছিলাম সে আমারি আমি
 আমার জনম বেয়ে আমার ঘরণে বাবে আমি ।

তবে কেন পড়ে মনে, নিবিড় হরষে
 প্রেরসীর দরশে পরশে
 বারে বারে
 পেরেছিলাম তারে
 অতল মাধুরীসিন্ধুতীরে
 আমার অতীত সে-আমিরে ।
 জানি তাই, সে-আমি ভো কন্দী নহে আমার সীমায়,
 পুরাণে বীরের অহিমায়
 আপনা হাঙ্গারে
 তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারারে ।
 সে-আমি হাঙ্গার আমরণে
 লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে,

সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

দিগন্তে বাদলবায়ুবেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাহি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে।
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারংবার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখন্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভূতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বগ্রগামীরে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

তুমি

সূর্য যখন উড়ালো কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিলাম জানতে।
সেই ধ্বনি ধায় বকুলশাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,
সদন্ত কুলায়ে জাগারে সে ধায়
আকাশপথের পাল্লেখ।
অরুণরথের সে ধ্বনি পথের
মন্ড শূন্যে দিলে,
তাই পায়-পায় দৌহার চলায়
ছন্দ গিয়েছে মিলে।

তিমিরভেদন আলোর বেদন
জাগিল বনের বক্ষে,
নবজাগরণ পরশরতন
আকাশে এল অলঙ্কার।
কিশলয়দল হল চঞ্চল,
শিথিলে শিথিল করে কলমল,
সদরলক্ষ্মীর স্বর্গকমল
দলে বিদ্যের চক্রে।

রক্তরঙের উঠে কোলাহল
 পলাশকুঞ্জময়,
 তুমি আমি দৌঁছে কণ্ঠ মিলারে
 গাহিন্দু আলোর জয়।

সংগীতে ভরি এ প্রাণের তরী
 অসীমে ভাসিল রঙ্গে,
 চিনি নাহি চিনি চিরসঞ্জিনী
 চলিলে আমার সঙ্গে।
 চক্ষে তোমার উদ্ভিত রবির
 বন্দনবাণী নীরব গভীর,
 অন্তাচলের করুণ কবির
 ছন্দ বসনভঙ্গে।
 উষারুণ হতে রাঙা গোধূলির
 দূরদিগন্তপানে
 বিভাসের গান হল অবসান
 বিধুর পূরবীতানে।

আমার নয়নে তব অঞ্নে
 ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
 তোমার মন্ড্রে এ বীণাতন্ড্রে
 উল্লাসে সুপবিত্র।
 অতল তোমার চিস্তাগহন,
 মোর দিনগূলি সফেন নাচন,
 তুমি সনাতনী আমিই নতন,
 অনিত্য আমি নিত্য।
 মোর ফাল্গুন হারায় যখন
 আশ্বিনে ফিরে লহ।
 তব অপরূপে মোর নবরূপ
 দলাইছ অহরহ।

আসিছে রাত্রি স্বপনধারী,
 বনবাণী হল শান্ত।
 জলভরা ঘটে চলে নদীতটে
 বধুর চরণ ক্রান্ত।
 নিখিলে খনাল দিবসের শোক,
 বাহির-আকাশে ঝুঁচিল আলোক,
 উজ্জ্বল করি অন্তরলোক
 হৃদয়ে এলে একান্ত।

লুকানো আলোয় তব কালো চোখ
সন্ধ্যাতারার দেশে
ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠাল
জানি না কী উদ্দেশে।

দেখিছি তোমার অঁখি স্নেহময়
নবজাগরিত বিশ্বের।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।
হস্তে আসে যবে যাত্রাবসান
বিমল অঁধারে ধরে দিলে প্রাণ,
দেখিনু মেলেছ তোমার নয়ন
অসীম দূর ভবিষ্যে।
অজানা তারার বাজে তব গান
হারায় গগনতলে।
বন্ধ আমার কঁপে দরুদ দরুদ,
চক্ষু ভাসিল জলে।

প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি।
মোর সংগীতে তুমিই সঙ্গিতে
তোমার নীরব ত্পতি।
আমারে লুকিয়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় স্নেহভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপন-লিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মধুর,
এখন এল যে স্মৃতি।

চেনা মৃৎখানি আর নাহি জানি
অঁধারে হতেছে গদগদ,
তব স্বর্ণরূপ কেন আজি চূপ,
কোথায় সে হার সন্মত।
অবগুণ্ঠিত তব চারি ধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকামায় ছন্দ তোমার
গহনে হল যে সন্মত।

শব্দে কিঞ্জির ঘন ঝংকার
 নীরবের বদকে বাজে।
 কাছে আছ তবু গিয়েছ হারান্নে
 দিশাহারা নিশামাঝে।

এ জীবনময় তব পরিচয়
 এখানে কি হবে শূন্য।
 তুমি যে বীণার বোধেছিলে তার
 এখনি কি হবে ক্ষয়।
 যে পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
 সে পথে তোমার নিবারো না বাতি,
 আরতির দীপে আমার এ রাত
 এখনো করিরো পূণ্য।
 আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
 আমার নয়নময়,
 মরণসভার তোমায় আমার
 গাব আলোকের জয়।

জাল্‌গন্‌ কুয়িন্‌। ন্যায়ক
 ৭ নভেম্বর ১৯০০

আছি

বৈশাখেতে তন্ত বাতাস মাতে
 কুরোর ধারে কলাগাছের দীর্ঘ পাতে পাতে;
 গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধূলা উড়ায়,
 ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচুড়ায়;
 আশুক্লান্ত বেলগর্দলি সব শীর্ণ হয়ে আসে,
 স্কান গম্বু কুড়িয়ে তারি ছড়িয়ে বেড়ায় সদীর্ঘ নিশ্বাসে;
 শুকনো টগর উড়িয়ে ফেলে,
 চিকন কচি অশথ পাতার যা খুঁশি তাই খেলে;
 বাঁশের গাছে কী নিয়ে তার কাড়াকাড়ি,
 খেজুর গাছের শাখায় শাখায় নাড়ানাড়ি;
 বটের শাখে ঘনসবুজ ছায়ানিবিড় পাখির পাড়ায়
 হুহু করে ধেরে এসে ঘুঘু দাঁটির নিদ্রা ছাড়ায়;
 রন্ধ কঠিন রক্তমাটি ডেউ খেলিয়ে ঝিলিয়ে গেছে দূরে
 তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে;
 খেপে উঠে হঠাৎ ছোটো ভালের বনে উত্তরে দিক্‌সীমায়
 অক্ষুট ওই বাঙ্গলানীলময়;
 টেলিগ্রাফের তারে তারে
 সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝংকারে ঝংকারে;
 এমনি করে বেলা বহে যায়,
 এই হাওয়াতে ছুপ করে রই একলা জানালায়।

ওই যে ছাতিমগাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে হৃদে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।
না থাক্ খ্যাতি, না থাক্ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার—
আজ আমি যে বেঁচেছিলাম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই ভারতা রইল আমার গানে।

১৯ বৈশাখ ১৩৩৮

বালক

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুইপহরে
স্বপ্নের 'পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেলা।
দূর আকাশে ডেকে যেত চিল,
সিসুগাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলমিল।
তপ্ত তুষার চণ্ড করি ফাঁক
প্রাচীর-পরে ক্ষণে ক্ষণে বসত এসে কাক।
চড়ুই পাখির আনাগোনা মধুর কলভাষা,
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা।
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায় গলির ওপার থেকে—
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে।
কখন মাঝে মাঝে
ঘড়িওয়ালার কোন্ বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।
সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাওয়া দূর
বাজাত কোন্ ঘর-ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।
অকারণের ভালো লাগা
অকারণের ব্যথায় মিলে গাঁথিত স্বপন নাইকো গোড়া আগা।
সাথীহীনের সাথী
মনে হত দেখতে পেতেম দিগন্তে নীল আসন ছিল পাতি।
সন্তরে আজ পা দিয়েছি আরুণোষের কূলে
অন্তরে আজ জানলা দিয়েছি খুলে।
তেমনি আবার বালকদিনের মতো
চোখ মেলে মোর সদূর-পানে বিনা কাজে গ্রহর হল গত।

প্রথর তাপের কাল,
 ঝরঝরিয়ে কেঁপে ওঠে শিরীষ গাছের ডাল;
 কুল্লোর ধারে তেঁতুলতলায় ঢুকে
 পাড়ার কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে ভিজে মাটির স্নিগ্ধ পরশসুখে;
 গাড়ির গোরু ক্ষণকালের মৃদু পৈয়ে ক্লান্ত আছে শূন্যে
 জামের ছায়ায় তৃণবিহীন ভূয়ে।
 কাঁকর-পথের পারে
 শূকনো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে।
 চেয়ে আছি দূর চোখ দিয়ে সব-কিছুরে ছুয়ে,
 ভাবনা আমার সবার মাঝে থুয়ে।
 বালক যেমন নন্দ-আবরণ,
 তেমনি আমার মন
 ওই কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
 বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে।
 সকল জানার মাঝে
 চিরকালের না-জানা কার শঙ্খধ্বনি বাজে।
 এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা
 সেই আমারে করেছে আনন্দনা।

২১ বৈশাখ ১৩০৮

বর্ষশেষ

যাত্রা হলে আসে সারা—আরুণ পশ্চিমপথশেষে
 ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
 অন্তসূর্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি
 ছড়ায় ঐশ্বর্য তার ভরি দই মৃতি।
 বর্গসমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
 জীবনের হেরিন্দু মহিমা।
 এই শেষ কথা নিরে নিশ্বাস আমার মাঝে থামি—
 কত ভালোবেসেছিলাম আমি।
 অনন্ত রহস্য তারি উজ্জলি আপন চারি ধার
 জীবন-মৃত্যুরে দিল করি একাকার;
 বেদনার পাঠ মোর বারংবার দিবসে নিশীথে
 ভরি দিল অপূর্ণ অমৃতে।
 দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
 হানিরাছে দারুণ বৈশাখী।
 কত দিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
 তারি মাঝে অন্তরেতে পেরেছি ইশারা।
 নিন্দার কণ্টকমালা বন্ধ বিন্ধিয়াছে ঝরে ঝরে,
 স্বপ্নমালা জানিয়াছি তারে।

আলোকিত ভুবনের মূখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে,
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব অঙ্গে মনে।
যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অগ্রদূতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁধিতে।

বাঁহারা মানদ্বরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আশ্রয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিত আছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রুদ্ধিত আশ্রয়
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

জাতিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিত যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বল
জানি তাহা সকলের বলি।

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সম্বন্ধ।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাক দীপ্তিময়ী শিখা।

যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ,
আমি তার জাতিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তার মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশব্দ বীর মৃত্যুরে লজ্জিত অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ডুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।
অন্তরে লেগেছে মোর স্তম্ভ আকাশের আশীর্বাদ;
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে।

আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন.
 মৃত্যু, তুমি ঘৃণাও গৃহস্থন।
 কত কী গিয়েছে ঝরে, জানি জানি কত স্নেহ প্রীতি
 নিবাসে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি।
 মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
 ওগো শেষ, অশেষের ধনে।

৩০ মে ১৯৩৩

মুক্তি

১

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর.
 দাও স্বচ্ছ ত্পিতর আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
 প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে.
 দিয়ো না দুলিতে মোরে তরঙ্গিত মৃহতের স্রোতে,
 ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে। শ্রাবণসন্ধ্যার পুষ্পবনে
 জ্ঞানহীন যে সাহস সুকুমার যুগ্মীর জীবনে—
 নির্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কশূন্য প্রসন্ন মধুর.
 মৃহতের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
 সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা-পরে.
 পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনয় অন্তরে
 সঙ্গমে রচিয়া তোলে; দাও সেই অক্ষুণ্ণ সাহস.
 সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
 আপনার সুন্দর সীমায়—শ্বিধাশূন্য সরলতা
 গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা।

১ জুলাই ১৯২৭

২

আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি
 হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
 তোমার আহ্বানবাণী। আজ তব বাজুক বাণি,
 চিত্তভরা শ্রাবণশ্রাবনরাগে—যেন গো পারি
 নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবারে ক্ষুধা কোলাহল,
 ধূলির নিবিড় টান পদতলে। রয়েছে নিশ্চল
 সারাদিন পথপার্শ্বে; কেলা হয়ে এল অবসান,
 ঘন হয়ে আসে ছায়া, প্রাপ্ত সূর্য করিছে সন্ধান

দিগন্তে অস্তিত্ব শাস্তি। দিবা যথা চলেছে নিভীক
চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক
আপনার কাছ হতে অস্তহীন অজানার পানে
অসীমের সংগীতে উদাসী—সেইমতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হোক সূর্য,
নিরে যাক পথে পথে হে অলঙ্কার, হে মহাসুন্দর।

২ জুলাই ১৯২৭

আহবান

আমার তরে পথের 'পরে কোথায় তুমি থাক
সে কথা আমি শূন্যই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখ
আমার লাগি নিভূতে একধারে।
বাতাস বেয়ে ইশারা পেয়ে গেছি মিলন-আশে
শিশির-ধোয়া আলোতে ছোঁয়া শিউলি-ছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলি-কলভাষে
অধীরধারা নদীর পারে পারে।
আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে, সেথায় সারাবেলা
তোমার বাঁশ শুনছি বারে বারে।

কেমনে বৃষ্টি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাক,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরী।
শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাকো,
স্বিধার ভরে দুরারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডাকা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা করিছে কারাগারে।
পাষণ ভিত টলিছে যেথা ক্রিতির বুক ফাটি
ধূলায় চাপা অনলগিথা কাঁপারে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুদূরের বাঁধন ফেলে কাটি,
সেথায় ভেরী বাজাও বারে বারে।

আম্বোয়ার জাহান্না
সিঙাপুর বন্দর
৪ প্রবল ১৩৩৪

দুয়ার

হে দুয়ার, তুমি আছ মৃদু অনন্দকণ,
 মৃদু মৃদু অশ্রুর নয়ন।
 অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই
 প্রবেশিতে সংশয় সদাই।

হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রিদিনমান
 সুগম্ভীর তোমার আহ্বান।
 সূর্যের উদয়-মাঝে খোল আপনারে।
 তারকার খোল অন্ধকারে।

হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
 খোল পথ, ফুল হতে ফলে।
 যুগ হতে যুগান্তর কর অব্যাহত,
 মৃত্যু হতে পরম অমৃত।

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে
 করে যাত্রা মরণে মরণে।
 মৃত্যুসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
 'মাইডে' বাজে নৈরাশ্যানিশীথে।

[১৯৩৪]

দীপিকা

প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়,
 জ্বাল তব নব দীপিকা।
 প্রভূষপটে প্রতিদিন লেখ
 আলোকের নব লিপিকা।
 অন্ধকারের সাথে দুর্বীর
 সংগ্রাম তব হয় বারবার,
 দিনে দিনে হয় কত পরাজয়,
 দিনে দিনে জয়সাধনা।
 পথ ভুলে ভুলে পথ খুঁজে লও,
 সেই উৎসাহে পথদ্বন্দ্ব বও,
 দেববিনোদে বাঁধা পড় মোহে
 তবে হয় দেবারাধনা।

খেলাঘর ভেঙে বাঁধ খেলাঘর,
 খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা।
 বাসা বেঁধে বেঁধে বাসা ভাঙে মন
 কোথাও আসন মেলে না।

জানি পথশেষে আছে পায়াবার,
 প্রতিধনে সেথা মেশে বারিধার,
 নিমেষে নিমেষে তব্দ নিঃশেষে
 ছুটিছে পথিক তটিনী।
 ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
 ফিরে ফিরে আসে নব নব তান,
 মরণে মরণে চকিত চরণে
 ছুটে চলে প্রাণনটিনী।

২৫ ফাল্গুন [১৩৩০]

লেখা

সব লেখা লুপ্ত হয়, বায়বীয় লিখিবায় তরে
 নতুন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
 কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
 নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হোক লম্ব
 সমাপ্তির রেখাদৃগ। নব লেখা আসি দর্পভরে
 তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দুরান্তরে
 উন্মুক্ত করুক পথ, স্খাবরের সীমা করি জয়,
 নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
 অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
 ষড়্গবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে
 যায় প্রতিমার দিন। ধূলা তারে ডাক দিয়ে কর—
 'ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষরে ক্ষরে হবি রে অক্ষর,
 তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নতুন প্রতিমা,
 প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।'

১১ চৈত্র ১৩৩০

নতুন শ্রোতা

শেষ লেখাটার খাতা
 পড়ে শোনাই পাতার পরে পাতা,
 অমিয়নাথ স্তম্ভ হয়ে দোলায় মৃদু মাথা।
 উচ্ছ্বসি কর, "তোমার অমর কাব্যখানি
 নিত্যকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণী।"

দাড়িবাঁধা কাঠের গাড়িটারে
 নন্দগোপাল ঘটর ঘটর টেনে বেড়ায় সজ্জবরের স্ফারে।
 আমি বলি, "ধাম্ রে বাপদ্, ধাম্,
 দুষ্টুদমি এর নাম—
 পড়ার সময় কেউ কি অমন বেড়ায় গাড়ি ঠেলে।
 দেখ্ দেখি তোর অমিকাকা কেমন লক্ষ্মীছেলে।"

অনেক কষ্টে ভালোমানুষ-বেশে
বসল নন্দ অমিকাকার কোলের কাছে ঘেঁষে।
দুঃস্বপ্ন সেই ছেলে
আমার মূখে ডাগর নমন মেলে
চুপ করে রইল মিনিট কয়েক, অমিরে কম ঠেলে,
“শোনো অমিকাকা,
গাড়ির ভাঙা চাকা
সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এঁটে ইস্পত্‌প।”
অমি বললে কানে কানে, “চুপ চুপ চুপ।”
আবার খানিক শান্ত হয়ে শুনল বসে নন্দ
কবিরের অমর ভাষার ছন্দ।

একটু পরে উদ্‌স্বাসিয়ে গাড়ির থেকে দশ-বারোটা কড়ি
মেজের 'পরে করলে ছড়াছড়ি।
ঝম্‌ঝমিয়ে কড়িগুলো গুন্‌গুনিয়ে আউড়ে চলে ছড়া—
এর পরে আর হয় না কাব্য পড়া।
তার ছড়া আর আমার ছড়ায় আর কতখন চলেবে রেবারেবি,
হার মানতে হবেই শেষাশেষি।

অমি বললে, “দুঃস্বপ্ন ছেলে।” নন্দ বললে, “তোমার সঙ্গে আড়ি—
নিয়ে যাব গাড়ি,
দিন্দাদাকে ডাকব ছাতে ইস্টিশনের খেলায়,
গড়গড়িয়ে যাবে গাড়ি বন্দিবাটির মেলায়।”
এই বলে সে ছল্‌ছলানি চোখে
গাড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল কোন্‌ দিকে কোন্‌ ঝোঁকে।

আমি বললেম, “যাও অমির, আজকে পড়া থাক্,
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক।
আমার ছন্দে কান দিল না ও যে
কী মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে।
যে কবির ও শুনবে পড়া সেও তো আজ খেলার গাড়ি ঠেলে,
ইস্টিশনের খেলাই সেও খেলে।
আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেলার পাড়ি,
তার মেলাতে পেঁছবে তার গাড়ি।
আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।
ভরেছিলেম এই-ফাগুনের ডাঙ্গা
তা নিয়ে কেউ নাই বা গাথুক আর-ফাগুনের ঝাঙ্গা।”

২

বছর বিশেক চলে গেল সাঙ্গা তখন ঠেলাগাড়ির খেলা;
 নন্দ বললে, “দাদামশায়, কী লিখেছ শোনাও তো এইবেলা।”
 পড়তে গেলেম ভরসাতে বুক বেঁধে,
 কণ্ঠ যে যায় বেধে;
 টেনে টেনে বাহির করি এ খাতা ওই খাতা,
 উল্টে মরি এ পাতা ওই পাতা।
 ভয়ের চোখে যতই দেখি লেখা,
 মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা।
 গোপনে তার মূখের পানে চাই,
 বদ্বন্দ্বি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
 নতুনকালের শান-দেওয়া তার ললাটখানি খরখড়া-সম,
 শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।
 তীক্ষ্ণ সজাগ অঁখি,
 কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।
 সংসারেতে গর্তগৃহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উঁকি,
 অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মূখোমুখি।
 তীর তাহার হাস্য
 বিশ্বকাজের মোহমুগ্ধ ভাষ্য।

একটু কেশে পড়া করলেম শূন্য
 যৌবনে যা শিখিয়েছিলেন অন্তর্যামী আমার কবিগুরু—
 প্রথম প্রেমের কথা,
 আপনাকে সেই জানে না সেই গভীর ব্যাকুলতা,
 সেই যে বিধুর তীরমধুর তরাস-দোদুল বন্ধ দরদ দরদ,
 উড়ো পাখির ডানার মতো যুগল কালো ছুরদ,
 নীরব চোখের ভাষা,
 এক নিমেষে উজ্জ্বল দেয় চিরদিনের আশা,
 তাহারি সেই স্থিতির ঘায়ে ব্যথায় কম্পমান
 দুটি-একটি গান।
 এড়িয়ে চলা জলধারার হাস্যমুখর কলকলোচ্ছ্বাস,
 পূজায় স্তম্ভ শরৎপ্রান্তের প্রশান্ত নিশ্বাস,
 বৈরাগিণী ধূসর সন্ধ্যা অস্তসাপন্নপারে,
 তন্দ্রাবিহীন চিরন্তনের শান্তিবাণী নিশীথ-অন্ধকারে,
 ফাগুনরাতির স্পর্শমায়ার অরণ্যতল পদ্পরোমাণ্ডিত,
 কোন্ অদৃশ্য সূচিরবাঁহিত
 বনবীথির ছায়াটিরে
 কাঁপিয়ে দিলে বেড়ান ফিরে ফিরে,
 তারি চঞ্চলতা

মর্মরিয়া কইল যে-সব কথা,
তারি প্রতিধ্বনিভরা
দু-একটা চৌপদী আমার সসংকোচে পড়ে গেলেম ঘরা।

পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল হঠাৎ ঝঞ্ঝে—

“দাদামশায়, শাবাশ!

তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস।”
খাতা নিতে হাত বাড়াল, চাদরেতে দিলেম তাহা ঢাকা,
কইনু তারে, “দেখ তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয়কাকা।”

স্বা-মারু জাহাজ। গঙ্গা
২৭ অক্টোবর [১৯২৭]

আশীর্বাদ

তরুণ আশীর্বাদপ্রার্থীর প্রতি প্রাচীন কবির নিবেদন
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে

নিম্নে সরোবর স্তম্ভ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে।
উর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিংধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, “আশীর্বাদ মাগি
হে প্রাচীন সরোবর।” সরোবর কহিল হাসিয়া,
“আশিস তোমারি তরে নীলাম্বরে উঠে উন্মাসিয়া
প্রভাতসূর্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরিতপস্বীর
বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদ-নীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায়া হতে
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি নির্ঝরিত স্রোতে
সংগীত-উন্মেষ নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিষ্মপূজ, পথরোধী পাষণসত্ত্ব,
গুড় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনার জাগার উৎসাহ।”

১৪ পৌষ ১৩০৫

মোহানা

ইরাবতীর মোহানামুখে কেন আপনভোলা
সাগর তব বরন কেন ঘোলা।
কোথা সে তব কিম্বল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া,
রবির পানে গভীর গান গাওয়া?
নদীর জলে ধরণী তার পাঠালে এ কী চিঠি,
কিসের ঘোরে আবিল হল দিঠি।

আকাশ-সাথে মিলারে রঙ আছিলে তুমি সাজি,
 ধরার রঙে বিলাস কেন আজি।
 রাতের তারা আলোকে আজ পরশ করে যবে
 পায় না সাড়া তোমার অন্তরে;
 প্রভাত চাহে স্বচ্ছ জলে নিজেরে দেখিবারে,
 বিফল করি ফিরারে দাও তারে।

নিরেছ তুমি ইচ্ছা করি আপন পরাজয়,
 মানিতে হার নাহি তোমার ভয়।
 বরন তব ধূসর কর, বাঁধন নিলে খেল,
 হেলায় হিয়া হারারে তুমি ফেল।
 এ লীলা তব প্রান্তে শূন্য তটের সাথে যেনা,
 একটুখানি মাটির লাগে নেশা।
 বিপুল তব বন্ধ-পরে অসীম নীলাকাশ,
 কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ।
 ধূলারে তুমি নিরেছ মানি, তবুও অমলিন,
 বাঁধন পরি স্বাধীন চিরদিন।
 কালীয়ে রহে বন্ধে ধরি শূন্য মহাকাল,
 বাঁধে না তাঁরে কালো কলুষজাল।

[ইরবত-সংগম। বঙ্গসাগর]
 ৭ কার্তিক ১৩৩৪। কালীপূজা

বক্সাদ-গম্ভ রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রাবির বন্দন।
 পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্দন।
 ফোয়ারার রম্ব হতে
 উদ্ভাসে উদ্ভাসে
 বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

মৃদুকর ভিত্তি ভেদি অশ্রুর আকাশে দিল আনি
 স্বসমুদ্র শক্তিবলে গভীর মৃদুর মন্ত্রবাণী।
 মহাকণে রুদ্ধাশীর
 কী বর লভিল বীর,
 মৃত্যু দিলে বিরাট অমর্ত্য নরের রাজধানী।

‘অমৃতের পুত্র মোরা’—কাহারো শুনালো বিশ্বময়।
 আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
 ভৈরবের আনন্দেরে
 দৃষ্টেতে জিনিল কে রে,
 বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মৃত্তকের কে দিল পরিচয়।

দার্জিলিং
 ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

দুর্দিনে

দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি
 কর্মে জড়ায় গ্রন্থি,
 মন্দির দিন পাথেরবিহীন
 দীর্ঘ পথের পন্থী;
 নিদয়তম নিন্দার হাস,
 নির্মমতম দৈব,
 শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস
 ফুকারে ‘নৈব নৈব’;
 হঠাৎ তখন কহে মোরে মন,
 ‘মিথো, এ-সব মিথো,
 প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয়
 সুর যদি রয় চিন্তে।’

চৌদিক করে যদ্ব্যঘাষণ,
 দুর্গম হয় পন্থা,
 চিন্তায় করে রক্ত শোষণ
 প্রথর নখর-দন্তা,
 নিরানন্দের ঘিরি রহে ঘের,
 নাই জীবনের সঙ্গী,
 দৈন্য কুরূপ করে বিদ্রূপ
 ব্যঙ্গের মৃদুভাঙ্গি,
 মন বলে, ‘নাই ভাবনা কিছুই
 মিথো, এ-সব মিথো,
 অন্তর-মাঝে চিরধনী তুই
 অন্তবিহীন বিস্তে।’

ভাষাহীন দিন কুশাশাবিলীন—
 মলিন উষার স্বর্ণ,
 কল্পনা যত বাদুড়ের মতো
 রাতে ওড়ে কালো বর্ণ;

আবজ্ঞানার অচলপুঞ্জ
 যাত্রার পথ রুদ্ধ,
 রিক্তকুসুম শব্দ কুঞ্জ
 বৈশাখ রহে রুদ্ধ,
 মন মোরে কয়, 'এ কিছুই নয়,
 মিথ্যে, এ-সব মিথ্যে,
 আপনায় ভুলে গাও প্রাণ খুলে,
 নাচো নিখিলের নৃত্যে।'

বন্ধদ্বারার বিশ্ব বিরাজে,
 নিবেছে ঘরের দীপ্তি,
 চির-উপবাসী আপনার মাঝে
 আপনি না পাই তৃপ্তি,
 পদে পদে রয় সংশয় ভয়,
 পদে পদে প্রেম ক্ষয়,
 বৃথা আহ্বান, বৃথা অনুনয়,
 সখার আসন শূন্য,
 মন বলি উঠে, 'ভূবে যা গভীরে,
 মিথ্যে, এ-সব মিথ্যে,
 নিবিড় ধোয়ানে নিখিল লভি রে
 আপনারি একাকিত্বে।'

আবা-মারু। বঙ্গসাগর
 ২৬ অক্টোবর ১৯২৭

প্রদন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দত্ত পাঠিয়েছ বারে বারে
 দয়ালীন সংসারে,
 তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
 অস্তর হতে বিশ্ববিস্ব নাশো'।
 বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-স্বারে
 আজি দুর্দিনে ফিরান তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাহিছারে
 হেনেছে নিঃসহায়ে,
 আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে
 বিচারের বাণী নীরবে নিঃশব্দে কাদে।
 আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হলে ছুটে
 কী যন্ত্রণার মরেছে পাথরে নিঃশব্দে মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বর্গি সংগীতহারা,
 অমাবস্যার কারা
 লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দৃঃস্বপনের তলে,
 তাই তো তোমায় শূন্যই অশ্রুজলে—
 যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
 তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

পৌষ ১৩৩৮

ভিক্ষু

হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
 নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর,
 নিঃশেষে দে বিদায় রে।
 ভিক্ষাতে শূভলগ্নের ক্ষয়
 কোন্ ভুলে তুই ভুলিলি,
 ভান্ডার তোর পন্ড যে হয়,
 অর্গল নাহি খুলিলি।
 আপনারে নিয়ে আবরণ দিয়ে
 এ কী কুৎসিত ছলনা;
 জীর্ণ এ চীর ছদ্মবেশীর,
 নিজেরে সে কথা বল না।
 হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
 মিথ্যা মায়া ছায়া ঘুচাবার
 মন্ত্র কে নির্বি আয় রে।

কাঙাল যে জন পায় না সে ধন,
 পায় সে কেবল ভিক্ষা।
 চির-উপবাসী মিছা-সম্মাসী
 দিলেছে তাহারে দীক্ষা।
 তোর সাধনায় রত্নমানিক
 পথে পথে ঘাস ছড়ায়,
 ভিক্ষার ঝুলি, থিক্ তারে থিক্,
 বহিস নে গিরে চড়ায়।
 হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
 নিঃস্বজনের দৃঃস্বপনের
 বন্ধ, ছিঁড়িস তায় রে।

অশ্রুতে রাতি ভিক্ষার কণা
 সঞ্চার করে তারাতে,
 নিয়ে সে পারানি তব্দ পারিল না
 তিমিরসিদ্ধি পারাতে।

পূর্বগগন আপনার সোনা
ছড়াল যখন দুল্লোকে
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা,
প্রভাত পূরিল পূলকে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
আপনা-মাঝারে গোপন রাজারে
মন যেন তোর পায় রে।

বাঙ্গালোর
২০ জুন ১৯২৮

আশীর্বাদী

কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে

তোমারে জননী ধরা
দিল রূপে রসে ভরা
প্রাণের প্রথম পাত্রখানি,
তাই নিয়ে তোলাপাড়া
ফেলাছড়া নাড়াচাড়া
অর্থ তার কিছুই না জানি।
কোন মহারঙ্গশালে
নৃত্য চলে তালে তালে,
ছন্দ তারি লাগে রক্তে তব।
অকারণ কলরোলে
তাই তব অঙ্গ দোলে,
ভাঙ্গি তার নিত্য নব নব।
চিন্তা-আবরণহীন
নন্দচিন্ত সারাদিন
লুটাইছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে,
ভাষাহীন ইশারায়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
স্বাধা-কিছু দেখে আর শোনে।
অক্ষুট ভাবনা যত
অশথপাতার মতো
কেবলি আলোর কিলিমিলি।
কী হাসি বাতাসে ভেসে
তোমারে লাগিছে এসে,
হাসি বেজে ওঠে খিলখিলি।
গ্রহ তারা লগি রবি
সমুখে ধরেছে ছবি

আপন বিপদে পরিচয়।
 কচি কচি দুই হাতে
 খেলিছ তাহারি সাথে,
 নাই প্রশ্ন, নাই কোনো ভয়।
 তুমি সর্ব দেহে মনে
 ভরি লহ প্রতিফলে
 যে সহজ আনন্দের রস,
 বাহা তুমি অনায়াসে
 ছড়াইছ চারি পাশে
 পলকিত দরশ পরশ,
 আমি কবি তারি লাগি
 আপনার মনে জাগি,
 বসে থাকি জানালার ধারে।
 অমরার দ্বীপগুলি
 অলঙ্কা দুয়ার খুলি
 আসে যায় আকাশের পারে।
 দিগন্তে নীলিম ছায়া
 রচে দূরান্তের মায়া,
 বাজে সেথা কী অশ্রুত বেগু।
 মধ্যদিন তন্দ্রাতুর
 শুনিয়ে রৌদ্রের সুর,
 মাঠে শূন্যে আছে ক্লান্ত ধেনু।
 চোখের দেখাটি দিয়ে
 দেহ মোর পায় কী এ,
 মন মোর বোবা হয়ে থাকে।
 সব আছে আমি আছি,
 দুইয়ে মিলে কাছাকাছি
 আমার সকল-কিছু ঢাকে।
 যে আশ্বাসে মর্ত্যতুমি
 হে শিশু, জাগাও তুমি,
 যে নির্মল যে সহজ প্রাণে,
 কবির জীবনে তাই
 যেন বাজাইয়া যাই
 তারি বাণী মোর যত গানে।
 ক্লান্তিহীন নব আশা
 সেই তো শিশুর ভাষা,
 সেই ভাষা প্রাণদেবতার,
 জন্মের জড়ত্ব ত্যাগে
 নব নব জন্মে সে যে
 নব প্রাণ পায় বারংবার।
 নৈরাশ্যের কুহেলিকা
 উবার আলোকটিকা

ক্ষণে ক্ষণে মৃদুছে দিতে চায়,
 বাধার পশ্চাতে কবি
 দেখে চিরন্তন রবি
 সেই দেখা শিশুচক্ষে ভায়।
 শিশুর সম্পদ বয়ে
 এসেছে এ লোকালয়ে,
 সে সম্পদ থাক্ অমলিনা।
 যে বিশ্বাস শ্বিধাহীন
 তারি সূরে চিরদিন
 বাজে ঘেন জীবনের বীণা।

দার্জিলিং
 ৮ কার্তিক ১৩৩৮

অবুঝ মন

অবুঝ শিশুর আবছায়া এই নয়ন-বাতায়নের ধারে
 আপনাতোলা মনখানি তার অধীর হয়ে উর্কি মারে।
 বিনাভাষার ভাবনা নিয়ে কেমন আঁকুর্বাঁকুর খেলা—
 হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছাড়িয়ে ফেলা,
 হঠাৎ অকারণ
 কী উৎসাহে বাহু নেড়ে উদ্দাম গর্জন।
 হঠাৎ দুলে দুলে ওঠে,
 অর্থবিহীন কোন্ দিকে তার লক্ষ ছোটে।
 বাহির-ভুবন হতে
 আলোর লীলায় ধর্মানির স্রোতে
 যে বাণী তার আসে প্রাণে
 তারি জবাব দিতে গিয়ে কী-ষে জানায় কেই তা জানে।

এই যে অবুঝ এই যে বোঝা মন
 প্রাণের 'পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে যে অধীর অনন্দকণ,
 সর্ব দিকেই সর্বদা উদ্মুখ,
 আপনারি চাঞ্চল্য নিয়ে আপনি সমুৎসুক—
 নয় বিধাতার নবীন রচনা এ,
 ইহার যাত্রা আদিম যুগের নারে।
 বিশ্বকবির মানস-সরোবরে
 প্রাতঃজ্ঞানের পরে
 প্রাণের সঙ্গে বাহির হল, তখন অন্ধকার,
 নিয়ে এল কীণ আলোটি তার।
 তারি প্রথম ভাষাবিহীন কুজনকাকলি যে
 বনে বনে পাখায় পাতায় পুষ্পে ফলে স্বীজে
 অন্ধুরে অন্ধুরে
 উঠল জেগে ছন্দে সূরে সূরে।

সূৰ্য-পানে অবাক আঁখি মেলি
 মূৰ্ছারিত উচ্ছল তার কেলি।
 নানা রূপের খেলনা যে তার নানা বর্ণে আঁকে,
 বারেক খোলে, বারেক তারে ঢাকে।
 রোদ-বাদলে করুণ কামা হাসি
 সদাই ওঠে আভাসি উচ্ছ্বাসি।

ওই যে শিশুর অবদ্ব্য ভোলা মন
 তরীর কোণে বসে বসে দেখছি তারি আকুল আন্দোলন।
 মাঝে মাঝে সাগর-পানে তাকিয়ে দেখি যত
 মনে ভাবি, ও যেন এই শিশু-আঁখির মতো,
 আকাশ-পানে আবছায়া ওর চাওয়া
 কোন্ স্বপনে পাওয়া,
 অন্তরে ওর যেন সে কোন্ অবদ্ব্য ভোলা মন
 এ-তীর হতে ও-তীর পানে দুলছে অনুরুণ।
 কেমন কলভাষে
 প্রলয়কাদিন কাদে ও যে প্রবল হাসি হাসে
 আপ্নিও তার অর্থ আছে ভুলে—
 ক্ষণে ক্ষণে শূন্যেই ফুলে ফুলে
 অকারণে গর্জি উঠে শূন্যে শূন্যে মৃৎ বাহর তুলে।

বিরাত অবদ্ব্য এই সে আদিম মন,
 মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্নারে তার অধীর অন্বেষণ।
 ঘর হতে ধার আগুন-পানে, আগুন হতে পথে,
 পথ হতে ধার তেপান্তরের বিঘ্নবিঘ্ন অরণ্যে পর্বতে;
 এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
 পায়ের তলার ধরণীরে আঘাত করে ধূলায় আকাশ বেদে;
 হঠাৎ খেপে উঠে
 রুদ্ধ পাষণ্ডভিত্তি-পরে বেড়ায় মাথা কুটে।
 অনাসৃষ্ট সৃষ্টি আপনগড়া
 তাই নিরে সে লড়াই করে, তাই নিরে তার কেবল ওঠাপড়া।
 হঠাৎ উঠে ঝেঁকে
 যায় সে ছুটে কী রাস্তা রঙ দেখে
 অদৃশ্য কোন্ দূর দিগন্ত-পানে;
 আবছায়া কোন্ সম্মা-আলোর শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,
 তাহার ব্যাকুলতা
 স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা।

পরিণয়

সুন্দরমা ও সুন্দরেন্দ্রনাথ কব্-এর বিবাহ উপলক্ষে

ছিল চিত্রকল্পনায়, এডকাল ছিল গানে গানে,
সেই অপরূপ এল রূপ ধরি তোমাদের প্রাণে।
আনন্দের দিব্যমূর্তি সে যে,
দীপ্ত বীরতেজে
উত্তরিয়া বিঘ্ন যত দূর করি ভীতি
তোমাদের প্রাণাগেতে হাঁকি দিল, 'এসেছি অতিথি।'

জ্বালো গো মঙ্গলদীপ, করো অর্ঘ্য দান
তনু মনপ্রাণ।
ও যে সুন্দরভবনের রম্য কমলবনবাসী,
মর্ত্য নেমে বাজাইল সাহানায় নন্দনের বঁশি।
ধরায় ধূলির 'পরে
মিলাইল কী আদরে
পারিজাতরেণু।
মানবগৃহের দৈন্যে অমরাবতীর কল্পধেনু
অলঙ্ক্য অমৃতরস দান করে
অন্তরে অন্তরে।
এল প্রেম চিরন্তন, দিল দৌহে আনি
রবিকরদীপ্ত আশীর্বাণী।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৮

চিরন্তন

এই বিদেশের রাস্তা দিলে ধূলোয় আকাশ ঢেকে
গাড়ি আমার চলতেছিল হেঁকে।
হেনকালে নেবু ডালে সিন্ধু ছায়ায় উঠল কোকিল ডেকে
পথকোণের ঘন বনের থেকে।

এই পাখিটির স্বরে
চিরদিনের সুন্দর যেন এই একটি দিনের 'পরে
বিষদু বিষদু স্বরে।
ছেলেবেলার গঙ্গাতীরে আপন মনে চেয়ে জলের পানে
শুনোছিলেম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীমকালের অনির্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, "তুমি আমার প্রিয়।"

সেই ধ্বনিটির কানন ব্যোপে পল্লবে পল্লবে
 জলের কলরবে
 ওপার-পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে।
 আজ এই পরবাসে
 সেই ধ্বনিটি ক্ষুদ্র পথের পাশে
 গোপন শাখার ফুলগুলিরে দিস আপন বাণী।
 বনচ্ছায়ার শীতল শান্তিধানি
 প্রভাত-আলোর সঙ্গে করে নিবিড় কানাকানি
 ওই বাণীটির বিমল সুরে গভীর রমণীয়—
 “তুমি আমার প্রিয়।”

এরি পাশেই নিত্য হানাহানি;
 প্রতারণার ছুরি
 পাজির কেটে করে চুরি
 সরল বিশ্বাস;
 কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ।
 নিরাশ দঃখে চেয়ে দেখি পৃথিবীব্যাপী মানববিভীষিকা
 জ্বালায় মানবলোকালয়ে প্রলয়বাহিনীখা,
 লোভের জ্বালে বিশ্বজগৎ ঘেরে,
 ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপনহারা অন্ধ মানুষ্যেরে।

হেনকালে স্নিগ্ধ ছায়ায় হঠাৎ কোকিল ডাকে
 ফুল্ল অশোকশাখে;
 পরশ করে প্রাণে
 যে শান্তিটি সব-প্রথমে, যে শান্তিটি সবার অবসানে,
 যে শান্তিতে জানায় আমার অসীম কালের অনির্বচনীয়—
 “তুমি আমার প্রিয়।”

পিনাক্ত
 ১৮ অক্টোবর ১৯২৭

কণ্টকারি

শিলঙে এক গিরির খোপে পাথর আছে খসে,
 তারি উপর লুকিয়ে বসে
 রোজ সকালে গেঁথেছিলেম ভোরের সুরে গানের মালা।
 প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে ছিল আমার মৃদুমৃদুখির পালা।
 ডান দিকেতে অফলা এক পিচের শাখা শুঁরে
 ফুল ফোটে আর ফুল পড়ে যার ঝরে।

কালো জানায় হলমে আভাস কোন পাখি সেই অকারণের গানে
 ক্লান্তি নাহি জানে,
 তেমনি তরো গোলাপলতা লতাঝিতান ঢেকে
 অজন্ম তার ফুলের ভাষায় অন্ত না পার উদ্দেশ্যহীন ডেকে।
 পাইনবনের প্রাচীন তরু তাকায় মেঘের মূখে,
 ডালগুদালি তার সবুজ ঝর্না ধরায় পানে ঝুঁকে
 মন্থে যেন থমক লেগে আছে।
 দুটি দালিম গাছে
 ঘনসবুজ পাতার কোলে কোলে
 ঘনরাঙা ফুলের গুচ্ছ দোলে।
 পারের কাছে একটি কণ্টকারি—
 অন্তরঙ্গ কাছের সঙ্গ তারি,
 দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহি করে।
 মাটির কাছে নত হলে পরে
 স্নিগ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধূলিশয়ন থেকে
 নীলবরনের ফুলের বৃকে একটুখানি সোনার বিন্দু এঁকে।

সেদিন যত রচিছিলাম গান
 কণ্টকারির দান
 তাদের সুরে স্বীকার করা আছে।
 আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষণিক শান্তি যাচে
 দুঃখদিনের দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে,
 হঠাৎ কেন জাগল আমার মনে,
 সেই সকালের টুকরো একটুখানি—
 মাটির কাছে কণ্টকারির নীল-সোনালির বাণী।

৫ আষাঢ় ১৩৩৯

আরেক দিন

স্পষ্ট মনে জাগে,
 তিরিগ বছর আগে
 তখন আমার বয়স পঁচিশ— কিছুকালের তরে
 এই দেশেতেই এসেছিলাম, এই বাগানের ঘরে।
 সূর্য যখন নেমে যেত নীচে
 দিনের শেষে ওই পাহাড়ে পাইনশাখার পিছে
 নীল শিখরের আগায় মেঘে মেঘে
 আগুনবরন কিরণ রইত লেগে,
 দীর্ঘ ছায়া বনে বনে এলিয়ে যেত পর্বতে পর্বতে;
 সামনেতে ওই কাকর-ঢালা পথে
 দিনের পরে দিনে
 ডাকপিঙ্গলের পারের ধ্বনি নিত্য নিত্যে চিনে।

মাসের পরে মাস গিয়েছে, তবু
 একবারও তার হয় নি কামাই কভু।
 আজও তেমনি সূর্য ডোবে সেইখানেতেই এসে
 পাইনবনের শেষে,
 সদূর শৈলতলে
 সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরনাধারার জলে,
 সেই সেকালের মতোই তেমনিধারা
 তারার পরে তারা
 আলোর মন্ত্র চুপি চুপি শুনায় কানে পর্বতে পর্বতে;
 শূন্য আমার কাঁকর-ঢালা পথে
 বহুকালের চেনা
 ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনও বাজবে না।

আজকে তবু কী প্রত্যাশা জাগল আমার মনে—
 চলতে চলতে গেলেম অকারণে
 ডাকঘরে সেই মাইল-তিনেক দূরে।
 দ্বিধাভরে মিনিট-কুড়িক এদিক ওদিক ঘুরে
 ডাকবাবুদের কাছে
 শূন্যই এসে, 'আমার নামে চিঠিপত্র আছে?'
 জবাব পেলেম, 'কই, কিছু তো নেই।'
 শূন্যে তখন নতশিরে আপন মনেতেই
 অন্ধকারে ধীরে ধীরে
 আসছি যখন শূন্য আমার ঘরের দিকে ফিরে,
 শূন্যতে পেলেম পিছন দিকে
 করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে,
 'মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি।'
 ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
 বন্ধে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
 পঁচিশবছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
 যে-ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
 কাঁকর-ঢালা পথের 'পরে ডাকপিয়নের পদধ্বনির সূরে।

রবিফটস্ জাহাজ
 ২০ অগস্ট ১৯২৭

তে হি নো দিবসাঃ

এই অজানা সাগরজলে বিকেলবেলার আলো
 লাগল আমার ভালো।
 কেউ দেখে কেউ নাই বা দেখে, রাখবে না কেউ মনে,
 এমনতরো ফেলাছড়ার হিসাব কি কেউ গোলো।

এই দেখে মোর ভরল বৃকের কোণ;
কোথা থেকে নামল রে সেই খ্যাপা দিনের মন,
যেদিন অকারণ
হঠাৎ হাওয়ায় বোবনেরই ঢেউ
ছল্‌ছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত না তা কেউ।
লাগত আমার আপন গানের নেশা
অনাগত ফাগুনদিনের বেদন দিয়ে ঘেশা।

সে গান যারা শুনত তারা আড়াল থেকে এসে
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে।
হয়তো তাদের দেবার ছিল কিছু,
আভাসে কেউ জানায় নি তা নয়ন করে নিচু।
হয়তো তাদের সারাদিনের মাঝে
পড়ত বাধা একবেলাকার কাজে।
চমক-লাগা নিমেষগুলি সেই
হয়তো বা কার মনে আছে, হয়তো মনে নেই।
জ্যোৎস্নারাতে একলা ছাদের 'পরে
উদার অনাদরে
কাটত প্রহর লক্ষ্যবিহীন প্রাণে,
মূল্যবিহীন গানে।

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজত তাহার বৃকের মাঝে খামখেয়ালী বীন—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনার নীলে
রূপ-হারানো রাধাশ্যামের দোলন দৌহার মিলে,
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেলবেলা
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শূন্য হওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলোছায়ার ভেলা।

মোর জাহাজ
২ অক্টোবর ১৯২৭

দীপশিল্পী

হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী,
তোমার অরূপ জ্যোতি
রূপ লবে আমার জীবনে,
তারি লাগি একমনে
রচিলাম এই দীপখানি,
মুর্তিমতী এই মোর অভ্যর্থনাবাগী।

এসো এসো করো অধিষ্ঠান,
 মোর দীর্ঘ জীবনে করে গো চরম বরদান।
 হয় নাই যোগ্য তব,
 কতবার ভিড়িয়াছি আবার গড়েছি অভিনব,
 মোর শক্তি আপনারে দিয়েছে ধিকার।
 সম্মুখ নাহি যে আর,
 নিগ্রাহারা প্রহর-ষে একে একে হয় অপগত,
 তাই আজ সমাপিন্দু রত।
 গ্রহণ করো এ মোর চিরজীবনের রচনারে
 ক্ষণকাল স্পর্শ করো তারে।
 তার পরে রেখে যাব এ জন্মের এক-সার্থকতা,
 চিরন্তন সুখ মোর, এই মোর নিরন্তর ব্যথা।

কালানু? ১০০৮

মানী

উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার
 ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
 হে মানী, হে অভিমানী।
 মন্দিরবাসী দেবতার মতো
 সম্মানশৃঙ্খলে
 বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
 সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে
 নিজেরে পৃথক করি
 আছ দিনরাত গৌরবগুরু
 কঠিন মূর্তি ধরি।
 সবার যেখানে ঠাই
 বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে
 সেথায় প্রবেশ নাই।
 অনেক উপাধি তব,
 মানুষ-উপাধি হারিয়েছ শুধু
 সে কতি কহারে কব।

ভক্তেরা মন্দিরে
 পূজারীর কৃপা বহু দামে কিনে
 পূজা দিয়ে যায় ফিরে
 ঈর্ষান্বিত বৈষ্ণবীধিকার ছায়ে
 আপন নিভৃত গায়ে।
 তখন একাকী বৃথা বিচির
 পাষণ্ডভিত্তি-মাঝে
 জেবতার বৃক্ষে জান সে কী ব্যথা বাজে।

বেদীর বাঁধন করি ধূলিসাৎ
অচেনারে দিয়ে নাড়া
মানুষের মাঝে সে-ষে পেতে চায় ছাড়া।

হে রাজা, তোমার পূজা-ঘেরা মন
আপনারে নাহি জানে।
প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙ-করা তুমি ঢেলা,
তোমার জীবন সাজানো পুতুল
স্থূল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে
আপনার অভিলাষে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে।
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা
মুগ্ধ ভুবনে ফিরে
মরিবার আগে তাদের পরশ
লাগুক তোমার শিরে।

কালদে? ১০০৮

রাজপুত্র

রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী
রাজপুত্র কোথা হতে আসি
শুভক্ষণে দেখা দেয় রূপে
চুপে চুপে,
জানি বলে জেনেছিঁই বায়ে
তারি মাঝে। আমার সংসারে,
বন্ধে মোর আগমনী পদধ্বনি বাজে
যেন বহুদূর হতে আসা।
তার ভাষা
প্রাণে দেয় আনি
সমুদ্রপারের কোন্ অভিনব যৌবনের বাণী।
সেদিন বৃষ্টিতে পারে মন
ছিল সে-ষে নিশ্চতন
ভুজ্জতার অন্তরালে
এতকাল যারানিদ্রাজালে।
তার দৃষ্টিপাতে মোরে নতুন সৃষ্টির ছোঁয়া লাগে,
চিন্তা জাগে।—
যদি তার পদধ্বনি চুমি,
'রাজপুত্র তুমি।'

এতদিন
 আত্মপরিচয়হীন
 জড়তার পাষণপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা
 দুর্গ-মাঝে রেখেছিল প্রত্যাহের প্রথার দৈত্যোরা।
 কোন্ মন্ত্রগুণে
 সে দুর্ভেদ বাধা যেন দাহিলে আগুনে,
 বিন্দিনীরে করিলে উদ্ধার,
 করি নিলে আপনার,
 নিয়ে গেলে মন্দির আলোকে।
 আজিকে তোমারে দেখি কী নতন চোখে।
 কুঁড়ি আজ উঠেছে কুসুমি,
 বার বার মন বলে, 'রাজপুত্র তুমি।'

২৪ ফাল্গুন ১৩৩৮

অগ্রদূত

হে পথিক, তুমি একা।
 আপনার মনে জানি না কেমনে
 অদেখার পেলে দেখা।
 যে পথে পড়ে নি পায়ের চিহ্ন
 সে পথে চলিলে রাতে,
 আকাশে দেখেছ কোন্ সংকেত,
 করেও নিলে না সাথে।
 তুঙ্গগিরির উঠিছ শিখরে
 যেখানে ভোরের তারা
 অসীম আলোকে করিছে আপন
 আলোর বাহা সারা।

প্রথম যৌদিন ফাল্গুনতাপে
 নবনির্ঝর জাগে,
 মহাসদরের অপরাধ রূপ
 দোষিতে সে পায় আগে।
 আছে আছে আছে, এই বাণী তার
 এক নিমেষেই ফুটে,
 অচেনা পথের আহবান শব্দে
 অজানার পানে ছুটে।
 সেইমতো এক অকথিত ভাষা
 ধ্বনিল তোমার মাঝে,
 আছে আছে আছে, এ মহামন্ত্র
 প্রতি নিশ্বাসে বাজে।

রোধিয়াছে পথ বন্ধ করি
 অচল শিলার স্তূপ।
 নহে নহে নহে, এ নিষেধবাণী
 পাষাণে ধরেছে রূপ।
 জড়ের সে নীতি করে গর্জন
 ভীরুজন মরে দলে,
 জনহীন পথে সংশয়মোহ
 রহে তর্জনী তুলে।
 অঙ্গম মনের আপনারি ছায়া
 শঙ্কিত কান্না ধরে,
 অতি নিরাপদ বিনাশের তলে
 বাঁচিতে চেরে সে মরে।

নবজীবনের সংকটপথে
 হে তুমি অগ্রগামী,
 তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
 কোথাও যাবে না থামি।
 শিখরে শিখরে কেতন তোমার
 রেখে যাবে নব নব,
 দুর্গম-মাঝে পথ করি দিবে।
 জীবনের ব্রত তব।
 যত আগে যাবে শিখা সন্দেহ
 ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
 পায় পায় তব ধনিরা উঠবে
 মহাবাহী—আছে আছে।

১২ চৈত্র ১৩৩৮

প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
 তোমার সুপ্তির প্রান্তে,
 নিষ্কৃত প্রদোষে
 প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
 দেখা দিল।
 চেরে আমি থাকি একমনে
 তোমার স্বপ্নের 'পরে।

স্তম্ভিত সমীরে
 স্রাব্য প্রহরণে সমুদ্রের তীরে
 সম্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিস্ট চোখে

চেয়ে পূর্বতট-পানে,
 প্রথম আলোকে
 স্পর্শস্নান হবে তার, এই আশা ধরি
 অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।

তব নবজাগরণী প্রথম
 যে হাসি
 কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
 আধোখোলা অধরেতে, নয়নের কোণে,
 চয়ন করিব তাই,
 এই আছে মনে।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

নির্বাক

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছ,
 যে কথা আমি বলি নি আর-কারে,
 সেদিন বনে মাধবীশাখা নিচু
 ফুলের ভারে ভারে।
 বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি
 বিরহব্যথাবৃন্ত হতে ভাঙা,
 গোপন রাতে উঠেছে তারা দু'লি
 সুরের রঙে রাঙা।

শিরীষবন নতুনপাতা-ছাওয়া
 মর্মরিয়া করিল, 'গাহো গাহো।'
 মধুমালতীগন্ধে-ভরা হাওয়া
 দিয়েছে উৎসাহ।
 পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া
 নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
 কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া
 ঘাসের 'পরে লুটে।

সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে
 কোথাও কিছ ছিল না কৃপণতা।
 চাঁদের আলো সবার হসে বলে
 যত মনের কথা।
 মনে হল যে, নীরবে কৃপা যাচে
 যা-কিছ আছে তোমার চারি দিকে।

সাহস ধরি গেলেম তব কাছে
চাহিন্দু অনিমিখে।
সহসা মন উঠিল চমকিয়া
বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী।
গহনছায়ে দাঁড়ান্দু থমকিয়া
হেরিন্দু মৃদুখানি।

সাগরশেষে দেখেছি একদিন
মিলিছে সেথা বহু নদীর ধারা—
ফেনিল জল দিক্‌সীমার লীন
অপারে দিশাহারা।
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
অবোধসম কর্পিছে ধরধরি,
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে
বাঁধিব মোর তরী।

তেমনি আজি তোমার মূখে চাহি
নয়ন যেন কল না পায় খুঁজি,
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি
তোমারে নাহি বৃষ্টি।
মুখেতে তব শ্রান্ত এ কী আশা,
শান্তি এ কী, গোপন এ কী প্রীতি,
বাণীবহীন এ কী ধ্যানের ভাষা,
এ কী সুদূর স্মৃতি।
নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে
স্তম্ভ তব নীরব গভীরতা—
রহিন্দু বসি লতাঝিতান-কোণে,
কহি নি কোনো কথা।

মাঘ ১৩৩৮

প্রণাম

তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ
যারে তুমি করেছ ধরণ।
ভূমি মূল্য দিলে তারে
দল্লভ পূজার অলংকারে।
ভক্তিসমুদ্ভব চোখে
তাহারে হেরিলে তুমি যে শূদ্র আলোকে
সে আলো করালো তারে স্মরন;
দীপ্তমান মহিমার দান
পর্যাইল ললাটের পর।

হোক সে দেবতা কিংবা নর,
তোমারি হৃদয় হতে বিচ্ছুরিত স্মিত ছটায়
দিব্য আবির্ভাবে তার প্রকাশ ঘটায়।
তার পরিচয়খানি
তোমাতেই লভিয়াছে জয়বাণী।
রচিয়া দিয়াছে তার সত্য স্বর্গ-পূরী
তোমারি এ প্রীতির মাধুরী।
ষে-অমৃত করে পান
ঢালে তাহা তোমারি এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
তব শির নত
দিক্‌রেখায় অরুণের মতো,
তারি 'পরে দেবতার অভ্যুদয়
রূপ লভে সুপ্রসন্ন পূণ্য জ্যোতির্ময়।

১৭ মে ১৩৩৪

শূন্যঘর

গোধূলি-অন্ধকারে
পূরীর প্রান্তে অতিথি আসিন্দু দ্বারে।
ডাকিন্দু, 'আছ কি কেহ,
সাড়া দেহো, সাড়া দেহো।'

ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা
না কহিল কোনো কথা।
বাহিরে বাগানে পুষ্কিত শাখা
গন্ধের আহবানে
সংকেত করে কাহারে তাহা কে জানে।
হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি,
জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া
নীরবে দাঁড়িয়ে মালী।
সিঁড়িটা নির্বিকার
বলে, 'এস আর নাই যদি এস
সন্মান অর্থ তার।'

ঘরগুলো বলে ফিলজফারের গলায়,
'ডুব দিলে দেখো সমুদ্রাগর-তলায়
বুঝিতে পারিবে, থাকা নাই থাকা
আসা আর দূরে যাওয়া
সবই এক কথা, খেলালের ফাঁকা হাওয়া।'
কেদারা এগিয়ে দিতে কারো নেই তাড়া,
প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া।

মেয়াদ যখন ফুরোর কপালে,
হায় রে তখন সেবা
কারেই বা করে কেবা।

মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁয়া,
সকল দেখিনু ধোঁয়া।
ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
বদ্বি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।
নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্ অতিশয়,
এই কথা জেনে সওয়ারেই ক্ষতি সয়।
অতএব—আরে, অতএবখানা থাক্।
আপাতত ফেরা থাক্।

ব্যর্থ আশার ভারাতুর সেই ক্ষণে
ফিরালেম রথ, ফিরিবার পথ
দূরতর হল মনে।
যাবার বেলায় শুষ্ক পথের
আকাশভরানো ধূলি
সহজে ছিলাম ভুলি।
ফিরিবার বেলা মৃধেতে রুমাল,
ধোঁয়াটে চশমা চোখে,
মনে হল যত মাইক্রোব-দল
নাকে মৃধে সব ঢেকে।
তাই বদ্বিজাম, সহজ তো নয়
ফিলজফারের বদ্বি।
দরকার করে বহু চিন্তাশক্তি।

মোটর চলিল জোরে,
একটু পরেই হাসিলাম হো হো করে।
সংশয়হীন আশার সামনে
হঠাৎ দরজা বন্ধ,
নেহাত এটার ঠাট্টার মতো হৃদয়।
বোকার মতন গম্ভীর মৃধটারে
অটুহাস্যে সহজ করিনু,
ফিরিনু আপন দ্বারে।

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই
না-থাকার ফিলজফি
মনটাকে ধরে চাপি।

থাকটা আকস্মিক,
 না-থাকই সে তো দেশকাল ছেয়ে
 চেয়ে আছে অনিমিত্ত।
 সন্ধ্যাবেলায় আলোটা নিবিয়ে
 বসে বসে গৃহকোণে
 না-থাকার এক বিরাট স্বরূপ
 অঁকিতোঁছি মনে মনে।
 কালের প্রান্তে চাই,
 ওই বাড়িটার আগাগোড়া কিছ্ নাই।
 ফুলের বাগান, কোথা তার উদ্দেশ্য,
 বসিবার সেই আরামকেন্দ্র
 পুরোপুরি নিঃশেষ।
 মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
 দুই দুই মালী একেবারে সব মিছে।
 ক্রেসান্থেমাম্ কার্নেশানের
 কেমারি সমেত তারা
 নাই-গহবরে হারা।
 চেয়ে দেখি দূর-পানে
 সেই ভাবীকালে যাহা আছে যেইখানে
 উপস্থিতের ছোটো সীমানায়
 সামান্য তাহা অতি—
 হেথায় সেথায় বৃদ্ধবৃদ্ধসংহতি।
 যাহা নাই তাই বিরাট বিপুল মহা।
 অনাদি অতীত বৃগের প্রবাহ-বহা
 অসংখ্য ধন, কণামাত্রও তার
 নাই নাই হায়, নাই সে কোথাও আর।

‘দূর করো ছাই’ এই বলে শেষে
 যেমনি জ্বালিন্দু আলো
 ফিলজফিটার কুয়াশা কোথা মিলাল।
 স্পষ্ট বৃক্কিন্দু যা-কিছ্ সমুখে আছে,
 চক্ষের ‘পরে যাহা বন্ধের কাছে
 সেই তো অন্তহীন
 প্রতিপল প্রতিদিন।
 যা আছে তাহারি মাঝে
 যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
 সত্য হইয়া রাজে।
 অতীতকালের যে ছিলেম আমি
 আজিকার আমি সেই
 প্রত্যেক নিমেষেই।
 বাঁধিয়া রেখেছে এই বৃহত্তরজাল
 সমস্ত ভাবীকাল।

অতএব সেই কৈদারাটা যেই
 জানালায় লব টানি,
 বসিব আরামে, সে-মুহূর্তেই
 চিরদিবসের জানি।
 অতএব কেনো সম্যাসী হব নাকো,
 আরবার যদি ডাক
 আবার সে ওই মাইক্রোব-ওড়া পথে
 চলিব মোটর-রথে।
 ঘরে যদি কেহ রয়
 নাই ব'লে তারে ফিলজফারের
 হবে নাকো সংশয়।
 দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
 দেখি যদি কোনো মিত্রম্
 কবি তবে কবে, 'এই সংসার
 অতীব বটে বিচিত্রম্।'

চৈত্র ? ১৩৩৮

দিনাবসান

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
 নিববে দীপের শিখা,
 এই জনমের লীলার 'পরে
 পড়বে যবনিকা,
 সেদিন যেন কবির তরে
 ভিড় না জমে সভার ঘরে,
 হয় না যেন উচ্চস্বরে
 শোকের সমারোহ।
 সভাপতি থাকুন বাসায়,
 কাটান বেলা তাসে পাশায়,
 নাই বা হল নানা ভাষায়
 আহা উহু ওহো।
 নাই ঘনাল দল-বেদলের
 কোলাহলের মোহ।

আমি জানি মনে মনে,
 সে-উত্তি মৃধী জবা
 আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
 কবির স্মৃতিসভা।

বর্ষা-শরৎ-বসন্তেরই
 প্রাগলভ্যে আমার ঘেরি
 যেথায় বীণা যেথায় ভেরী

বেজেছে উৎসবে,
 সেথায় আমার আসন-পরে
 স্নিগ্ধশ্যামল সমাদরে
 আলিপনায় স্তরে স্তরে
 অঁকন অঁকা হবে।
 আমার মৌন করবে পূর্ণ
 পাখির কলরবে।

জানি আমি এই ভারত
 রইবে অরণ্যেতে—
 ওদের সুরে কবির কথা
 দিয়েছিলেম গেঁথে।
 ফাগুনহাওয়ায় শ্রাবণধারে
 এই ভারতাই বারে বারে
 দিক্‌বালাদের শ্বারে শ্বারে
 উঠবে হঠাৎ বাজি;
 কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
 কভু অরুণ আলোক লেগে,
 এই ভারত উঠবে জেগে
 রঙিন বেশে সাজি,
 স্মরণসভার আসন আমার
 সোনার দেবে মাজি।

আমার স্মৃতি থাক্‌না গাঁথা
 আমার গীতি-মাঝে
 যেখানে ওই ঝাউয়ের পাতা
 মর্মরিয়া বাজে।
 যেখানে ওই শিউলিতলে
 ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
 ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
 কিরণকণামালী;
 যেথায় আমার কাজের বেলা
 কাজের বেশে করে খেলা,
 যেথায় কাজের অবহেলা
 নিভুতে দীপ জ্বালি
 নানা রঙের স্বপন দিয়ে
 ভরে রূপের ডালি।

পথসঙ্গী

শ্রীযুক্ত কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছিলে-যে পথের সাথী,
 দিবসে এনেছ পিপাসার জল
 রাতে জেলেছ বাতি।
 আমার জীবনে সম্বা ঘনায়,
 পথ হয় অবসান,
 তোমার লাগিয়া রেখে যাই মোর
 শূভকামনার দান।
 সংসারপথ হোক বাধাহীন,
 নিয়ে যাক কল্যাণে,
 নব নব ঐশ্বর্য আনুক
 জ্ঞানে কর্মে ও ধ্যানে।
 মোর স্মৃতি যদি মনে রাখ কভু
 এই বলে রেখো মনে—
 ফুল ফুটায়োছি, ফল যদিও বা
 ধরে নাই এ জীবনে।

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
 অন্তরে তাহা রাখি,
 কর্মে তাহার শেষ নাই হয়
 প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
 আমার আলোর ক্রান্তি ঘুচাতে
 দীপে তেল ভরি দিলে।
 তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
 সে আলোকে যায় মিলে।

তেহেরান
 ৬ মে ১৯০২

অন্তর্হিতা

তুমি যে তারে দেখ নি চেয়ে
 জানিত সে তা মনে,
 ব্যথার ছায়া পড়িত ছেয়ে
 কালো চোখের ঝুলাণে।

জীবনশিখা নিবিজ তার,
 ডুবিজ তারি সাথে
 অবমানিত দঃখভার
 অবহেলার রাতে।
 দীপাবলীর খালাতে নাই
 তাহার ম্লান হিয়া,
 তারায় তারি আলোক তাই
 উঠিল উজলিয়া।
 স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি
 ভাষাবিহীন মৃখে,
 বহুজনের বাণীরে ঠেলি
 বাজে কি তব বৃকে।
 নিকটে তব এসেছিল যে,
 সে কথা বৃঝাবারে
 অসীম দূরে গিয়েছে ও-যে
 শূন্যে খুঁজাবারে।
 সেখানে গিয়ে করেছে চুপ,
 ভিক্ষা গেল থামি,
 তাই কি তার সত্যরূপ
 হৃদয়ে এল নামি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
 ১ আষাঢ় ১৩৩৯

আশ্রমবালিকা

শ্রীমতী মমতা সেনের বিবাহ-উপলক্ষে

আশ্রমের হে বালিকা,
 আশ্রমের শেফালিকা
 ফাল্গুনের শালের মঞ্জরী
 শিশুকাল হতে তব
 দেহে মনে নব নব
 যে-মাধুর্য দিলেছিল ভরি,
 মাঘের বিদায়ক্ষেপে
 মৃকুলিত আশ্রমবনে
 বসন্তের যে-নবদীপিকা,
 আষাঢ়ের রাশি রাশি
 শুভ্র মালতীর হাসি,
 প্রাণের যে-সিদ্ধার্থিকা,
 ছিল ঘিরে রাশিদিন
 তোমাতে বিচ্ছেদহীন
 প্রান্তরের যে-শান্তি উদার,

প্রভুষের জাগরণে
 পেয়েছ বিস্মিত মনে
 যে-আম্বাদ আলোকসুধার,
 আষাঢ়ের পূজ্যমেঘে
 যখন উঠিত জেগে
 আকাশের নিবিড় কন্দন,
 মর্ম্মরিত গীতিকায়
 সন্তপর্ণবীথিকায়
 দেখেছিলে যে-প্রাণস্পন্দন,
 বৈশাখের দিনশেষে
 গোধূলিতে রুদ্ধবেশে
 কালবৈশাখীর উন্মত্ততা—
 সে-ঝড়ের কলোন্মাসে
 বিদ্যুতের অট্টহাসে
 শূনেছিলে যে-মুষ্টিবারতা,
 পউষের মহোৎসবে
 অনাহত বাঁগারবে
 লোকে লোকে আলোকের গান
 তোমার হৃদয়স্বারে
 আনিয়াছে বারে বারে
 নবজীবনের যে-আহ্বান,
 নববরষের রবি
 যে-উজ্জ্বল পূণ্যছবি
 একেছিল নির্মল গগনে,
 চিরনৃতনের জয়
 বেজেছিল শূন্যময়
 বেজেছিল অন্তর-অঙ্গনে,
 কত গান কত খেলা,
 কত-না বন্ধুর মেলা,
 প্রভাতে সন্ধ্যার আরাধনা,
 বিহঙ্গকৃজন-সাথে
 গাছের তলার প্রাতে
 তোমাদের দিনের সাধনা,
 তারি স্মৃতি শূভকণে
 সমস্ত জীবনে মনে
 পূর্ণ করি নিরে যাও চলে,
 চিস্ত করি ভরপুর
 নিত্য ডায়া দিক সদর
 জনতার কঠোর কল্পোলে।
 নবীন সংসারখানি
 রচিতে হবে-যে জানি
 আধুনীতে মিশারে কল্যাণ

প্রেম দিয়ে, প্রাণ দিয়ে,
 কাজ দিয়ে, গান দিয়ে,
 ধৈর্য দিয়ে, দিয়ে তব ধ্যান—
 সে তব রচনা-মাঝে
 সব ভাবনায় কাজে
 তারা যেন উঠে রূপ ধরি,
 তারা যেন দেয় আনি
 তোমার বাণীতে বাণী
 তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি।
 সূখী হও, সূখী রহো
 পূর্ণ করো অহরহ
 শৃঙ্খলকর্মে জীবনের ডালা,
 পূর্ণ্যসূত্রে দিনগুলি
 প্রতিদিন গেথে তুলি
 রচি লহো নৈবেদ্যের মালা।
 সমুদ্রের পার হতে
 পূর্বপবনের স্রোতে
 ছন্দের তরণীখানি ভরে
 এ-প্রভাতে আজি তোরই
 পূর্ণতার দিন স্মরি
 আশীর্বাদ পাঠাইনু তোরে।

রোহিতসাগর
 ১০ জ্যৈষ্ঠ [১৩৩৩]

বধু

শ্রীমতী অমিতা সেনের পরিণয় উপলক্ষে

মানুষের ইতিহাসে ফেনোজুল উদ্ভেল উদ্যম
 গর্জি উঠে; অতীত তিমিরগর্ভ হতে তুরঙ্গম
 তরঙ্গ ছুটিছে শূন্যে; উন্মেষিছে মহাভবিষ্যৎ।
 বর্তমান কালতটে অগ্নিগর্ভ অপূর্ব পর্বত
 সদ্যোজাত মহিমায় উড়ায় উজ্জ্বল উত্তরীক
 নব সূর্যোদয়-পানে। যে-অদৃষ্ট, যে-অভাবনীয়
 মানুষের ভাগ্যলিপি লিখিতেছে অজ্ঞাত অক্ষরে
 দস্ত বীরমূর্তি ধরি, দেখিয়াছি; তার কণ্ঠস্বরে
 শুনোছি দীপকরাগে সৃষ্টিবাণী মরণবিজয়ী
 প্রাণমন্ত্রে।

এই ক্ষুদ্র বদগান্তর-মাঝে সংসে অগ্নি,
 তোমাতে হেরিনু বধুবোলে, নিব্বরিণী নৃত্যশীলা,
 সহসা মিলিছ সরোবরে, চটুল চঞ্চল লীলা
 গভীরে করিছ মগ্ন; নির্ভয়ে নিখিল করি পণ
 নবজীবনের সৃষ্টি-রহস্য করিছ উন্মোচন।

ইতিহাসবিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্বদুঃখসুখে
দেশে দেশে যে-বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে
যুগে যুগে, নরনারীহৃদয়ের আকাশে আকাশে
এও সেই স্মৃতিলীলা জ্যোতির্ময় বিশ্ব-ইতিহাসে।

[শান্তিনিকেতন]
৩ আষাঢ় ১৩৩৯

মিলন

শ্রীমতী ইন্দ্রা মৈত্রেয় বিবাহ উপলক্ষে

সেদিন উষার নবযৌগাঙ্কুরে
মেঘে মেঘে করে সোনার সুরের কণা।
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোরপরপারে
পাখিদুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রঙে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা।
সুর্ভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুজনের পাখার ঠেকিল পাখা।

কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি
মেঘের রঙেতে রাঙারে দৌহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথী,
কোথাও ছিল না মানা।
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি
দৌহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি—
পূজিত শ্যামলতা।
চারি দিক হতে বিরাটের মহাবাগী
শুনালো দৌহারে ভাষার-অতীত কথা।

মেঘলোকে সেই নীরব সন্মিলনী
বেদনা আনিল কী অনির্বাচনীয়।
দৌহার চিন্তে উজ্জ্বলি উঠে ধনি—
'প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।'
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে প্যাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এল তারি,
এলে নামি ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছায়া,
পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে।

স্পাই

শক্তি হল রোগ,
 হস্তা-পাঁচেক ছিল আমার ভোগ।
 একটুকু যেই সুস্থ হলেম পরে
 লোক ধরে না ঘরে,
 ব্যামোর চেয়ে অনেক বেশি ঘটালো দুর্যোগ।
 এল ভবেশ, এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান,
 এল পোলিটিশান,
 এল গোকুল সংবাদপত্রের,
 খবর রাখে সকল পাড়ার নাড়ীনকশের।
 কেউ বা বলে 'বদল করো হাওয়া',
 কেউ বা বলে 'ভালো ক'রে করবে খাওয়াদাওয়া'।
 কেউ বা বলে, 'মহেন্দ্র ডাক্তার
 এই ব্যামোতে তার মতো কেউ ওস্তাদ নেই আর।'

দেয়াল ঘেঁষে ওই যে সবার পাছে
 সতীশ বসে আছে।
 থাকে সে এই পাড়ায়,
 চুলগুলো তার উর্ধ্ব তোলা পাঁচ আঙুলের নাড়ায়।
 চোখে চলমা আঁটা,
 এক কোণে তার ফেটে গেছে বাক্সের পরকলাটা।
 গলার বোতাম খোলা,
 প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে-ভোলা।
 সর্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
 হঠাৎ খুলে পাতা
 লুকিয়ে লুকিয়ে কী-যে লেখে, হয়তো বা সে কবি,
 কিংবা আঁকে ছবি।
 নবীন আমার শোনায় কানে কানে,
 ওই ছেলেটার গোপন খবর নিশ্চিত সে-ই জানে—
 যাকে বলে 'স্পাই',
 সন্দেহ তার নাই।
 আমি বলি, হবেও বা, ভক্তিনয় নিরীহ ওই মদখে
 খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্ছে টুকু।
 ও মানুষটা সত্যি যদি ভেঁমনি হয় হয়,
 ঘৃণা করব, কেন করব ভয়।

এই বছরে বছর-খানেক বেড়িয়ে নিলেম পাল্লাবে কাশ্মীরে।
 এলেম বখন ফিরে,
 এল গণেশ, পল্টু এল, এল নবীন পাল,
 এল মাখনলাল।

হাতে একটা মোড়ক নিয়ে প্রণাম করলে পাঁচু,
 মৃদুখটা কাঁচুমাচু।
 ‘মনিব কোথায়’ শূন্যেই আমি তারে,
 ‘সতীশ কোথায় হাঁ রে।’
 নবীন বললে, ‘খবর পান নি তবে—
 দিন-পনেরো হবে
 উপোস করে মারা গেল সোনার টুকরো ছেলে
 নন-ভায়োলেন্স্ প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে।’
 পাঁচু আমার হাতে দিল খাতা,
 খুলে দেখি পাতার পরে পাতা—
 দেশের কথা কী বলেছি তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে,
 পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে।
 আজকে বসে বসে ভাবি, মৃদুখের কথাগুলো
 ঝরা পাতার মতোই তারা ধুলোয় হত ধুলো।
 সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখবে কি এ
 মৃত্যুসুধার নিত্যপরশ দিয়ে।

শান্তিনিকেতন
 ৩ আষাঢ় ১৩৩৯

ধাবমান

‘যেয়ো না, যেয়ো না’ বলি করে ডাকে বার্থ এ ক্রন্দন।
 কোথা সে বন্ধন
 অসীম যা করিবে সীমারে।
 সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে
 এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসালে,
 কাঁদায়ে হাসায়ে।
 অস্থির সস্তার রূপ ফুটে আর টুটে;
 ‘নয় নয়’ এই বাণী ফেনাইয়া মৃদুখিয়া উঠে
 মহাকালসমুদ্রের ‘পরে।
 সেই স্বে
 রুদ্ধের ডম্বরধ্বনি বাজে
 অসীম অম্বর-মাঝে—
 ‘নয় নয় নয়’।
 ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।
 সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়।

যাবে সব যাবে চলে, তবু ভালোবাসি,
 চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাসি
 আনন্দের বেগে।
 মরণের বাণীভারে উঠে জেগে
 জীবনের গান;

নিরন্তর ধাবমান
 চঞ্চল মাধুরী।
 ক্ষণে ক্ষণে উঠে ক্ষুরি
 শাস্বতের দীপাশিখা
 উজ্জ্বলিয়া মৃদুতের মরীচিকা।
 অতল কাম্মার স্রোত মাতার করুণ স্নেহ বয়,
 প্রিয়ের হৃদয়বিনিময়।
 বিজ্ঞাপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বীৰ্যমদ
 ধরণীর সৌন্দর্যসম্পদ।

অসীমের দান
 ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
 সময়ের মাপে নহে।
 কাল ব্যাপি রহে নাই রহে
 তবু সে মহান;
 যতক্ষণ আছে তারে মৃদা দাও পণ করি প্রাণ।
 ধায় যবে বিদায়ের রথ
 জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ
 আপনারে ভুলি।
 যতটুকু ধূলি
 আছ তুমি করি অধিকার
 তার মাঝে কী রহে না, তুচ্ছ সে বিচার।
 বিরাতের মাঝে
 এক রূপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে।
 ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
 মৃত্যুকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ।
 ওরে শোকাতুর, শেষে
 শোকের বদ্বন্দ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

তাকিয়ে দেখি পিছে
 সেদিন ভালোবেসেছিলাম,
 দিন না বেতেই হয়ে গেল মিছে।
 কলার কথা পাই নি আমি খুঁজে,
 আপনা হতে নেয় নি কেন বদলে,
 দেবার মতন এনেছিলাম কিছুর,
 ডালির থেকে পড়ে গেল নীচে।

ভরসা ছিল না যে,
তাই তো ভেবে দেখি নি হায়
কী ছিল তার হাসির মিথ্যা-মাঝে।
গোপন বীণা সুরেই ছিল বাঁধা,
ঝংকার তায় দিয়েছিল আধা,
সংশয়ে আজ তলিয়ে গেল কোথা,
পাব কি তায় দঃখসাগর সিঁচে।

হায় রে গরবিনী,
বারেক তব করুণ চাহনিত
ভীরুতা মোর লও নি কেন জিনি।
যে মণিটি ছিল বৃকের হারে
ফেলে দিলে কোন্ খেদে হায় তারে,
ব্যর্থ রাতের অশ্রুফোঁটার মালা
আজ তোমার ওই বক্ষে বলকিছে।

৯ আষাঢ় ১০০৯

বিচার

বিচার করিলো না।
যেখানে তুমি রয়েছ, সে তো
জগতে এক কোণা।
ষেটুকু তব দৃষ্টি যায়
সেটুকু কতখানি,
ষেটুকু শোন তাহার সাথে
মিশাও নিজ বাণী।
মন্দ-ভালো সাদা ও কালো
রাখিছ ভাগে ভাগে।
সীমানা মিছে অঁকিয়া ভোল
আপন-রচা দাগে।

সূরের বাঁশ যদি তোমার
মনের মাঝে থাকে,
চলিতে পথে আপন মনে
জাগারে দাও তাকে।
গানের মাঝে তর্ক নাই,
কাজের নাই তাজা।

মাহার খুঁশি চলিয়া যাবে,
 যে খুঁশি দিবে সাড়া।
 হোক-না তারা কেহ বা ভালো
 কেহ বা ভালো নয়,
 এক পথেরই পথিক তারা
 লহো এ পরিচয়।

বিচার করিলো না।
 হায় রে হায়, সময় যায়,
 বৃথা এ আলোচনা।
 ফুলের বনে বেড়ার কোণে
 হেরো অপরাজিতা
 আকাশ হতে এনেছে বাণী,
 মাটির সে যে মিতা।
 ওই তো ঘাসে আষাঢ়মাসে
 সবুজে লাগে বান,
 সকল ধরা ভরিয়া দিল
 সহজ তার দান।
 আপনা ভুলি সহজ সূখে
 ভরুক তব হিয়া,
 পথিক, তব পথের ধন
 পথেরে যাও দিয়া।

উন্নয়ন। শান্তিনিকেতন
 ১০ আষাঢ় ১৩৩৯

পুরানো বই

আমি জানি
 পুরাতন এই বইখানি।
 অপঠিত, তবু মোর ঘরে
 আছে সমাদরে।
 এর ছিন্ন পাতে পাতে তার
 বাষ্পাকুল করুণার
 স্পর্শ যেন রয়েছে বিলীন।
 সে-যে আজ হল কতদিন।

সরল দুখানি আঁখি ঢলোঢলো,
 বেদনার আভাসেই করে ছলোছলো;
 কালোপাড় শাড়িখানি মাথার উপর দিয়ে ফেরা,
 দুটি হাত কঙ্কণে ও সান্দ্রনায় ঘেরা।

জনহীন শ্মিপ্রহরে
 এলোচুল মেলে দিয়ে বালিশের 'পরে,
 এই বই তুলে নিয়ে বৃকে
 একমনে স্নিগ্ধমুখে
 বিচ্ছেদকাহিনী যায় পড়ে।
 জানালা-বাহিরে শুন্যে ওড়ে
 পায়রার ঝাঁক,
 গলি হতে দিয়ে যায় ডাক
 ফেরিওলা,
 পাপোশের 'পরে ভোলা
 ভক্ত সে কুকুর
 ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ছাড়ে আত্ম সদর।
 সময়ের হয়ে যায় ভুল:
 গলির ওপারে স্কুল,
 সেথা হতে বাজে হবে
 কাংসারবে
 ছুটির ঘণ্টার ধ্বনি,
 দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখনি
 তাড়াতাড়ি
 ওঠে সে শয়ন ছাড়ি,
 গৃহকার্ষে চলে যায় সচকিতে
 বইখানি রেখে কুলদলিতে।

অন্তঃপুর হতে অন্তঃপুরে
 এই বই ফিরিয়াছে দূর হতে দূরে।
 ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে
 খ্যাতি এর ব্যাপিয়াছে দক্ষিণে ও বামে।

তার পরে গেল সেই কাল,
 ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সৃষ্টির মারাজাল।
 এ লজ্জিত বই
 কোনো ঘরে স্থান এর কই।
 নবীন পাঠক আজ বসি কেদারায়
 ভেবে নাহি পায়
 এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল জন্ম
 সেদিনের অসংখ্য হৃদয়।

জানালা-বাহিরে নীচে ট্রাম যায় চলি।
 প্রশস্ত হয়েছে গলি।
 চলে গেছে ফেরিওলা, সে-পসরার তার
 ঝিকান্ন না আর।

ডাক তার ক্রান্ত সুরে
 দূর হতে মিলাইল দূরে।
 বেলা চলে গেল কোন্ ক্ষণে,
 বাজিল ছুটির ঘণ্টা ও-পাড়ার সূর্যের প্রাঙ্গণে।

কোশাকর্। শান্তিনিকেতন
 ১১ আষাঢ় ১৩৩৯

বিস্ময়

আবার জাগিন্দু আমি।
 রাগি হল ক্ষয়।
 পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।
 এই তো বিস্ময়
 অন্তহীন।
 ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
 নিবে গেছে কত তারা,
 হয়েছে নিঃশেষ
 কত যুগ-যুগান্তর।
 বিশ্বজয়ী বীর
 নিজেরে বিলুপ্ত করি শূন্য কাহিনীর
 বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়।
 কত জাতি
 কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
 মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা।
 সে বিরাট
 ধ্বংসধারা-মাঝে আজি আমার লজাট
 পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
 নিদ্রাশেষে,
 এই তো বিস্ময় অন্তহীন।
 আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্কসভাতে
 রয়েছি দাঁড়িয়ে।
 আছি হিমাদ্রির সাথে,
 আছি সপ্তর্ষির সাথে,
 আছি যেথা সমুদ্রের
 তরঙ্গে ভাঙিয়া উঠে উন্মত্ত রূপের
 অটুহাস্যে নাটলীলা।
 এ বনস্পতির
 বক্ষলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
 কত রাজমুকুটে দেখিল বসিতে।

তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—

জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্ৰ শব্দহীন বাজে।

কোণার্ক। শান্তিনিকেতন
১২ আষাঢ় ১৩৩৯

অগোচর

হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি,
হাজার হাজার মুখ হাজার হাজার ইতিহাস
ঢাকা দিয়ে আসে যার দিনের আলোর
রাতের আধারে।
সব কথা তার
কোনো কালে জানবে না কেউ,
নিজেও জানে না কোনো লোক।
মুখের আলাপ তার, উচ্চস্বরে কত আলোচনা,
তারি অন্তস্তলে
বিচিত্র বিপুল
স্মৃতিবিস্মৃতির সৃষ্টিরশি।
সেখানে তো শব্দ নেই, আলো নেই,
বাইরের দৃষ্টি নেই,
প্রবেশের পথ নেই কারো।
সংখ্যাহীন মানুষের
এই যে প্রচ্ছন্ন বাণী, অপ্রদূত কাহিনী
কোন আদিকাল হতে
অন্তঃশীল অগণ্য ধারায়
আধার মৃত্যুর মাঝে মেশে রাত্রিদিন,
কী হল তাদের,
কী এদের কাজ।

হে প্রিয়, তোমার ষতটুকু
দেখেছি শুনেছি
জেনেছি, পেয়েছি স্পর্শ করি—
তার বহুশতগুণ অদৃশ্য অপ্রদূত
রহস্য কিসের জন্য বন্ধ হয়ে আছে,
কর অপেক্ষায়।
সে নিরালা ভবনের
কুলদুপ তোমার কাছে নেই।
কর কাছে আছে ভবে।

কে মহা-অপরিচিত যার অগোচর সভাতলে
 হে চেনা-অপরিচিত, তোমার আসন।
 সেই কি সবার চেয়ে জানে
 আমাদের অন্তরের অজানারে।
 সবার চেয়ে কি বড়ো তার ভালোবাসা
 যার শব্দদৃষ্টি-কাছে
 অবাক করেছে অবগদ-চেন মোচন।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

সাম্বন্ধনা

যে বোবা দঃখের ভার
 ওরে দঃখী, বহিতেছ, তার কোনো নেই প্রতিকার।
 সহায় কোথাও নাই, বার্থ প্রার্থনার
 চিন্তদৈন্য শূন্য বেড়ে যায়।

ওরে বোবা মাটি,
 বন্ধ তোর যায় না তো ফাটি
 বহিয়া বিশ্বের বোঝা দঃখবেদনার
 বন্ধে আপনার
 বহু যুগ ধরে।
 বোবা গাছ ওরে,
 সহজে বহিস গিরে বৈশাখের নির্দয় দাহন,
 তুই সর্বসহিষ্ণু বাহন
 শ্রাবণের
 বিশ্বব্যাপী প্লাবনের।

তাই মনে ভাবি
 যাবে নাবি
 সর্ব দঃখ সম্তাপ নিঃশেষে
 উদার মাটির বন্ধোদেশে,
 গভীর শীতল
 যার স্তম্ভ অন্ধকারতল
 কালের মথিত বিষ নিরন্তর নিতেছে সংহারি।
 সেই বিলুপ্তির 'পরে দিব্যবিভাবরী
 দুলিছে শ্যামল তৃণস্তর
 নিঃশব্দ সূন্দর।
 লতাকীর সব কতি সব মৃত্যুকৃত
 যেখানে একান্ত অপগত,

সেইখানে বনস্পতি প্রশান্ত গম্ভীর
সূর্যোদয়-পানে তোলে শির,
পুষ্প তার পত্রপটে
শোভা পায় ধরিত্রীর মহিমামুকুটে।

বোঝা মাটি, বোঝা তরুদল,
ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল
স্বতন্ত্রতার মিলাইছ প্রতি মৃদুভেই,
নির্বাক সাল্পনা সেই
তোমাদের শান্তরূপে দেখিলাম,
করিন্দু প্রণাম।
দেখিলাম, সব ব্যথা প্রতিক্রমে লইতেছে জিনি
সুন্দরের ভৈরবী রাগিনী
সর্ব অবসানে
শব্দহীন গানে।

১৫ আষাঢ় ১৩৩৯

ছোটো প্রাণ

ছিলাম নিদ্রাগত,
সহসা আতর্বিলাপে কর্ণদল
রজনী কল্লাহত।
জাগিয়া দেখিন্দু পাশে
কচি মৃদুখানি সুখনিদ্রায়
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে।
সংসার-পরে এই বিশ্বাস
দৃঢ় বাধা স্নেহডোরে,
বল্ল-আঘাতে ভাঙে তা কেমন করে।

সৈন্যবাহিনী বিজয়বাহিনী
লিখে ইতিহাস জুড়ে।
শক্তিদম্ব জয়সুতম্ব
ভুলিছে আকাশ ফুড়ে।
সম্পদসমারোহ
গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে
স্বর্ণময়ীচিমোহ।
সেখান আঘাতসংঘাতবেগে
ভাঙাচোরা যত হোক
তার লাগি বুঝা শোক।

কিন্তু হেথায় কিছ্ তো চাছে নি এরা।
 এদের বাসাটি ধরণীর কোণে
 ছোটো-ইচ্ছার ঘেরা।
 যেমন সহজে পাখির কুলার
 মৃদুকণ্ঠের গীতে
 নিভৃত ছায়ার ভরা থাকে মাধুরীতে।
 হে রুদ্র, কেন তারো 'পরে বাণ হান,
 কেন তুমি নাহি জান
 নিভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো,
 বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
 দেখেছে তোমার আলো।

১৬ আষাঢ় ১৩৩৯

নিরাবৃত

যবনিকা-অন্তরালে মর্ত্য পৃথিবীতে
 ঢাকা-পড়া এই মন।
 আভাসে ইঙ্গিতে
 প্রমাণে ও অনুমানে আলোতে অধারে
 ভাঙা খণ্ড জুড়ে সে-যে দেখেছে আমারে
 মিলায়ে তাহার সাথে নিজ অভিরুচি
 আশা ভ্রম।
 বার বার ফেলেছিল মর্দু
 রেখা তার;
 মাঝে মাঝে করিয়া সংস্কার
 দেখেছে নতুন করে মোরে।
 কতবার
 ঘটেছে সংশয়।
 এই যে সত্য ও ভুলে
 রচিত আমার মর্তি,
 সংসারের কূলে
 এ নিরে সে এতদিন কাটায়েছে বেলা।
 এরে ভালোবেসেছিল,
 এরে নিয়ে খেলা
 সাঙ্গ করে চলে গেছে।
 বসে একা ঘরে
 মনে মনে ভাবিতেছি আজ,
 লোকান্তরে
 যদি তার দিয়া অর্পি মায়ামুগ্ধ হয়

অকস্মাৎ,

পাবে যার নব পরিচয়
সে কি আমি।

স্পষ্ট তারে জানুক যতই
তবু যে অস্পষ্ট ছিল তাহারি মতোই
এরে কি আপনি রচি বাসিবে সে ভালো।
হায় রে মানুষ এ যে।

পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে,

সৃষ্টির চাতুরী
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি।
সে-মায়াতে বেঁধেছিন্দু মর্ত্য মোরা দৌঁছে
আমাদের খেলাঘর,

অপূর্ণের মোহে
মুগ্ধ ছিন্দু,
মর্ত্যপাত্রে পেরেছি অমৃত।
পূর্ণতা নির্মম সে-ষে স্তম্ভ অনাবৃত।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

মৃত্যুঞ্জয়

দর হতে ভেবেছিন্দু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথবী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বহু টেনে আনে।

ভরে ভরে এসেছিন্দু দরদরদর বক্ষে
তোমার সম্মুখে।
তোমার প্রকৃতিভঙ্গে তরঙ্গিত আসন্ন উৎপাত,
নামিল আঘাত।

পাঁজর উঠিল কেঁপে,

বক্ষে হাত চেপে

শুধালেম, 'আরো কিছু আছে না কি,
আছে বাকি

শেষ বহুপাত?'

নামিল আঘাত।

এইমাত্র? আর কিছু নয়?

ভেঙে গেল ভয়।

যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি

তোমাতে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিজেছিন্দু গণি।

তোমার আখাত-সাথে নেমে এলে তুমি
 যেথা মোর আপনার ভূমি।
 ছোটো হয়ে গেছ আজ।
 আমার টুটিল সব লাজ।
 যত বড়ো হও,
 তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
 আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলি
 যাব আমি চলে।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

অবাধ

সরে যা, ছেড়ে দে পথ,
 দূর্ভর সংশয়ে ভারী তোর মন পাথরের পারা।
 হালকা প্রাণের ধারা
 দিকে দিকে ওই ছুটে চলে
 কলকোলাহলে
 দূরন্ত আনন্দভরে।
 ওরাই যে লঘু করে
 অতীতের পুরাতন বোঝা।
 ওরাই তো করে দেয় সোজা
 সংসারের বক্র ভঙ্গি চণ্ডল সংঘাতে।
 ওদের চরণপাতে
 জটিল জালের গ্রন্থি যত
 হয় অপগত।
 মলিনতা দেয় মেজে,
 প্রাপ্তি দূর করে ওরা ক্রান্তিহীন তেজে।

ওরা সব মেঘের মতন
 প্রভাতকিরণপায়ী, সিদ্ধুর তরঙ্গ অগগন,
 ওরা যেন দিশাহারা হাওয়ার উৎসাহ,
 মাটির হৃদয়জয়ী নিরন্তর তরুর প্রবাহ;
 প্রাচীন রজনীপ্রান্তে ওরা সবে প্রথম-আলোক।
 ওরা শিশু, বালিকা বালক,
 ওরা নারী যৌবনে উচ্ছল।
 ওরা যে নিভীক বীরদল
 যৌবনের দুঃসাহসে বিপদের দুর্গ হানে,
 সম্পদে উন্মারিয়া আনে।
 পায়ের শব্দ ওরা চলিয়াছে স্বাক্ষরিত
 অন্তরে প্রবল মূর্তি নিয়া।
 আগামী কালের লালি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়,
 আগামী কালারে করে জয়।

চলেছে চলেছে ওরা চারি দিক হতে
 আধারে আলোতে,
 সম্মুখের পানে
 অজ্ঞাতের টানে।
 তুই সরে যা রে
 ওরে ভীরু, ভারতুর সংশয়ের ভারে।

১৮ আষাঢ় ১৩৩৯

যাত্রী

যে কাল হরিয়া লয় ধন
 সেই কাল করিছে হরণ
 সে ধনের ক্ষতি।
 তাই বসুমতী
 নিত্য আছে বসুন্ধরা।
 একে একে পাখি যায়, গানের পসরা
 কোথাও না হয় শূন্য,
 আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুণ্ণ
 বিপুল সংসার।
 দুঃখ শূন্য তোমার, আমার,
 নিমেষের বেড়া-ঘেরা এখানে ওখানে।
 সে বেড়া পারায়ে তাহা পেঁছায় না নিখিলের পানে।
 ওরে তুমি, ওরে আমি,
 যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে আমি
 সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
 তরণের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি।
 কামা আর হাসি
 এক বীণাতন্ত্রীতারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
 একই শব্দে এসে
 মহামৌনে মিলে যায় শেষে।
 তোমার হৃদয়তাপ
 তোমার বিলাপ
 চাপা থাক্ আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
 যেইখানে লোকযাত্রা চলে
 সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো একসারে,
 দেখা দাও শান্তিসৌম্য আপনারে—
 যে শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাগ্যে নিভৃত,
 আত্মসমাহিত;
 দিবসের যত
 ধূলিচিহ্ন, যত-কিছু ক্ষত
 লুপ্ত হল যে শান্তির অন্তিম তিমিরে;

সংসারের শেষ তীরে
 সন্তর্ষির ধ্যানপূণ্য রাতে
 হারায় যে-শান্তিসিন্ধু আপনার অন্ত আপনাতে;
 যে শান্তি নিবিড় প্রেমে
 স্তম্ভ আছে ধেম্বে,
 যে প্রেম শরীর মন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
 একান্ত মধুরে
 লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।
 সে পরম শান্তি-মাঝে হোক তব অচঞ্চল স্থিতি।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

মিলন

তোমাতে দিব না দোষ।
 জানি মোর ভাগের ভ্রুকুটি,
 ক্ষুদ্র এই সংসারের যত ক্ষত, যত তার গুটি,
 যত ব্যথা
 আঘাত করিছে তব পরম সন্তারে;
 জানি যে তুমি তো নাই কোনোদিন ছাড়ায়ে আমারে
 নির্লিপ্ত সুদূর স্বর্গে।
 আমি মোর তোমাতে বিরাজে:
 দেওয়া-নেওয়া নিরন্তর প্রবাহিত তুমি-আমি-মাঝে
 দুর্গম বাধারে অতিক্রমি।
 আমার সকল ভার
 রাত্রিদিন রয়েছে তোমারি 'পরে,
 আমার সংসার
 সে শুধু আমারি নহে।
 তাই ভাবি এই ভার মোর
 যেন লঘু করি নিজবলে,
 জটিল বন্ধনডোর
 একে একে ছিন্ন করি যেন,
 মিলিয়া সহজ মিলে
 বন্ধনহীন বন্ধনহীন বিচরণ করি এ নিখিলে
 না চেরে আপনা-পানে।
 অশান্তিরে করি দিলে দূর
 তোমাতে আমাতে মিলি ধ্বনিয়া উঠিবে এক সুর।

১৯ আষাঢ় ১৩৩৯

আগন্তুক

এসেছি সুদূর কাল থেকে।
 তোমাদের কালে
 পেঁছলেম যে সময়ে
 তখন আমার সঙ্গী নেই।
 ঘাটে ঘাটে কে কোথায় নেবে গেছে।
 ছোটো ছোটো চেনা সুখ যত,
 প্রাণের উপকরণ,
 দিনের রাতের মৃষ্টিদান
 এসেছি নিঃশেষ করে বহুদূর পারে।
 এ জীবনে পা দিয়েছি প্রথম যে কালে
 সে কালের পরে অধিকার
 দৃঢ় হয়েছিল দিনে দিনে
 ভাবে ও ভাষায়,
 কাজে ও ইঙ্গিতে,
 প্রণয়ের প্রাত্যহিক দেনাপাওনায়।
 হেসে খেলে কোনোমতে সকলের সঙ্গে বেঁচে থাকা,
 লোকযাত্রারথে
 কিছ, কিছ, গতিবেগ দেওয়া,
 শূন্য উপস্থিত থেকে প্রাণের আসরে
 ভিড় জমা করা,
 এই তো যথেষ্ট ছিল।

আজ তোমাদের কালে
 প্রবাসী অপরিচিত আমি।
 আমাদের ভাষার ইশারা
 নিয়েছে নতুন অর্থ তোমাদের মধ্যে।
 ঋতুর বদল হয়ে গেছে—
 বাতাসের উল্টোপাল্টা ঘটে
 প্রকৃতির হল বর্ণভেদ।
 ছোটো ছোটো বৈষম্যের দল
 দেয় ঠেলা,
 করে হাসাহাসি।
 রুচি আশা অভিজ্ঞা
 যা মিথিয়ে জীবনের স্বাদ,
 তার হল রসবিপর্যয়।

আমাদের সেকালকে যে সঙ্গ দিয়েছি
 যতই সামান্য হোক মূল্য তার
 তবু সেই সঙ্গসঙ্গে গাঁথা হয়ে মানদণ্ডে মানদণ্ডে
 রচাছিল যুগের স্বরূপ—

আমার সে সঙ্গ আজ
 মেলে না যে তোমাদের প্রত্যাহের মাপে।
 কালের নৈবেদ্যে লাগে যে-সকল আধুনিক ফুল
 আমার বাগানে ফোটে না সে।
 তোমাদের যে বাসার কোণে থাকি
 তার খাজনার কড়ি হাতে নেই।
 তাই তো আমাকে দিতে হবে
 বড়ো কিছু দান
 দানের একান্ত দঃসাহসে।
 উপস্থিত কালের যে দাবি
 মিটাবার জন্যে সে তো নয়,
 তাই যদি সেই দান তোমাদের রুচিতে না লাগে,
 তবে তার বিচার সে পরে হবে।
 তবু যা সম্বল আছে তাই দিয়ে
 একালের ঋণ শোধ করে অবশেষে
 ঋণী তারে রেখে যাই যেন।
 যা আমার লাভক্ষতি হতে বড়ো,
 যা আমার সুখদুঃখ হতে বেশি—
 তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে যাই
 স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে।

১১ জুলাই ১৯০২

জরতী

হে জরতী,
 অন্তরে আমার
 দেখেছি তোমার ছবি।
 অবসানরজনীতে দীপবর্তিকার
 স্থিরশিখা আলোকের আভা
 অধরে ললাটে শূদ্র কেশে।
 দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রভুষের তারা
 মৃদু বাতায়ন থেকে
 পড়েছে নিমেষহীন নয়নে তোমার।
 সন্ধ্যাবেলা
 মল্লিকার মালা ছিঁল গলে
 গন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে
 বাতাসকে করুণ করেছে—
 উৎসবলেশের যেন অবসন্ন অঙ্গারালির
 বীণাগদ্গরন।
 শিথিলমস্তক বান্দ্র,
 অশথের পাখা অকম্পিত।

অদরে নদীর শীর্ণ স্বচ্ছ ধারা কলশব্দহীন,
বালুতটপ্রান্তে চলে ধীরে
শূন্যগৃহ-পানে
ক্লান্তগতি বিরহিণী বধুর মতন।

হে জরতী মহাশেবতা,
দেখিছি তোমাকে
জীবনের শারদ অম্বরে
বৃষ্টিরিক্ত শূচিশূক্ল লঘু স্বচ্ছ মেঘে।
নিম্নে শস্যে-ভরা খেত দিকে দিকে,
নদী ভরা কূলে কূলে,
পূর্ণতার স্তম্ভতার বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর।

হে জরতী, দেখিছি তোমাকে
সস্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষেপে ডুবিছে অতলে।
নিস্তরঙ্গ সিংহনীরে
তীর্থস্নান করি'
রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শিলাবেদীমূলে
এলোচূলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।
চণ্ডলের অন্তরালে অচণ্ডল যে শান্ত মহিমা
চিরন্তন,
চরম প্রসাদ তার
নামিল তোমার নম্র শিরে
মানস সরোবরের অগাধ সলিলে
অস্তগত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন।

১০ জুলাই ১৯০২

প্রাণ

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বৃদ্ধবৃদ্ধ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অশ্রুতম কালে
কপাতম লিখা করে
অসীমের করে সে আরাতি।

সে না হলে বিরাটের নিখিলমন্দিরে
 উঠত না শঙ্খধ্বনি,
 মিলত না যাত্রী কোনোজন,
 আলোকের সামমুখ ভাষাহীন হয়ে
 রইত নীরব।

১৪ জুলাই ১৯০২

সাথী

তখন বয়স সাত।
 মুখচোরা ছেলে,
 একা একা আপনার সঙ্গে হত কথা।
 মেঝে বসে
 ঘরের গরাদেখানা ধরে
 বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে
 বয়ে যেত বেলা।
 দূরে থেকে মাঝে মাঝে ঢং ঢং করে
 বাজত ঘণ্টার ধ্বনি,
 শোনা যেত রাস্তা থেকে সইসের হাঁক।
 হাঁসগুলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে।
 ও পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক দিত।
 গলির মোড়ের কাছে দস্তদের বাড়ি,
 কাকাতুরা মাঝে মাঝে উঠত চীৎকার করে ডেকে।
 একটা বাতাবিলেবু, একটা অশ্বখ,
 একটা কয়েংবেল, একজোড়া নারকেলগাছ,
 তারাই আমার ছিল সাথী।
 আকাশে তাদের ছুটি অহরহ,
 মনে মনে সে ছুটি আমার।
 আপনার ছায়া নিয়ে
 আপনার সঙ্গে যে খেলাতে
 তাদের কাটত দিন
 সে আমার খেলা।
 তারা চিরশিশু
 আমার সমবয়সী।
 আষাঢ়ে বৃষ্টির ছাটে, বাদল-হাওয়ার,
 দীর্ঘ দিন অকারণে
 তারা যা করেছে কলরব
 আমার বালকভাষা
 হো হা শব্দ করে
 করেছিল তারি অনুবাদ।

তারপরে একদিন যখন আমার
 বয়স পঁচিশ হবে,
 বিরহের ছায়ামল্লান বৈকালেতে
 ওই জানালার
 বিজনে কেটেছে বেলা।
 অশথের কম্পমান পাতায় পাতায়
 যৌবনের চঞ্চল প্রত্যাশা
 পেয়েছে আপন সাড়া।
 সক্রদুগ মূলতানে গদন্ গদন্ গেরেছি যে গান
 রৌদ্রে-ঝিলিমিলি সেই নারকেলডালে
 কেঁপেছিল তারি সুর।
 বাতাবিফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাধীহারী রাতে
 এনেছে আমার প্রাণে
 দূর শয্যাভল থেকে
 সিক্ত অঁখি আর কার উৎকণ্ঠিত বেদনার বাণী।
 সেদিন সে গাছগুঁলি
 বিচ্ছেদে মিলনে ছিল যৌবনের বয়স্য আমার।

তার পরে অনেক বৎসর গেল
 আরবার একা আমি।
 সেদিনের সঙ্গী যারা
 কখন চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে।
 আবার আরেকবার জানলাতে
 বসে আছি আকাশে তাকিয়ে।
 আজ দেখি সে অশ্বখ, সেই নারকেল
 সনাতন তপস্বীর মতো।
 আদিম প্রাণের
 যে বাণী প্রাচীনতম
 তাই উচ্চারিত রাহুদিন
 উচ্ছ্বসিত পল্লবে পল্লবে।
 সকল পথের আরম্ভেতে
 সকল পথের শেষে
 পুরাতন যে নিঃশব্দ মহাশান্তি জ্বলছে হয়ে আছে,
 নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার
 মন্ত ওরা প্রতিরূপে দিয়েছে আমার কানে কানে।

বোবার বাণী

আমার ঘরের সম্মুখেই
 পাকে পাকে জড়িয়ে শিমুলগাছে
 উঠেছে মালতীলতা।
 আষাঢ়ের রসস্পর্শ
 লেগেছে অন্তরে তার।
 সবুজ তরঙ্গগুলি হয়েছে উচ্ছল
 পল্লবের চিকণ হিল্লোলে।
 বাদলের ফাঁকে ফাঁকে মেঘচ্যুত রৌদ্র এসে
 ছোঁয়ায় সোনার কাঠি অঙ্গে তার,
 মন্ডায় কাঁপন লাগে,
 শিকড়ে শিকড়ে বাজে আগমনী।
 যেন কত কী যে কথা নীরবে উৎসর্গ হয়ে থাকে
 শাখাপ্রশাখায়।
 এই মৌনমুখরতা
 সারারাত্রি অন্ধকারে
 ফুলের বাণীতে হয় উচ্ছ্বসিত,
 ভোরের বাতাসে উড়ে পড়ে।

আমি একা বসে বসে ভাবি
 সকালের কাঁচ আলো দিয়ে রাঙা
 ভাঙা ভাঙা মেঘের সম্মুখে;
 বৃষ্টিধোয়া মধ্যাহ্নের
 গোরু-চরা মাঠের উপরে আঁখি রেখে;
 নিবিড় বর্ষণে আতঁ
 শ্রাবণের আদ্র অন্ধকার রাতে;
 নানা কথা ভিড় করে আসে
 গহন মনের পথে,
 বিবিধ রঙের সাজ,
 বিবিধ ভঙ্গিতে আসাষাওয়া—
 অন্তরে আমার যেন
 ছুটির দিনের কোলাহলে
 কথাগুলো মেতেছে খেলায়।

তবুও যখন তুমি আমার আঙিনা দিয়ে যাও
 ডেকে আনি, কথা পাই নে তো।
 কখনো যদি বা ভুলে কাছে আস
 বোবা হয়ে থাকি।
 অব্যাহত সহজ আলোপে
 সহজ হাসিতে
 হল না তোমার অভিযর্থনা।

অবশেষে ব্যর্থতার লজ্জায় হৃদয় ভরে দিয়ে
 ভূমি চলে যাও,
 তখন নির্জন অন্ধকারে
 ফুটে ওঠে ছন্দে-গাথা সুরে-ভরা বাণী—
 পথে তারা উড়ে পড়ে,
 যার খুঁশি সাজি ভরে নিয়ে চলে যায়।

৩ শ্রাবণ ১৩৩৯

আঘাত

সোঁদালের ডালের ডগায়
 মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগর্দিল
 কুকড়ে গিয়েছে;
 বিলিতি নিমের
 বাকলে লেগেছে উই;
 কুরচির গুঁড়িটাতে পড়েছে ছুরির ক্ষত,
 কে নিয়েছে ছাল কেটে;
 চারা অশোকের
 নীচেকার দুরেকটা ডালে
 শূন্যকরে পাতার আগা কালো হয়ে গেছে।
 কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাজুনা,
 তারি মাঝে অরণ্যের অক্ষুণ্ণ মর্ষাদা
 শ্যামল সম্পদে
 তুলেছে আকাশ-পানে পরিপূর্ণ পুজার অঞ্জলি।
 কদম্বের কদাঘাতে
 দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা,
 সে সকলি অধঃসাং করে
 শান্ত প্রসন্নতা
 ধরণীতে ধন্য করে পূর্ণের প্রকাশে।
 ফুটিয়েছে ফুল সে যে,
 ফলিয়েছে ফলভার,
 বিছিয়েছে ছায়া-আন্তরঙ্গ,
 পাখিরে দিয়েছে বাসা,
 মৌমাছিরে জুগিয়েছে মধু,
 বাজিয়েছে পল্লবমর্মর।
 পেয়েছে সে প্রভাতের পূর্ণ্য আঞ্জলি,
 শ্রাবণের অভিজ্ঞেক,
 বসন্তের বাতাসের আনন্দমিতালি,

পেয়েছে সে ধরণীর প্রাণরস,
 সঙ্গভীর স্বেদপদ আশ্রয়,
 পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্বাদ।
 পেয়েছে সে কীটের দংশন।

১৯ জুলাই ১৯৩২

শান্ত

বিদ্রুপবাণ উদ্যত করি
 এসেছিল সংসার,
 নাগাল পেল না তার।
 আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
 শান্ত মনের স্তম্ভ গহনে
 ধ্যানের বাণীর সুরে
 রেখেছে তাহারে ঘিরি।
 হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয়গিরি।
 সেথা অন্তরলোকে
 সিদ্ধপারের প্রভাত-আলোক
 জ্বলিছে তাহার চোখে।
 সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ
 অপরূপ হয়ে জাগে।
 তার দৃষ্টির আগে
 বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে
 বিরূপ বিকল খণ্ডিত যত-কিছু
 করে এসে মাথা নিচু।

সিদ্ধভীরের শৈলতটের 'পরে
 হিংসামুখর তরঙ্গদল
 যতই আঘাত করে—
 কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
 অতলের মহালীলা,
 ফেনিল নৃত্যে দামায়া বাজায় শিলা।
 হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
 মহিমা করিছ দান,
 গর্জন এসে তোমার মাঝারে
 হল ভৈরব গান।
 তোমার চোখের গভীর আলোকে
 অপমান হল গত
 সম্মুখভেদে তিমিররঞ্জে
 দীপ্ত রবির মতো।

জলপাথ

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জ্ঞাত,
 জ্ঞান তাহা হে জীবননাথ।
 তবুও সবার স্বার ঠেলে
 কেন এলে
 কোন্ দখে
 আমার সম্মুখে।
 ভরা ঘট লয়ে কাঁখে
 মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে
 তীরে শ্বিপ্রহরে
 আসিতেছিলাম খেয়ে আপনার ঘরে।
 চাহিলে তুষ্কার বারি,
 আমি হীন নারী
 তোমারে করিব হেয়,
 সে কি মোর শ্রেয়।
 ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম করে
 কহিলাম, “অপরাধী করিয়ো না মোরে।”
 শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
 হাসিয়া কহিলে, “হে মন্ময়ী,
 পূণ্য যথা মস্তিকার এই বসুধরা
 শ্যামল কান্তিতে ভরা,
 সেইমতো তুমি
 লক্ষ্মীর আসন, তার কমলচরণ আছ চুমি।
 সুন্দরের কোনো জ্ঞাত নাই,
 মৃত সে সদাই।
 তাহারে অরুণরাঙা উষা
 পরায় আপন ভূষা;
 তারাময়ী রাত্তি
 দেয় তার বরমাল্য গাঁধি।
 মোর কথা শোনো,
 শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।
 যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি
 সেও কি অশুচি।
 বিধাতা প্রসন্ন যথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে
 নিত্য তার অভিব্যেক নিখিলের আশিসবৃষ্টিতে।”
 জলভরা মেঘস্বরে এই কথা বলে
 তুমি গেলে চলে।

তার পর হতে
 এ ডগ্গদুর পাহাখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
 নানা বর্ণে আঁকি,
 নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।
 হে মহান, নেমে এসে তুমি যারে করেছে গ্রহণ,
 সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা-পানে করুক বহন।

২৪ জুলাই ১৯০২

আতঙ্ক

বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে
 গোধূলিবেলায়
 বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে
 সাদাকালো দাগগুলো
 দেখা দিত ভয়ংকর মর্তি ধরে।
 ওইখানে দৈত্যপুত্রী,
 অদৃশ্য কুঠরি থেকে তার
 মনে মনে শোনা যেত হাঁউমাউখাঁউ।
 লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ
 খিলিখিলি হাসত ডাইনিবুড়ি।
 কাশীরাম দাস
 পরারে যা লিখেছিল হিড়িম্বার কথা
 ইন্ট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'পরে
 ছিল তারি প্রত্যক্ষ কাহিনী।
 তারি সঙ্গে সেইখানে নাককাটা সুপর্ণখা
 কালো কালো দাগে
 করেছিল কুটুম্বিতা।

সভেরো বৎসর পরে
 গিয়েছি সে সাবেক বাড়িতে।
 দাগ বেড়ে গেছে,
 মৃদু নতুনের তুলি পুরোনোকে দিয়েছে প্রশ্রয়।
 ইন্টগুলো মাঝে মাঝে খসে গিয়ে
 পড়ে আছে রাশ-করা।
 গারে গারে লেগেছে অনন্তমূল,
 কালমেঘ লতা,
 বিহুটির ঝাড়;
 ভাটিগাছে হয়েছে জগল।

পুরোনো ষটের পাশে
 উঠেছে ভেরেন্ডাগাছ মস্ত বড়ো হয়ে।
 বাইরেতে সুপর্ণখা-হিড়িম্বার চিহ্নগুলো আছে,
 মনে তারা কোনোখানে নেই।

 স্টেশনে গেলেম ফিরে একবার খুব হেসে নিয়ে।
 জীবনের ভিত্তির গায়ে
 পড়েছে বিস্তর কালো দাগ,
 মৃত অতীতের মসীলোখা;
 ভাঙা গাধানিতে
 ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।
 মাঝে মাঝে
 যেদিন বিকেলবেলা
 বাদলের ছায়া নামে
 সারি সারি তালগাছে
 দিঘির পাড়িতে,
 দূরের আকাশে
 স্নিগ্ধ সুগম্ভীর
 মেঘের গর্জন ওঠে গুরুগুরু,
 ঝাঁঝ ডাকে বুনো খেজুরের ঝোপে,
 তখন দেশের দিকে চেয়ে
 বাঁকাচোরা আলোহীন পথে
 ভেঙে-পড়া দেউলের মূর্তি দেখি:
 দীর্ঘ ছাদে, তার জীর্ণ ভিতে
 নামহীন অবসাদ,
 অনির্দিষ্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেঁচা,
 নৈরাশ্যের অলীক অভ্যুত্তি যত,
 দুর্বলের স্বরাচিত শত্রুর চেহারা।
 থিক্ রে ভাঙন-লাগা মন,
 চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথ্যা আঁচড় কেটেছে।
 দৃষ্টগ্রহ সেক্ষে ডয়
 কালো চিহ্নে মুখভঙ্গি করে।
 কাটা-আগাছার মতো
 অমঙ্গল নাম নিয়ে
 আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে।
 চারি দিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে
 ভেঙে-পড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি
 কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ।

আলেখ্য

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
 লেখনীর নটনলেখায়।
 নির্বাকের গদহা হতে আনিয়াছি
 নিখিলের কাছাকাছি,
 যে সংসারে হতেছে বিচার
 নিন্দাপ্রশংসার।
 এই আত্মপার্থীর তরে
 আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।
 অব্যক্ত আছিল যবে
 বিশ্বের বিচিত্ররূপ চলেছিল নানা কলরবে
 নানা ছন্দে লয়ে
 সৃজনে প্রলয়ে।
 অপেক্ষা করিয়া ছিল শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
 নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শব্দনি
 সীমায় বর্ধিবে তোরে সাদার কালোয়
 আধারে আলোয়।
 পথে আমি চলেছি ন্দ। তোর আবেদন
 করিল ভেদন
 নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল,
 পরশিল মোর ভাল
 চুপে চুপে
 অর্ধক্ষুণ্ট স্বপ্নমূর্তিরূপে।
 অমৃত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যালোকে
 আনিয়াছি তোকে।
 ব্যাখ্যা কি কোথাও বাজে
 মূর্তির মর্মের মাঝে।
 সূক্ষ্মার অন্যথায়
 ছন্দ কি লঞ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।
 যদিও তাই বা হয়
 নাই ভয়,
 প্রকাশের ভ্রম কোনো
 চিরদিন হবে না কখনো।
 রূপের মরণ-হৃদি
 আপনিই যাবে টুটি
 আপনারি ভারে,
 আরবার মৃদু হৃদি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

সান্ধনা

সকালের আলো এই বাদলবাতাসে
 মেঘে রুদ্ধ হয়ে আসে
 ভাঙা কণ্ঠে কথার মতন।
 মোর মন
 এ অক্ষুট প্রভাতের মতো
 কী কথা বলিতে চায়, থাকে বাক্যহত।
 মানুষের জীবনের মঞ্জার মঞ্জার
 যে দঃখ নিহিত আছে অপমানে শঙ্কার মঞ্জার,
 কোনো কালে যার অন্ত নাই,
 আজি তাই
 নির্যাতন করে মোরে। আপনার দর্গমের মাঝে
 সান্ধনার চির-উৎস কোথায় বিরাজে,
 যে উৎসের গুঢ় ধারা বিশ্বচিহ্ন-অন্তঃস্তরে
 উদ্ভূত পথের তরে
 নিত্য ফিরে যুঝে,
 আমি তারে মরি খুঁজে।
 আপন বাণীতে
 কী পুণ্যে বা পারিব আনিতে
 সেই স্ফুটন্ত শান্তি, নৈরাশ্যের তীর বেদনারে
 স্তম্ভ যা করিতে পারে।
 হায় রে ব্যথিত,
 নিখিল-আত্মার কেন্দ্রে বাজে অকথিত
 আরোগ্যের মহামন্ত্র, যার গুণে
 সৃজনের হোমের আগুনে
 নিজেরে আহুতি দিয়া নিত্য সে নবীন হয়ে উঠে—
 প্রাণেরে ভরিয়া তুলে নিত্যই মৃত্যুর করপটে।
 সেই মন্ত্র শান্ত মৌনতলে
 শূন্যে যায় আত্মহারা তপস্যার বলে।
 মাঝে মাঝে পরম বৈরাগী
 সে মন্ত্র চেয়েছে দিতে সর্বজন লাগি।
 কে পারে তা করিতে বহন,
 মৃদু হয়ে কে পারে তা করিতে গ্রহণ।
 গতিহীন আত্ম অন্ধমের ভরে
 কোন্ করুণার স্বর্গে মন মোর দয়া ভিক্ষা করে
 উর্ধ্ব বাহু তুলি।
 কে বন্ধু রয়েছে কোথা, দাও দাও খুঁজি
 পাষণ্ডকারার দ্বার—
 যেথায় পুঞ্জিত হল নিষ্ঠুরের অত্যাচার,
 বণ্ডনা লোভীর,
 যেথায় গভীর

মর্মে উঠে বিষাইয়া সত্যের বিকার।

আমিষ-বিমুগ্ধ মন যে দুর্বল ভার
আপনার আসক্তিতে জমায়েছে আপনার 'পরে,
নির্মম বর্জনশক্তি দাও তার অন্তরে অন্তরে।

আমার বাণীতে দাও সেই সূখা
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা।

হেনকালে সহসা আসিল কানে
কোন্ দূর তরুণাথে শ্রান্তিহীন গানে
অদৃশ্য কে পাখি
বারবার উঠিতেছে ডাকি।
কহিলাম তারে, 'ওগো, তোমার কণ্ঠেতে আছে আলো,
অবসাদ-অধার ঘুচালো।
তোমার সহজ এই প্রাণের প্রোক্ষাস
সহজেই পেতেছে প্রকাশ।
আদিম আনন্দ যাহা এ বিশ্বের মাঝে,
যে আনন্দ অন্তিমে বিরাজে,
যে পরম আনন্দলহরী
যত দুঃখ যত সূখ নিয়েছে আপনা-মাঝে হরি,
আমারে দেখালে পথ তুমি তারি পানে
এই তব অকারণ গানে।'

২৭ জুলাই ১৯০২

२

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী

তোমায় আমার মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন্ সে পদ্বেন বায়ে
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হতে মিলল তারি মাঝে।
বিক্রু আমায় কইল কানে, বললে দশভুজা,
'অজানা ওই সিংহতীরে নেব আমার পূজা।'
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো
পদ্ব সাগরে হাত বাড়িয়ে বললে, 'চলো, চলো।'
রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে,
'আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে।'
তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা—
বললে, 'আমি ওই পারেতে বাঁধব নতুন বাসা।'
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইল আমার কানে,
'আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে।'

সেদিন প্রাতে সুনীল জলে ভাসল আমার তরী,
শুদ্ধ পালে গর্ব জাগায় শূভ হাওয়ায় ভরি।
তোমার ঘাটে লাগল এসে, জাগল সেথায় সাড়া,
কূলে কূলে কাননলক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া।
প্রথম দেখা আবছায়াতে অধার তখন ধরা,
সেদিন সম্মুখ সন্তর্কষির আশীর্বাদে ভরা।
প্রাতে মোদের মিলনপথে উষা ছড়ায় সোনা,
সে পথ বেয়ে লাগল দৌহার প্রাণের আনাগোনা।
দুইজনেতে বাঁধন বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বসন সেথায় একটি আসন পেতে।

বিরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্ বরষের থেকে,
কালের রথের ধূলা উড়ে দিল আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে
ক্লান্তহাতে রিক্তমনে একা আপন ভীরে।
বঙ্গসাগর বহুবরষ বলে নি মোর কানে
সে যে কভু সেই মিলনের গোপন কথা জানে।
জাহ্নবীও আমার কাছে গাইল না সেই গান
সুদূর পারের কোথায় যে তার আছে নাড়ীর টান।

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
 হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।
 মৃথের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে,
 আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
 হয়েছিল রাখীবান্দন সেদিন শুভ প্রাতে,
 সেই রাখী যে আজও দেখি তোমার দখিন হাতে।
 এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
 আজও সেথায় ছাড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
 সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
 সেই সেদিনের প্রদীপ-জ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
 আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
 নতুন-পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।

[বাটাভিয়া] স্বর্ষীপ

৪ ভাদ্র ১৩০৪

বোরোবদূর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে
 অরণ্যের বন্দনমর্মরে;
 নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লাভ
 শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।
 নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
 ধ্যানমগ্ন-আঁধ।
 উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
 কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
 আপন পূজার মন্ত্র যুগযুগান্তরে।
 অপরূপ অমৃত অক্ষরে
 লিখিল বিচিত্র লেখা; সাধকের ভক্তির পিপাসা
 রচিল আপন মহাভাষা—
 সর্বকাল সর্বজন
 আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।

সে লিপি ধরিল স্বীপ আপন বন্ধের মাঝখানে,
 সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।
 সে লিপির বাণী সনাতন
 করেছে গ্রহণ
 প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।
 অদূরে নদীর কিনারাতে
 আল-বাঁধা মাঠে

কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে—

অধারে আলোর

প্রত্যাহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়

ছায়ানাটো কণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে.

সদন্ত হয় নিমিখে নিমিখে।

কালের সে লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার

প্রতিদিন করে মনোচ্চার,

বলে অবিশ্রাম,

‘বৃন্দেধর শরণ লইলাম।’

প্রাণ যার দুর্দিনের, নাম যার মিলাল নিঃশেষে

সংখ্যাতীত বিস্মৃতির দেশে,

পাষাণের ছন্দে ছন্দে বর্ধিরা গেছে সে

আপনার অক্ষয় প্রণাম,

‘বৃন্দেধর শরণ লইলাম।’

কত যাত্রী কতকাল ধরে

নম্রশিরে দাঁড়িয়েছে হেথা করজোড়ে।

পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কত দিন,

তাদের আপন কণ্ঠ কণীণ।

বিপুল ইঞ্জিতপূজা পাষাণের সংগীতের তানে

আকাশের পানে

উঠেছে তাদের নাম,

জেরেছে অনন্ত ধ্বনি, ‘বৃন্দেধর শরণ লইলাম।’

অর্থ আজ হারিয়েছে সে যুগের লিখা,

নেমেছে বিস্মৃতিবুহেলিকা।

অর্থশূন্য কৌতুহলে দেখে যায় দলে দলে আসি

শ্রমণবিলাসী—

বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।

চিন্তা আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,

হৃদয় নীরস অহংকারে।

ক্ষিপ্ৰগতি বাসনার তাড়নার তৃপ্তিহীন স্বরা,

কম্পমান ধরা;

বেগ শূন্য বেড়ে চলে উর্ধ্বমুখে মৃগয়া-উদ্দেশে,

লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিণেবে;

অন্তহারা সপ্তরের আহুতি মাগিয়া

সর্বগ্রাসী কুদ্যানল উঠেছে জাগিয়া;

তাই আসিয়াছে দিন,

পীড়িত মানুষ মর্জিতহীন,

আবার তাহারে

আসিতে হবে যে তীর্থস্বারে

জর্নিবারে

পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমের প্রেমের মন্ত্র, 'বৃদ্ধের শরণ লইলাম।'

বোরোবুদুর [ম্বম্বীপ]
২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্ত্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তম্বার দিল যবে ধূলে
আনন্দমুখর উন্মোচন—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারি ভিতে,
দঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদান-সাধন ক্ষুধিত্তে,
উচ্ছ্বসিত উদার উজ্জ্বলিত্তে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে—
সে মন্ত্র অমৃতবাণী হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলঙ্কিত আপনাবিস্মৃত শূভকণে
দূরাগত পান্থ সমীরণে।

সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লিভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্রভারতী
দিল অস্থানিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শূভ আকর্ষণে বর্ধি তারে
এক ধ্রুব কেন্দ্র-সাথে
চরম মূর্তির সাধনাতে—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে,
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।
সে বাণীর সৃষ্টিক্ষিরা নাহি জানে শেষ,
নবযুগ-যাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ;

সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরসহার।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সমুদ্র জীবনমন্দির,
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যার শান্তি অন্তহারা,
বাণী যার সকল সাস্থনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেনা ভগ্নস্তম্ভে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ঘকীর্ণ মৃক শিলারূপে,
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজি আমি তারে দেখি লব—
ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিবে তারে
ভারত-বাহিরে তব স্বোরে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাম্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পূণ্যযুগ হতে—
যে যুগের গিরিশঙ্কর-পদ
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

Phya Thai Palace Hotel
[Bangkok]
11 October 1927

সিয়াম

বিদায়কালে

কোন সে সুন্দর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
 আমার গোপন ধ্যানে
 চিহ্নিত করেছে তব নাম
 হে সিয়াম,
 বহু পূর্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে।
 মৃদুভর্তে লয়েছি তাই চিনে
 তোমারে আপন বলি,
 তাই আজ ভরিয়াছি ক্ষণিকের পথিক অঞ্জলি
 পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
 সন্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।
 চিরন্তন আত্মীয়জনারে
 দেখিয়াছি বারে বারে
 তোমার ভাষায়,
 তোমার ভক্তিতে, তব মৃদুতির আশায়,
 সুন্দরের তপস্যাতে
 যে অর্থ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
 তাহারি শোভন রূপে—
 পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্বলিত ধূপে।

আজি বিদায়ের ক্ষণে
 চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
 দাঁড়ান্দু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
 পরাইনু গলে
 বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে—
 অঙ্গান কুসুম বার ফুটেছিল বহুবৃগ আগে।

৩০ আশ্বিন ১৩৩৪
 ইন্টারন্যাশনাল রেলোয়ে [সিয়াম]

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত
 ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
 তব জন্মভূমি।
 সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
 দান করো ভূমি।

বোধিদ্রুমতলে তব সৈদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মৃদু হোক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাগিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিন্তা হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস যার
হোক প্রাণবান।
খুলে যাক রক্তস্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমের প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজের আহ্বান।

Darjeeling
24. 10. 31

পারস্যে জন্মদিনে

ইরান, তোমার যত বদলবদল
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দনবাণী।

ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালা
নব গৌরব বহি নিজ ডালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া যুগ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লেষক—
ইরানের জয় হোক।

[ভেহেরান]
২৫ বৈশাখ ১৩৩৯

ধর্মমোহ

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
 অন্ধ সে জন যারে আর শব্দ মরে।
 নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
 ধর্মিকতার করে না আড়ম্বর।
 শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বদ্বিধির আলো,
 শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।

বিধর্ম বলি যারে পরধর্মেরে,
 নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
 পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
 আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
 পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা—
 দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
 বর্বরতার বিকারবিড়ম্বনা,
 ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
 আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।
 প্রলয়ের ওই শূন্য শৃঙ্গধ্বনি,
 মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

যে দেবে মর্দুত্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
 যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,
 যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
 তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
 তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে,
 তবু এরা করে অপবাদ দেয় কোঙে।

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
 ধর্মমুড়ুজনেরে বাঁচাও আসি।
 যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
 ভাঙে ভাঙে, আজি ভাঙে তারে নিঃশেষে,
 ধর্মকারার প্রাচীরে বহু হানো,
 এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

সংযোজন

প্রাচী

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।
ঢেকেছে তোমারে নির্বিড় তিমির
যুগযুগব্যাপী অমরজনীর;
মিলেছে তোমার স্নপ্তিতর তীর
স্নপ্তিতর কাছাকাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমস্ত্রে হল অবসান;
কবে আলোকের শব্দ আহ্বান
নাড়ীতে উঠবে নাচ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

সর্পিবে তোমারে নবীন বাণী কে।
নবপ্রভাতের পরশমানিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে,
তারি লাগি বসি আছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

জরার জড়িমা-আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মদকুটে
নব রূপ তব উঠুক-না ফুটে,
করপুটে এই বাঁচ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

'খোলো খোলো দ্বার, ঘুচুক অধার',
নবযুগ আসি ডাকে বারবার—
দুঃখ-আঘাতে দীপ্ত তোমার
সহসা উঠুক বাঁচ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

ভৈরবরাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের যুগি বাজিল বিষাদ,
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

আশীর্বাদ

শ্রীমতী লীলা দেবী কল্যাণীয়াসু

বিশ্ব-পানে বাহির হবে
 আপন কারা টুটি—
 এই সাধনার কুণ্ডি ওঠে
 কুসুম হয়ে ফুটি।
 বীজ আপনার বাধন ছিঁড়ে
 ফুলেরে দেয় সাড়া।
 সূর্য্যতারা আঁধার চিরে
 জ্যোতির দেয় ছাড়া।
 এই সাধনার যোগযুক্ত
 সাধু তাপসবর
 মৃত্যু হতে করেন মুক্ত
 অমৃতনিধির।
 এই সাধনার বিশ্বকবির
 আনন্দবীন বাজে,
 আপনারে দেয় উৎসাহিয়া
 আপন সৃষ্টি-মাঝে।
 সেই ফল পাও প্রেমের যোগে
 পুণ্য মিলনরতে:
 আপনারে দাও ছুটি ভূমি
 আপন বন্ধ হতে।
 আশ্রভেলা দুইটি প্রাণে
 মিলবে একাকার,
 সেই মিলনে বিকাশ হবে
 নতন সংসার।

১১ আষাঢ় ১৩৩০

আশীর্বাদ

শ্রীমতী কম্পনা দেবীর প্রতি

সুন্দর ভক্তির ফুল অলঙ্কে নিভৃত তব মনে
 যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে,
 হে শোভনে, আজি এই নির্মল কোমল গন্ধ তার
 দিল্লোছ দক্ষিণা মোরে, কবির গভীর পুরস্কার।

সহো আশীর্বাদ বৎসে, আপন গোপন অন্তঃপদে
ছন্দের নন্দনবন সৃষ্টি করো সুধামিন্থ সুরে—
বঙ্গের নন্দিনী তুমি, প্রিয়জনে করো আনন্দিত,
প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক গানের অমৃত।

লক্ষ্মিনিকেতন
২২ ভাদ্র ১৩৩০

লক্ষ্যশূন্য

রথীয়ে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্নবে ডাকি,
“থামো থামো, কোথা তুমি রত্নবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।” রথী কহে, “ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।”
গৃহী কহে, “নিদারুণ স্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।” রথী কহে, “যেতে হবে আগে।”
“কোন্‌খানে” শূন্যইল। রথী বলে, “কোনোখানে নহে,
শূন্য আগে।” “কোন্‌ তীর্থে, কোন্‌ সে মন্দিরে” গৃহী কহে।
“কোথাও না, শূন্য আগে।” “কোন্‌ বন্ধু-সাথে হবে দেখা।”
“কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।”
ঘর্ষিত রথবেগে গৃহীভিত্তি করি দিল গ্রাস;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুণ্ণিত বাতাস
সম্মুখ আকাশে। অধীরের দীপ্ত সিংহস্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অমৃতপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

কাকোভিয়া জাহাজ
৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

প্রবাসী

পরবাসী চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণভরে।
বারে বারে শূন্যদিন
ফিরে গেল অর্থহীন,
চেয়ে আছে সবে তোমা-তরে,
ফিরে এসো ঘরে।

আকাশে আকাশে আরোজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
বন ভরা ফুলে ফুলে,
“এসো এসো, সহো তুলে”,
উঠে ডাক ঘরঘরে ঘরঘরে।

ফসলে ঢাকিয়া যায় মাটি,
 তুমি কি লবে না তাহা কাটি।
 ওই দেখো কতবার
 হল খেয়া পারাপার,
 সারিগান উঠিল অম্বরে।

কোথা যাবে সে কি জানা নেই।
 যেথা আছ, ঘর সেখানেই।
 মন যে দিল না সাড়া,
 তাই তুমি গৃহছাড়া,
 পরবাসী বাহিরে অন্তরে।

আঁঙিনায় অঁকা আলিপনা,
 অঁখি তব চেয়ে দেখিল না।
 মিলনঘরের বাতি
 জ্বলে অনিমেষভাতি
 সারারাত জ্বালার 'পরে।

বাঁশ পড়ে আছে তরুন্মূলে,
 আজ তুমি আছ তারে ভূলে।
 কোনোখানে সুর নাই,
 আপন ভুবনে তাই
 কাছে থেকে আছ দুরান্তরে।

এসো এসো মাটির উৎসবে,
 দক্ষিণবায়ুর বেগুরবে।
 পাখির প্রভাতীগানে,
 এসো এসো পদ্যম্ভানে
 আলোকের অমৃতনির্ঝরে।

ফিরে এসো তুমি উদাসীন,
 ফিরে এসো তুমি দিশাহীন।
 প্রিয়েরে বরিতে হবে,
 বরমাল্য আনো তবে,
 দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে।

দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া স্মারে,
 বীর তুমি বন্ধে লহো তারে।
 পথের কণ্টক দলি
 ক্ষতপদে এসো চলি
 কটিকার মেঘমন্দ্রস্বরে।

বেদনার অর্ঘ্য দিলে, তবে
ঘর তব আপনার হবে।
তুফান তুলিবে ক্লে,
কাঁটাও ভরিবে ফ্লে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে।

[চৈত্র ১৩৩২]

বৃদ্ধজন্মোৎসব

সংস্কৃত-ছন্দে নিয়ম-অনুসারে পঠনীয়

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী,
নিত্য নিষ্ঠুর ম্বল্ল,
ঘোর কুটিল পশু তার,
লোভজুটিল বন্ধ।
নতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
করো গ্রাণ মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী,
বিকশিত করো প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষাদ।

শান্ত হে, মৃদু হে, হে অনন্তপূণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

এসো দানবীর, দাও
ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার
অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন করো মোহ,
উজ্জ্বল করো জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন,
নয়ন লভুক অন্ধ।

শান্ত হে, মৃদু হে, হে অনন্তপূণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনহীন নিখিলহৃদয়
ভাপদহনদীপ্ত।
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ
খিন্ন অপরিভূষিত।

দেশ দেশ পরিমল তিলক রক্তকন্দম্বলানি,
 তব মঙ্গলমণ্ডল আনো, তব দক্ষিণ পাণি,
 তব শব্দ সংগীতরাগ,
 তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপদ্য,
 করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

১০০০

প্রথম পাতায়

লিখতে যখন বল আমার
 তোমার খাতার প্রথম পাতে
 তখন জানি, কাঁচা কলম
 নাচবে আজো আমার হাতে।
 সেই কলমে আছে মিশে
 ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,
 সেই কলমে সঁঝের মেঘে
 লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
 সেই কলমে শিশু দোয়েল
 শিস দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি।
 পারুলদিদির বাসায় দোলে
 কনকচাঁপার কচি কুঁড়ি।
 খেলার পুতুল আজো আছে
 সেই কলমের খেলাঘরে;
 সেই কলমে পথ কেটে দেয়
 পথহারানো তেপান্তরে।
 নতুন চিকন অশথপাতা
 সেই কলমে আপনি নাচে।
 সেই কলমে মোর বয়সে
 তোমার বয়স বাঁধা আছে।

৮ বৈশাখ ১০০৪

নতুন

আমরা খেলা খেলিছিলাম,
 আমরাও গান গেয়েছি;
 আমরাও পাল মেলেছিলাম,
 আমরা তরী বেয়েছি।
 হারায় নি তা হারায় নি,
 যেতরণী পারায় নি,

নবীন আঁখির চপল আলোয়
সে কাল ফিরে পেরেছি।

দূর রজনীর স্বপন জাগে
আজ নতনের হাসিতে।
দূর ফাগুনের বেদন জাগে
আজ ফাগুনের বাঁশিতে।
হায় রে সেকাল, হায় রে,
কখন চলে যায় রে
আজ একালের মরীচিকায়
নতুন মায়ায় ভাসিতে।

যে মহাকাল দিন ফুরালে
আমার কুসুম ঝরালো
সেই তোমারি তরুণ ভালে
ফুলের মালা পরালো।
কইল শেষের কথা সে,
কাদিয়ে গেল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে
শূন্য আবার ভরালো।

আনলে ডেকে পথিক মোরে
তোমার প্রেমের আঙনে।
শুকনো ঝোরা দিল ডরে
এক পশলায় শাঙনে।
সন্ধ্যামেষের কোণাতে
রক্তরাগের সোনাতে
শেষ নিমেষের বোঝাই দিয়ে
ভাসিয়ে দিলে ভাঙনে।

শিল্প
৩০ বৈশাখ ১৩৩৪

শুকসারী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু পাহাড়-আঁকা চিত্রপটিকার উত্তরে

শুক বলে, 'গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য।'
সারী বলে, 'মেঘমালা, সেই বা কী সামান্য—
গিরির মাথায় থাকে।'
শুক বলে, 'গিরিরাজের দৃঢ় অচল পিলা।'
সারী বলে, 'মেঘমালার আদি-অন্তই লীলা—
বাঁধবে কে বা তাকে।'

শুক বলে, 'নদীর জলে গিরি ঢালেন প্রাণ।'
 সারী বলে, 'তার পিছনে মেঘমালার দান—
 তাই তো নদী আছে।'
 শুক বলে, 'গিরীশ থাকেন গিরিতে দিনরাত্র।'
 সারী বলে, 'অম্পূর্ণা ভরেন ভিক্ষাপাত্র—
 সে তো মেঘের কাছে।'

শুক বলে, 'হিমাদ্রি যে ভারত করে ধন্য।'
 সারী বলে, 'মেঘমালা বিশ্বেরে দেয় স্তন্য—
 বাঁচে সকল জন।'
 শুক বলে, 'সমাধিতে স্তম্ভ গিরির দৃষ্টি।'
 সারী বলে, 'মেঘমালার নিতানুতন সৃষ্টি—
 তাই সে চিরন্তন।'

শিল্প
 ৩১ বৈশাখ ১৩৩৪

সুসময়

বৈশাখী ঝড় ষতই আঘাত হানে
 সন্ধ্যাসোনার ভান্ডারম্বার-পানে,
 দস্যুর বেশে ষতই করে সে দাবি
 কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
 গগন সঘন অবগুষ্ঠন টানে।
 'খোলো খোলো মূখ' বনলক্ষ্মীরে ডাকে,
 নিবিড় ধূলায় আপনি তাহারে ঢাকে।
 'আলো দাও' হাঁকে, পায় না কাহারো সাড়া,
 অঁধার বাড়ায় বেড়ায় লক্ষ্মীছাড়া,
 পথ সে হারায় আপন ঘূর্ণিপাকে।

তারপরে যবে গিউলিফুলের বাসে
 শরৎলক্ষ্মী শূন্য আলোর ভাসে,
 নদীর ধারায় নাই মিছে মস্ততা,
 কুম্ভকলির স্নিগ্ধশীতল কথা,
 মৃদু উচ্ছ্বাস মর্মরে ঘাসে ঘাসে—

শিশির যখন কেলুর পাতার আগে
 রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ার আগে,
 সবুজ খেড়ের নবীন ধানের শিষে
 ঢেউ খেলে যায় আলোকছায়ার মিলে,
 গগনসীমার কাশের কাঁপন লাগে—

হঠাৎ তখন সূর্য্যভোবার কালে
দীপ্তি লাগায় দিক্‌ললমার ভালে;
যেহ ছেঁড়ে তার পদা অধার-কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
চরম খনের পরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

নতুন কাল

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমার হেসে,
“আমার সঙ্গে লড়াই করে কখুনো কি পার,
বারে বারেই হার।”
আমি বললেম, “তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক দেখি তো লড়াই।”
“আচ্ছা তবে দেখাই তোমায়” এই বলে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশাই তখনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত।

বারে বারে শুনায় আমায়, “বলো তোমার হার হয়েছে না কি।”
আমি কইলেম, “বলতে হবে তা কি।
ধূলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।
এই কথা কি জান—
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মান
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধূলোয় যেদিন পড়ব যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারি শেষ জিত।”

রুম্‌ফিউস জাহাজ
২০ অগস্ট [১৯২৭]

পরিণয়মঙ্গল

হেমন্তী দেখী ও অমিরচন্দ্র জেবতীর পরিণয়-উপলক্ষে

উত্তরে দয়াররন্ধ্র হিম্যানীর কারাদর্গভূলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার গুণ্ডলে।
যে নীহারবিন্দু ফুল ছিঁড়ি তার স্বকলম্পাশ
কঠিনের মরুবকে মাধুরীর আনিল আশ্বাস,

হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গোধূমে তাহারি শূভ্রমালা
 নিভৃত গোপন চিত্তে; সেই অর্ঘ্য পূর্ণ করি ডালা
 লাবণ্যনৈবেদ্যখানি দক্ষিণসমুদ্র-উপকূলে
 এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে
 রবির সোহাগগর্ভ বর্ণগন্ধমধুরসধারে
 বৎসরের ঋতুপাঠ উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে।
 বিস্ময়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
 কোথা করে অন্তর্ধান মৃদুহৃতে দৃষ্টের অন্তরাল—
 দক্ষিণপবনসখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
 হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমালা নিল শূভক্ষণে।

শান্তিনিকেতন
 ১ পৌষ ১৩৩৪

জীবনমরণ

জীবনমরণের বাজারে খজনি
 নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
 অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
 বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
 আজিকে আলো ছায়া করিছে কোলাকুলি,
 আজিকে এক দোলে দুজনে দোলাদুলি
 শূকানো পাতা আর মৃকুলে।
 আজিকে শিরীষের মধুর উপবনে
 জড়িত পাশাপাশি নতনে পুরাতনে
 চিকন শ্যামলের দৃকুলে।

বিরহে টানে মীড় মিলন-বীণাতারে,
 সুরের বৃকে বাজে বেদনা।
 কপোত কাকলিতে করুণা সঞ্চারে,
 কাননদেবী হল বিমনা।
 আমারো প্রাণে বৃষ্টি বহেছে ওই হাওয়া,
 কিছ-বা কাছে আসা, কিছ-বা চলে যাওয়া,
 কিছ-বা স্মরি কিছ-পাসরি।
 যে আছে যে-বা নাই আজিকে দৌহে মিলি
 আমার ভাবনাতে প্রমিছে নিরিবিমলি
 বাজারে ফাল্গুনের বাঁশরি।

[ফাল্গুন ১৩৩৪]

গহলক্ষ্মী

নবজাগরণ-সগনে গগনে বাজে কল্যাণশব্দ—
এসো তুমি উষা ওগো অকলুষা, আনো দিন নিঃশঙ্ক।
দ্যুলোক-ভাসানো আলোকসুধায়
অভিষেক তুমি করো বসুধায়,
নবীন দৃষ্টি নম্রনে তাহার এনে দাও অকলঙ্ক।

সমুদ্র-পানে নবযুগ আজি মেলুক উদার চিত্র।
অমৃতলোকের দ্বার খুলে দিন চিরজীবনের মিত্র।
বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক,
যাত্রীরা সবে থাক ঘেরে থাক,
দেহমন হতে হোক অপগত অবসাদ অপবিত্র।

মৌন যে ছিল বন্ধে তাহার বাজুক বীণার তন্ত্র।
নব বিশ্বাসে আশ্বাসহীন শূন্যক বিজয়মন্ত্র।
এসো আনন্দ, দুঃখহরণ,
দুঃখেতে দাও করিতে বরণ,
মরণতোরণ পার হলে পাই অমর প্রাণের পন্থ।

কল্যাণী, তব অঙ্গনে আজি হবে মঙ্গলকর্ম,
শুভসংগ্রামে যে যাবে তাহারে পরাও বীরের বর্ম।
বলো সবে ডাকি 'ছাড়ো সংশয়',
বলো যাত্রীরা 'হয়েছে সময়',
বলো 'নাহি ভয়', বলো 'জয় জয়, জয়ী যেন হয় ধর্ম'।

পশ্চাৎ-পানে ফিরায়ে ডেকো না, মনে জাগারো না শঙ্ক,
দুর্বল শোকে অগ্রসরিলে নমন কোরো না অশ্রু।
সংকট-মাঝে ছুটিবার কালে
বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে,
যে চরণ বাধা লগ্নিবে, তাহে জড়ায়ো না মোহবন্ধ।

[বৈশাখ ১৩৩৪]

রঙিন

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে।
কেউ-বা জলে কেউ-বা তারা কলে।
অজানা দেশ, স্মৃতিদিনে
পারের কাছের পথটি কিলে
দুঃসাহসে এগিয়ে তারা চলে।

কোন্ মহারাজ রথের 'পরে একা,
ভালো করে যায় না তাঁরে দেখা।
সূর্যতারা অন্ধকারে
ডাইনে বাঁয়ে উঁকি মারে,
আপন আলোর দৃষ্টি তাদের ঠেকা।

আমার মশাল সামনে ধরি না যে,
তাই তো আলো চক্ষে নাহি বাজে।
অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টিকা,
রাঙনকে তাই দেখি মনের মাঝে।

পাখিরা রঙ ওড়ায় আকাশতলে,
মাছেরা রঙ খেলায় গভীর জলে।
রঙ জেগেছে বনসভায়
গোলাপ চাঁপা রঙন জ্বায়,
মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে।

নীরব ডাকে রঙমহালের রাজা
হুকুম করেন, 'রঙের আসর সাজা।'—
অমনি ফাগুন কোথা হতে
ভেসে আসে হাওয়ার স্রোতে,
পুরানোকে রাঙিয়ে করে তাজা।

তাদের আসর বাহির-ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে।
আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন ধোয়ানে দিই পেতে।

২৬ ভাদ্র ১০০৫

আশীর্বাদী

কল্যাণীর শ্রীযুক্ত স্বতীন্দ্রমোহন বাগচীর সংবর্ধনা উপলক্ষে

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়,
নবীন বটে ছিলাম কোনো কালে।
বসন্তে আজ কত নতুন বোটার
ধরল কুঁড়ি বাণীবনের ডালে।

কত ফুলের যৌবন যায় চুকে
একবেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে।
মধুর পালা রেন্দুকণার মৃখে
ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে।

কাগুনফুলে ভরেছিলে সাজি,
শ্রাবণমাসে আনো ফলের ভিড়।
সেতারেতে ইমন উঠে বাজি
সদরবাহারে দিক কানাড়ার মীড়।

২ ভাদ্র ১৩৩৮

আশীর্বাদ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তারি পুঞ্জিত হল জীবনের ভাঙা আশা।
ঘরের মধ্যে বৃকের কাদনগদলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধূলা।
দুঃখিয়া রুঃখিয়া উঠে নিরুদ্ভব বায়ু,
শোষণ করিছে আরু।
যেখানে-সেখানে মলিনের লাগে ছোঁয়া,
দীপ নিভে যায়, তীব্রগন্ধ ধোঁয়া
রোধ করে নিঃবাস,
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ।

ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্ তোর ভাঙা ভিস্তির ধারে,
অসীম আকাশ, কে তারে রোধিতে পারে।
সেথা নাই যখন,
প্রভাত-আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন।
সন্ধ্যার তারা তোমারি মৃখেতে চাহে,
তোমারি মৃক্তি গাহে।
তব সস্তার মহিমা ঘোষিছে সব সস্তার মাঝে,
হে মানব, তুমি কোথার লুকাও লাজে।
যেখানে ক্ষুদ্র সেখানে পীড়িত তুমি,
ককর্শ হাসি হাসিছে যেথার দৈন্যের মরুভূমি
তাহার বাহিরে তোমার উদার স্থান,
বিশ্ব তোমাতে বন্ধ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান।

শুদ্ধপঞ্চমী
১৮ আশ্বিন ১৩৩৯

আশীর্বাদ

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে

প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান,
দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান।

২ পৌষ ১৩৩৯

তোমার মধুর দিন হে দিনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি
আপনার দিগ্দিগন্তে রবির সংগীতরশ্মিগুণি
প্রহর করিয়া পূর্ণ। মেঘে মেঘে তারি লিপি লিখে
বিরহমিলনবাণী পাঠাইলে বহু দূর দিকে
উদার তোমার দান। রবিকর করি মর্মগত
বনস্পতি আপনার পদপদ্মে করে পরিণত,
তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা
নিত্যোৎসব-সমারোহে। সেইমতো তোমার সাধনা।
রবির সম্পদ হত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
সুদূরে সুদূরে রূপ নিল তোমা-পরে স্নেহ সুগভীর,
রবির সংগীতগুণি আশীর্বাদ রহিল রবির।

২ পৌষ ১৩৩৯

উত্তীর্ণত নিবোধত

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবী

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ—
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কালস্রোতে ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে। আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্যলক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর—
দুঃখেয়ে স্বীকার করি; অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরাস্যে করিবে মার্জনা
প্রতিপক্ষে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্মে তব—উত্তীর্ণত নিবোধত।

প্রার্থনা

কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
 নিরন্তর নিদারুণ শ্বশ্রু যবে দেখি ঘরে ঘরে
 প্রহরে প্রহরে; দেখি অন্ধ মোহ দূরন্ত প্রয়াসে
 বদভুঙ্কার বহি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
 নিঃসহায় দূর্ভাগ্যের সঙ্করুণ সকল প্রত্যাশা,
 জীবনের সকল সম্বল; দঃখীর আগ্রয়বাসা
 নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দূর্দায় দুরাশাহোমানলে
 আহুতি-ইন্ধন জোগাইতে; নিঃসংকোচ গর্বে বলে,
 আত্মতুষ্টি ধর্ম হতে বড়ো; দেখি আত্মশ্রমী প্রাণ
 তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
 গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায়; সিঁধির স্পর্ধার তরে
 দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি-পরে
 জয়যাত্রাপথে; দেখি খিঙ্কারে ভরিয়া উঠে মন,
 আত্মজাতি-মাংসলুস্খ মানুষের প্রাণনিকেতন
 উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা; চিত্ত মম
 নিষ্কৃতিসন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গমসম,
 মৃহতে মৃহতে বাজে শৃঙ্খলবন্ধন-অপমান
 সংসারের। হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি-সম্মান
 চিন্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
 বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
 বর্তমানকাল হতে নিষ্কমিলা নিত্যকাল-মাঝে
 অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
 অহমিকা-বন্দীশালা হতে।—ভগবান বৃদ্ধ তুমি,
 নিদয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
 ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
 তোমারি করুণাবিন্দু ভরুক তাদের সর্বনাশ,
 আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।—আর যারা
 ক্ষীণের নির্ভর ধরুস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
 দুর্বলের মৃতি রুধি, বোসো তাহাদের দুর্গম্বারে
 তপের আসন পাতি; প্রমাদবিহীন অহংকারে
 পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
 তব পূণ্য আলোকেতে লড়ুক নিঃশেষ অবসান।

২৯ জুলাই ১৯৩০

অতুলপ্রসাদ সেন

বৃদ্ধ, তুমি বৃদ্ধতার অজ্ঞান অমৃতে
 পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
 ছিল তব অবিরত
 হৃদয়ের সদাশ্রুত,
 বশিত কর নি কঙ্কু করে
 তোমার উদার মৃদু স্বারে।

মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে
 অমরাবতীর সেই সন্ধ্যা-ঝরা দানে।
 সন্ধ্যা-ভরা সঙ্গ তব
 বারে বারে নব নব
 মাধুরীর আতিথ্য বিলাস,
 রসতৈলে জেলেছিল আলো।

দিন পরে গেছে দিন, মাস পরে মাস,
 তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস।
 'হবে হবে, দেখা হবে'—
 এ কথা নীরব রবে
 ধ্বনিত হয়েছে কণে কণে
 অকথিত তব আমন্ত্রণে।

আমারো যাবার কাল এল শেষে আজি,
 'হবে হবে, দেখা হবে' মনে ওঠে বাজি।
 সেখানেও হাসিমুখে
 বাহু মেলি লবে বদকে
 নবজ্যোতিদীপ্ত অনুরাগে,
 সেই ছবি মনে মনে জাগে।

এখানে গোপন চোর ধরার ধূলায়
 করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
 যদি ব্যথাহীন কাল
 বিনাশের ফেলে জাল,
 বিরহের ক্ষতি লয় হরি,
 সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি।

তাই বলি, দীর্ঘ আরু, দীর্ঘ অভিলাপ,
 বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
 অনেক হারাতে হয়,
 তারেও করি নে ভয়;
 যতদিন ব্যথা রয়ে থাকি,
 তার বেশি যেন নাহি থাকি।

শিরোনাম-সূচী

শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
অগোচর। পরিশেষ	৯৪৭	আনুমান। পূর্ববী	৬০৪
অগ্রদূত। পরিশেষ	৯২৬	আমি। পরিশেষ	৮৯৬
অচেনা। মহুয়া	৭৮৯	আত্মবন। বনবাণী	৮৫৫
অতিথি। পূর্ববী	৬৬০	আরেক দিন। পরিশেষ	৯২৯
অতীত কাল। পূর্ববী	৬৫৮	আলেখ্য। পরিশেষ	৯৬৬
অতুলপ্রসাদ সেন। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯৫	আশঙ্কা। পূর্ববী	৬৬৬
অদেখা। পূর্ববী	৬৭৫	আশা। পূর্ববী	৬০৬
অনাবশ্যক। খেয়া	১৪১	‘আশীর্বাদ’। গীতালি	০৬০
অনাহত। খেয়া	১০৮	‘আশীর্বাদ’। পরিশেষ	৮৮৭
অনুমান। খেয়া	১৮২	আশীর্বাদ। পরিশেষ	৯১০
অন্তর্ধান। মহুয়া	৮৪৯	আশীর্বাদ। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮২
অন্তর্হিতা। পরিশেষ	৯০৫	আশীর্বাদ। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮২
অন্তর্হিতা। পূর্ববী	৬৬৪	আশীর্বাদ। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯০
অন্তিম প্রেম। পূর্ববী, সংযোজন	৭০০	আশীর্বাদ। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯৪
অন্ধকার। পূর্ববী	৬৯৪	আশীর্বাদ। মহুয়া	৮২৯
অনা মা। শিশু ভোলানাথ	৫৬৫	আশীর্বাদী। পরিশেষ	৯১৫
অপমণ। শিশু	১০	আশীর্বাদী। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯২
অপরাজিত। মহুয়া	৭৯০	আশ্রমবালিকা। পরিশেষ	৯০৬
অপরিচিতা। পূর্ববী	৬০২	আসল। পলাতক	৫০৯
অপূর্ণ। পরিশেষ	৮৯৪	আহবান। পরিশেষ	৯০৫
অবশেষ। মহুয়া	৮৪০	আহবান। পূর্ববী	৬২২
অবসান। পূর্ববী	৬৫১	আহবান। মহুয়া	৮০৬
অবসান। পূর্ববী, সংযোজন	৭০০		
অবাধ। পরিশেষ	৯৫২	ইচ্ছামতী। শিশু ভোলানাথ	৫৬০
অবারিত। খেয়া	১৪২	ইটালিয়া। পূর্ববী	৬৯৭
অবদূষ মন। পরিশেষ	৯১৭		
অঘা। মহুয়া	৭৭৭		
অশ্রু। মহুয়া	৮৪১	‘উজ্জীবন’। মহুয়া	৭৭০
অসমাপ্ত। মহুয়া	৭৮৭	উৎসবের দিন। পূর্ববী	৬০৭
অন্তঃসখী। শিশু	৪২	উৎসর্গ ১-৪৮	৫৯-১১২
		উৎসর্গ। সংযোজন ১-৭	১১৫-২০
আকন্দ। পূর্ববী	৬৭৮	‘উৎসর্গ’। খেয়া	১২০
আকুল আহবান। শিশু	৫০	‘উৎসর্গ’। বলাকা	৪০৫
আগন্তুক। পরিশেষ	৯৫৫	উদ্ভিষ্টত নিবোধত। পরিশেষ,	
আগমন। খেয়া	১২৯	সংযোজন	৯৯৪
আগমনী। পূর্ববী	৬০৫	উদ্ভাত। মহুয়া	৭৮৬
আঘাত। পরিশেষ	৯৬১	উপহার। মহুয়া	৭৭৯
আছি। পরিশেষ	৯০০	উপহার। শিশু	৪৬
আতঙ্ক। পরিশেষ	৯৬৪	উষসী। মহুয়া	৮২০

শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
একাকী। মহদয়া	৮২৮	চঞ্চল। পূরবী	৬৭৬
কঙ্কাল। পূরবী	৬৮১	চাঞ্চল্য। খেয়া	১৭৯
কণ্টিকারি। পরিশেষ	৯২০	চাতুরী। শিশু	১১
করুণী। মহদয়া	৮২১	চারি। পূরবী	৬৭০
কাকলি। মহদয়া	৮১৪	চামেলি-বিতান। বনবাণী	৮৬৬
কাগজের নোকা। শিশু	৫০	চিঠি। পূরবী	৬৮২
কাজলী। মহদয়া	৮১২	চিরদিনের দাগ। পলাতকা	৪৯৬
কালো মেয়ে। পলাতকা	৫২৯	চিরন্তন। পরিশেষ	৯১৯
কিশোর প্রেম। পূরবী	৬৬০	ছবি। পূরবী	৬২৬
কুটিরবাসী। বনবাণী	৮৭৯	ছায়া। মহদয়া	৮৩৬
কুয়ার ধারে। খেয়া	১৫০	ছায়ালোক। মহদয়া	৮২৪
কুর্চি। বনবাণী	৮৫৯	ছিন্ন পত্র। পলাতকা	৫২৫
কৃতজ্ঞ। পূরবী	৬৫০	ছুটির দিনে। শিশু	৩০
কৃপণ। খেয়া	১৪৯	ছোটো প্রশ্ন। পরিশেষ	৯৪৯
কেন মধুর। শিশু	১৩	ছোটোবড়ো। শিশু	২৩
কোকিল। খেয়া	১৬৯		
		জগদীশচন্দ্র। বনবাণী	৮৫২
কর্ণিকা। পূরবী	৬২৯	জন্মকথা। শিশু	৫
		জন্মদিন। পরিশেষ	৮৯২
খেয়া। খেয়া	১৮৯	জয়ন্তী। মহদয়া	৮১৭
খেলানী। মহদয়া	৮১০	জয়ন্তী। পরিশেষ	৯৫৬
খেলা। পূরবী	৬৩১	জলপাত্র। পরিশেষ	৯৬৩
খেলা। শিশু	৬	জাগরণ। খেয়া	১৫১
খেলা-ভোলা। শিশু ভোলানাথ	৫৫৪	জাগরণ। খেয়া	১৭৬
খোকা। শিশু	৭	জীবনমরণ। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯০
খোকার রাজ্য। শিশু	১৪	জ্যোতিষ-শাস্ত্র। শিশু	৩৫
		জ্যোতিষী। শিশু ভোলানাথ	৫৫৩
গান শোনা। খেয়া	১৭৫		
গানের সাজ। পূরবী	৬০৯	ঝড়। খেয়া	১৭২
গীতাজলি ১-১৫৭	১৯৫-২৮৭	ঝড়। পূরবী	৬৪৩
গীতাজলি। সংযোজন	২৯১	ঝামরী। মহদয়া	৮১৮
গীতাজলি গীতিমালা গীতালি।			
সংযোজন ১-১০	৪২৭-৩১	টিকা। খেয়া	১৬১
গীতালি ১-১০৮	৩৬৫-৪২০		
গীতিমালা ১-১১১	২৯৫-৩৬০	ঠাকুরদাদার ছুটি। পলাতকা	৫৩৪
গদ্যস্তম্ভন। মহদয়া	৮৩৪		
গৃহলক্ষ্মী। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯১	তপোভঙ্গা। পূরবী	৬০০
গোধূলিলগ্ন। খেয়া	১৪৪	তার। পূরবী	৬৫২
		তালগাছ। শিশু ভোলানাথ	৫৪৫
ঘাটে। খেয়া	১২৮	তুমি। পরিশেষ	৮৯৭
ঘাটের পথ। খেয়া	১২৬	তৃতীয়া। পূরবী	৬৭৪
ঘুমচোরা। শিশু	৯	তে হি নো দিবসঃ। পরিশেষ	৯২২
ঘুমের ভয়। শিশু ভোলানাথ	৫৬৯		

শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
দর্পণ। মহদ্রা	৮২৭	নির্লিপ্ত। শিশু	১০
দান। খেয়া	১০৪	নিষ্কৃতি। পলাতক	৫১০
দান। পুরবী	৬৫৬	নীড় ও আকাশ। খেয়া	১৬৫
দায়মোচন। মহদ্রা	৭৯৫	নীলমণিলাতা। বনবাণী	৮৫৭
দিঘি। খেয়া	১৭০	নতুন। পরিণেশ, সংযোজন	৯৮৬
দিনশেষ। খেয়া	১৬৭	নতুন কাল। পরিণেশ, সংযোজন	৯৮৯
দিনান্তে। মহদ্রা	৮৪০	নতুন শ্রোতা। পরিণেশ	৯০৭
দিনাবসান। পরিণেশ	৯০০	নৈবেদ্য। মহদ্রা	৮৪০
দিয়ালী। মহদ্রা	৮১৫	নৌকাযাত্রা। শিশু	৩০
দীনা। মহদ্রা	৮১০		
দীপশিলাপী। পরিণেশ	৯২০	পশ্চিমে বৈশাখ। পুরবী	৫৯১
দীপিকা। পরিণেশ	৯০৬	পথ। পুরবী, সংযোজন	৭০৪
দুই আঁমি। শিশু ভোজানাত	৫৭১	পথ। পুরবী	৬৯০
দুঃখমূর্তি। খেয়া	১০১	পথবর্তী। মহদ্রা	৮০০
দুঃখ-সম্পদ। পুরবী	৬৫৫	পথসঙ্গী ১। পরিণেশ	৯০৫
দুঃখহারী। শিশু	৩৯	পথসঙ্গী ২। পরিণেশ	৯০৫
দুয়ার। পরিণেশ	৯০৬	পথহারা। শিশু ভোজানাত	৫৫৬
দুয়োরানী। শিশু ভোজানাত	৫৬৬	পথিক। খেয়া	১৫৫
দুর্দিন। পুরবী, সংযোজন	৭১২	পথের বাঁধন। মহদ্রা	৭৯২
দুর্দিনে। পরিণেশ	৯১২	পথের শেষ। খেয়া	১৬৪
দুর্ঘটন। শিশু ভোজানাত	৫৬২	পদধ্বনি। পুরবী	৬৪৬
দুত। মহদ্রা	৭৯০	পরদেশী। বনবাণী	৮৭০
দুর। শিশু ভোজানাত	৫৫৯	পরিচয়। মহদ্রা	৭৯০
দেবদারু। বনবাণী	৮৫৪	পরিচয়। শিশু	৪০
দোসর। পুরবী	৬৫০	পরিণয়। পরিণেশ	৯১৯
দৈবত। মহদ্রা	৭৭৮	পরিণয়। মহদ্রা	৮০১
		পরিণয়মণ্ডল। পরিণেশ, সংযোজন	৯৮৯
ধর্মমোহ। পরিণেশ	৯৭৮	পলাতক। পলাতক	৪৯৫
ধাবমান। পরিণেশ	৯৪১	পান্থ। পরিণেশ	৮৯০
		পারসো জন্মদিনে। পরিণেশ	৯৭৭
নগিনী। মহদ্রা	৮২২	পিরালী। মহদ্রা	৮১৫
নববধূ। মহদ্রা	৮০০	পুতুল ভাঙা। শিশু ভোজানাত	৫৪৯
নবীন অতিথি। শিশু	৪১	পুরাতন। মহদ্রা	৮০৫
নমস্কার। পুরবী, সংযোজন	৭১০	পুরানো বই। পরিণেশ	৯৪৪
নাগরী। মহদ্রা	৮১৬	পুজার সাজ। শিশু	৪৮
না-পাওয়া। পুরবী	৬৮৬	পুরবী। পুরবী	৫৮৭
'নাশনী'। মহদ্রা	৮১১-২৪	পূর্ণতা। পুরবী	৬২১
নারিকেল। বনবাণী	৮৬৫	প্রকাশ। পুরবী	৬৪৮
নিবেদন। মহদ্রা	৭৮৮	প্রকাশ। মহদ্রা	৭৮০
নিরাবৃত্ত। পরিণেশ	৯৫০	প্রজ্ঞা। খেয়া	১৮১
নিরুদ্যম। খেয়া	১৪৭	প্রজ্ঞা। মহদ্রা	৮২৫
নির্ধারিত। মহদ্রা	৭৮২	প্রতিভা। মহদ্রা	৮৪০
নির্ধারক। পরিণেশ	৯২৮	প্রশাস। পরিণেশ	৮৮৯
নির্ভর। মহদ্রা	৭৯১	প্রশাস। পরিণেশ	৯২৯

শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
প্রতিমা। মহদুয়া	৮২২	বসন্ত-উৎসব। বনবাণী, সংযোজন	৮৮১
প্রতীক্ষা। খেয়া	১৭৪	বসন্তের দান। পূরবী, সংযোজন	৭০৫
প্রতীক্ষা। পরিশেষ	৯২৭	বাউল। শিশু ভোলানাথ	৫৬০
প্রতীক্ষা। মহদুয়া	৭৯৭	বাণী-বিনিময়। শিশু ভোলানাথ	৫৭৪
প্রত্যাগত। মহদুয়া	৮০৪	বাতাস। পূরবী	৬০৮
প্রত্যাশা। মহদুয়া	৭৭৬	বাপী। মহদুয়া	৮০৭
প্রথম পাতায়। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮৬	বালক। পরিশেষ	৯০১
প্রবাসী। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮৩	বালিকা বধু। খেয়া	১০৬
প্রবাহিনী। পূরবী	৬৭৮	বাঁশ। খেয়া	১৪০
[প্রবেশক]। মহদুয়া	৭৬৯	বাসরঘর। মহদুয়া	৮০৭
[প্রবেশক]। শিশু	৩	বিকাশ। খেয়া	১৫৯
প্রভাত। পূরবী	৬৬১	বিচার। পরিশেষ	৯৪৩
প্রভাতী। পূরবী	৬৭২	বিচার। শিশু	১১
প্রভাতে। খেয়া	১০৩	বিচিত্র সাধ। শিশু	১৯
প্রদ্বন্দ্ব। পরিশেষ	৯১৩	বিচিত্রা। পরিশেষ	৮৯০
প্রদ্বন্দ্ব। শিশু	১৭	বিচ্ছেদ। খেয়া	১৫৮
প্রশ্ন। পূরবী, সংযোজন	৭০৬	বিচ্ছেদ। মহদুয়া	৮০৭
প্রাচী। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮১	বিচ্ছেদ। শিশু	৪৫
প্রাণ। পরিশেষ	৯৫৭	বিজয়ী। পূরবী	৫৮৭
প্রাণ-গঙ্গা। পূরবী	৬৯৫	বিজয়ী। মহদুয়া	৭৭৫
প্রার্থনা। খেয়া	১৮৯	বিজ্ঞ। শিশু	২১
প্রার্থনা। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯৫	বিদায়। খেয়া	১৬৩
		বিদায়। মহদুয়া	৮০৮
ফাঁকি। পলাতক	৫০১	বিদায়। শিশু	৪০
ফুল ফোটানো। খেয়া	১৫৩	বিদায়সম্বল। মহদুয়া	৮৪২
ফুলের ইতিহাস। শিশু	৫৩	বিদেশী ফুল। পূরবী	৬৬২
		বিপাঙ্গা। পূরবী	৬৬৮
বক্সাদগুপ্ত রাজবন্দীদের প্রতি।		বিরহ। মহদুয়া	৮৪১
পরিশেষ	৯১১	বিরহিনী। পূরবী	৬৮৫
বকুল-বনের পাখি। পূরবী	৬১৪	বিস্ময়। পরিশেষ	৯৪৬
বদল। পূরবী	৬১৬	বিস্মরণ। পূরবী	৬৩৫
বধু। পরিশেষ	৯০৮	বীণা-হার। পূরবী	৬৮৭
বনবাস। শিশু	৩৩	বীরপুরুষ। শিশু	২৬
বনস্পতি। পূরবী	৬৮৯	বুড়ি। শিশু ভোলানাথ	৫৪৬
বন্দিনী। মহদুয়া	৮০৩	বুদ্ধজন্মোৎসব। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮৫
বন্দী। খেয়া	১৫৫	বুদ্ধদেবের প্রতি। পরিশেষ	৯৭৬
বরষ। মহদুয়া	৮০২	বৃক্ষবন্দনা। বনবাণী	৮৫১
বরষাডালা। মহদুয়া	৭৮৪	বৃক্ষরোপণ উৎসব। বনবাণী	৮৭৫
বরষাঘা। মহদুয়া	৭৭৪	বৃষ্টি রৌদ্র। শিশু ভোলানাথ	৫৭৫
বর্ষাশেষ। পরিশেষ	৯০২	বেঠিক পথের পাথক। পূরবী	৬১৩
বর্ষাপ্রভাত। খেয়া	১৮৩	বেদনার লীলা। পূরবী	৬৫৮
বর্ষাসন্ধ্যা। খেয়া	১৮৫	বৈজ্ঞানিক। শিশু	৩৬
বলাকা ১-৪৫	৪০৭-৯১	বৈতরণী। পূরবী	৬৭১
বলন্ত। মহদুয়া	৭৭৩	বৈশাখ। খেয়া	১৬২

শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
বোধন। মহদ্রা	৭৭১	ষেঘ। খেয়া	১৪৬
বোবার বাণী। পরিশেষ	৯৬০	মোহানা। পরিশেষ	৯১০
বোরোবদ্র। পরিশেষ	৯৭২		
ব্যাকুল। শিশু	২২	যাত্রা। পূর্ববী	৫৯৯
		যাত্রী। পরিশেষ	৯৫০
ভাঙা মন্দির। পূর্ববী	৬০৪		
ভাবিনী। মহদ্রা	৮২৭	রঙিন। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯১
ভাবী কাল। পূর্ববী	৬৫৭	রবিবার। শিশু ভোলানাথ	৫৪৭
ভার। খেয়া	১৬০	রাখীপূর্ণিমা। মহদ্রা	৮০৬
ভিক্ষু। পরিশেষ	৯১৪	রাজপুত্র। পরিশেষ	৯২৫
ভিতরে ও বাহিরে। শিশু	১৫	রাজমিস্ত্রী। শিশু ভোলানাথ	৫৬৮
ভীরু। পরিশেষ	৯৪২	রাজা ও রানী। শিশু ভোলানাথ	৫৫৯
ভোলা। পলাতকা	৫২২	রাজার বাড়ি। শিশু	২৭
মধু। পূর্ববী	৬৭০	লক্ষ্যশূন্য। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮০
মধুমঞ্জরী। বনবাণী	৮৬০	লগ্ন। মহদ্রা	৭৯৮
মনে পড়া। শিশু ভোলানাথ	৫৪৮	লিপি। পূর্ববী	৬২৭
মর্ত্যবাসী। শিশু ভোলানাথ	৫৭১	লীলা। খেয়া	১৪৫
মহদ্রা। মহদ্রা	৮০৮	লীলাসিঙ্গিনী। পূর্ববী	৬১০
মাকি। শিশু	২৮	লুকোচুরি। শিশু	৩৮
মাটির ডাক। পূর্ববী	৫৮৮	লেখন	৭২০-৬৬
মাতৃসংসল। শিশু	৩৭	লেখা। পরিশেষ	৯০৭
মাধবী। মহদ্রা	৭৭৫		
মানী। পরিশেষ	৯২৪	শান্ত। পরিশেষ	৯৬২
মায়া। মহদ্রা	৭৮১	শামলী। মহদ্রা	৮১১
মায়ের সম্মান। পলাতকা	৫০৫	শাল। বনবাণী	৮৬১
মাল্য। পলাতকা	৫১৮	শিবাজী-উৎসব। পূর্ববী, সংযোজন	৭০৮
মালিনী। মহদ্রা	৮২০	শিলঙের চিঠি। পূর্ববী	৫৯৬
মাসটারবাবু। শিশু	২০	শিশু ভোলানাথ। শিশু ভোলানাথ	৫৪১
মিলন। খেয়া	১৫৭	শিশুর জীবন। শিশু ভোলানাথ	৫৪১
মিলন। পরিশেষ	৯০৯	শীত। পূর্ববী	৬৫৯
মিলন। পরিশেষ	৯৫৪	শীতের বিদায়। শিশু	৫২
মিলন। পূর্ববী	৬৯২	শুকতারা। মহদ্রা	৭৮২
মিলন। মহদ্রা	৮৩১	শুকসারী। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮৭
মুক্তরূপ। মহদ্রা	৮০৪	শুভক্ষণ। খেয়া	১২৮
মুক্তি। পরিশেষ	৯০৪	শুভক্ষণ : ভাগ। খেয়া	১২৯
মুক্তি। পলাতকা	৪৯৯	শুভযোগ। মহদ্রা	৭৮০
মুক্তি। পূর্ববী	৬৪১	শূন্যঘর। পরিশেষ	৯০০
মুক্তি। মহদ্রা	৭৮৫	শেষ। পূর্ববী	৬৪৯
মুক্তিপাল। খেয়া	১০২	শেষ অর্ঘ্য। পূর্ববী	৬১২
মুদ্রতি। মহদ্রা	৮১৯	শেষ খেয়া। খেয়া	১২৫
মুখু। শিশু ভোলানাথ	৫৫০	শেষ গান। পলাতকা	৫০৬
মুখ্যায়। পরিশেষ	৯৫১	শেষ প্রতিষ্ঠা। পলাতকা	৫০৭
মুখ্যর আহ্বান। পূর্ববী	৬৫৫	শেষ বসন্ত। পূর্ববী	৬৬৭

শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
শেষ মধু। মহুয়া	৮৪৪	সাম্বন্ধ। পরিশেষ	৯৪৮
শ্রীবিজয়লক্ষ্মী। পরিশেষ	৯৭১	সাম্বন্ধ। পরিশেষ	৯৬৭
		সাবিত্রী। পূর্ববী	৬১৯
সংশয়ী। শিশু ভোলানাথ	৫৫৮	সার্থক নৈরাশ্য। খেয়া	১৮৭
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পূর্ববী	৫৯৩	সিয়াম : প্রথম দর্শনে। পরিশেষ	৯৭৪
সম্মান। মহুয়া	৭৭৯	সিয়াম : বিদায়কালে। পরিশেষ	৯৭৬
সব-পেয়েছি'র দেশ। খেয়া	১৮৬	সীমা। খেয়া	১৫৯
সবলা। মহুয়া	৭৯৬	সুপ্রভাত। পূর্ববী, সংযোজন	৭১৫
সমব্যাধী। শিশু	১৮	সুসময়। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮৮
সময়হারা। শিশু ভোলানাথ, সংযোজন	৫৮৯	সৃষ্টিকর্তা। পূর্ববী	৬৮৭
সমাপন। পূর্ববী	৬৫৭	সৃষ্টিরহস্য। মহুয়া	৮১১
সমাপ্তি। খেয়া	১৬৮	স্পর্ধা। মহুয়া	৮০৬
সমালোচক। শিশু	২৫	স্পাই। পরিশেষ	৯৪০
সমুদ্র। পূর্ববী	৬৪০	স্বপ্ন। পূর্ববী	৬৩৯
সমুদ্রে। খেয়া	১৬৬		
সাগর-মন্ধান। পূর্ববী, সংযোজন	৭০৮	হার। খেয়া	১৫৪
সাগর সংগম। পূর্ববী, সংযোজন	৭০৬	হারাধন। খেয়া	১৭৮
সাগরিকা। মহুয়া	৮০০	হারিয়ে-যাওয়া। পলাতকা	৫৩৬
সাগরী। মহুয়া	৮১৭	হারিসর পাথেয়। বনবাণী	৮৭৩
সাত সমুদ্র পারে। শিশু ভোলানাথ	৫৫২	হে'রালি। মহুয়া	৮১৩
সাধী। পরিশেষ	৯৫৮		

প্রথম ছত্রের সূচী

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা-পরে। লেখন	
Spring hesitates at winter's door	৭৩৯
অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে। গীতালি	৩৯০
আঁচর বসন্ত হায় এল, গেল চলে। পূরবী, সংযোজন	৭০৫
অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে। গীতালি	৪১০
অজানা খনির নতুন মণির। মহদুয়া	৭৮৮
অজানা জীবন বাহিন্দ। মহদুয়া	৭৮৬
অজানা ফুলের গন্ধের মতো। লেখন	
Your smile, love	৭৪৫
অত চুপি চুপি কেন কথা কও। উৎসর্গ	১০৮
অতল আঁধার নিশা-পারাবার, তাহারি উপরিতলে। লেখন	
Days are coloured bubbles	৭২৫
অনন্তকালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া। লেখন	
The clouded sky today bears the vision	৭৪২
অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা। পূরবী	৬৬০
অনেককালের যাত্রা আমার। গীতিমাল্য	৩০৭
অন্তর মম বিকশিত করো। গীতাঞ্জলি	১৯৭
অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা। পূরবী	৬৪৩
অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শূন্যে ছলে সূর্যের আহ্বান। বনবাণী	৮৫১
অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। গীতালি	৪১৬
অপূর্বদের বাড়ি অনেক ছিল চৌকি টেবিল। পলাতকা	৫০৫
অবকাশ কর্মে খেলে আপনারি সঙ্গে। লেখন	৭৬৬
অব্যুৎ শিশুর আবছায়া এই নয়ন-বাতায়নের ধারে। পরিশেষ	৯১৭
অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯০
অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে। গীতাঞ্জলি	২০৭
অমন করে আছিস কেন মা গো। শিশু	২২
অমৃত যে সত্য, তার নাই পরিমাণ। লেখন	৭৬৬
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। পূরবী, সংযোজন	৭১৩
অর্থ কিছ্ বৃদ্ধি নাই, কুড়ারে পেয়েছি কবে জ্ঞান। পরিশেষ	৮৮৯
অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে। লেখন	
The sky remains infinitely vacant	৭৪৩
অসীম ধন তো আছে তোমার। গীতিমাল্য	৩১৯
ভস্মতরুর আলো-শতদল। লেখন	৭৪৯
আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে। লেখন	
Love attracts and unites	৭৪৪
আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ। লেখন	
The sky sets no snare to capture the moon	৭৬১
আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি। বনবাণী	৮৭৭
আকাশ ধরায়ে বাহুতে বোঁড়িয়া রাখে। লেখন	
The sky, though holding in his arms	৭২৬
আকাশ জেতে বৃষ্টি পড়ে। খেরা	১৭২
আকাশভলে উঠল ফুটে আলোর শতদল। গীতাঞ্জলি	২২১

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই। পূরবী	৬৫২
আকাশ-সিন্ধু-মাঝে এক ঠাই। উৎসর্গ	৭৫
আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোঙর রহিল পাঁকে। লেখন	৭২৯
Breezes come from the sky	...
আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর। লেখন	৭০৪
I leave no trace of wings in the air	...
আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে। গীতিমালা	৩৫৮
আকাশে মন কেন ডাকায় ফলের আশা পুঁথি। লেখন	৭৪২
The greed for fruit misses the flower	...
আকাশের তারায় তারায়। লেখন	৭০৫
God watches with the same smile	...
আকাশের নীল বনের শ্যামলে চায়। লেখন	৭৩০
The blue of the sky longs for the earth's green	...
আঁখি চাহে তব মৃদুপানে। মহুয়া	৮৩৬
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। গীতালি	৩৭৩
আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে। লেখন	৭৬৬
আঘাত করে নিলে জিনে। গীতালি	৩৬৯
আচ্ছাদন হতে ডেকে লহো মোরে। মহুয়া	৭৮৩
আছি আমি বিন্দুরূপে হে অন্তর্যামী। উৎসর্গ	৮১
আছে আমার হৃদয় আছে ভরে। গীতাঞ্জলি	২৫৯
আজ এই দিনের শেষে। বলাকা	৪৭৫
আজ জ্যোৎস্নারাত্রে সবাই গেছে বনে। গীতিমালা	৩৪৬
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়। গীতাঞ্জলি	১৯৯
আজ পূরবে প্রথম নয়ন মেলিতে। খেয়া	১৬১
আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি। গীতিমালা	২৯৫
আজ প্রভাতের আকাশটি এই। বলাকা	৪৭৭
আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের। গীতিমালা	৩৫৮
আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে। গীতাঞ্জলি	২৫১
আজ বারি ঝরে ঝরঝর। গীতাঞ্জলি	২১০
আজ বিকালে কোকিল ডাকে। খেয়া	১৬৯
আজ বৃকের বসন ছিঁড়ে ফেলে। খেয়া	১৫৯
আজ ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি। পরিশেষ	৮৯৬
আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে তোমারেই ভালো বেসেছি। উৎসর্গ	৭১
আজকে আমি কতদূর যে। শিশু ভোলানাথ	৫৫৬
আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার। মহুয়া	৭৮৪
আজি গন্ধবিধুর সমীরণে। গীতাঞ্জলি	২২৬
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। গীতাঞ্জলি	২০৬
আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯৪
আজি নির্ভর্যনির্ভৃত ভুবনে জাগে। গীতাঞ্জলি গীতিমালা গীতালি, সংযোজন	৪২৯
আজি বসন্ত জাগ্রত স্নারে। গীতাঞ্জলি	২২৭
আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে। গীতাঞ্জলি	২০৫
আজি হেরিতেছি আমি হে হিমাদ্রি। উৎসর্গ	৮৫
আজিকার দিন না ফুরাতে। পূরবী	৬৬৭
আজিকে এই সকালবেলাতে। গীতিমালা	৩১৫
আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে ওগো। উৎসর্গ	৮৮
আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে। খেয়া	১৪৬
আঁধার একেরে দেখে একাকার করে। লেখন	৭৬৫
Darkness smothers the one into uniformity	...
আঁধার সে ঘন বিরহিণী বধু। লেখন	৭২৯
Darkness is the veiled bride	...
আঁধারে প্রজ্বল ঘন বনে। পূরবী	৬৪৬

ছন্দ। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

আনন্মনা গো, আনন্মনা। পূর্ববী	...	৬৩৪
আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি'। বলাকা	...	৪৬৫
আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান। গীতাঞ্জলি	...	১৯৯
আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে। লেখন		
The desert is imprisoned in the wall	...	৭৪১
আপন হতে বাহির হয়ে। গীতাঞ্জলি	...	৪০১
আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। গীতিমালা	...	৩৪৫
আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি। পরিশেষ	...	৯০৪
আপনারে তুমি করিবে গোপন। উৎসর্গ	...	৬৩
আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক। বলাকা, উৎসর্গ	...	৪০৫
আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যদি হবে। লেখন	...	৭৬৬
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন। গীতাঞ্জলি	...	২১৩
আবার এসেছে আঘাত আকাশ ছেয়ে। গীতাঞ্জলি	...	২৫১
আবার জাগিন্দু আমি। পরিশেষ	...	৯৪৬
আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে। গীতাঞ্জলি	...	৪০৯
আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে। গীতাঞ্জলি	...	৩৭১
আমরা খেলা খেলেছিলাম। পরিশেষ, সংযোজন	...	৯৮৬
আমরা চলি সমুদ্রপানে। বলাকা	...	৪৪০
আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়। পরিশেষ, সংযোজন	...	৯৯২
আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা। মহুরা	...	৭৯১
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ। গীতাঞ্জলি	...	২০০
আমাদের এই পল্লীখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। উৎসর্গ	...	১০৭
আমায় অর্পণ করিবে রাখো। খেরা	...	১৮৫
আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে। গীতিমালা	...	৩৪৮
আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়। গীতিমালা	...	৩৩৯
আমায় আর হবে না দেরি। গীতাঞ্জলি	...	৩৯৬
আমায় এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার। গীতাঞ্জলি	...	২৬৯
আমায় এ গান শুনবে তুমি যদি। খেরা	...	১৭৫
আমায় এ প্রেম নয় তো ভীরু। গীতাঞ্জলি	...	২৪৬
আমায় এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ। গীতিমালা	...	৩০০
আমায় একলা ঘরের আড়াল ভেঙে। গীতাঞ্জলি	...	২৪৩
আমায় কণ্ঠ তাঁরে ডাকে। গীতিমালা	...	৩২৭
আমায় কাছে রাজা আমার রইল অজানা। বলাকা	...	৪৭১
আমায় খেলা যখন ছিল তোমার সনে। গীতাঞ্জলি	...	২৩৪
আমায় খোকা করে গো যদি মনে। শিশু	...	১১
আমায় খোকার কত যে দোষ। শিশু	...	১১
আমায় খোলা জানালাতে। উৎসর্গ	...	৯৬
আমায় গোধূলিলগন এল বৃষ্টি কাছে। খেরা	...	১৪৪
আমায় ঘরের সম্মুখেই। পরিশেষ	...	৯৬০
আমায় চিত্ত তোমায় নিত্য হবে। গীতাঞ্জলি	...	২৭৫
আমায় তরে পথের পরে কোথায় তুমি থাক। পরিশেষ	...	৯০৫
আমায় নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়। মহুরা	...	৭৭৯
আমায় নয়ন-ভুলানো এলে। গীতাঞ্জলি	...	২০২
আমায় নাই বা হল পারে যাওয়া। খেরা	...	১২৮
আমায় নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে। গীতাঞ্জলি	...	২৭৮
আমায় প্রাণের গানের পাখির দল। লেখন		
Migratory songs from my heart are on wings	...	৭৩৮
আমায় প্রাণের মাঝে যেমন করে। গীতিমালা	...	৩৫৯
আমায় প্রেম রবি-কিরণ হেন। লেখন		
Let my love, like sunlight, surround you	...	৭২৪
আমায় বলী আমার প্রাণে লাগে। গীতিমালা	...	৩৪৩

ছন্দ। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

আমার বাসীর পতঙ্গ গৃহাচর। লেখন

Mind's underground moths

আমার বোঝা এতই করি ভারী। গীতাঞ্জলি গীতিমালা গীতালি, সংযোজন

আমার বাধা যখন আনে আমার। গীতিমালা

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়। গীতিমালা

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে। বলাকা

আমার মা না হয়ে। শিশু ভোলানাথ

আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে। উৎসর্গ

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে। গীতাঞ্জলি

আমার মাথা নত করে দাও হে। গীতাঞ্জলি

আমার মিলন লাগি তুমি। গীতাঞ্জলি

আমার মূখের কথা তোমার। গীতিমালা

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে। গীতিমালা

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি। গীতিমালা

আমার যেতে ইচ্ছে করে। শিশু

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না। শিশু

আমার লিখন ফুটে পথধারে। লেখন

The same voice murmurs

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে। গীতিমালা

আমার সকল রসের ধারা। গীতালি

আমার সূরের সাধন রইল পড়ে। গীতালি

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে। গীতিমালা

আমারে তুমি অশেষ করেছ। গীতিমালা

আমারে দিই তোমার হাতে। গীতিমালা

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ। গীতাঞ্জলি

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে। পূর্ববী

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর। পরিশেষ

আমি অধম অবিশ্বাসী। গীতাঞ্জলি গীতিমালা গীতালি, সংযোজন

আমি আজ কানাই মাস্টার। শিশু

আমি আমার করব বড়ো। গীতিমালা

আমি এখন সময় করেছি। খেয়া

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার। খেয়া

আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী। উৎসর্গ

আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে। গীতাঞ্জলি

আমি জানি পুরাতন এই বইখানি। পরিশেষ

আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরষে। লেখন

I see an unseen kiss from the sky

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে। পূর্ববী

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী। গীতালি

আমি বহু বাসনার প্রাপপণে চাই। গীতাঞ্জলি

আমি বিকাব না কিছুতে আর। খেয়া

আমি ভিঁকা করে ফিরতেছিলাম। খেয়া

আমি যখন পাঠশালাতে যাই। শিশু

আমি যদি দৃষ্টদৃষ্টি করে। শিশু

আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গায়ে। উৎসর্গ

আমি যে আর সহিতে পারি নে। গীতালি

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে। বলাকা

আমি যেদিন সন্টার গেলাম প্রাতে। পলাতক

আমি যেন গোখলিগগন। মহুয়া

আমি শরৎলেন্থের মেঘের মতো। খেয়া

আমি লুপ্ত বলেছিলাম। শিশু

ছবি। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

আমি হাল ছাড়লে তবে। গীতিমাল্য	...	২১১
আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি। গীতালি	...	৩৬৭
আমি হেথায় থাকি শূন্য। গীতাজলি	...	২১২
আর আমাদের অঙ্গনে। বনবাণী	...	৮৭৫
আর আমার আমি নিজের শিরে বইব না। গীতাজলি	...	২৫৪
আর নাই রে বেলা নামল ছায়া। গীতাজলি	...	২০৯
আরো আঘাত সহিবে আমার। গীতাজলি	...	২৪৬
আরো কিছুখন না-হয় বসিযো পাশে। মহদুয়া	...	৮০৪
আরো চাই যে, আরো চাই গো। গীতিমাল্য	...	৩৪২
আলো নাই, দিন শেষ হল। উৎসর্গ	...	১০৪
আলো হবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে। লেখন		
Light accepts Darkness for his spouse	...	৭৩১
আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো। গীতালি	...	৩৯৪
আলো যে যায় রে দেখা। গীতালি	...	৩৬৭
আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়। উৎসর্গ	...	১৮
আলোকের সাথে মেলে। লেখন		
The darkness of night	...	৭৪২
আলোকের স্মৃতি ছায়া বৃকে করে রাখে। লেখন		
The picture—a memory of light	...	৭৩১
আলোয় আলোকময় করে হে। গীতাজলি	...	২২০
আলোহীন বাহিরের আলোহীন দয়াহীন কতি। লেখন	...	৭৪৯
আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি। বনবাণী, সংযোজন	...	৮৮১
আশ্রমের হে বালিকা। পরিণেশ	...	১৩৬
আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি। শিশু	...	৪৮
আশ্বিনের রাশিদেশে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের। পূর্ববী	...	৫৯৯
আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিষে এল। গীতাজলি	...	২০৫
আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব। গীতাজলি	...	২২০
আসিবে সে, আছি সেই আশাতে। পূর্ববী	...	৬৭৫
ইচ্ছে করে মা, যদি তুই। শিশু ভোলানাথ	...	৫৬৬
ইরান, তোমার বউ বুলবুল। পরিণেশ	...	১৭৭
ইরাবতীর মোহানামুখে কেন আপনভোলা। পরিণেশ	...	১১০
উচ্চ প্রাচীরে সূর্য তোমার। পরিণেশ	...	১২৪
উড়িয়ে ধবলা অভভেদী রথে। গীতাজলি	...	২৬৪
উত্তল সাগরের অধীর ক্রন্দন। লেখন	...	৭৫২
উত্তরে দুয়ারদুখ হিমালীর কারাদুর্গতলে। পরিণেশ, সংযোজন	...	১৮৯
উদয়াস্ত দুই ভটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার। পূর্ববী	...	৬৯৪
উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি। লেখন		
Dawn plays her lute before the gate of darkness		৭৪০-৪১
এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর না-জাহান। বলাকা	...	৪৪৭
এ দিন আজ কোন্ ঘরে গো। গীতালি	...	৪১১
এ মণিহার আমার নাহি সাজে। গীতিমাল্য	...	৩১৯
এই অজানা সাগরজলে বিকলবেলায় আলো। পরিণেশ	...	১২২
এই আবরণ কর হবে গো কর হবে। গীতালি	...	৪০২
এই আমি একমনে সপিলাম ভাঁরে। গীতালি, 'আশীর্বাদ'	...	৩৬৩

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে। গীতিমালা	৩৪১
এই কথা সদা শুনি, 'গেছে চলে', 'গেছে চলে'। পলাতকা	৫৩৭
এই কথাটা ধরে রাখিস। গীতালি	৩৮৮
এই করেছ ভালো, নিঠর। গীতাঞ্জলি	২৪৭
এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ। গীতাঞ্জলি	২৪২
এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে। গীতালি	৪২২
এই তো তোমার আলোক-ধেনু। গীতিমালা	৩৫৫
এই দুয়ারটি খোলা। গীতিমালা	৩০৫
এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো। বলাকা	৪৭৩
এই নিমেষে গণনাহীন নিমেষ গেল টুটে। গীতালি	৪২০
এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে। পরিশেষ	৯৯৯
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে। গীতাঞ্জলি	২১৮
এই মোর সাধ যেন এ জীবনমাঝে। গীতাঞ্জলি	২৫২
এই যে এরা আঙিনাতে। গীতিমালা	৩০৬
এই যে কালো মাটির বাসা। গীতালি	৩৭৬
এই যে তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ। গীতাঞ্জলি	২১২
এই লভিন্দু সঙ্গ তব। গীতিমালা	৩৫৫
এই শরৎ-আলোর কমল-বনে। গীতালি	৩৭২
এইক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে। বলাকা	৪৮৪
এক যে ছিল চাঁদের কোণায়। শিশু ভোলানাথ	৫৪৬
এক যে ছিল রাজা। শিশু ভোলানাথ	৫৫৯
এক রজনীর বরষনে শুধু। খেয়া	১০৩
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে। গীতালি	৩৭৫
একটি একটি করে তোমার। গীতাঞ্জলি	২০২
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে। গীতাঞ্জলি	২৮১
একটি পুষ্প কলি। লেখন	
I came to offer thee a flower	৭০৪
একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লীটি তার দখলে। শিশু	৪৩
একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে। মহুয়া	৮০৭
একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়। লেখন	
Though the thorn pricked me	৭০৫
একলা আমি বাহির হলেম। গীতাঞ্জলি	২৫৩
একা আমি ফিরব না আর। গীতাঞ্জলি	২৪৪
একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব। লেখন	
The one without second is emptiness	৭৬৫
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে। গীতিমালা	৩১০
এখনো তো বড়ো হই নি আমি। শিশু	২৩
এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত না পাই। গীতালি	৪১৩
এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে। গীতিমালা	৩৩৭
এতটুকু আঁধার যদি লুকিয়ে রাখিস। গীতালি	৩৮৫
এদের পানে তাকাই আমি। গীতালি	৩৯৭
এনেছে কবে বিদেশী সখা। বনবাণী	৮৭০
এবার আমার ডাকলে দূরে। গীতালি	৩৭৯
এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে। গীতিমালা	৩১২
এবার নীরব করে দাও হে তোমার। গীতাঞ্জলি	২২৯
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী। গীতিমালা	৩০৯
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো। বলাকা	৪৩৮
এবারে ফাল্গুনের দিনে সিংহভীরের কুজবীথিকায়। বলাকা	৪৭০
এবারের মতো করো শেষ। পূর্ববাণী	৬৫৭
ঐশ্বর্য করে ঐশ্বর্য দূরে বাহিরে। গীতিমালা	৩১৪
এবরে ভিখারী সাজারে কী রঙ্গ তুমি করিলে। গীতিমালা	৩৫৭

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
এসেছি সুদূর কাল থেকে। পরিশেষ	৯৫৫
এসো হে এসো, সজল ঘন। গীতাজলি	২১৪
ও আমার মন বখন জাগলি না রে। গীতালি	৩৭৮
ও নিষ্ঠুর আরো কি বল। গীতালি	৩৬৮
ও যে চেরীফুল ভব বন-বিহারিণী। লেখন	৭৫২
ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে। গীতালি	৩৯০
ওই আকাশ-পরে আধার মেলে কী খেলা। পূর্ববী, সংযোজন	৭১২
ওই তোমার ওই বাঁশখানি। খেয়া	১৪০
ওই দেখো মা, আকাশ ছেঁয়ে। শিশু	৩০
ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে। পরিশেষ	৯৭৬
ওই যে রাভের ভার। শিশু ভোলানাথ	৫৫৩
ওই যে সম্মা খুলিয়া ফেলিল তার। গীতালি	৩৯৬
ওই যেখানে শিরীষ গাছে। পলাতকা	৪৯৫
ওই রে ভরী দিল খুলে। গীতাজলি	২৩৫
ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি। লেখন	
I hear the prayer to the sun	৭৪৯
ওগো অনন্ত কালো। লেখন	
Wishing to hearten a timid lamp	৭২৬
ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা। গীতাজলি	২৬৩
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর। গীতালি	৩৬৯
ওগো আমার হৃদয়বাসী। গীতালি	৪০২
ওগো এমন সোনার মায়াখানি। খেয়া	১৮৩
ওগো তোরা বল্ তো, এরে ঘর বলি কোন্ মতে। খেয়া	১৪২
ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি। খেয়া	১৩২
ওগো পঞ্চিক দিনের শেষে। গীতিমালা	৩০৩
ওগো বর, ওগো ব'ধু। খেয়া	১৩৬
ওগো বসন্ত, হে ভুবনজরী। মহুয়া	৭৭০
ওগো বৈতরণী, তরল খেলের মতো ধারা ভব। পূর্ববী	৬৭১
ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর। খেয়া	১২৯
ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আঁড়ি মোর। খেয়া	১২৮
ওগো মোর না-পাওয়া গো। পূর্ববী	৬৮৬
ওগো মৌন, না যদি কও। গীতাজলি	২৩৬
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা। গীতিমালা	২১৬
ওগো হংসের পাঁতি। লেখন	৭৫১
ওদের কথার ধাঁধা লাগে। গীতিমালা	৩৪০
ওদের সাথে মেলাও, যারা চরার তোমার ঘেন্দু। গীতিমালা	৩৪৭
ওপার হতে এপার পানে খেয়া নৌকো বেয়ে। পলাতকা	৪৯৬
ওরা চলেছে দিঘির ধারে। খেয়া	১২৬
ওরে আমার কর্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া। উৎসর্গ	১৫
ওরে তোদের স্বর সহে না আর। বলাকা	৪৬৬
ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা। বলাকা	৪০৭
ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেমসী। পূর্ববী, সংযোজন	৭০০
ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি। গীতাজলি	২৭৭
ওরে মোর শিশু ভোলানাথ। শিশু ভোলানাথ	৫৪১
ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার। গীতালি	৩৯২
ওহে নবীন অর্তিধি। শিশু	৪১
কত অজানারে জানাইলে তুমি। গীতাজলি	১১৬
কত কী যে আসে কত কী যে যায়। উৎসর্গ	১০

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
কত দিবা কত বিভাবরী। উৎসর্গ, সংযোজন	১১৫
কত ধৈর্য ধরি। মহুয়া	৮৪০
কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে। বলাকা	৪৬০
কর্তাদিন যে তুমি আমায়। গীতিমালা	৩৩০
কথা কও, কথা কও। উৎসর্গ	৯০
কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি। গীতাঞ্জলি	২৪২
কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে। গীতাঞ্জলি	২৩২
কর্ম আপন দিনের মজুরি রাখিতে চাহে না বাকি। লেখন	
My work is rewarded...	৭৪১
কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী। পলাতকা	৫২৫
কলহুন্দে পূর্ণ তার প্রাণ। মহুয়া	৮১৪
কহিলাম, 'ওগো রানী। পূরবী	৬৯৭
কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে। পূরবী	৬৫৬
কাকা বলেন, সময় হলে। শিশু ভোলানাথ	৫৭১
কাঁচা ধানের খেতে যেমন। গীতালি	৩৮৬
কাছে-থাকার আড়ালখানা। লেখন	
Let your love see me	৭৪৯
কাছের থেকে দেয় না ধরা। পূরবী	৬৭৪
কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক। লেখন	৭৬৬
কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে। লেখন	৭৫১
কান্ডারী গো, যদি এবার। গীতালি	৩৯৯
কানন কুসুম-উপহার দেয় চাঁদে। লেখন	
The sea smites his own barren breast	৭৬১
কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯৫
কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে। গীতিমালা	৩৩৬
কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে। উৎসর্গ, সংযোজন	১১৭
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। মহুয়া	৮৩৮
কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে। খেয়া	১৪১
কাহারে পরাব রাখী ঘোবনের রাখীপূর্ণিমায়। মহুয়া	৮০৬
কী কথা বলিব বলে। উৎসর্গ, সংযোজন	১১৫
কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল। লেখন	
Flower, have pity for the worm	৭৩০
কুঁড়ির ভিতরে কাঁদছে গন্ধ অন্ধ হয়ে। উৎসর্গ	৬৭
কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দ্রুত, নাই তার লাজ। লেখন	
Beauty smiles in the confinement of the bud	৭৪৪
কুর্চি, তোমার লাগি পশ্মেরে ভুলেছে অনামনা। বনবাণী	৮৫৯
কুরাণা যদি বা ফেলে পরাজবে ঘিরি। লেখন	
The mountain remains unmoved	৭৩৫
কূল থেকে মোর গানের তরী। গীতালি	৪০৩
কুকপক্ষে আধখানা চাঁদ। খেয়া	১৭৬
কে গো অন্তরতর সে। গীতিমালা	৩১২
কে গো তুমি বিদেশী। গীতিমালা	৩০২
কে তোমারে দিল প্রাণ। বলাকা	৪৫০
কে নিবি গো কিনে আমায়। গীতিমালা	৩১৭
কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া। শিশু	৯
কে বলে সব ফেলে থাকি। গীতাঞ্জলি	২৬০
কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না। গীতিমালা	৩৪৯
কেন তোমরা আমায় ডাক। গীতিমালা	৩৫০
কেবল তব মূখের পানে চাহিয়া। উৎসর্গ	৬১
কেবল থাকিস স'রে স'রে। গীতিমালা	৩২৬
কোন করে এমন বাধা কর হবে। গীতাঞ্জলি গীতিমালা গীতালি, সংযোজন	৪২৭

ছবি। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

কেমন করে তিড়িং আলোয়। গীতালি	...	৪১৯
কোথা আছ? ডাকি আমি। শোনো শোনো, আছে প্রয়োজন। মহদুয়া	...	৮০৬
কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি। খেরা	...	১৮১
কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো। গীতাজলি	...	২০৪
কোথায় যেতে ইচ্ছে করে। শিশু ডোলানাথ	...	৫৫৮
কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ। গীতাজলি	...	২২৪
কোন ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমণ্ডনে। বলাকা	...	৪৬৮
কোন দূর শতাব্দের কোন এক অখ্যাত দিবসে। পূরবী, সংযোজন	...	৭০৮
কোন বারতা পাঠালে মোর পরানে। গীতালি	...	৩৮২
কোন সে দূরের মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে। পরিশেষ	...	৯৭৬
কোলাহল তো বরণ হল। গীতিমাল্য	...	৩০০
ক্রান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু। গীতালি	...	৩৯৫

ক্ষমা কোরো যদি গর্বভরে। পূরবী	...	৬৫৭
ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি। উৎসর্গ	...	৮৫
ক্ষম্ব চিহ্ন একে দিয়ে শান্ত সিদ্ধবৃকে। পূরবী	...	৬২৬

খুঁকি তোমার কিচ্ছ বোকে না মা। শিশু	...	২৯
খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায়। পূরবী	...	৬৪৮
খুঁশি হু তুই আপন মনে। গীতালি	...	৩৯১
খেলার খেরালবণে কাগজের তরী। লেখন	...	৭৪৯
খোকা থাকে জগৎ-মায়ের। শিশু	...	১৫
খোকা মাকে শূন্য ডেকে। শিশু	...	৫
খোকার চোখে যে ঘুম আসে। শিশু	...	৭
খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে। শিশু	...	১৪
খোলো খোলো হে আকাশ, স্তম্ভ তব নীল ষবনিকা। পূরবী	...	৬২৯

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি। লেখন	...	৭০৩
The same sun is newly born in newlands	...	৭০৩
গতি আমার এসে ঠেকে যেথায় শেষে। গীতালি	...	৪১৭
গর্ব করে নিই নে ও নাম, জ্ঞান অন্তর্ভামী। গীতাজলি	...	২৬০
গান গাওয়ারে আমার তুমি। গীতাজলি	...	২৮৫
গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা। গীতিমাল্য	...	৩৫৬
গান দিয়ে যে তোমার খুঁজি। গীতাজলি	...	২৭৩
গানগর্জল বেদনার খেলা যে আমার। পূরবী	...	৬৫৮
গানের কান্ডাল এ বীণার তার বেসুরে মরিছে কেঁদে। লেখন	...	৭০০
My untuned strings beg for music	...	৭০০
গানের সাজি এনেছি আজি। পূরবী	...	৬০৯
গাষ তোমার সুরে। গীতিমাল্য	...	৩২৮
গাধার মতো হয় নি কোনো গান। গীতাজলি	...	২৭১
গায়ে আমার পুঙ্ক লাগে। গীতাজলি	...	২১৮
গিরি যে তুষার নিজে রাখে, তার। লেখন	...	৭৪৮
Its store of snow is the hill's own burden	...	৭৪৮
গিরির দুয়াল্য উড়িয়ে। লেখন	...	৭৫২
গুপীর লাগিয়া বাঁশ চাহে পথপানে। লেখন	...	৭৩৭
The reed waits for his master's breath	...	৭৩৭
গোধূলি-অন্ধকারে পূরীর প্রান্তে। পরিশেষ	...	৯০০

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি। লেখন	
The clumsiness of power spoils the key	৭৩৮
গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার। পূরবী	৬৩৮
ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্ঘোণে। পূরবী	৬১৯
ঘরের থেকে এনেছিলাম। গীতালি	৪০৪
ঘুম কেন নেই তোরি চোখে। গীতালি	৩৭০
ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাখির বাসা। লেখন	
In the drowsy dark caves of the mind	৭২৩
চতুর্দশী এল নেমে। মহুয়া	৮২২
চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী। মহুয়া	৮২৮
চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি। পূরবী	৬৭২
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে। গীতিমাল্য	৩৫৬
চলিতে চলিতে খেলার পদতুল খেলার বেগের সাথে। লেখন	
Life's play runs fast	৭২৯
চলেছে উজান ঠেলি তরুণী তোমার। মহুয়া	৮৩০
চাই গো আমি তোমারে চাই। গীতাঞ্জলি	২৪৫
চাঁদ কহে, 'শোন' শূন্যতারা। লেখন	৭৫২
চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর। লেখন	
While God waits for his temple	৭২৭
চাহনি তাহার, সব কোলাহল হলে সারা। মহুয়া	৮১৫
চাহিয়া প্রভাত-রবির নয়নে। লেখন	
While the Rose said to the Sun	৭৩৪
চিস্ত আমার হারাল আজ। গীতাঞ্জলি	২৩৫
চিস্তকোণে ছন্দে তব। মহুয়া	৭৮১
চিরকাল এ কী লীলা গো। উৎসর্গ	৯৯
চিরকাল হবে মোর প্রেমের কাঙাল। মহুয়া	৭৯৫
চিরজনমের বেদনা। গীতাঞ্জলি	২৩৯
চেয়ে দেখি হোথা তব জানালার। লেখন	৭৫১
চোখে দেখিস, প্রাণে কানা। গীতালি	৩৯৩
ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে। পূরবী	৫৯৬
ছাড়িস নে, ধরে থাক এ'টে। গীতাঞ্জলি	২৫৯
ছিন্দ আমি বিবাদে মগনা। মহুয়া	৭৯৩
ছিন্ন করে লও হে মোরে। গীতাঞ্জলি	২৪৫
ছিল চিত্রকল্পনার, এতকাল ছিল গানে গানে। পরিশেষ	৯১৯
ছিলাম নিদ্রাগত, সহসা আতর্বিলাপে কাঁদিল। পরিশেষ	৯৪৯
ছিলাম যবে মায়ের কোলে। পরিশেষ	৮৯০
ছিলে-যে পথের সাথী। পরিশেষ	৯৩৫
ছোট্ট হলে রোজ ভাসাই জলে। শিশু	৫০
ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস। শিশু ভোলানাথ	৫৪১
ছোট্ট আমার মেয়ে। পলাতকা	৫৩৬
জগৎ জুড়ে উদার সুরে। গীতাঞ্জলি	২০৩
জগৎ-পারাবারের তীরে। শিশু, [প্রবেশক]	৩
জগতে আনন্দযন্ত্রে আমার নিমন্ত্রণ। গীতাঞ্জলি	২১৯

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

জড়ারে আছে বাধা, ছাড়ারে যেতে চাই। গীতাজলি	...	২৭৯
জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দূটো তারে। গীতাজলি	...	২৭০
জনতার মাঝে দেখিতে পাই নে তারে। মহদুয়া	...	৮১৫
জননী, তোমার করুণ চরণখানি। গীতাজলি	...	২০২
জন্ম মোদের রাতের আধার। লেখন
Birth is from the mystery of night	...	৭০৮
জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে। পূরবী	...	৬৫৫
জাগার থেকে ঘুমোই, আবার ঘুমের থেকে। শিশু ভোলানাথ	...	৫৬৯
জাগো নির্মল নেত্রে। গীতাজলি গীতিমালা গীতালি, সংযোজন	...	৪২৭
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী। পরিশেষ, সংযোজন	...	৯৮১
জানি আমার পায়ের শব্দ রাতে দিনে। বলাকা	...	৪৭৫
জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন। পূরবী	...	৬৮৭
জানি গো দিন যাবে এ দিন যাবে। গীতিমালা	...	৩২২
জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে। গীতাজলি	...	২০৬
জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে। গীতিমালা	...	৩৪০
জীবন আমার চলছে যেমন। গীতিমালা	...	৩৪১
জীবন আমার যে অমৃত আপন-মাঝে গোপন রাখে। গীতালি	...	৪১৫
জীবন-খাতার অনেক পাতাই এমনিরো শূন্য থাকে। লেখন	...	৭৫০
জীবনমরণের বাজারে খজনি। পরিশেষ, সংযোজন	...	৯১০
জীবন-মরণের স্রোতের ধারা। পূরবী	...	৬৯২
জীবন যখন ছিল ফুলের মতো। গীতিমালা	...	৩২১
জীবন যখন শূন্যে যায়। গীতাজলি	...	২২৮
জীবন-স্রোতে ঢেউয়ের পরে। গীতিমালা	...	৩৩০
জীবনে যত পূজা হল না সারা। গীতাজলি	...	২৮১
জীবনে যা চিরদিন রয়ে গেছে আভাসে। গীতাজলি	...	২৮২
জীর্ণ ভয়-তোরণ-ধূলি-পর। লেখন
By the ruins of terror's triumph	...	৭০২
জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুড়াল সব কাজ। খেরা	...	১৭০
জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা। লেখন
The glow worm while exploring the dust	...	৭০৩
জ্বলিল অরুণরশ্মি আজ এই তরুণ-প্রভাতে। মহদুয়া	...	৮২৯
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো। গীতিমালা	...	৩১১
ঝরনা, তোমার স্ফটিকজলের। মহদুয়া	...	৭৮২
ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে। লেখন	...	৭৫০
ঝুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে। শিশু ভোলানাথ	...	৫৭৫
ডাকো ডাকো ডাকো আমারে। গীতাজলি	...	২৪৯
ডাঙারে যা বলে বলুক নাকো। পলাতকা	...	৪৯৯
তখন আকাশতলে ঢেউ ডুলেছে। খেরা	...	১৪৭
তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা। খেরা	...	১৮৭
তখন তারা দস্ত-বেগের বিজয়-রথে। পূরবী	...	৫৮৭
তখন বরষ সাত। পরিশেষ	...	১৫৮
তখন বর্ষাহীন অপরাহ্নমেঘে। মহদুয়া	...	৭১০
তখন রাত্রি আধার হল। খেরা	...	১২৯
তপোমগ্ন হিমালয়ের স্তম্ভরশ্মি তেঁদে করি চুপে। বনবাণী	...	৮৫৪
তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ। খেরা	...	১৬২

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
তব অন্তর্ধানপটে হোঁরি ডব রূপ চিরন্তন। মহুয়া	৪৪১
তব গানের সুরে হৃদয় মম। গীতাঞ্জলি গীতিমালা গীতালি, সংযোজন	৪২৮
তব পথছায়া বাহি বাঁশিরিতে যে বাজালো আজি। বনবাণী	৪৫৫
তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া। গীতিমালা	৩১৬
তব সিংহাসনের আসন হতে। গীতাঞ্জলি	২২৭
তবে আমি যাই গো তবে যাই। শিশু	৪০
তরুণতা যে ভাবার কর কথা। মহুয়া	৪২১
তাই তোমার আনন্দ আমার পর। গীতাঞ্জলি	২৬৭
তাকিয়ে দেখি পিছে। পরিশেষ	৯৪২
তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া। গীতিমালা	৩৫৩
তারা তোমার নামে বাটের মাঝে। গীতাঞ্জলি	২৪১
তারা দিনের বেলা এসেছিল। গীতাঞ্জলি	২৪১
তারার দীপ জ্বালেন যিনি। লেখন	
God among stars waits for man to light	৭২৮
তালগাছ এক পারে দাঁড়িয়ে। শিশু ভোলানাথ	৫৪৫
তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে। পূরবী	৬৮৫
তুই কি ভাবিস, দিনরাত্তির খেলতে আমার মন। শিশু ভোলানাথ	৫৫৪
তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসংগত। উৎসর্গ	৮৬
তুমি আড়াল পেলে কেমনে। গীতালি	৩৬৫
তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল। গীতিমালা	৩৫৩
তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে। গীতাঞ্জলি	২২৫
তুমি এ পার ও পার কর কে গো। খেয়া	১৮৯
তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে। গীতিমালা	৩১১
তুমি এবার আমার লহো হে নাথ, লহো। গীতাঞ্জলি	২২৮
তুমি কি কেবল ছবি শব্দ পটে লিখা। বলাকা	৪৪৪
তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী। গীতাঞ্জলি	২০৭
তুমি জান ওগো অন্তর্যামী। গীতিমালা	৩৩৩
তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে। বলাকা	৪৫৮
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। গীতাঞ্জলি	১৯৮
তুমি বনের পূব পবনের সাথী। মহুয়া	৪৩৩
তুমি যখন গান গাহিতে বল। গীতাঞ্জলি	২৪০
তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার। খেয়া	১৬০
তুমি যে এসেছ মোর ভবনে। গীতিমালা	৩৪৫
তুমি যে কাজ করছ, আমার সেই কাজে। গীতাঞ্জলি	২৪৮
তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে। গীতিমালা	৩৪৪
তুমি যে তারে দেখ নি চেয়ে। পরিশেষ	৯৩৫
তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে। গীতিমালা	৩৪৮
তোমার আমার মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে। পরিশেষ	৯৭১
তোমার আমার মিলন হবে বলে। গীতিমালা	৩২৯
তোমার আমার প্রভু করে রাখি। গীতাঞ্জলি	২৭৬
তোমার আমি দেখি নাকো। পূরবী	৬৩৯
তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর। গীতাঞ্জলি	২৭৩
তোমার চিনি বলে আমি করেছি গরব। উৎসর্গ	৬৪
তোমার ছেড়ে দূরে চলার নানা ছলে। গীতালি	৪১৮
তোমার সৃষ্টি করব আমি। গীতালি	৪০৬
তোমার আনন্দ ওই এল ম্বারে। গীতিমালা	৩৫২
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ করবে। গীতালি	৩৮৮
তোমার কটি-তটের ধটি। শিশু	৬
তোমার কাছে এ বর মাগি। গীতালি	৪০১
তোমার কাছে আমিই দন্ডু। শিশু ভোলানাথ	৫৬২
তোমার কাছে চাই নি কিছু। খেয়া	১৫০

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

তোমার কাছে চাই নে আমি অবসর। গীতালি	...	৪১২
তোমার কাছে শান্তি চাব না। গীতিমালা	...	৩৩৮
তোমার কুটিরের সমুখবাটে। বনবাণী	...	৮৭১
তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে। গীতালি	...	৩৭৭
তোমার ছুটি নীল আকাশে। পলাতকা	...	৫৩৪
তোমার দয়া যদি চাহিতে নাও জানি। গীতাঞ্জলি	...	২৮০
তোমার দয়ার খোলায় ধনি। গীতালি	...	৩৯৪
তোমার পুজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি। গীতিমালা	...	৩৪৪
তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ। পরিশেষ	...	৯২৯
তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে। মহদয়া	...	৭৯৭
তোমার প্রেম যে বইতে পারি। গীতাঞ্জলি	...	২০৩
তোমার বনে ফুটেছে শ্বেতকরবী। লেখন	...	৭২৬
White and pink oleanders meet	...	৭৮
তোমার বীণায় কত তার আছে। উৎসর্গ	...	১৫৮
তোমার বীণার সাথে আমি। খেয়া	...	৪০০
তোমার ভুবন মর্মে আমার লাগে। গীতালি	...	৩৫২
তোমার মাঝে আমারে পথ। গীতিমালা	...	৯৯৪
তোমার মধুর দিন হে দিনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি। পরিশেষ, সংযোজন	...	৩৭২
তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে। গীতালি	...	৪৪১
তোমার শব্দ ধূল্যায় পড়ে। বলাকা	...	২৮৩
তোমার সাথে নিত্য বিরোধ আর সহ্য না। গীতাঞ্জলি	...	২০০
তোমার সোনার থালার সাজাব আজ। গীতাঞ্জলি	...	৯২৭
তোমার স্বপ্নের স্ফারে আমি আছি বসে। পরিশেষ	...	৩১৮
তোমারি নাম বলব নানা ছলে। গীতিমালা	...	৮০৪
তোমারে আপন কোণে স্তম্ভ করি যবে। মহদয়া	...	৪৮৬
তোমারে কি বার বার করেছি নু অপমান। বলাকা	...	৬৪
তোমারে চিনি বলে আমি করেছি গরব। উৎসর্গ	...	৮০৭
তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে। মহদয়া	...	৯১৫
তোমারে জননী ধরা। পরিশেষ	...	৮৪০
তোমারে দিই নি সূখ, মৃদুতির নৈবেদ্য গেন্দু রাখি। মহদয়া	...	৯৫৪
তোমারে দিব না দোষ। পরিশেষ	...	৬২
তোমারে পাছে সহজে বৃষ্টি। উৎসর্গ	...	৭৫০
তোমারে, প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে। লেখন	...	৮১০
তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি। মহদয়া	...	১৫৩
তোরা কেউ পারবি নে গো। খেয়া	...	২০১
তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পারের ধনি। গীতাঞ্জলি	...	৯৬৬
তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়। পরিশেষ	...	৯৭৪
ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে। পরিশেষ	...	

দখিন হতে আনিলে, বারু, কুলের জাগরণ। লেখন	...	৭৫১
দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোটো করে। গীতাঞ্জলি	...	২৬২
দয়া দিলে হবে গো মোর। গীতাঞ্জলি	...	২৩৮
দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন লুপাও একমনে। মহদয়া	...	৮২৭
দর্পণে বাহারে দেখি সেই আমি ছায়া। লেখন	...	৭৬৬
দাও হে আমার ডর ভেঙে দাও। গীতাঞ্জলি	...	২১৩
দাঁড়ারে গিরি, শির মেঘে ভুলে। লেখন	...	৭২৭
The lake lies low by the hill	...	১৩৮
দাঁড়ারে আছ আধেক-খোলা বাতাসনের ধারে। খেয়া	...	৩৩৯
দাঁড়ারে আছ তুমি আমার গানের ওপারে। গীতিমালা	...	

ছত্র। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
দিন দেয় তার সোনার বীণা। লেখন Day offers to the silence of stars	৭৪৬
দিন হয়ে গেল গভ। লেখন Through the silent night	৭৩১
দিনান্তের জলাট লেপি। লেখন	৭৫১
দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পায়। লেখন My work is rewarded in daily wages	৭৪১
দিনের আলোক যবে রাত্রির অভলে। লেখন	৭৪৯
দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন। লেখন Let my love feel its strength	৭৪৭
দিনের রোদ্রে আবৃত বেদনা বচনহারা। লেখন Day's pain muffled by its own glare	৭৩০
দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া। খেরা	১২৫
দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি। গীতাঞ্জলি	২৮৭
দিবসে বাহারে করিয়াছিলাম হেলা। লেখন	৭৫০
দিবসের অপরাধ সম্বা যদি ক্ষমা করে তবে। লেখন Let the evening forgive the mistakes of the day	৭৪৪
দিবসের দীপে শব্দ থাকে তেল। লেখন The judge thinks that he is just	৭৪৮
দিয়েছ প্রণয় মোরে করুণানিলয়। পূরবী, সংযোজন	৭০৬
দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়। লেখন The two separated shores mingle their voices	৭২৮
দুখের বেশে এসেছ বলে। খেরা	১০১
দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে। পূরবী	৬১০
দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে। উৎসর্গ	৭৯
দুর্গম দূর শৈলশিখরের। পূরবী	৬৭৮
দুর্ভোগ আসি টানে যবে ফাঁসি। পরিণেয়	৯১২
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো। গীতাঞ্জলি	৩৯৭
দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি। পূরবী	৬৫৫
দুঃখ যদি না পাবে তো। গীতাঞ্জলি	৩৮৭
দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন। গীতাঞ্জলি গীতিমালা গীতাঞ্জলি, সংযোজন	৪৩০
দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে। লেখন The fire of pain traces for my soul	৭৪০
দুঃখের বরষায় চক্কর জল যেই নামল। গীতাঞ্জলি	৩৬৫
দুঃখেরে যখন প্রেম করে নিরোমি। লেখন	৭৬৬
দুঃস্বপন কোথা হতে এসে। গীতাঞ্জলি	২৭২
দূর এসেছিল কাছে। লেখন One who was distant came near to me	৭২৬
দূর প্রবাসে সম্মানবল্লভ বাসায় ফিরে এন। পূরবী	৬৮২
দূর মন্দিরে সিদ্ধিকিনারে। মহুয়া	৮০৩
দূর হতে কী শব্দনিস মৃত্যুর গর্জন। বলাকা	৪৭৯
দূর হতে ভেবেছিল মনে। পরিণেয়	৯৫১
দূর হতে যারে পেরেছি পাশে। লেখন	৭৫২
দূরে অলখতলার পুড়িত কণ্ঠখানি গলায়। শিশু ভোলানাথ	৫৬০
দূরে গিরেছিলে চলি; বসন্তের আনন্দভাণ্ডার। মহুয়া	৮০৪
দেখি না কি, নীল মেঘে আজ। শিশু ভোলানাথ	৫৫২
দেখো চেয়ে গিরির গিরে। উৎসর্গ	৯১
দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়। গীতাঞ্জলি	২৪৭
দেবতা যে চার পরিতে গলায়। লেখন	৭৫০
দেবতার সৃষ্টি বিশ্বময়নে নতুন হয়ে উঠে। লেখন God's world is ever renewed by death	৭৩৯

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

দেবমন্দির-আঁটনাতলে শিশুরা করেছে মেলা। লেখন

From the solemn gloom of the temple ...

৭২৫

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে। পূর্ববী

...

৬৫০

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু। লেখন

...

৭৫২

ধনে জনে আছি জড়িয়ে হার। গীতাজলি

...

২১৯

ধরণীর বজ্র অগ্নি বৃক্ষরূপে লিখা তার তুলে। লেখন

The earth's sacrificial fire flames up in her trees ...

৭৪১

ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল। লেখন

The first flower that blossomed on this earth ...

৭০৭

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে। লেখন

...

৭৪৯

ধর্মের বেশে মোহ ধারে এসে ধরে। পরিশেষ

...

৯৭৮

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা। গীতাজলি

...

২৪০

ধূলার মারিলে লাখি ঢোকে চোখে মূখে। লেখন

If you kick the dust it troubles the air ...

৭৬৫

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে। উৎসর্গ

...

৭৮

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সৃষ্টির নাটে। লেখন

The Eternal Dancer dances ...

৭৪৬

নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি। গীতাজলি

...

২৬১

নন্দগোপাল বৃক ফুলিয়ে এসে। পরিশেষ, সংযোজন

...

৯৮৯

নবজাগরণ-লগনে গগনে বাজে কল্যাণগন্ধ। পরিশেষ, সংযোজন

...

৯৯১

নব বৎসরে করিলাম পণ। উৎসর্গ, সংযোজন

...

১১৯

নয় এ মধুর খেলা। গীতিমালা

...

৩২০

নর-জনমের পূরা দায় দিব যেই। লেখন

We gain freedom when we have paid ...

৭০৮

না গো এই যে ধূলা, আমার না এ। গীতালি

...

৩৮৮

না জানি করে দেখিয়াছি। উৎসর্গ

...

৬৯

না বাঁচাবে আমার যদি। গীতালি

...

৩৮১

না রে তোদের ফিরতে দেব না রে। গীতালি

...

৩৮৪

না রে না রে হবে না তোমার স্বর্গসাধন। গীতালি

...

৩৮৭

নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোমার তরী। গীতালি

...

৩৮০

নাই বা ডাক, রইব তোমার স্মারে। গীতালি

...

৩৮০

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়। উৎসর্গ, সংযোজন

...

১১৭

নানা রঙের ফুলের মতো উষা মিলায় হবে। লেখন

Dawn—the many-coloured flower—fades ...

৭২৮

নামটা যেদিন শুঁচাবে নাথ। গীতাজলি

...

২৭৯

নামহারা এই নদীর পারে। গীতিমালা

...

৩০১

নামাও নামাও আমার তোমার চরণতলে। গীতাজলি

...

২২৫

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার। মহুয়া

...

৭৯৬

নিত্য তোমার পারের কাছে। কলাক্য

...

৪৭৪

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে। গীতিমালা

...

৩২৪

নিন্দা মূখে অপমানে বড় আঘাত খাই। গীতাজলি

...

২৬৯

নিভৃত প্রাণের দেবতা। গীতাজলি

...

২২৪

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ার নীরব নীড়ের 'পরে। লেখন

In the shady depth of life are the lonely nests ...

৭০১

নিমেষকালের অতিথি বাহারা পুথি আনাগোনা করে। লেখন

The shade of my tree is for passers by ...

৭৬০

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
নিমেষকালের খেয়ালের জীলাভরে। লেখন	
Your moments' careless gifts	৭৩৯
নিম্নে সরোবর স্তম্ভ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে। পরিশেষ	৯১০
নিশার স্বপন ছুটল রে এই। গীতাজলি	২১৫
নিশীথে লক্ষ্মী দিল অন্ধকারে রবির বন্দন। পরিশেষ	৯১১
নিম্বাস রুদ্ধে দ্দ চক্কু মৃদে। খেয়া	১৭৯
নীড়ে বসে গেরেছিলেম। খেয়া	১৬৫
নীরব যিনি তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে। লেখন	৭৫১
নতন প্রেম সে ঘরে ঘরে মরে শূন্য আকাশ-মাঝে। লেখন	
My love of today finds herself homeless	৭৪০
নেই বা হলেম যেমন তোমার অম্বিকে গোসাই। শিশু ভোলানাথ	৫৫০
পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে। বলাকা	৪৫৯
পথ চেয়ে তো কাটল নিশি। খেয়া	১৫১
পথ চেয়ে যে কেটে গেল। গীতাজলি	৩৭০
পথ দিয়ে কে যায় গো চলে। গীতাজলি	৩৭৫
পথ বাকি আর নাই তো আমার। পূরবী	৬৩২
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি। মহদুয়া	৭৯২
পথিক ওগো পথিক, যাবে তুমি। খেয়া	১৫৫
পথে পথেই বাসা বাঁধি। গীতাজলি	৪১৪
পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরী। লেখন	
I lingered on my way	৭৩২
পথের নেশা আমায় লেগেছিল। খেয়া	১৬৪
পথের পথিক করেছ আমায়। উৎসর্গ	১০৪
পথের প্রান্তে আমার ভীর্ণ নয়। লেখন	
My offerings are not for the temple	৭৪৫
পথের সাথী, নমি বারংবার। গীতাজলি	৪১৬
পবন দিগন্তের দুরার নাড়ে। মহদুয়া	৭৭৪
পরবাসী চলে এসো ঘরে। পরিশেষ, সংযোজন	৯৮০
পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা। লেখন	
Hills are the silent cry of the earth	৭৩৫
পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে। পূরবী	৬৮১
পাথিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান। বলাকা	৪৭১
পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি। উৎসর্গ	৬৫
পাছে দেখি তুমি আস নি। খেয়া	১৮২
পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে। গীতাজলি	৪১৪
পারিবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে। গীতাজলি	২১৫
পারের ঘাটা পাঠাল তরী ছায়ার পাল তুলে। পূরবী	৬৫১
পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে। লেখন	
The sigh of the shore follows in vain	৭৪৫
পূজোর ছুটি আসে যখন। শিশু ভোলানাথ	৫৫৯
পূজালোভীর নাই হল ভিড়। পূরবী	৬০৪
পূঁথি-কাটা ওই পোকা। লেখন	
The worm thinks it strange and foolish	৭৪২
পূরানে বলেছে একদিন নিরেছিল। মহদুয়া	৮০২
পূরাতন বংশরের জীর্ণক্লান্ত রাহি। বলাকা	৪১০
পূরানো মাঝে বা-কিছু ছিল। লেখন	
My new love comes bringing to me	৭৪৮
পূর্ণ দিলে মার যারে। গীতাজলি	৪০২
পূর্ণতার সাধনার বনস্পতি চাহে উষ্মপানে। পূরবী	৬৮১

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই। গীতিমালা	...	৩১৪
পৌরপথের বিরহী তরুর কানে। লেখন	...	৭৫২
প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভরে চিস্ত তার নত। মহদুরা	...	৮১২
প্রজাপতি পায় অবকাশ। লেখন	...	৭৪৩
The butterfly has the leisure	...	৭২৩
প্রজাপতি সে তো বরষ না গণে। লেখন	...	৯০৬
The butterfly does not count years	...	৬৯৫
প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়। পরিণেশ	...	৮৬০
প্রতিদিন নদীস্রোতে পল্লপত্র করি অর্ঘ্য দান। পূর্ববী	...	৯৯৪
প্রত্যাশী হয়ে ছিন্দ্র এতকাল ধরি। বনবাণী	...	৮২২
প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান। পরিণেশ, সংযোজন	...	৬৬৪
প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নির্বিড় আবাড়ে। মহদুরা	...	৬৬৩
প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি। মহদুরা	...	৭৬২
প্রদীপ যখন নিবেছিল আধার যখন রাত। পূর্ববী	...	২১৯
প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী। পূর্ববী	...	৪২৮
প্রভাত আলোরে বিদ্রুপ করে ও কি। লেখন	...	৯৬৩
The razor blade is proud of its keenness	...	৯৬২
প্রভু আজ তোমার দক্ষিণ হাত। গীতাঞ্জলি	...	২১৯
প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে। গীতাঞ্জলি গীতিমালা গীতালি, সংযোজন	...	৪২৮
প্রভু তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত। পরিণেশ	...	৯৬৩
প্রভু তোমা লাগি অধি জাগে। গীতাঞ্জলি	...	২১৯
প্রভু তোমার বীণা যেমন বাজে। গীতিমালা	...	৩২৯
প্রভুগৃহ হতে আসিলে বেদিন। গীতাঞ্জলি	...	২৬৮
প্রভেদেই মানো যদি ঐক্য পাবে তবে। লেখন	...	৭৬৫
Try to break the difference and it is	...	৭৭৬
প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ-শাখার ফাগুন মাসে। মহদুরা	...	৩১৫
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিরে। গীতিমালা	...	৩২০
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে। গীতিমালা	...	৩৫০
প্রাণে গান নাই, মিছে ভাই ফিরিন্দু যে। গীতিমালা	...	৮৭৭
প্রাণের পাথের ভব পূর্ণ হোক হে শিশু চিরায়দু। বনবাণী	...	৭৬৬
প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান। লেখন	...	১৯৮
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পূলকে। গীতাঞ্জলি	...	২৮৫
প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে। গীতাঞ্জলি	...	৩৯৫
প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে। গীতালি	...	২৮৪
প্রেমের হাতে ধরা দেব। গীতাঞ্জলি	...	৭৬৬
প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ। লেখন	...	৭২৫
ফাগুন, শিশুর মতো, ধূলিতে রঙিন ছবি আঁকে। লেখন	...	৮৫৭
April, like a child, writes hieroglyphics	...	৭৯০
ফাগুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে। বনবাণী	...	৭৪১
ফিরাবে তুমি মদুখ। মহদুরা	...	৩৯৯
ফুরাইলে দিবসের পালা। লেখন	...	৭৬৫
The sky tells its beads all night	...	৭৪৪
ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে। গীতালি	...	৭৩১
ফুল দেখিবার যোগ্য চকু বার রছে। লেখন	...	৭৪৪
Let him take note of the thorn	...	৭৩১
ফুলগর্দলি যেন কথা। লেখন	...	৭৪৪
Leaves are masses of silence	...	৭৩১
ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আশ্বহারা। লেখন	...	৭৩১
In the bounteous time of roses	...	৭৩১

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
ফুলের মতন আপনি ফুটোও গান। গীতাঞ্জলি	২৫০
ফুলের লাগি তাকারে ছিল শীতে। লেখন	৭৫৩
ফেলে যবে যাও একা ধূরে। লেখন	
Since thou hast vanished from my reach	৭৪০
বন্ধের ধন হে ধরণী, ধরো। বনবাণী	৮৭৬
বলোর দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল। পরিণেশ, [প্রবেশক]	৮৮৭
বন্ধে তোমার বাজে বাঁশ। গীতাঞ্জলি	২৩৮
বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে। পরিণেশ	৯৬৪
বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে। খেরা	১৫৫
বন্ধ হরে এল স্রোতের ধারা। খেরা	১৬৮
বন্ধ, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা। খেরা, 'উৎসর্গ'	১২০
বন্ধ, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে। পরিণেশ, সংযোজন	৯৯৫
বন্ধ, যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু। বনবাণী	৮৫২
বয়স আমার হবে তিরিশ। শিশু ভোলানাথ	৫৬৮
বয়স ছিল আট, পড়ার ঘরে বসে বসে। পলাতকা	৫৩১
বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বস্বারে। পূরবা	৫৯৩
কল তো এই বারের মতো। গীতিমালা	৩৪৬
বলোছিন্দু, 'ভুলিব না', যবে তব ছলছল আঁখি। পূরবা	৬৫৩
বলো, আমার সনে তোমার কী শত্রুতা। গীতাঞ্জলি গীতিমালা গীতালি, সংযোজন	৪৩০
বসন্ত, তুমি এসেছ হেথায়। লেখন	
Spring in pity for the desolate branch	৭৩৪
বসন্ত বালক মৃদু-ভরা হাসিটি। শিশু	৫২
বসন্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল। লেখন	
Spring scatters the petals of flowers	৭২৪
বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল। শিশু	৫৩
বসন্তবার সন্ধ্যাসী হার। মহুয়া	৮৪৪
বসন্তবার, কুসুমকেশর গেছ কি ভুলি। লেখন	৭৫০
বসন্তে আজ ধরার চিত্র হল উতলা। গীতিমালা	৩৩১
বসন্তের জয়রবে। মহুয়া	৭৭৫
বহুদিন মনে ছিল আশা। পূরবা	৬৩৭
বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা। পরিণেশ	৯৫৭
বহি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাকথানে। লেখন	
The fire restrained in the tree fashions flowers	৭৬০-৬১
বাগানে এই দড়ো গাছে। শিশু	৪৫
বাঁচান বাঁচি যারেন মরি। গীতাঞ্জলি, সংযোজন	২৯১
বাছা রে, তোরে চক্ষে কেন জল। শিশু	১০
বাছা রে মোর বাছা। শিশু	১৩
বাজাও আমারে বাজাও। গীতিমালা	৩২২
বাজিয়েছিলে বীণা তোমার। গীতালি	৪০৯
বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে। গীতালি	৩৬৬
বাবা নাকি যই লেখে সব নিজ। শিশু	২৫
বাবা যদি স্নায়ের মতো। শিশু	৩৩
বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে। পরিণেশ	৯০১
বাঁশ যখন ধানবে ঘরে। পরিণেশ	৯৩৩
বাহির পথে বিবালী হিরা। মহুয়া	৮৪৩
বাহির হইতে দেখো না এমন করে। উৎসর্গ	৮০
বাহিরে তুমি নিলে না মোরে। মহুয়া	৮৪৩
বাহিরে তোমার বা পেরেছি সেবা। পরিণেশ	৯৩৫
বাহিরে যখন কদম্ব দাঁড়িপের মদির পবন। বনবাণী	৮৬১

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

বাহিরে সে দূরন্ত আবেগে। মহদুয়া	...	৮১৭
বিচার করিলো না। পরিশেষ	...	৯৪০
বিদায় দেহো, ক্ষমো আমার ভাই। খেয়া	...	১৬৩
বিদেশে অচেনা ফুল পথিক করিবে ডেকে কহে। লেখন	...	৭৪২
An unknown flower in a strange land	...	৮২৫
বিদেশে ওই সৌধ শিখর-পরে। মহদুয়া	...	৯৬২
বিদ্যুৎপাণ উদ্যত করি। পরিশেষ	...	৬৭০
বিধাতা যেদিন মোর মন। পূরবী	...	১৭৮
বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন। খেয়া	...	৫০১
বিন্দুর বয়স ভেইশ তখন, রোগে ধরল তারে। পলাতকা	...	১৯৬
বিপদে মোরে রক্ষা করো। গীতাজলি	...	৭৭৫
বিবশ দিন, বিরস কাজ। মহদুয়া	...	৮০৮
বিরক্ত আমার মন কিংলুকের এত গর্ব দেখি'। মহদুয়া	...	৭৩৬
বিরহ প্রদীপে জ্বলন্ত দিবসরাতি। লেখন	...	৭০৩
Thou hast left thy memory as a flame	...	৭২৯
বিরহ-বৎসর পরে, মিলনের বীণা। পূরবী, সংযোজন	...	২৩০
বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ গঙ্গী। লেখন	...	৮০৫
Thou hast risen late, my crescent moon	...	৯৮২
বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার। গীতাজলি	...	২৪২
বিশ্বজোড়া ফাদ পেতেছ। গীতালি	...	২৪৯
বিশ্ব-পানে বাহির হবে। পরিশেষ, সংযোজন	...	৮৬১
বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'। গীতাজলি	...	৭৩৬
বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি উঠে অটুহাসি'। বলাকা	...	৭৪০
বদ্বন্দ সে তো বন্ধ আপন ঘেরে। লেখন	...	৮০৮
In the swelling pride of itself	...	৫৭১
বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন। লেখন	...	৬১৩
The tree is of today, the flower is old	...	৩৩৩
বৃত্ত হতে ছিন্ন করি শূন্য কমলগর্দল। গীতালি	...	৯৮৮
বৃষ্টি কোথায় নরকিয়ে বেড়ায়। শিশু ভোলানাথ	...	৯০০
বৌঠক পথের পথিক আমার। পূরবী	...	৭৮৭
বেসুর বাজে রে। গীতিমালা	...	৮১৬
বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে। পরিশেষ, সংযোজন	...	৮০৭
বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে। পরিশেষ	...	৮২৭
বোলো তারে, বোলো। মহদুয়া	...	৮৭
ব্যঙ্গসূনিপুণা শ্লেষবাণসম্মানদারুণা। মহদুয়া	...	৮৭
ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে। গীতালি	...	৭২৪
ভক্তি ভোয়ের পাখি। লেখন	...	৭৪৬
Faith is the bird that feels the light	...	১১৩
ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে। পরিশেষ	...	২৬৫
ভজন পূজন সাধন আরাধনা। গীতাজলি	...	৬০৭
ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে। পূরবী	...	৭৭০
ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু। মহদুয়া	...	২৯৮
ভাগ্যে আমি পথ হারালেম। গীতিমালা	...	১৬৭
ভাঙা অতিথিমালা। খেয়া	...	৪৮৭
ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে। বলাকা	...	৮২৭
ভাবিছ যে ভাবনা একা একা। মহদুয়া	...	৮৭
ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিঃসরে গগনে। উৎসর্গ	...	৮৭
ভারতের কোন বৃক্ষ ধ্বংস করল মর্তি' তুমি। উৎসর্গ	...	৭২৪
ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে। লেখন	...	
My words that are slight	...	

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা। লেখন	৭৬৬
ভালো যে করিতে পারে ফেরে স্মারে এসে। লেখন	৭৬৬
ভালোবাসার মূল্য আমার দূর হাত ভরে। পূরবী	৬৬৬
ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা। লেখন	
There smiles the Divine Child	৭২৭
ভিক্ষুবশে স্মারে তার “দাও” বলি দাঁড়ালে দেবতা। লেখন	
Man discovers his own wealth	৭৩৭
ভিড় করেছে রঙমণালীর দলে। পরিশেষ, সংযোজন	৯৯১
ভীরু মোর দান ভরসা না পায়। লেখন	
My offerings are too timid	৭২৫
ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়। গীতালি	৪১৭
ভেবেছিঁদু গণি গণি লব সব তারা। লেখন	৭৫৩
ভেবেছিঁদু মনে যা হবার তারি শেষে। গীতাঞ্জলি	২৬৮
ভেবেছিলাম চেয়ে নেব, চাই নি সাহস করে। থেয়া	১৩৪
ভেলার মতো বৃকে টানি কলমখানি। গীতিমালা	৩২১
ভোরের আগের যে প্রহরে। মহদুয়া	৮২৩
ভোরের পাখি ডাকে কোথায়। উৎসর্গ	৫৯
ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি। মহদুয়া	৭৮৫
ভোরের ফুল গিয়েছে যারা। লেখন	
Stars of night are the memorials for me	৭৪৭
ভোরের বেলায় কখন এসে। গীতিমালা	৩২০
মণিমালা হাতে নিয়ে। মহদুয়া	৭৭৯
মস্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে। বলকা	৪৪২
মধু মাঝির ওই যে নোকোথানা। শিশু	৩০
মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে। মহদুয়া	৮১৩
মনকে, আমার কাষকে। গীতাঞ্জলি	২৭৭
মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস নে। গীতালি	৩৮৫
মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল। পূরবী	৬৩৫
মনে করি এইখানে শেষ। গীতাঞ্জলি	২৮৬
মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে। শিশু	৩৯
মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে। শিশু	২৬
মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু। পরিশেষ	৯২৮
মন্তে সে যে পুত। উৎসর্গ	১০২
মন্দ যাহা নিন্দা তার রাখ না বটে বাকি। লেখন	
Too ready to blame the bad	৭৬১
মরুর, কর নি মোরে ভয়। বনবাণী	৮৬৭
মরুচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি। পলাতকা	৫২৯
মরুণ বৈদ্য দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে। গীতাঞ্জলি	২৬২
মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে। বনবাণী	৮৭৫
মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শস্ত তেমন নয়। পূরবী	৬৩৬
মহাতরু যহে বহুবরষের ভার। লেখন	
The tree bears its thousand years	৭৪৪
মা কেঁদে কর, “মঞ্জুলী মোর ওই তো কাঁচ মেয়ে। পলাতকা	৫১০
মা গো, আমার ছুটি দিতে বল। শিশু	১৭
মা, যদি তুই আকাশ হতিস। শিশু ভোলানাথ	৫৭৪
মাঝে আমার পড়ে না মনে। শিশু ভোলানাথ	৫৪৮
মাঝের বৃকে সকৌতুকে কে আজি এল। পূরবী	৬০৫
মাঝের সুখ উল্লসায়নে। মহদুয়া	৭৭১

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

মাটির প্রদীপ সারাদিবসের অবহেলা লয় মেনে। লেখন	...	৭৩০
The lamp waits through the long day	...	৭৩০
মাটির সূপ্তিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া। লেখন	...	৭২৫
Joy freed from the bound of earth's slumber	...	৭২৫
মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্যম। পরিশেষ	...	২০৮
মানের আসন, আরাম-শয়ন। গীতাজলি	...	২৬৭
মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়। লেখন	...	৭৪০
The mist weaves her net round the morning	...	৭৪০
মায়ামগী, নাই বা ভূমি। পূর্ববী	...	৬৬৮
মালা-হতে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল। গীতালি	...	৩৮২
মিথ্যা আমি কী সম্বন্ধে। গীতিমালা	...	৩০৫
মিলন নিশীথে ধরণী ভাবিছে। লেখন	...	৭৪৮
The earth gazes at the moon and wonders	...	৭৪৮
মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে। পূর্ববী	...	৬৪১
মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে। গীতাজলি	...	২৫০
মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে। গীতালি	...	৪২১
মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য। লেখন	...	৭৪৫
Death laughs when we exaggerate	...	৭৪৫
মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা। লেখন	...	৭৬৫
The spirit of death is one	...	৭৬৫
মেঘ বলেছে যাব যাব। গীতালি	...	৩৯৮
মেঘ সে বাষ্পগিরি। লেখন	...	৭২৭
Clouds are hills in vapour	...	৭২৭
মেঘের দল বিলাপ করে। লেখন	...	৭৩৭
My clouds sorrowing in the dark	...	৭৩৭
মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে। গীতাজলি	...	২০০
মেঘের মধ্যে মা গো, ধারা থাকে। শিশু	...	৩৭
মেনেছি, হার মেনেছি। গীতাজলি	...	২০১
মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে। খেরা	...	১৫৪
মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা। লেখন	...	৭৩৯
My paper boats sail away in play	...	৭৩৯
মোর কিছু ধন আছে সংসারে। উৎসর্গ	...	৬১
মোর গান এরা সব শৈবালের দল। বলাকা	...	৪৬১
মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার। লেখন	...	৭২৮
I touch God in my song	...	৭২৮
মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের। গীতিমালা	...	৩৫১
মোর মরণে তোমার হবে জয়। গীতালি	...	৩৭৯
মোর সম্ভার ভূমি সুন্দরবেশে এসেছে। গীতিমালা	...	৩৬০
মোর হৃদয়ের গোপন বিজ্ঞান ঘরে। গীতালি	...	৩১০
মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাঙার ভরিবারে। পূর্ববী	...	৬৭০
যখন আমার বাঁধ আগে পিছে। গীতাজলি	...	২৭৪
যখন আমার হাতে ধরে আদর করে। বলাকা	...	৪৬৭
যখন ভূমি বাঁধিছিলে তার। গীতালি	...	৩৭০
যখন তোমার আঘাত করি। গীতালি	...	৪১৯
যখন পঞ্চিক এলেম কুসুমবনে। লেখন	...	৭৩৩
The shy little pomegranate bud	...	৭৩৩
যখন যেমন মনে করি। শিশু জোয়াননাথ	...	৫৬০
যতকাল ভূই শিশুর মতো রইবি বলহীন। গীতাজলি	...	২৭৫

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি। বলাকা ...	৪৬৩
যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত। শিশু ভোলানাথ, সংযোজন ...	৫৮২
যতবার আলো জ্বালাতে চাই। গীতাঞ্জলি ...	২৩৭
যদি আমার তুমি বাঁচাও তবে। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি, সংযোজন ...	৪৩০
যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী। উৎসর্গ ...	৮৯
যদি খোকা না হয়ে। শিশু ...	১৮
যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা। গীতিমাল্য ...	৩৩২
যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু। গীতাঞ্জলি ...	২০৮
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে। গীতিমাল্য ...	৩২৪
যবনিকা-অন্তরালে মর্ত্য পৃথিবীতে। পরিশেষ ...	৯৫০
যবে এসে নাড়া দিলে ম্বার। পূরবী ...	৬৮৭
যবে কাজ করি প্রভু দেয় মোরে মান। লেখন	
God honours me when I work ...	৭৩৩
যা দিচ্ছে আমার এ প্রশ ভরি। গীতাঞ্জলি ...	২৭৬
যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে। গীতালি ...	৪১৩
যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে। গীতাঞ্জলি ...	২১৭
যাত্রা হয়ে আসে সারা—আমর পশ্চিমপথশেষে। পরিশেষ ...	৯০২
যাত্রী আমি ওরে। গীতাঞ্জলি ...	২৬৩
যাবার দিকের পথিকের 'পরে। মহুয়া ...	৮৪২
যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই। গীতাঞ্জলি ...	২৭৮
যাবার যা সে যাবেই, তারে। লেখন	
Open thy door to that which must go ...	৭৪৭
যারা আমার সাঁঝ সকালের গানের দীপে। পলাতকা ...	৫৩৬
যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে। পূরবী ...	৫৮৭
যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়। মহুয়া ...	৮১৩
যাস নে কোথাও ধৈর্যে। গীতালি ...	৪২২
যে কথা বলিতে চাই, বলা হয় নাই। বলাকা ...	৪৮৫
যে কাল হরিয়া লয় ধন। পরিশেষ ...	৯৫৩
যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে। পরিশেষ ...	৮৯৪
যে গান গাহিয়াছিল কবেকার দক্ষিণ বাতাসে। মহুয়া ...	৮৩৫
যে ডারা মহেন্দ্রক্ষেণে প্রভুষবেলায়। পূরবী ...	৬১২
যে থাকে থাক-না ম্বারে। গীতালি ...	৩৭৬
যে দিল কাঁপ ভবসাগর-মাকথানে। গীতালি ...	৪১০
যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল। বলাকা ...	৪৭০
যে বোবা দুঃখের ভার। পরিশেষ ...	৯৪৮
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ডাঙল ঝড়ে। গীতিমাল্য ...	৩৩৭
যে শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা। মহুয়া ...	৮১৯
যে সন্ধ্যার প্রসন্ন লগনে। মহুয়া ...	৭৮০
যেতে যেতে একলা পথে। গীতালি ...	৩৮২
যেতে যেতে চায় না যেতে। গীতালি ...	৩৮৩
যেখান তুমি গুলী জ্ঞানী, যেখান তুমি মানী। মহুয়া ...	৮২৪
যেখান তোমার লুট হতেছে ছুঁনে। গীতাঞ্জলি ...	২৫০
যেখান থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন। গীতাঞ্জলি ...	২৫৭
যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিদ্ধপারে। বলাকা ...	৪৮৩
যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা। বলাকা ...	৪৭২
যেদিন প্রথম কবিসান। পূরবী ...	৬৭৯
যেদিন ফুটল কমল কিছাই জানি নাই। গীতিমাল্য ...	৩০৯
যেন তার চক্ষু মাঝে। মহুয়া ...	৮১৭
যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে। গীতাঞ্জলি ...	২৭৪
জন্মনি যা গো গুরু গুরু। শিশু ...	৩৬
জন্মো না, মেরো যা বলি করে ডাকে ব্যর্থ এ জন্মন। পরিশেষ ...	৯৪১

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

যৌবন রে, তুই কি রবি সূতের খাঁচাতে। বলাকা	...	৪৮৯
যৌবনবেদনারসে উজ্জল আমার দিনগর্দলি। পূরবী	...	৬০০
স্নিগ্ধ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে। শিশু	...	১০
রঙের খেলালে আপনা খোয়ালে। লেখন	...	৭০২
The cloud gives all its gold	...	৪২
রজনী একাদশী পোহার ধীরে ধীরে। শিশু	...	৪২
রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠার উদ্বাস্বরে ডাকি।	...	১৮০
পরিশেষ, সংযোজন	...	৮২২
রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন। পরিশেষ	...	৭৬৬
রস যেথা নাই সেথা যত-কিছু খোঁচা। লেখন	...	০০৪
রাজপদরীতে রাজার বাঁশি। গীতিমাল্য	...	২৭০
রাজার মতো বেলে তুমি সাজাও যে শিশুরে। গীতাজলি	...	২৯৫
রাতি এসে যেথায় মেলে দিনের পারাবারে। গীতিমাল্য	...	৮০৭
রাতি হবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে। মহুয়া	...	৫২১
রাতি হল ভোর। পূরবী	...	৭১৫
রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি। পূরবী, সংযোজন	...	২২৫
রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী। পরিশেষ	...	২২১
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি। গীতাজলি	...	৭৮৯
রে অচেনা, মোর মৃষ্টি ছাড়াবি কী করে। মহুয়া	...	১১৬
রোগীর শিয়রে রাতে একা ছিন্দু জাগি। উৎসর্গ, সংযোজন	...	০৮৯
লক্ষ্মী যখন আসবে তখন। গীতালি	...	৭০৫
লাজুক ছায়া বনের তলে। লেখন	...	২৮৬
The shy shadow in the garden	...	৭৫০
লিখতে যখন বল আমার। পরিশেষ, সংযোজন	...	০২৬
লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি। লেখন	...	৭৬১
লুকিয়ে আস আঁধার রাতে। গীতিমাল্য	...	২০১
লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে। লেখন	...	১৪০
To the blind pen the hand that writes	...	৮৪১
লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া। গীতাজলি	...	০৭৮
শব্দ হল রোগ। পরিশেষ	...	২১৬
শঙ্কিত আলোক নিরে দিগন্তে উদ্ভল শীর্ণ শলী। মহুয়া	...	৫৮৮
শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি। গীতালি	...	৭২৮
শরতে আজ কোন্ অতিথি। গীতাজলি	...	৯২০
শালবনের ওই আঁচল বেয়ে। পূরবী	...	৭৪১
লিখারে কহিল হাওয়া। লেখন	...	৭৫১
Wind tries to take flame by storm	...	৭৫০
শিল্পে এক গিরির খোপে পাথর আছে খসে। পরিশেষ	...	৬৫৯
শিল্পির রবিরে শব্দ জানে। লেখন	...	৯৮৭
The dewdrop knows the sun only	...	৭৪০
শিল্পির-সিঁদু বন-মর্মর। লেখন	...	৭৬১
শিল্পিরের শালা গাথা শরতের তৃণ-সূচিতে। লেখন	...	৭৮৭
শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল। পূরবী	...	৭৪০
শুক বলে, 'গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য'। পরিশেষ, সংযোজন	...	৭৪১
শুকতারা মনে করে শব্দ একা মোর ভরে। লেখন	...	৭৪০
The morning star whispers to Dawn	...	৭৪১
শুধারো না, কবে কোন্ গান। মহুয়া, [প্রবেশক]	...	৮২০
শুধারো না মোর তুমি মৃষ্টি কোথা। পরিশেষ	...	৮২০

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু। গীতালি	৩৭৭
শুভখন আসে সহসা আলোক জেবলে। মহুয়া	৮৩১
শূন্য ছিল মন, নানা কোলাহলে ঢাকা। উৎসর্গ	৮২
শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে। গীতালি	৩৮৪
শেষ লেখাটার খাতা। পরিশেষ	৯০৭
শেষের মধ্যে অশেষ আছে। গীতালি	২৮৬
শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি। পূরবী	৬১৪
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে। গীতিমালা	৩৩৮
শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না। মহুয়া	৮০৬
সংগীতে যখন সত্য শোনে। লেখন	
Truth smiles in beauty when she beholds	৭৩৬
সংসারেতে আর-যাহারা আমার ভালোবাসে। গীতালি	২৮৪
সকল চাঁপই দেয় মোর প্রাণে আনি। লেখন	
Each rose that comes brings me greetings	৭৪০
সকল দাবি ছাড়বি যখন। গীতিমালা	৩৩৪
সকালবেলায় ঘাটে যেদিন। খেয়া	১৬৬
সকাল-সাঁজের ধার যে ওরা নানা কাজে। গীতিমালা	৩৪৭
সকালের আলো এই বাদলবাতাসে। পরিশেষ	৯৬৭
সত্য তার সীমা ভালোবাসে। লেখন	
Truth loves its limits	৭৪৫
সন্ধ্যা হল, একলা আছি বলে। গীতালি	৪০৫
সন্ধ্যা হল গো। গীতিমালা	৩৫৭
সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন। পূরবী	৬৭৮
সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল। গীতালি	৪১১
সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ। পূরবী	৬৩১
সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে। লেখন	
The day's cup that I have emptied	৭৪৬
সন্ধ্যায় প্রদীপ মোর রাত্রির তারারে। লেখন	৭৫০
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলিমের স্রোতখানি বাঁকা। বলাকা	৪৭৭
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার। শিশু	৫৩
সব ঠাই মোর ঘর আছে। উৎসর্গ	৭৩
সব-পেরেছি'র দেশে কারো। খেয়া	১৮৬
সব লেখা লুপ্ত হয়, বারংবার লিখিবার ভরে। পরিশেষ	৯০৭
সবা হতে রাখব তোমায়। গীতালি	২৩৭
সভা যখন ভাঙবে তখন। গীতালি	২৩৯
সভার তোমার থাকি সবার শাসনে। গীতিমালা	৩৩২
সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা। লেখন	
The light that fills the sky	৭৬১
সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে লক্ষহীন মাঠে। বনবাণী	৮৬৬
সরিরে দিরে আমার ঘুমের পর্দাখানি। গীতালি	৪০৭
সরে যা, ছেড়ে দে পথ। পরিশেষ	৯৫২
সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী। বলাকা	৪৮২
সহজ হবি সহজ হবি। গীতালি	৩৯১
সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে। মহুয়া	৮০০
সাগরের কানে জোয়ার বেলায়। লেখন	
The shore whispers to the sea	৭৪৭
সাল হরেছে রস। উৎসর্গ	১০৫
স্বপ্ন-আটটে সাতাল' আমি বলেছিলাম বলে। শিশু ভোজনান্য	৫৪৯
স্বপ্না জীবন দিল আলো। গীতালি	৪০৬

ছয়। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
সীমার মাঝে অসীম, তুমি। গীতাঞ্জলি	২৬৬
সুখে আমার রাখবে কেন। গীতাঞ্জলি	৩৬৮
সুখের মাঝে তোমার দেখেছি। গীতাঞ্জলি	৪১৫
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে। গীতাঞ্জলি	২৩৪
সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া। মহুয়া	৮৪১
সুন্দর ঝটে তব অঙ্গদখানি। গীতিমালা	৩১৬
সুন্দর ভক্তির ফুল অলঙ্কো নিভৃত তব মনে। পরিণেশ, সংযোজন	৯৮২
সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে। লেখন	
The tree gazes in love at the beautiful shadow	৭২৪
সুন্দরী তুমি শূকতারা। মহুয়া	৭৮২
সুশ্রুত জড়িমাধোরে। পূর্ববী	৬৪৪
সূর্য যখন উড়ালো কেতন। পরিণেশ	৮৯৭
সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল। লেখন	৭৫০
সূর্যমুখীর বর্ণে বসন। মহুয়া	৭৭৭
সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পরিণত ফল। লেখন	
Flushed with the glow of sunset	৭৪০
সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব। পূর্ববী, সংযোজন	৭০৪
সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি হে আলোক। বনবাণী	৮৭৬
সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরলো ফুলে ফুলে। মহুয়া	৮০৯
সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব। মহুয়া	৮১১
সে তো সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে। উৎসর্গ	১১১
সে যে পাশে এসে বসেছিল। গীতাঞ্জলি	২৩০
সে যেন খসিয়া-পড়া তারা। মহুয়া	৮১৮
সে যেন গ্রামের নদী। মহুয়া	৮১৯
সেই তো আমি চাই। গীতাঞ্জলি	৩৮৩
সেই ভালো প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান। পূর্ববী	৬৫৮
সেটুকু তোর অনেক আছে। খেয়া	১৫৯
সেদিন উষার নববীণা ঝংকারে। পরিণেশ	৯৩৯
সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো। উৎসর্গ	১০০
সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে। পরিণেশ	৯৭২
সেদিনে আপদ আমার মাঝে কেটে। গীতিমালা	৩৫১
সোদালের ডালের ডগায়। পরিণেশ	৯৬১
সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও। লেখন	৭৫০
সোম মঙ্গল বৃধ এরা সব। শিশু ভোলানাথ	৫৪৭
স্থলিত পালখ ধুলার জীর্ণ। লেখন	
Feathers lying in the dust	৭০২
স্তম্ভ অতল শব্দবিহীন মহাসমুদ্রতলে। লেখন	
The world is the ever changing foam	৭০৮
স্তম্ভ হয়ে কেন্দ্র আছে না দেখা যায় তারে। লেখন	
The centre is still and silent	৭৪৮
স্তম্ভরূপে একদিন নিদ্রাহীন। পূর্ববী	৬২১
স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি। গীতিমালা	২১৭
স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই। শিশু	৪৬
স্পষ্ট মনে জাগে। পরিণেশ	৯২১
স্বপ্নলিলা তার পাখায় পেল। লেখন	
My thoughts, like sparks	৭২৪
স্বপ্ন আমার জোনাকি। লেখন	
My fancies are fireflies	৭২৩
স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে। পূর্ববী	৬৮৪
স্বপ্ন কোথায় জানিস কি তা ভাই। বলাকা	৪৬৯
স্বপ্নসুখ-ঢালা এই প্রভাতের বৃকে। পূর্ববী	৬৬১

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
স্বপ্ন সেও স্বপ্ন নয়, বড়োকে ফেলে ছেয়ে। লেখন The world ever knows ...	৭৩৬
হঠাৎ আমার হল মনে। পলাতকা ...	৫২২
হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা। লেখন ...	৭৫২
হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই। লেখন ...	৭৬৬
হাওয়া লাগে গানের পালে। গীতিমাল্য ...	৩৪২
হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি। পরিশেষ ...	৯৪৭
হার গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা। উৎসর্গ ...	৭৯
হার রে তোরে রাখব ধরে। পূরবী ...	৬৭৬
হার রে ভিক্ষু, হার রে। পরিশেষ ...	৯২৪
হার-মানা হার পরাব তোমার গলে। গীতিমাল্য ...	৩১৩
হাসিমুখ নিরে যায় ঘরে ঘরে। মহুয়া ...	৮২০
হাসির কুসুম আনিল সে, ডালি ভরি'। পূরবী ...	৬২৬
হিংসার উন্মত্ত পৃথবী। পরিশেষ, সংযোজন ...	৯৮৫
হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার বত। লেখন The world suffers most from the disinterested ...	৭৩৭
হিমালয় গিরিপথে চলিছিন্ কবে বালাকালে। বনবাণী ...	৮৭৪
হিসাব আমার মিলবে না তা জানি। গীতালি ...	৩৯৮
হৃদয় আমার প্রকাশ হল। গীতালি ...	৩৭৪
হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার। লেখন ...	৭৫১
হে অন্তরের ধন। গীতিমাল্য ...	৩৪৪
হে অশেষ, তব হাতে শেষ। পূরবী ...	৬৪৯
হে আমার ফুল, ভোগী মূর্খের মালে। লেখন My flower, seek not thy paradise ...	৭২৯
হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে। পূরবী, সংযোজন ...	৭০৮
হে জরতী, অন্তরে আমার। পরিশেষ ...	৯৫৬
হে দুরার, তুমি আছ মূর্ত্ত অনুরক্ত। পরিশেষ ...	৯০৬
হে ধরণী, কেন প্রতিদিন। পূরবী ...	৬২৭
হে নিম্নতম গিরিরাজ, অভভেদী তোমার সংগীত। উৎসর্গ ...	৮৪
হে পথিক কোন খানে। পূরবী, সংযোজন ...	৭০৬
হে পথিক, তুমি একা। পরিশেষ ...	৯২৬
হে পবন কর নাই গোল। বনবাণী ...	৮৭৭
হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে নিজ হাতে। বলাকা ...	৪৫৪
হে প্রেম, বন্ধন কমা কর তুমি সব অভিমান ত্যজে। লেখন Love punishes when it forgives ...	৭৩৯
হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা। লেখন Let not my love be a burden on you ...	৭৩৬
হে বিদেশী ফুল, ববে আমি পুছিলাম। পূরবী ...	৬৬২
হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল। বলাকা ...	৪৫০
হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে। উৎসর্গ ...	৭৬
হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে। উৎসর্গ, সংযোজন ...	১১৮
হে ভুবন আমি বতকল। বলাকা ...	৪৬৩
হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া। লেখন The sea of danger, doubt and denial ...	৭৩৩
হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে। বনবাণী ...	৮৭৬
হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে। গীতালি ...	২৫৫
হে মোর দুর্ভাগ্য দেশ, যাদের করেছ অপমান। গীতালি ...	২৫৮
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ। গীতালি ...	২৫২
হে মোর সুন্দর, যেতে যেতে। বলাকা ...	৪৫৬

ছন্দ। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

হে রাজন্, তুমি আমারে বাঁশ বাজাবার। উৎসর্গ	...	৭৯
হে সমুদ্র, স্তম্ভাচিন্তে শুনোছিন্, গজর্ন তোমার। পূরণী	...	৬৪০
হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী। পরিশেষ	...	১২৩
হে 'হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার। উৎসর্গ	...	৮৬
হেথা যে গান গাইতে আসা আমার। গীতাজলি	...	২১৬
হেথায় তিনি কোল পেতেছেন। গীতাজলি	...	২২২
হোরি অহরহ তোমারি বিরহ। গীতাজলি	...	২০৯

All the delights that I have felt। লেখন	...	৭৬২
---	-----	-----

Beauty knows to say, "Enough"। লেখন	...	৭৫৮
Between the shores of Me and Thee। লেখন	...	৭৫৮
Bigotry tries to keep truth safe। লেখন	...	৭৫৪

Day with its glare of curiosity। লেখন	...	৭৬২
---------------------------------------	-----	-----

Emancipation from the bondage of the soil। লেখন	...	৭৬৩
---	-----	-----

Forests, the clouds of earth। লেখন	...	৭৫৭
Form is in Matter, rhythm in Force। লেখন	...	৭৬০

God honoured me with his fight। লেখন	...	৭৬০
God loves to see in me not his servant। লেখন	...	৭৫৮
God seeks comrades and claims love। লেখন	...	৭৫৪
Gods, tired of paradise, envy man। লেখন	...	৭৫৫

He owns the world who knows its law। লেখন	...	৭৫৭
History slowly smothers its truth। লেখন	...	৭৫৮

I am able to love my God। লেখন	...	৭৫৮
I decorate with futile fancies my idle moments। লেখন	...	৭৫৭
In my life's garden my wealth। লেখন	...	৭৬৪
In my love I pay my endless debt to thee। লেখন	...	৭৫৬
In the mountain, stillness surges up। লেখন	...	৭৫৪
It is easy to make faces at the sun। লেখন	...	৭৫৮

Leave out my name from the gift। লেখন	...	৭৫০
Let me not grope in vain in the dark। লেখন	...	৭৬০
Let not my thanks to thee rob my silence। লেখন	...	৭৬৪

ছন্দ। গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
Let thy touch thrill my life's strings। লেখন	৭৫৯
Life sends up in blades of grass। লেখন	৭৫৯
Life's aspiration comes in the guise। লেখন	৭৬৪
Life's errors cry for the merciful beauty। লেখন	৭৫৬
Like the tree its leaves, I scatter my speech। লেখন	৭৬০
Memory, the priestess। লেখন	৭৫০
Men form constellations with stars। লেখন	৭৬৪
Mistakes live in the neighbourhood of truth। লেখন	৭৬২
Mother with her ancient tree। লেখন	৭৫৬
My faith in truth, my vision of the perfect। লেখন	৭৬০
My heart today smiles at its past night। লেখন	৭৫৬
My life has its play of colours through। লেখন	৭৬৪
My mind has its true union with thee। লেখন	৭৬০
My mind starts up at some flash। লেখন	৭৫০
My self's burden is lightened। লেখন	৭৫৬
My songs are to sing that I have। লেখন	৭৬৪
My soul tonight loses itself। লেখন	৭৬০
Pearl shell cast up by the sea। লেখন	৭৬৪
Pride engraves his frowns in stones। লেখন	৭৫৭
Profit laughs at goodness। লেখন	৭৫৮
Realism boasts of its burden of sands। লেখন	৭৫৭
Some have thought deep। লেখন	৭৬২
Sorrow that has lost its memory। লেখন	৭৫৪
The bottom of the pond, from its dark। লেখন	৭৫৬
The breeze whispers to the lotus। লেখন	৭৫৫
The child ever dwells in the mystery। লেখন	৭৫৫
The darkness of night, like pain। লেখন	৭৫৭
The departing night's one kiss। লেখন	৭৫৪
The Devil's wares are expensive। লেখন	৭৫৭
The freedom of the wind and the bondage। লেখন	৭৫৫
The fruit that I have gained for ever। লেখন	৭৬৪
The hill in its longing for the far away। লেখন	৭৫৭
The immortal, like a jewel। লেখন	৭৫৪
The inner world rounded in my life। লেখন	৭৬০
The jasmine's lisp of love to the sun। লেখন	৭৫৫
The lonely light of the sky comes through। লেখন	৭৫৪
The lotus offers its beauty to the heaven। লেখন	৭৬২
The man proud of his sect। লেখন	৭৫৯
The morning lamp on the lamp post। লেখন	৭৫৮
The mountain fir keeps hidden। লেখন	৭৫৯
The muscle that has a doubt of its wisdom। লেখন	৭৫৬

ছত্র। গ্রন্থ

পৃষ্ঠা

The night's loneliness is maintained। লেখন	...	৭৫৫
The obsequious brush curtails truth। লেখন	...	৭৫৭
The right to possess foolishly boasts। লেখন	...	৭৫৯
The rose is a great deal more। লেখন	...	৭৫৯
The soil in return for her service। লেখন	...	৭৫৮
The sun's kiss mellows the miserliness। লেখন	...	৭৬২
The tapestry of life's story is woven। লেখন	...	৭৬০
The tyrant claims freedom to kill freedom। লেখন	...	৭৫৫
The weak can be terrible। লেখন	...	৭৫৬
There are seekers of wisdom। লেখন	...	৭৬০
There is a light laughter in the steps। লেখন	...	৭৫৫
They expect thanks for the banished nest। লেখন	...	৭৫৬
Those thoughts of mine that soar। লেখন	...	৭৬০
To carry the burden of the instrument। লেখন	...	৭৫৯
To justify their own spilling। লেখন	...	৭৫৮
True end is not in the reaching of the limit। লেখন	...	৭৫৯
Unimpassioned benevolence। লেখন	...	৭৫৫
Vacancy in my life's flute। লেখন	...	৭৬০
Wealth is the burden of bigness। লেখন	...	৭৫৮
When peace is active sweeping its dirt। লেখন	...	৭৫৫
Your calumny against the great। লেখন	...	৭৫৬